দশ খণ্ডে সমাপ্ত স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলীর

স্বামী বিবেকানন্দের

বাণী ও রচনা

জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

তৃতীয় খণ্ড

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামীজীর বাণী ও রচনার তৃতীয় খণ্ডে ধর্ম- ও দর্শন-বিষয়ক বক্তৃতা ও লেখা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকাংশই বক্তৃতা, কয়েকটি মাত্র পত্র ও প্রবন্ধাকারে লেখা।

প্রথমাংশ 'ধর্মবিজ্ঞান' পুস্তকাকারে উদ্বোধন-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত, ইহা স্বামী সারদানন্দ-সম্পাদিত 'Science and Philosophy of Religion' গ্রন্থের অনুবাদ। প্রথমে ইহা 'জ্ঞানযোগ—২য় ভাগ' নামে আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হয়।

'ধর্মসমীক্ষা' উদ্বোধন-প্রকাশিত 'Study of Religion' গ্রন্থের নূতন বাংলা অনুবাদ। তৃতীয়াংশ 'ধর্ম, দর্শন ও সাধনা'—ইংরেজী গ্রন্থাবলী (Complete Works) হইতে সংগৃহীত।

'বেদান্তের আলোকে' প্রধানতঃ উদ্বোধন-প্রকাশিত 'Thoughts on Vedanta' গ্রন্থেরই অনুবাদ; তবে প্রথমটি ও শেষ তিনটি বক্তৃতা নূতন সংযোজন। হার্ভার্ড-বক্তৃতাটি দ্বিতীয় খণ্ডে গিয়াছে, তাই এখানে বাদ গেল।

'যোগ ও মনোবিজ্ঞান'-বিষয়ক বক্তৃতা ও লেখাগুলি ইংরেজী গ্রন্থাবলী হইতে চয়ন করিয়া শেষে নিবদ্ধ হইল।

ধর্ম ও দর্শন-বিষয়ক বহু তথ্য ও টীকা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে, পুনরুক্তি হইবে বলিয়া আর এই খণ্ডে দেওয়া হইল না।

এই গ্রন্থাবলী-প্রকাশে যে-সকল শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বর্তমান গ্রন্থাবলীর প্রচ্ছদপট তাঁহারই পরিকল্পনা।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' প্রকাশে আংশিক অর্থসাহায্য করিয়া আমাদের প্রাথমিক প্রেরণা দিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

ধর্মবিজ্ঞান

(সাংখ্য ও বেদান্ত-মতের আলোচনা)

অনুবাদকের নিবেদন হইতে

এই গ্রন্থখানি উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত 'The Science and Philosophy of Religion' নামক সমগ্র পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহার অন্তর্গত বক্তৃতাগুলি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নিউ ইয়র্কে একটি ক্ষুদ্র ক্লাসের সমক্ষে প্রদত্ত হয়। ঐগুলি তখনই সাঙ্কেতিক লিপি দ্বারা গৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতি অল্পদিন মাত্র 'জ্ঞানযোগ—২য় ভাগ' নামে আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হয়। তাহারই কিছু পরে উহা স্বামী সারদানন্দ-কর্তৃক সংশোধিত হইয়া উদ্বোধন আফিস হইতে বাহির হয়। এতদিন 'উদ্বোধনে' উহার বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল।...

এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, উভয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে ঐক্য ও কোন্ কোন্ বিষয়েই বা অনৈক্য, তাহা উত্তমরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে, আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যেগুলি না বুঝিলে ধর্ম জিনিসটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না—আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া এই গ্রন্থে আলোচিত হওয়াতে গ্রন্থের 'ধর্মবিজ্ঞান' নামকরণ বোধ হয় অনুচিত হয় নাই। অনুবাদ মূলানুযায়ী অথচ সুবোধ্য করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। যে-সকল স্থানে সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারই মূল পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে ঐ-সকল উদ্ধৃতাংশের অনুবাদ যথাযথ নয়—সেই-সকল স্থলে প্রায় কোন্ গ্রন্থের কোন্ স্থান-অবলম্বনে ঐ অংশ লিখিত হইয়াছে, পাদটীকায় তাহার উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে। কয়েকটি স্থলে স্বামীজীর লেখায় আপাততঃ অসঙ্গতি বোধ হয়—অনুবাদে সেই স্থলগুলির কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়া অনুবাদকের বুদ্ধি-অনুযায়ী পাদটীকায় উহাদের সামঞ্জস্যের চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্যান্য কয়েকটি আবশ্যকীয় পাদটীকাও প্রদত্ত হইয়াছে।......ইতি

মাঘ, ১৩১৬ — বিনীতানুবাদকস্য

ইংরেজী সংস্করণের

সম্পাদকীয় ভূমিকা হইতে

কোন বিজ্ঞান একত্বে উপনীত হইলে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না—ঐক্যই চূড়ান্ত। যে অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তা হইতে বিশ্বের সব কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহার অতীত কোন বস্তু চিন্তা করা যায় না।… অদ্বৈতভাবের শেষ কথা—'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই সেই। গ্রন্থের শেষে (লেখকের) এই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের ঋষিগণ এই সুস্পষ্ট ও অসমসাহসিক দাবি করিয়াছেন যে, তাঁহারা ধর্মরাজ্যে এরূপ একত্বে পৌঁছিয়া ধর্মকে একটি পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসম্পন্ন বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান যে-সকল পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে, ঋষিগণও সে-সব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পদ্ধতিগুলি এই: আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্যসমূহের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ, এবং সেই সত্যগুলি আবিষ্কার করিবার জন্য প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলির সমন্বয়। কপিল, ব্যাস, পতঞ্জলি এবং ভারতের সকল দার্শনিক ও অধিকাংশ বৈদিক ঋষিই যে তাঁহাদের আবিষ্কারে পৌঁছিতে এ-সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই বিষয়টি গ্রন্থকার তাঁহার বিভিন্ন যোগ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন।

ভাসাভাসা ভাবে দেখিলে দাবিগুলি বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য মনে হইলেও সেগুলি খণ্ডন করিবার শক্তি বা ইচ্ছা কাহারও হয় নাই। যে-সকল দার্শনিক পথ হারাইয়া এ-বিষয়ে একটু চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষা, উহার প্রকাশভঙ্গী ও কল্পনা, সূত্রগুলির অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাব এবং কাল-সঞ্চিত আবর্জনা দ্বারা সর্বদা বিব্রত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইতে হইয়াছে; আর ভারতীয় মন মহৎ আবিষ্কারের অমানুষিক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ শ্রান্ত হইয়া যুগযুগান্ত-ব্যাপী নিদ্রায় কাল কাটাইতেছিল। আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নয়, এই কার্য সাধনের জন্য এবং ভারতে ও বিদেশে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মহান্ সত্য প্রয়োগ করিবার উপায় শিক্ষা দিবার জন্য ধর্মভূমি ভারতের বর্তমান পুনর্জাগরণ এবং তৎসহ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদর্শন ও স্বামী বিবেকানন্দের ঈশ্বরদত্ত

প্রতিভার প্রয়োজন ছিল, কারণ একান্ত ভারতীয় বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য সর্বদাই ভারতীয় মন আবশ্যক।

স্বামীজীর মহত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, ১৮৯৬ খৃঃ প্রথমভাগে নিউ ইয়র্কে শিক্ষার্থীদের একটি ক্ষুদ্র সমাবেশে কোন নোট ছাড়াই এই সাতটি ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় সাঙ্কেতিক লিপিতে বক্তৃতাগুলি লিখিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়াই এত দীর্ঘকাল পরে আমাদের পক্ষে এগুলি বর্তমান আকারে মুদ্রিত করা সম্ভব হইয়াছে। ১৮৯৭ খৃঃ প্রথমভাগে যখন সম্পাদক[১] আমেরিকায় ছিলেন, তখন তিনি সম্পাদনার কাজ করিতে অনুরুদ্ধ হন, এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

১ স্বামী সারদানন্দ

সূচনা

আমাদের এই জগৎ—এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ—যাহার তত্ত্ব আমরা যুক্তি- ও বুদ্ধি-বলে বুঝিতে পারি, তাহার উভয় দিকেই অনন্ত, উভয় দিকেই অজ্ঞেয়—'চির-অজ্ঞাত' বিরাজমান। যে জ্ঞানালোক জগতে 'ধর্ম' নামে পরিচিত, তাহার তত্ত্ব এই জগতেই অনুসন্ধান করিতে হয়; যে-সকল বিষয়ের আলোচনায় ধর্মলাভ হয়, সেগুলি এই জগতেরই ঘটনা। স্বরূপতঃ কিন্তু ধর্ম অতীন্দ্রিয় ভূমির অধিকারভুক্ত, ইন্দ্রিয়-রাজ্যের নয়। উহা সর্বপ্রকার যুক্তিরও অতীত, সুতরাং উহা বুদ্ধির রাজ্যেরও অধিকারভুক্ত নয়। উহা দিব্যদর্শন-স্বরূপ—মানব মনে ঈশ্বরীয় অলৌকিক প্রভাবস্বরূপ, উহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান, উহাতে অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত অপেক্ষা আমাদের অধিক পরিচিত করিয়া দেয়, কারণ জ্ঞান কখন 'জ্ঞাত' হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস, মানব-সমাজের প্রারম্ভ হইতেই মানব-মনে এই ধর্মতত্ত্বের অনুসন্ধান চলিয়াছে। জগতের ইতিহাসে এমন সময় কখনই হয় নাই, যখন মানব-যুক্তি ও মানব-বুদ্ধি এক জগদতীত বস্তুর জন্য এই অনুসন্ধান—এই প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়াছে।

আমাদের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে—এই মানব-মনে—আমরা দেখিতে পাই, একটি চিন্তার উদয় হইল; কোথা হইতে উহার উদয় হইল, তাহা আমরা জানি না; আর যখন উহা তিরোহিত হইল, তখন উহা যে কোথায় গেল, তাহাও আমরা জানি না। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ যেন একই পথে চলিয়াছে, এক প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া যেন উভয়কেই চলিতে হইতেছে, উভয়েই যেন এক সুরে বাজিতেছে।

এই বক্তৃতাসমূহে আমি আপনাদের নিকট হিন্দুদের এই মত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব যে, ধর্ম মানুষের ভিতর হইতেই উৎপন্ন, উহা বাহিরের কিছু হইতে হয় নাই। আমার বিশ্বাস, ধর্মচিন্তা মানবের প্রকৃতিগত; উহা মানুষের স্বভাবের সহিত এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, যতদিন না সে নিজ দেহমনকে অস্বীকার করিতে পারে, যতদিন না সে চিন্তা ও জীবন-ভাব ত্যাগ করিতে পারে, ততদিন তাহার পক্ষে ধর্ম ত্যাগ করা অসম্ভব। যতদিন মানবের চিন্তাশক্তি থাকিবে, ততদিন এই চেষ্টাও চলিবে এবং ততদিন কোন-না-কোন

আকারে তাহার ধর্ম থাকিবেই থাকিবে। এই জন্যই আমরা জগতে নানা প্রকারের ধর্ম দেখিতে পাই। অবশ্য এই আলোচনা আমাদের হতবুদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে যে এরূপ চর্চাকে বৃথা কল্পনা মনে করেন, তাহা ঠিক নয়। নানা আপাতবিরোধী বিশৃঙ্খলার ভিতর সামঞ্জস্য আছে, এই-সব বেসুরা-বেতালার মধ্যেও ঐকতান আছে; যিনি উহা শুনিতে প্রস্তুত, তিনিই সেই সুর শুনিতে পাইবেন।

বর্তমান কালে সকল প্রশ্নের মধ্যে প্রধান প্রশ্ন এই: মানিলাম, জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের উভয় দিকেই অজ্ঞেয় ও অনন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে, কিন্তু ঐ অনন্ত অজ্ঞাতকে জানিবার চেষ্টা কেন? কেন আমরা জ্ঞাতকে লইয়াই সন্তুষ্ট না হই? কেন আমরা ভোজন, পান ও সমাজের কিছু কল্যাণ করিয়াই সন্তুষ্ট না থাকি? এই ভাবের কথাই আজকাল চারিদিকে শুনিতে পাওয়া যায়। খুব বড় বড় বিদ্বান্ অধ্যাপক হইতে অনর্গল কথা-বলা শিশুর মুখেও আমরা আজকাল শুনিয়া থাকি—জগতের উপকার কর, ইহাই একমাত্র ধর্ম, জগদতীত সত্তার সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করায় কোন ফল নাই। এই ভাবটি এখন এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই জগদতীত সত্তার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া থাকিবার জো আমাদের নাই। এই বর্তমান ব্যক্ত জগৎ সেই অব্যক্তের এক অংশমাত্র। এই পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ যেন সেই অনন্ত আধ্যাত্মিক জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ—আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং জগদতীতকে না জানিলে কিরূপে উহার এই ক্ষুদ্র প্রকাশের ব্যাখ্যা হইতে পারে, উহাকে বুঝা যাইতে পারে? কথিত আছে, সক্রেটিস্ একদিন এথেন্সে বক্তৃতা দিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার সহিত এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়—ইনি ভারত হইতে গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'মানুষকে জানাই মানবজাতির সর্বোচ্চ কর্তব্য—মানবই মানবের সর্বোচ্চ আলোচনার বস্তু।' ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিলেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বরকে না জানিতেছেন, ততক্ষণ মানুষকে কিরূপে জানিবেন?' এই ঈশ্বর, এই চির অজ্ঞেয় বা নিরপেক্ষ সত্তা, বা অনন্ত, বা নামের অতীত বস্তু—তাঁহাকে যে নামে ইচ্ছা তাহাতেই ডাকা যায়—এই

বর্তমান জীবনের যাহা কিছু জ্ঞাত ও যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলেরই একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ। যে-কোন বস্তুর কথা—নিছক জড়বস্তুর কথা ধরুন। কেবল জড়-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে-কোন একটি, যথা—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত-জ্যোতিষ বা প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার কথা ধরুন, উহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করুন, ঐ তত্ত্বানুসন্ধান ক্রমশঃ অগ্রসর হউক, দেখিবেন স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থে লয় পাইতেছে, শেষে ঐগুলি এমন স্থানে আসিবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বস্তু ছাড়িয়া একেবারে অজড়ে বা চৈতন্যে যাইতেই হইবে। জ্ঞানের সকল বিভাগেই স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মে মিলাইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা দর্শনে পর্যবসিত হয়।

এইরূপে মানুষকে বাধ্য হইয়া জগদতীত সত্তার আলোচনা করিতে হয়। যদি আমরা ঐ তত্ত্ব জানিতে না পারি, তবে জীবন মরুভূমি হইবে, মানবজীবন বৃথা হইবে। এ-কথা বলিতে ভাল যে, বর্তমানে যাহা দেখিতেছ, তাহা লইয়াই তৃপ্ত থাকো; গোরু, কুকুর ও অন্যান্য পশুগণ এইরূপ বর্তমান লইয়াই সন্তুষ্ট, আর ঐ ভাবই তাহাদিগকে পশু করিয়াছে। অতএব যদি মানুষ বর্তমান লইয়া সন্তুষ্ট থাকে এবং জগদতীত সত্তার অনুসন্ধান একেবারে পরিত্যাগ করে, তবে মানবজাতিকে পশুর স্তরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ধর্মই—জগদতীত সত্তার অনুসন্ধানই মানুষ ও পশুতে প্রভেদ করিয়া থাকে। এটি অতি সুন্দর কথা, সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই স্বভাবতঃ উপরের দিকে চাহিয়া দেখে; অন্যান্য সকল জন্তুই স্বভাবতঃ নীচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। এই ঊর্ধ্বদৃষ্টি, ঊর্ধ্বদিকে গমন ও পূর্ণত্বের অনুসন্ধানকেই 'পরিত্রাণ' বা 'উদ্ধার' বলে; আর যখনই মানুষ উচ্চতর দিকে গমন করিতে আরম্ভ করে, তখনই সে এই পরিত্রাণ-রূপ সত্যের ধারণার দিকে নিজেকে উন্নীত করে। পরিত্রাণ—অর্থ, বেশভূষা বা গৃহের উপর নির্ভর করে না, উহা মানুষের মস্তিষ্কস্থ আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। উহাতেই মানবজাতির উন্নতি, উহাই ভৌতিক ও মানসিক সর্ববিধ উন্নতির মূল; ঐ প্রেরণাশক্তিবলে—ঐ উৎসাহ-বলেই মানবজাতি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া থাকে।

ধর্ম—প্রচুর অন্ন ও পানে নাই, অথবা সুরম্য হর্ম্যেও নাই। বারংবার ধর্মের বিরুদ্ধে আপনারা এই আপত্তি শুনিতে পাইবেন: ধর্মের দ্বারা কি উপকার

হইতে পারে? উহা কি দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করিতে পারে? মনে করুন, উহা যেন পারে না, তাহা হইলেই কি ধর্ম অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল? মনে করুন, আপনি একটি জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন—একটি শিশু দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ইহাতে কি মনোমত খাবার পাওয়া যায়?' আপনি উত্তর দিলেন—'না, পাওয়া যায় না।' তখন শিশুটি বলিয়া উঠিল, 'তবে ইহা কোন কাজের নয়।' শিশুরা তাহাদের নিজেদের দৃষ্টি হইতে অর্থাৎ কোন্ জিনিসে কত ভাল খাবার পাওয়া যায়, এই হিসাবে সমগ্র জগতের বিচার করিয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া শিশুসদৃশ, সংসারের সেই শিশুদের বিচারও ঐরূপ। নিম্নভূমির দৃষ্টি হইতে উচ্চতর বস্তুর বিচার করা কখনই কর্তব্য নয়। প্রত্যেক বিষয়ই তাহার নিজস্ব মানের দ্বারা বিচার করিতে হইবে। অনন্তের দ্বারাই অনন্তকে বিচার করিতে হইবে। ধর্ম সমগ্র মানবজীবনে অনুস্যূত, শুধু বর্তমানে নয়—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সর্বকালে। অতএব ইহা অনন্ত আত্মা ও অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে অনন্ত সম্বন্ধ। অতএব ক্ষণিক মানবজীবনের উপর উহার কার্য দেখিয়া উহার মূল্য বিচার করা কি ন্যায়সঙ্গত?—কখনই নয়। এগুলি সব নেতিমূলক যুক্তি।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, ধর্মের দ্বারা কি প্রকৃতপক্ষে কোন ফল হয়? হাঁ, হয়; উহাতে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে। মানুষ বর্তমানে যাহা, তাহা এই ধর্মের শক্তিতেই হইয়াছে, আর উহাই এই মনুষ্য-নামক প্রাণীকে দেবতা করিবে। ধর্মই ইহা করিতে সমর্থ। মানবসমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দাও—কি অবশিষ্ট থাকিবে? তাহা হইলে এই সংসার শ্বাপদসমাকীর্ণ অরণ্য হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়সুখ মানবজীবনের লক্ষ্য নয়, জ্ঞানই সমুদয় প্রাণীর লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, পশুগণ ইন্দ্রিয়সুখে যতটা প্রীতি অনুভব করে, মানুষ বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা করিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকে; আর ইহাও আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচালনা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সুখে মানুষ অধিকতর সুখবোধ করিয়া থাকে। অতএব অধ্যাত্মজ্ঞানকে নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিতে হইবে। এই জ্ঞানলাভ হইলে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আসিবে। জাগতিক সকল বস্তুই সেই প্রকৃত জ্ঞান ও আনন্দের ছায়ামাত্র—শুধু তিন-চারি ধাপ নিম্নের প্রকাশ।

আর একটি প্রশ্ন আছে: আমাদের চরম লক্ষ্য কি? আজকাল প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়াছে—ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার লাভ করিবার কোন চরম লক্ষ্য নাই। এই 'ক্রমাগত নিকটবর্তী হওয়া অথচ কখনই লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছানো'—ইহার অর্থ যাহাই হউক, আর এ তত্ত্ব যতই অদ্ভুত হউক, ইহা যে অসম্ভব তাহা অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। সরল রেখায় কি কখন কোন প্রকার গতি হইতে পারে? একটি সরল রেখাকে অনন্ত প্রসারিত করিলে উহা একটি বৃত্তরূপে পরিণত হয়; উহা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেখানেই আবার ফিরিয়া যায়। যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছি, সেখানেই অবশ্য শেষ করিতে হইবে; আর যখন ঈশ্বর হইতে আপনাদের গতি আরম্ভ হইয়াছে, তখন অবশ্যই ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তবে ইতিমধ্যে আর করিবার কি থাকে? ঐ অবস্থায় পৌঁছিবার উপযোগী বিশেষ বিশেষ খুঁটিনাটি কার্যগুলি করিতে হয়—অনন্ত কাল ধরিয়া ইহা করিতে হয়।

আর একটি প্রশ্ন এই: আমরা উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে হইতে কি ধর্মের নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিব না? হাঁও বটে, নাও বটে। প্রথমতঃ এইটি বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম-সম্বন্ধে অধিক আর কিছু জানিবার নাই, সবই জানা হইয়া গিয়াছে। আপনারা দেখিবেন, জগতের সকল ধর্মাবলম্বীই বলিয়া থাকেন, আমাদের ধর্মে একটি একত্ব আছে। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত আত্মার একত্ব-জ্ঞান অপেক্ষা আর অধিক উন্নতি হইতে পারে না। জ্ঞান-অর্থে এই একত্ব-আবিষ্কার। আমি আপনাদিগকে নরনারীরূপে পৃথক্ দেখিতেছি—ইহাই বহুত্ব। যখন আমি ঐ দুইটি ভাবকে একত্র করিয়া দেখি এবং আপনাদিগকে কেবল 'মানবজাতি' বলিয়া অভিহিত করি, তখন উহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হইল। উদাহরণস্বরূপ রসায়নশাস্ত্রের কথা ধরুন। রাসায়নিকেরা সর্বপ্রকার জ্ঞাত বস্তুকে ঐগুলির মূল উপাদানে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর যদি সম্ভব হয়, তবে যে-এক ধাতু হইতে ঐগুলি সব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় আসিতে পারে, যখন তাঁহারা সকল ধাতুর মূল এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিবেন। যদি ঐ অবস্থায় তাঁহারা কখন উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না; তখন রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ণ

হইবে। ধর্মবিজ্ঞান-সম্বন্ধেও ঐ কথা। যদি আমরা পূর্ণ একত্বকে আবিষ্কার করিতে পারি, তবে তাহার উপর আর কোন উন্নতি হইতে পারে না।

তার পরের প্রশ্ন এই: এইরূপ একত্বলাভ কি সম্ভব? ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম ও দর্শনের বিজ্ঞান আবিষ্কার করার চেষ্টা হইয়াছে; কারণ পাশ্চাত্যদেশে যেমন এইগুলিকে পৃথক্‌ভাবে দেখাই রীতি, হিন্দুরা ইহাদের মধ্যে সেরূপ প্রভেদ দেখেন না। আমরা ধর্ম ও দর্শনকে একই বস্তুর দুইটি বিভিন্ন দিক্ বলিয়া বিবেচনা করি, আর আমাদের ধারণা—উভয়েরই তুল্যভাবে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। পরবর্তী বক্তৃতাসমূহে আমি প্রথমে ভারতের—শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের সর্বপ্রাচীন দর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম 'সাংখ্যদর্শন' বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ইহার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা কপিল সমুদয় হিন্দু-মনোবিজ্ঞানের জনক, আর তিনি যে প্রাচীন দর্শনপ্রণালীর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও আজকালকার ভারতীয় সমুদয় প্রচলিত দর্শনপ্রণালীসমূহের ভিত্তিস্বরূপ। এই-সকল দর্শনের অন্যান্য বিষয়ে যত মতভেদ থাকুক না কেন, সকলেই সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছেন।

তারপর আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, সাংখ্যের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বেদান্ত কিভাবে উহারই সিদ্ধান্তগুলিকে লইয়া আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে। কপিল কর্তৃক উপদিষ্ট সৃষ্টি- বা ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের সহিত একমত হইলেও বেদান্ত দ্বৈতবাদকে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়, বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েরই লক্ষ্যস্বরূপ চরম একত্বের অনুসন্ধান বেদান্ত আরও আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। কি উপায়ে ইহা সাধিত হইয়াছে, তাহা এই বক্তৃতাবলীর শেষের বক্তৃতাগুলিতে দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব

দুইটি শব্দ রহিয়াছে—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড; অন্তঃ ও বহিঃ। আমরা অনুভূতি দ্বারা এই উভয় হইতেই সত্য লাভ করিয়া থাকি—আভ্যন্তর অনুভূতি ও বাহ্য অনুভূতি। আভ্যন্তর অনুভূতি দ্বারা সংগৃহীত সত্যসমূহ—মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম নামে পরিচিত; আর বাহ্য অনুভূতি হইতে জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এখন কথা এই, যাহা পূর্ণ সত্য, তাহার সহিত এই উভয় জগতের অনুভূতিরই সামঞ্জস্য থাকিবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সত্যসমূহে সাক্ষ্য প্রদান করিবে, সেরূপ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সত্যে সাক্ষ্য দিবে। বহির্জগতের সত্যের অবিকল প্রতিকৃতি অন্তর্জগতে থাকা চাই, আবার অন্তর্জগতের সত্যের প্রমাণও বহির্জগতে পাওয়া চাই। তথাপি আমরা কার্যতঃ দেখিতে পাই, এই-সকল সত্যের অধিকাংশই সর্বদা পরস্পর-বিরোধী। পৃথিবীর ইতিহাসের একযুগে দেখা যায়, 'অন্তর্বাদী'র প্রাধান্য হইল; অমনি তাঁহারা 'বহির্বাদী'র সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। বর্তমান কালে 'বহির্বাদী' অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, আর তাঁহারা মনস্তত্ত্ববিৎ ও দার্শনিকগণের অনেক সিদ্ধান্ত উড়াইয়া দিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাই, মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত সারভাগের সহিত আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সারভাগের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

প্রকৃতি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সকল বিষয়ে বড় হইবার শক্তি দেন নাই; এইজন্য একই জাতি সর্বপ্রকার বিদ্যার অনুসন্ধানে সমান শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। আধুনিক ইওরোপীয় জাতিগুলি জড়বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে সুদক্ষ, কিন্তু প্রাচীন ইওরোপীয়গণ মানুষের অন্তর্জগতের অনুসন্ধানে তত পটু ছিলেন না। অপর দিকে আবার প্রাচ্যেরা বাহ্য জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে তত দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু অন্তর্জগতের গবেষণায় তাঁহারা খুব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, জড়জগৎ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রাচ্য মতবাদের সহিত পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞানের মিলে না, আবার পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান প্রাচ্যজাতির ঐ-বিষয়ক উপদেশের সহিত মিলে না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ

প্রাচ্য জড়বিজ্ঞানীদের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহা হইলেও উভয়ই সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আর আমরা যেমন পূর্বেই বলিয়াছি, যে-কোন বিদ্যাতেই হউক না, প্রকৃত সত্যের মধ্যে কখন পরস্পর বিরোধ থাকিতে পারে না, আভ্যন্তর সত্যসমূহের সহিত বাহ্য সত্যের সমন্বয় আছে।

ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কি, তাহা আমরা জানি ; আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববাদিগণের কিরূপ ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে ; যেমন যেমন এক-একটি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে, অমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে, আর সেইজন্যই তাঁহারা সকল যুগেই এই-সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ আমরা ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ও তদানুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে প্রাচ্যজাতির মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানদৃষ্টিতে কি ধারণা ছিল, তাহা আলোচনা করিব ; তাহা হইলে আপনারা দেখিবেন যে, কিরূপ আশ্চর্যভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আধুনিকতম আবিষ্ক্রিয়ার সহিত উহাদের সামঞ্জস্য রহিয়াছে ; আর যদি কোথাও কিছু অপূর্ণতা থাকে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকেই। ইংরেজীতে আমরা সকলে Nature (নেচার) শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাচীন হিন্দুদার্শনিকগণ উহাকে দুইটি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিতেন ; প্রথমটি 'প্রকৃতি'—ইংরেজী Nature শব্দের সহিত ইহা প্রায় সমার্থক ; আর দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক নাম—'অব্যক্ত', যাহা ব্যক্ত বা প্রকাশিত বা ভেদাত্মক নয়, উহা হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, উহা হইতে অণু-পরমাণু সমুদয় আসিয়াছে, উহা হইতেই জড়বস্তু ও শক্তি, মন ও বুদ্ধি—সব আসিয়াছে। ইহা অতি বিস্ময়কর যে, ভারতীয় দার্শনিকগণ অনেক যুগ পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন, মন সূক্ষ্ম জড়মাত্র। 'দেহ যেমন প্রকৃতি হইতে প্রসূত, মনও সেরূপ'—ইহা ব্যতীত আমাদের আধুনিক জড়বাদীরা—আর অধিক কি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন? চিন্তা সম্বন্ধেও তাই ; ক্রমশঃ আমরা দেখিব, বুদ্ধিও সেই একই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে প্রসূত।

প্রাচীন আচার্যগণ এই অব্যক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন : তিনটি শক্তির সাম্যাবস্থা। তন্মধ্যে একটির নাম সত্ত্ব, দ্বিতীয়টি রজঃ এবং তৃতীয়টি তমঃ। তমঃ—সর্বনিম্নতম শক্তি, আকর্ষণস্বরূপ ; রজঃ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর—উহা বিকর্ষণস্বরূপ ; আর সর্বোচ্চ শক্তি এই উভয়ের সংযমস্বরূপ—উহাই সত্ত্ব।

অতএব যখনই এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তিদ্বয় সত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ সংযত হয় বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন আর সৃষ্টি বা বিকার থাকে না ; কিন্তু যখনই এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, তখনই উহাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, এবং উহাদের মধ্যে একটি শক্তি অপরগুলি অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া উঠে ; তখনই পরিবর্তন ও গতি আরম্ভ হয় এবং এই সমুদয়ের পরিণাম চলিতে থাকে। এইরূপ ব্যাপার চক্রের গতিতে চলিতেছে। অর্থাৎ এক সময় আসে, যখন সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়, তখন এই বিভিন্ন শক্তিসমুদয় বিভিন্নরূপে সম্মিলিত হইতে থাকে, এবং তখনই এই ব্রহ্মাণ্ড বাহির হয়। আবার এক সময় আসে, যখন সকল বস্তুই সেই আদিম সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে চায়, আবার এমন সময় আসে, যখন সকল অভিব্যক্তির সম্পূর্ণ অভাব ঘটে। আবার কিছুকাল পরে এই অবস্থা নষ্ট হইয়া যায় এবং শক্তিগুলি বহির্দিকে প্রসৃত হইবার উপক্রম করে, আর ব্রহ্মাণ্ড ধীরে ধীরে তরঙ্গাকারে বহির্গত হইতে থাকে। জগতের সকল গতিই তরঙ্গাকারে হয়—একবার উত্থান, আবার পতন।

প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মত এই যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই কিছুদিনের জন্য একেবারে লয়প্রাপ্ত হয় ; আবার অপর কাহারও মত এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষেই এই প্রলয়ব্যাপার সংঘটিত হয়। অর্থাৎ মনে করুন, আমাদের এই সৌরজগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া গেল, কিন্তু সেই সময়েই অন্যান্য সহস্র সহস্র জগতে তাহার ঠিক বিপরীত কাণ্ড চলিতেছে। আমি দ্বিতীয় মতটির অর্থাৎ প্রলয় যুগপৎ সমগ্র জগতে সংঘটিত হয় না, বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ব্যাপার চলিতে থাকে—এই মতটিরই অধিক পক্ষপাতী। যাহাই হউক, মূল কথাটা উভয়ত্রই এক, অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, এই সমগ্র প্রকৃতিই ক্রমান্বয়ে উত্থান-পতনের নিয়মে অগ্রসর হইতেছে। এই সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় গমনকে 'কল্পান্ত' বলে। সমগ্র কল্পটিকে—এই ক্রমবিকাশ ও ক্রম-সঙ্কোচকে—ভারতের ঈশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঈশ্বর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে তাঁহা হইতে যেন জগৎ বাহির হয়, আবার উহা তাঁহাতেই প্রত্যাবর্তন করে। যখন প্রলয় হয়, তখন জগতের কি অবস্থা হয় ? তখনও উহা বর্তমান থাকে, তবে সূক্ষ্মতররূপে বা কারণা-বস্থায় থাকে। দেশ-কাল-নিমিত্ত সেখানেও বর্তমান, তবে উহারা অব্যক্ত-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। এই অব্যক্তাবস্থায় প্রত্যাবর্তনকে ক্রমসঙ্কোচ বা

'প্রলয়' বলে। প্রলয় ও সৃষ্টি বা ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমাভিব্যক্তি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে, অতএব আমরা যখন আদি বা আরম্ভের কথা বলি, তখন আমরা এক কল্পের আরম্ভকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ বহির্ভাগকে—আজকাল আমরা যাহাকে স্থূল জড় বলি, প্রাচীন হিন্দু মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ (পঞ্চ) 'ভূত' বলিতেন। তাঁহাদের মতে ঐগুলিরই একটি অবশিষ্টগুলির কারণ, যেহেতু অন্যান্য সকল ভূত এই এক ভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূত 'আকাশ' নামে অভিহিত। আজকাল 'ইথার' বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা কতকটা তাহারই মতো, যদিও সম্পূর্ণ এক নয়। আকাশই আদিভূত—উহা হইতেই সমুদয় স্থূল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে. আর উহার সঙ্গে 'প্রাণ' নামে আর একটি বস্তু থাকে—ক্রমশঃ আমরা দেখিব, উহা কি। যতদিন সৃষ্টি থাকে, ততদিন এই প্রাণ ও আকাশ থাকে। তাহারা নানারূপে মিলিত হইয়া এই-সমুদয় স্থূল প্রপঞ্চ গঠন করিয়াছে, অবশেষে কল্পান্তে ঐগুলি লয়প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও প্রাণের অব্যক্তরূপে প্রত্যাবর্তন করে। জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে সৃষ্টিবর্ণনাত্মক একটি সূক্ত[১] আছে, সেটি অতিশয় কবিত্বপূর্ণ: 'যখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, তখন কি ছিল ?'

আর ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে: 'ইনি—সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ—গতিশূন্য বা নিশ্চেষ্টভাবে ছিলেন।'

প্রাণ ও আকাশ তখন সেই অনন্ত পুরুষে সুপ্তভাবে ছিল, কিন্তু কোনরূপ ব্যক্ত প্রপঞ্চ ছিল না। এই অবস্থাকে 'অব্যক্ত' বলে—উহার ঠিক শব্দার্থ স্পন্দন-রহিত বা অপ্রকাশিত। একটি নূতন কল্পের আদিতে এই অব্যক্ত স্পন্দিত হইতে থাকে, আর প্রাণ আকাশের উপর ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত করে, আকাশ ঘনীভূত হইতে থাকে, আর ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তিদ্বয়ের বলে পরমাণু গঠিত হয়। এইগুলি পরে আরও ঘনীভূত হইয়া *দ্ব্যণুকাদিতে পরিণত হয় এবং সর্বশেষে প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থ যে যে* উপাদানে নির্মিত, সেই-সকল বিভিন্ন স্থূল ভূতে পরিণত হয়।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, লোকে এইগুলির অতি অদ্ভুত ইংরেজী

---

১ ঋগ্বেদ, ১০।১২৯ (নাসদীয় সূক্ত)।

অনুবাদ করিয়া থাকে। অনুবাদকগণ অনুবাদের জন্য প্রাচীন দার্শনিকগণের ও তাঁহাদের টীকাকারগণের সহায়তা গ্রহণ করেন না, আর নিজেদেরও এত বেশী বিদ্যা নাই যে, নিজে-নিজেই ঐগুলি বুঝিতে পারেন। তাঁহারা 'পঞ্চভূতে'র অনুবাদ করিয়া থাকেন বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি। যদি তাঁহারা ভাষ্যকারগণের ভাষ্য আলোচনা করিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, ভাষ্যকারগণ ঐগুলি লক্ষ্য করেন নাই। প্রাণের বারংবার আঘাতে আকাশ হইতে বায়ু বা আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা উপস্থিত হয়, উহা হইতেই বায়বীয় বা বাষ্পীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়। স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে থাকিলে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। উত্তাপ ক্রমশঃ কমিয়া শীতল হইতে থাকে, তখন ঐ বাষ্পীয় পদার্থ তরল ভাব ধারণ করে, উহাকে 'অপ্' বলে; অবশেষে উহা কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম 'ক্ষিতি' বা পৃথিবী। সর্ব-প্রথমে আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা, তারপর উত্তাপ, তারপর উহা তরল হইয়া যাইবে, আর যখন আরও ঘনীভূত হইবে, তখন উহা কঠিন জড়পদার্থের আকার ধারণ করিবে। ঠিক ইহার বিপরীতক্রমে সব কিছু অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কঠিন বস্তুসকল তরল পদার্থে পরিণত হইবে, তরল পদার্থ কেবল উত্তাপ বা তেজোরাশিতে পরিণত হইবে, তাহা আবার ধীরে ধীরে বাষ্পীয় ভাব ধারণ করিবে, পরে পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হয় এবং সর্বশেষে সমুদয় শক্তির সামঞ্জস্য-অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন স্পন্দন বন্ধ হয়—এইরূপে কল্পান্ত হয়। আমরা আধুনিক জ্যোতিষ হইতে জানিতে পারি যে, আমাদের এই পৃথিবী ও সূর্যের সেই অবস্থা-পরিবর্তন চলিয়াছে, শেষে এই কঠিনাকার পৃথিবী গলিয়া গিয়া তরলাকার এবং অবশেষে বাষ্পাকার ধারণ করিবে।

আকাশের সাহায্য ব্যতীত প্রাণ একা কোন কার্য করিতে পারে না। প্রাণ-সম্বন্ধে আমরা কেবল এইটুকু জানি যে, উহা গতি বা স্পন্দন। আমরা *যা-কিছু গতি দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাণের বিকার, এবং জড় বা ভূত-পদার্থ যা-কিছু আমরা জানি, যা-কিছু আকৃতিযুক্ত বা বাধাদান করে, তাহাই এই আকাশের বিকার।* এই প্রাণ এককভাবে থাকিতে পারে না বা কোন মাধ্যম ব্যতীত কার্য করিতে পারে না, আর উহার কোন অবস্থায়—উহা কেবল প্রাণরূপেই বর্তমান থাকুক অথবা মহাকর্ষ বা কেন্দ্রাতিগা শক্তিরূপ

প্রাকৃতিক অন্যান্য শক্তিতেই পরিণত হউক—উহা কখন আকাশ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না। আপনারা কখন জড় ব্যতীত শক্তি বা শক্তি ব্যতীত জড় দেখেন নাই। আমরা যাহাদিগকে জড় ও শক্তি বলি, সেগুলি কেবল এই দুইটির স্থূল প্রকাশমাত্র, এবং ইহাদের অতি সূক্ষ্ম অবস্থাকেই প্রাচীন দার্শনিকগণ 'প্রাণ' ও 'আকাশ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাণকে আপনারা জীবনীশক্তি বলিতে পারেন, কিন্তু উহাকে শুধু মানুষের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে অথবা আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে বুঝিলেও চলিবে না। অতএব সৃষ্টি প্রাণ ও আকাশের সংযোগে উৎপন্ন, এবং উহার আদিও নাই, অন্তও নাই; উহার আদি-অন্ত কিছুই থাকিতে পারে না, কারণ অনন্ত কাল ধরিয়া সৃষ্টি চলিয়াছে।

তারপর আর একটি অতি দুরূহ ও জটিল প্রশ্ন আসিতেছে। কয়েকজন ইওরোপীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, 'আমি' আছি বলিয়াই এই জগৎ আছে, এবং 'আমি' যদি না থাকি, তবে এই জগৎও থাকিবে না। কখন কখন ঐ কথা এইভাবে প্রকাশ করা হইয়া থাকে—যদি জগতের সকল লোক মরিয়া যায়, মনুষ্যজাতি যদি আর না থাকে, অনুভূতি- ও বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন কোন প্রাণী যদি না থাকে, তবে এই জগৎপ্রপঞ্চও আর থাকিবে না। এ-কথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ক্রমে আমরা স্পষ্টই দেখিব যে, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ইওরোপীয় দার্শনিকগণ এই তত্ত্বটি জানিলেও মনোবিজ্ঞান অনুসারে ইহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। তাঁহারা এই তত্ত্বের আভাসমাত্র পাইয়াছেন।

প্রথমতঃ আমরা এই প্রাচীন মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের আর একটি সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করিব—উহাও একটু অদ্ভুত রকমের—তাহা এই যে, স্থূল ভূতগুলি সূক্ষ্ম ভূত হইতে উৎপন্ন। যাহা কিছু স্থূল, তাহাই কতকগুলি সূক্ষ্ম বস্তুর সমবায়। অতএব স্থূল ভূতগুলিও কতকগুলি সূক্ষ্মবস্তুগঠিত—ঐগুলিকে সংস্কৃতভাষায় 'তন্মাত্রা' বলে। আমি একটি পুষ্প আঘ্রাণ করিতেছি; উহার গন্ধ পাইতে গেলে কিছু অবশ্য আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে। ঐ পুষ্প রহিয়াছে—উহা যে আমার দিকে আসিতেছে, এমন তো দেখিতেছি না; কিন্তু কিছু যদি আমার নাসিকার সংস্পর্শে না আসিয়া থাকে, তবে আমি

গন্ধ পাইতেছি কিরূপে? ঐ পুষ্প হইতে যাহা আসিয়া আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে, তাহাই তন্মাত্রা, ঐ পুষ্পেরই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু; উহা এত সূক্ষ্ম যে, যদি আমরা সারাদিন সকলে মিলিয়া উহার গন্ধ আঘ্রাণ করি, তথাপি ঐ পুষ্পের পরিমাণের কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। তাপ, আলোক এবং অন্যান্য সকল বস্তু সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এই তন্মাত্রাগুলি আবার পরমাণুরূপে পুনর্বিভক্ত হইতে পারে। এই পরমাণুর পরিমাণ লইয়া বিভিন্ন দার্শনিকগণের বিভিন্ন মত আছে; কিন্তু আমরা জানি—ঐগুলি মতবাদ-মাত্র, সুতরাং বিচারস্থলে আমরা ঐগুলিকে পরিত্যাগ করিলাম। এইটুকু জানিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—যাহা কিছু স্থূল তাহা অতি সূক্ষ্ম পদার্থদ্বারা নির্মিত। প্রথম আমরা পাইতেছি স্থূল ভূত—আমরা উহা বাহিরে অনুভব করিতেছি; তার পর সূক্ষ্ম ভূত—এই সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারাই স্থূল ভূত গঠিত, উহারই সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণাদির স্নায়ুর সংযোগ হইতেছে। যে ইথার-তরঙ্গ আমার চক্ষুকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি জানি—আলোক দেখিতে পাইবার পূর্বে চাক্ষুষ স্নায়ুর সহিত উহার সংযোগ প্রয়োজন। শ্রবণ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমাদের কর্ণের সংস্পর্শে যে তন্মাত্রাগুলি আসিতেছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু আমরা জানি—সেগুলি অবশ্যই আছে। এই তন্মাত্রাগুলির আবার কারণ কি? আমাদের মনস্তত্ত্ববিদ্গণ ইহার এক অতি অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তন্মাত্রাগুলির কারণ 'অহংকার' —অহং-তত্ত্ব বা 'অহং-জ্ঞান'। ইহাই এই সূক্ষ্ম ভূতগুলির এবং ইন্দ্রিয়গুলিরও কারণ। ইন্দ্রিয় কোন্‌গুলি? এই চক্ষু রহিয়াছে, কিন্তু চক্ষু দেখে না। চক্ষু যদি দেখিত, তবে মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তো চক্ষু অবিকৃত থাকে, তবে তখনও তাহারা দেখিতে পাইত। কোনখানে কিছুর পরিবর্তন হইয়াছে। কোন-কিছু মানুষের ভিতর হইতে চলিয়া গিয়াছে, আর সেই-কিছু, যাহা প্রকৃতপক্ষে দেখে, চক্ষু যাহার যন্ত্রস্বরূপ মাত্র, তাহাই যথার্থ ইন্দ্রিয়। এইরূপ এই নাসিকাও একটি যন্ত্রমাত্র, উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত একটি ইন্দ্রিয় আছে। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞান আপনাদিগকে বলিয়া দিবে, উহা কি। উহা মস্তিষ্কস্থ একটি স্নায়ুকেন্দ্র মাত্র। চক্ষুকর্ণাদি কেবল বাহ্যযন্ত্র। অতএব এই স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয়গণই অনুভূতির যথার্থ স্থান।

নাসিকার জন্য একটি, চক্ষুর জন্য একটি, এইরূপ প্রত্যেকের জন্য এক-একটি পৃথক স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিবার প্রয়োজন কি? একটিতেই কার্য সিদ্ধ হয় না কেন? এইটি স্পষ্ট করিয়া বুঝানো যাইতেছে। আমি কথা কহিতেছি, আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন; আপনাদের চতুর্দিকে কি হইতেছে, তাহা আপনারা দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ মন কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়েই সংযুক্ত রহিয়াছে, চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে নিজেকে পৃথক্ করিয়াছে। যদি একটিমাত্র স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিত, তবে মনকে একই সময়ে দেখিতে, শুনিতে ও আঘ্রাণ করিতে হইত। আর উহার পক্ষে একই সময়ে এই তিনটি কার্য না করা অসম্ভব হইত। অতএব প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্নায়ু-কেন্দ্রের প্রয়োজন। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকে। অবশ্য আমাদের পক্ষে একই সময়ে দেখা ও শুনা সম্ভব, কিন্তু তাহার কারণ—মন উভয় কেন্দ্রেই আংশিকভাবে যুক্ত হয়। তবে যন্ত্র কোন্‌গুলি? আমরা দেখিতেছি, উহারা বাহিরের বস্তু এবং স্থূলভূতে নির্মিত—এই আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসা প্রভৃতি। আর এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলি কিসে নির্মিত? উহারা সূক্ষ্মতর ভূতে নির্মিত; যেহেতু উহারা অনুভূতির কেন্দ্রস্বরূপ, সেই জন্য উহারা ভিতরের জিনিস। যেমন প্রাণকে বিভিন্ন স্থূল শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য এই দেহ স্থূলভূতে গঠিত হইয়াছে, তেমনি এই শরীরের পশ্চাতে যে স্নায়ুকেন্দ্রসমূহ রহিয়াছে, তাহারাও প্রাণকে সূক্ষ্ম অনুভূতির শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য সূক্ষ্মতর উপাদানে নির্মিত। এই সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সমষ্টিকে একত্রে লিঙ্গ (বা সূক্ষ্ম)-শরীর বলে।

এই সূক্ষ্ম-শরীরের প্রকৃতপক্ষে একটি আকার আছে, কারণ যাহা কিছু জড় তাহারই একটি আকার অবশ্যই থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাতে মন অর্থাৎ বৃত্তিযুক্ত চিত্ত আছে, উহাকে চিত্তের স্পন্দনশীল বা অস্থির অবস্থা বলা যাইতে পারে। যদি স্থির হ্রদে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে প্রথমে উহাতে স্পন্দন বা কম্পন উপস্থিত হইবে, তারপর উহা হইতে বাধা বা প্রতিক্রিয়া উত্থিত হইবে। মুহূর্তের জন্য ঐ জল স্পন্দিত হইবে, তারপর উহা ঐ প্রস্তরের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এইরূপ চিত্তের উপর যখনই কোন বাহ্যবিষয়ের আঘাত আসে, তখনই উহা একটু স্পন্দিত হয়। চিত্তের এই অবস্থাকে 'মন' বলে। তারপর উহা হইতে প্রতিক্রিয়া হয়, উহার

নাম 'বুদ্ধি'। এই বুদ্ধির পশ্চাতে আর একটি জিনিস আছে, উহা মনের সকল ক্রিয়ার সহিতই বর্তমান, উহাকে 'অহঙ্কার' বলে; এই অহঙ্কার-অর্থে অহংজ্ঞান, যাহাতে সর্বদা 'আমি আছি' এই জ্ঞান হয়। তাহার পশ্চাতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, উহা প্রাকৃতিক সকল বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার পশ্চাতে পুরুষ, ইনিই মানবের যথার্থ স্বরূপ—শুদ্ধ, পূর্ণ; ইনিই একমাত্র দ্রষ্টা এবং ইঁহার জন্যই এই সমুদয় পরিণাম। পুরুষ এই-সকল পরিণাম-পরম্পরা দেখিতেছেন। তিনি স্বয়ং কখনই অশুদ্ধ নন, কিন্তু অধ্যাস বা প্রতিবিম্বের দ্বারা তাঁহাকে ঐরূপ দেখাইতেছে, যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সমক্ষে একটি লাল ফুল রাখিলে স্ফটিকটি লাল দেখাইবে, আবার নীল ফুল রাখিলে নীল দেখাইবে। প্রকৃতপক্ষে স্ফটিকটির কোন বর্ণই নাই। পুরুষ বা আত্মা অনেক, প্রত্যেকেই শুদ্ধ ও পূর্ণ। আর এই স্থূল, সূক্ষ্ম নানাপ্রকারে বিভক্ত পঞ্চভূত তাঁহাদের উপর প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখাইতেছে। প্রকৃতি কেন এ-সকল করিতেছেন? প্রকৃতির এই-সকল পরিণাম পুরুষ বা আত্মার ভোগ ও অপবর্গের জন্য—যাহাতে পুরুষ নিজের মুক্ত স্বভাব জানিতে পারেন। মানুষের সমক্ষে এই জগৎপ্রপঞ্চরূপ সুবৃহৎ গ্রন্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহাতে মানুষ ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিণামে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পুরুষরূপে জগতের বাহিরে আসিতে পারেন। আমাকে এখানে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আপনারা যে অর্থে সগুণ বা ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, আমাদের অনেক বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ্ সেই অর্থে তাঁহাতে বিশ্বাস করেন না। মনস্তত্ত্ববিদ্গণের পিতাস্বরূপ কপিল সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহার ধারণা এই যে, সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই; যাহা কিছু ভাল, প্রকৃতিই তাহা করিতে সমর্থ। তিনি তথা-কথিত 'কৌশল-বাদ' (Design Theory) খণ্ডন করিয়াছেন। এই মতবাদের ন্যায় ছেলে-মানুষী মত জগতে আর কিছুই প্রচারিত হয় নাই। তবে তিনি এক বিশেষ-প্রকার ঈশ্বর স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমরা সকলে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যখন মানবাত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি যেন কিছুদিনের জন্য প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকিতে পারেন। আগামী কল্পের প্রারম্ভে তিনিই একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই কল্পের শাসনকর্তা হইতে পারেন। এই অর্থে তাঁহাকে

'ঈশ্বর' বলা যাইতে পারে। এইরূপে আপনি, আমি এবং অতি সামান্য ব্যক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন কল্পে ঈশ্বর হইতে পারিব। কপিল বলেন, এইরূপ 'জন্য ঈশ্বর' হইতে পারা যায়, কিন্তু 'নিত্য ঈশ্বর' অর্থাৎ নিত্য সর্বশক্তিমান্—জগতের শাসনকর্তা কখনই হইতে পারা যায় না। এরূপ ঈশ্বর-স্বীকারে এই আপত্তি উঠিবে: ঈশ্বরকে হয় বদ্ধ, না হয় মুক্ত—এই দুই-এর একতর ভাব স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি মুক্ত হন, তবে তিনি সৃষ্টি করিবেন না, কারণ তাঁহার সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি তিনি বদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহাতে সৃষ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব; কারণ বদ্ধ বলিয়া তাঁহার শক্তির অভাব, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। সুতরাং উভয় পক্ষেই দেখা গেল, নিত্য সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। এই হেতু কপিল বলেন, আমাদের শাস্ত্রে—বেদে যেখানেই ঈশ্বর-শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাতে যে-সকল আত্মা পূর্ণতা ও মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছে। সাংখ্যদর্শন সকল আত্মার একত্বে বিশ্বাসী নন। বেদান্তের মতে সকল জীবাত্মা ও ব্রহ্ম-নামধেয় এক বিশ্বাত্মা অভিন্ন, কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিল দ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি অবশ্য জগতের বিশ্লেষণ যতদূর করিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত। তিনি হিন্দু পরিণামবাদিগণের জনক-স্বরূপ, পরবর্তী দর্শন-শাস্ত্রগুলি তাঁহারই চিন্তাপ্রণালীর পরিণাম মাত্র।

সাংখ্যদর্শন-মতে সকল আত্মাই তাহাদের স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা-রূপ স্বাভাবিক অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মার এই বন্ধন কোথা হইতে আসিল? সাংখ্য বলেন, ইহা অনাদি। কিন্তু তাহাতে এই আপত্তি উপস্থিত হয় যে, যদি এই বন্ধন অনাদি হয়, তবে উহা অনন্তও হইবে, আর তাহা হইলে আমরা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। কপিল ইহার উত্তরে বলেন, এখানে এই 'অনাদি' বলিতে নিত্য অনাদি বুঝিতে হইবে না। প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু আত্মা বা পুরুষ যে অর্থে অনাদি অনন্ত, সে অর্থে নয়; কারণ প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব নাই। যেমন আমাদের সম্মুখ দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, প্রতি মুহূর্তেই উহাতে নূতন নূতন জলরাশি আসিতেছে, এই-সমুদয় জলরাশির নাম নদী, কিন্তু নদী কোন ধ্রুব বস্তু নয়। এইরূপ প্রকৃতির অন্তর্গত যাহা কিছু, সর্বদা তাহার পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু আত্মার কখনই

পরিবর্তন হয় না। অতএব প্রকৃতি যখন সর্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আত্মার পক্ষে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

সাংখ্যদিগের একটি মত তাহাদের নিজস্ব, যথা: একটি মনুষ্য বা কোন প্রাণী যে নিয়মে গঠিত, সমগ্র জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডও ঠিক সেই নিয়মে বিরচিত। সুতরাং আমার যেমন একটি মন আছে, সেরূপ একটি বিশ্ব-মনও আছে। যখন এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ হয়, তখন প্রথমে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, পরে অহঙ্কার, পরে তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় ও শেষে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। কপিলের মতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি শরীর। যাহা কিছু দেখিতেছি, সেগুলি সব স্থূল শরীর, উহাদের পশ্চাতে আছে সূক্ষ্ম শরীর এবং তাহাদের পশ্চাতে সমষ্টি অহংতত্ত্ব, তাহারও পশ্চাতে সমষ্টি-বুদ্ধি। কিন্তু এ-সকলই প্রকৃতির অন্তর্গত, প্রকৃতির বিকাশ, এগুলির কিছুই উহার বাহিরে নাই। আমাদের মধ্যে সকলেই সেই মহতত্ত্বের অংশ। সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিতেছি; এইরূপ জগতের ভিতরে সমষ্টি মনস্তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতেও আমরা চিরকালই প্রয়োজনমত লইতেছি। কিন্তু দেহের বীজ পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া চাই। ইহাতে বংশানুক্রমিকতা (Heredity) ও পুনর্জন্মবাদ উভয় তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়া থাকে। আত্মাকে দেহনির্মাণ করিবার জন্য উপাদান দিতে হয়, কিন্তু সে উপাদান বংশানুক্রমিক সঞ্চারের দ্বারা পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি যে, সাংখ্যমতানুযায়ী সৃষ্টিপ্রণালীতে সৃষ্টি বা ক্রমবিকাশ এবং প্রলয় বা ক্রমসঙ্কোচ—এই উভয়টিই স্বীকৃত হইয়াছে। সমুদয় সেই অব্যক্ত প্রকৃতির ক্রমবিকাশে উৎপন্ন, আবার ঐ সমুদয়ই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্তভাব ধারণ করে। সাংখ্যমতে এমন কোন জড় বা ভৌতিক বস্তু থাকিতে পারে না, মহত্তত্ত্বের অংশবিশেষ যাহার উপাদান নয়। উহাই সেই উপাদান, যাহা হইতে এই সমুদয় প্রপঞ্চ নির্মিত হইয়াছে। আগামী বক্তৃতায় ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা যাইবে। তবে এখন আমি এইটুকু দেখাইব, কিরূপে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। এই টেবিলটির স্বরূপ কি, তাহা আমি জানি না, উহা কেবল আমার উপর একপ্রকার সংস্কার জন্মাইতেছে মাত্র। উহা প্রথমে

চক্ষুতে আসে, তারপর দর্শনেন্দ্রিয়ে গমন করে, তারপর উহা মনের নিকটে যায়। তখন মন আবার উহার উপর প্রতিক্রিয়া করে, সেই প্রতিক্রিয়াকেই আমরা 'টেবিল' আখ্যা দিয়া থাকি। ইহা ঠিক একটি হ্রদে একখণ্ড প্রস্তর-নিক্ষেপের ন্যায়। ঐ হ্রদ প্রস্তরখণ্ডের অভিমুখে একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করে; আর ঐ তরঙ্গটিকেই আমরা জানিয়া থাকি। মনের তরঙ্গসমূহ—যেগুলি বহির্দিকে আসে, সেগুলিই আমরা জানি। এইরূপেই এই দেয়ালের আকৃতি আমার মনে রহিয়াছে; বাহিরে যথার্থ কি আছে, তাহা কেহই জানে না; যখন আমি কোন বহির্বস্তুকে জানিতে চেষ্টা করি, তখন উহাকে আমার প্রদত্ত উপাদানে পরিণত হইতে হয়। আমি আমার নিজমনের দ্বারা আমার চক্ষুকে প্রয়োজনীয় উপাদান দিয়াছি, আর বাহিরে যাহা আছে, তাহা উদ্দীপক বা উত্তেজক কারণ মাত্র। সেই উত্তেজক কারণ আসিলে আমি আমার মনকে উহার দিকে প্রক্ষেপ করি এবং উহা আমার দ্রষ্টব্য বস্তুর আকার ধারণ করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই—আমরা সকলেই এক বস্তু কিরূপে দেখিয়া থাকি? ইহার কারণ—আমাদের সকলের ভিতর এই বিশ্ব-মনের এক এক অংশ আছে। যাহাদের মন আছে, তাহারাই ঐ বস্তু দেখিবে; যাহাদের নাই, তাহারা উহা দেখিবে না। ইহাতেই প্রমাণ হয়, যতদিন ধরিয়া জগৎ আছে, ততদিন মনের অভাব—সেই এক বিশ্ব-মনের অভাব কখন হয় নাই। প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক প্রাণী সেই বিশ্ব-মন হইতেই নির্মিত হইতেছে, কারণ বিশ্বমন সর্বদাই বর্তমান থাকিয়া উহাদের নির্মাণের জন্য উপাদান যোগাইতেছে।

প্রকৃতি ও পুরুষ

আমরা যে তত্ত্বগুলি লইয়া বিচার করিতেছিলাম, এখন সেইগুলির প্রত্যেকটিকে লইয়া বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সাংখ্যমতাবলম্বিগণ উহাকে 'অব্যক্ত' বা অবিভক্ত বলিয়াছেন এবং উহার অন্তর্গত উপাদানসকলের সাম্যাবস্থারূপে উহার লক্ষণ করিয়াছেন। আর ইহা হইতে স্বভাবতই পাওয়া যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা বা সামঞ্জস্যে কোনরূপ গতি থাকিতে পারে না। আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি বা অনুভব করি, সবই জড় ও গতির সমবায় মাত্র। এই প্রপঞ্চ-বিকাশের পূর্বে আদিম অবস্থায় যখন কোনরূপ গতি ছিল না, যখন সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা ছিল, তখন এই প্রকৃতি অবিনাশী ছিল, কারণ সীমাবদ্ধ হইলেই তাহার বিশ্লেষণ বা বিয়োজন হইতে পারে। আবার সাংখ্য-মতে পরমাণুই জগতের আদি অবস্থা নয়। এই জগৎ পরমাণুপুঞ্জ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থা হইতে পারে। আদি ভূতই পরমাণুরূপে পরিণত হয়, তাহা আবার স্থূলতর পদার্থে পরিণত হয়, আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যতদূর চলিয়াছে, তাহা ঐ মতের পোষকতা করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। উদাহরণস্বরূপ—ইথার-সম্বন্ধীয় আধুনিক মতের কথা ধরুন। যদি বলেন, ইথারও পরমাণুপুঞ্জের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহা হইলে সমস্যার মীমাংসা মোটেই হইবে না। আরও স্পষ্ট করিয়া এই বিষয় বুঝানো যাইতেছে: বায়ু অবশ্য পরমাণুপুঞ্জে গঠিত। আর আমরা জানি, ইথার সর্বত্র বিদ্যমান, উহা সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান ও সর্বব্যাপী। বায়ু এবং অন্যান্য সকল বস্তুর পরমাণুও যেন ইথারেই ভাসিতেছে। আবার ইথার যদি পরমাণুসমূহের সংযোগে গঠিত হয়, তাহা হইলে দুইটি ইথার-পরমাণুর মধ্যেও কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিবে। ঐ অবকাশ কিসের দ্বারা পূর্ণ? আর যাহা কিছু ঐ অবকাশ ব্যাপিয়া থাকিবে, তাহার পরমাণুগুলির মধ্যে ঐরূপ অবকাশ থাকিবে। যদি বলেন, ঐ অবকাশের মধ্যে আরও সূক্ষ্মতর ইথার বিদ্যমান, তাহা হইলে সেই ইথার-পরমাণুর মধ্যেও আবার অবকাশ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ইথার

কল্পনা করিতে করিতে শেষ সিদ্ধান্ত কিছুই পাওয়া যাইবে না—ইহাকে 'অনবস্থা-দোষ' বলে। অতএব পরমাণুবাদ চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সাংখ্যমতে প্রকৃতি সর্বব্যাপী, উহা এক সর্বব্যাপী জড়রাশি, তাহাতে—এই জগতে যাহা কিছু আছে—সমুদয়ের কারণ রহিয়াছে। কারণ বলিতে কি বুঝায়? কারণ বলিতে ব্যক্ত অবস্থার সূক্ষ্মতর অবস্থাকে বুঝায়—যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই অব্যক্ত অবস্থা। ধ্বংস বলিতে কি বুঝায়? ইহার অর্থ কারণে লয়, কারণে প্রত্যাবর্তন—যে-সকল উপাদান হইতে কোন বস্তু নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলি তাহাদের আদিম অবস্থায় চলিয়া যায়। ধ্বংস-শব্দের এই অর্থ ব্যতীত সম্পূর্ণ অভাব বা বিনাশ-অর্থ যে অসম্ভব, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কপিল অনেক যুগ পূর্বে ধ্বংসের অর্থ যে 'কারণে লয়' করিয়াছিলেন, বাস্তবিক উহা দ্বারা যে তাহাই বুঝায়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। 'সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন' ব্যতীত ধ্বংসের আর কোন অর্থ নাই। আপনারা জানেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কিরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে—জড়বস্তুও অবিনশ্বর। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, যদি একটি কাচনলের ভিতর একটি বাতি ও কষ্টিক (Caustic Soda) পেন্সিল রাখা যায় এবং সমগ্র বাতিটি পুড়াইয়া ফেলা হয়, তবে ঐ কষ্টিক পেন্সিলটি বাহির করিয়া ওজন করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ পেন্সিলটির ওজন এখন উহার পূর্ব ওজনের সহিত বাতিটির ওজন যোগ করিলে যাহা হয়, ঠিক তত হইয়াছে। ঐ বাতিটিই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া কষ্টিকে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতএব আমাদের আধুনিক জ্ঞানোন্নতির অবস্থায় যদি কেহ বলে যে, কোন জিনিস সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে সে নিজেই কেবল উপহাসাস্পদ হইবে। কেবল অশিক্ষিত ব্যক্তিই ঐরূপ কথা বলিবে, আর আশ্চর্যের বিষয়—সেই প্রাচীন দার্শনিকগণের উপদেশ আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিতেছে। প্রাচীনেরা মনকে ভিত্তিস্বরূপ লইয়া তাঁহাদের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মানসিক ভাগটির বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন এবং উহাদ্বারা কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন আর আধুনিক বিজ্ঞান উহার ভৌতিক (physical) ভাগ বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। উভয় প্রকার বিশ্লেষণই একই সত্যে উপনীত হইয়াছে।

আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, এই জগতে প্রকৃতির প্রথম বিকাশকে সাংখ্যবাদিগণ 'মহৎ' বলিয়া থাকেন। আমরা উহাকে 'সমষ্টি বুদ্ধি' বলিতে পারি, উহার ঠিক শব্দার্থ—মহৎ তত্ত্ব। প্রকৃতির প্রথম বিকাশ এই বুদ্ধি; উহাকে অহংজ্ঞান বলা যায় না, বলিলে ভুল হইবে। অহংজ্ঞান এই বুদ্ধিতত্ত্বের অংশ মাত্র, বুদ্ধিতত্ত্ব কিন্তু সর্বজনীন তত্ত্ব। অহংজ্ঞান, অব্যক্ত জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা—এগুলি সবই উহার অন্তর্গত। উদাহরণস্বরূপ: প্রকৃতিতে কতকগুলি পরিবর্তন আপনাদের চক্ষের সমক্ষে ঘটিতেছে, আপনারা সেগুলি দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন, কিন্তু আবার কতকগুলি পরিবর্তন আছে, সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোন মানবীয় বোধশক্তিরই আয়ত্ত নয়। এই উভয়-প্রকার পরিবর্তন একই কারণ হইতে হইতেছে, সেই একই মহৎ ঐ উভয়-প্রকার পরিবর্তনই সাধন করিতেছে। আবার কতকগুলি পরিবর্তন আছে, যেগুলি আমাদের মন বা বিচারশক্তির অতীত। এই-সকল পরিবর্তনই সেই মহতের মধ্যে। ব্যষ্টি লইয়া যখন আমি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন এ কথা আপনারা আরও ভাল করিয়া বুঝিবেন। এই মহৎ হইতে সমষ্টি অহংতত্ত্বের উৎপত্তি হয়, এই দুইটিই জড় বা ভৌতিক। জড় ও মনে পরিমাণগত ব্যতীত অন্য কোনরূপ ভেদ নাই—একই বস্তুর সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থা, একটি আর একটিতে পরিণত হইতেছে। ইহার সহিত আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ঐক্য আছে; মস্তিষ্ক হইতে পৃথক্ একটি মন আছে—এই বিশ্বাস এবং এরূপ সমুদয় অসম্ভব বিষয়ে বিশ্বাস হইতে বিজ্ঞানের সহিত যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, পূর্বোক্ত বিশ্বাসের দ্বারা বরং ঐ বিরোধ হইতে রক্ষা পাইবেন। মহৎ-নামক এই পদার্থ অহংতত্ত্ব-নামক জড় পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থাবিশেষে পরিণত হয় এবং সেই অহংতত্ত্বের আবার দুই প্রকার পরিণাম হয়, তন্মধ্যে এক প্রকার পরিণাম ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় বলিতে এই দৃশ্যমান চক্ষুকর্ণাদি বুঝাইতেছে না, ইন্দ্রিয় এইগুলি হইতে সূক্ষ্মতর—যাহাকে আপনারা মস্তিষ্ককেন্দ্র ও স্নায়ুকেন্দ্র বলেন। এই অহংতত্ত্ব পরিণামপ্রাপ্ত হয়, এবং এই অহংতত্ত্বরূপ উপাদান হইতে এই কেন্দ্র ও স্নায়ুসকল উৎপন্ন হয়। অহংতত্ত্বরূপ সেই একই উপাদান হইতে আর এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থের উৎপত্তি হয়—তন্মাত্রা, অর্থাৎ সূক্ষ্ম জড় পরমাণু।

যাহা আপনাদের নাসিকার সংস্পর্শে আসিয়া আপনাদিগকে ঘ্রাণ-গ্রহণে সমর্থ করে, তাহাই তন্মাত্রার একটি দৃষ্টান্ত। আপনারা এই সূক্ষ্ম তন্মাত্রাগুলি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, আপনারা কেবল ঐগুলির অস্তিত্ব অবগত হইতে পারেন। অহংতত্ত্ব হইতে এই তন্মাত্রাগুলির উৎপত্তি হয়, আর ঐ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম জড় হইতে স্থূল জড় অর্থাৎ বায়ু, জল, পৃথিবী ও অন্যান্য যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই বা অনুভব করি, তাহাদের উৎপত্তি হয়। আমি এই বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই। এটি ধারণা করা বড় কঠিন, কারণ পাশ্চাত্য দেশে মন ও জড় সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে। মস্তিষ্ক হইতে ঐ-সকল সংস্কার দূর করা বড়ই কঠিন। বাল্যকালে পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষিত হওয়ায় আমাকেও এই তত্ত্ব বুঝিতে প্রচণ্ড বাধা পাইতে হইয়াছিল।

এ সবই জগতের অন্তর্গত। ভাবিয়া দেখুন, প্রথমাবস্থায় এক সর্বব্যাপী অখণ্ড অবিভক্ত জড়রাশি রহিয়াছে। যেমন দুগ্ধ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া দধি হয়, সেরূপ উহা মহৎ-নামক অন্য এক পদার্থে পরিণত হয়—ঐ মহৎ এক অবস্থায়[১] বুদ্ধিতত্ত্বরূপে অবস্থান করে, অন্য অবস্থায় উহা অহংতত্ত্বরূপে পরিণত হয়। উহা সেই একই বস্তু, কেবল অপেক্ষাকৃত স্থূলতর আকারে পরিণত হইয়া অহংতত্ত্ব নাম ধারণ করিয়াছে। এইরূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন স্তরে স্তরে বিরচিত। প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতি, উহা সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বে বা মহতে পরিণত হয়, তাহা আবার সর্বব্যাপী অহংতত্ত্ব বা অহংকারে এবং তাহা পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া সর্বব্যাপী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতে[২] পরিণত হয়। সেই ভূতসমষ্টি ইন্দ্রিয় বা স্নায়ু-কেন্দ্রসমূহে এবং সমষ্টি সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহে পরিণত হয়। পরে এইগুলি মিলিত হইয়া এই স্থূল জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি। সাংখ্যমতে ইহাই সৃষ্টির ক্রম, আর

১ ভাষার ভঙ্গীতে পাঠকের মনে হইতে পারে, বুদ্ধিতত্ত্ব মহতের অবস্থাবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে; যাহাকে 'মহৎ' বলা যায়, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব।

২ পূর্বে সাংখ্যমতানুযায়ী যে সৃষ্টির ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই স্থানে স্বামীজীর কিঞ্চিৎ বিরোধ আপাততঃ বোধ হইতে পারে। পূর্বে বুঝানো হইয়াছে, অহংতত্ত্ব হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। এখানে আবার উহাদের মধ্যে ভূতের কথা বলিতেছেন। এটি কি কোন নূতন তত্ত্ব? বোধ হয়, অহংতত্ত্ব একটি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া তাহা হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রার উৎপত্তি সহজে বুঝাইবার জন্য স্বামীজী এইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতের কল্পনা করিয়াছেন।

সমষ্টি বা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাহা আছে, তাহা ব্যষ্টি বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও অবশ্য থাকিবে।

ব্যষ্টি-রূপ একটি মানুষের কথা ধরুন। প্রথমতঃ তাঁহার ভিতর সেই সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতির অংশ রহিয়াছে। সেই জড়প্রকৃতি তাঁহার ভিতর মহৎ-রূপে পরিণত হইয়াছে, সেই মহৎ অর্থাৎ সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বের এক অংশ তাঁহার ভিতর রহিয়াছে। আর সেই সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বের ক্ষুদ্র অংশটি তাঁহার ভিতর অহংতত্ত্বে বা অহংকারে পরিণত হইয়াছে—উহা সেই সর্বব্যাপী অহংতত্ত্বেরই ক্ষুদ্র অংশমাত্র। এই অহংকার আবার ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রায় পরিণত হইয়াছে। তন্মাত্রাগুলি আবার পরস্পর মিলিত করিয়া তিনি নিজ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড—দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিষয়টি আমি স্পষ্টভাবে আপনাদিগকে বুঝাইতে চাই, কারণ ইহা বেদান্ত বুঝিবার পক্ষে প্রথম সোপান-স্বরূপ; আর ইহা আপনাদের জানা একান্ত আবশ্যক, কারণ ইহাই সমগ্র জগতের বিভিন্নপ্রকার দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি। জগতে এমন কোন দর্শনশাস্ত্র নাই, যাহা এই সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিলের নিকট ঋণী নয়। পিথাগোরাস ভারতে আসিয়া এই দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং গ্রীকদের নিকট ইহার কতকগুলি তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিলেন। পরে উহা 'আলেকজান্দ্রিয়ার দার্শনিক-সম্প্রদায়ের' ভিত্তিস্বরূপ হয় এবং আরও পরবর্তী কালে উহা নষ্টিক দর্শনের (Gnostic Philosophy) ভিত্তি হয়। এইরূপে উহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একভাগ ইওরোপ ও আলেকজান্দ্রিয়ায় গেল, অপর ভাগটি ভারতেই রহিয়া গেল এবং সর্বপ্রকার হিন্দুদর্শনের ভিত্তিস্বরূপ হইল। কারণ ব্যাসের বেদান্তদর্শন ইহারই পরিণতি। এই কাপিল দর্শনই পৃথিবীতে যুক্তি-বিচার দ্বারা জগত্তত্ত্ব-ব্যাখ্যার সর্বপ্রথম চেষ্টা। কপিলের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা জগতের সকল দার্শনিকেরই উচিত। আমি আপনাদের মনে এইটি বিশেষ করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই যে, দর্শনশাস্ত্রের জনক বলিয়া আমরা তাঁহার উপদেশ শুনিতে বাধ্য এবং তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধা করা আমাদের কর্তব্য। এমন কি, বেদেও এই অদ্ভুত ব্যক্তির—এই সর্বপ্রাচীন দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার অনুভূতিসমুদয় কি অপূর্ব! যদি যোগিগণের অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষশক্তির কোন প্রমাণপ্রয়োগ আবশ্যক হয়, তবে বলিতে হয়, এইরূপ ব্যক্তিগণই তাহার প্রমাণ। তাঁহারা কিরূপে এই-সকল তত্ত্ব

উপলব্ধি করিলেন? তাঁহাদের তো আর অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ ছিল না। তাঁহাদের অনুভবশক্তি কি সূক্ষ্ম ছিল, তাঁহাদের বিশ্লেষণ কেমন নির্দোষ ও কি অদ্ভুত!

যাহা হউক, এখন পূর্বপ্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করা যাক। আমরা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—মানবের তত্ত্ব আলোচনা করিতেছিলাম। আমরা দেখিয়াছি, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড যে নিয়মে নির্মিত, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ। প্রথমে অবিভক্ত বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি। তারপর উহা বৈষম্যপ্রাপ্ত হইলে কার্য আরম্ভ হয়, আর এই কার্যের ফলে যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহা মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি। এখন আপনারা দেখিতেছেন, মানুষের মধ্যে যে এই বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহা সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহতের ক্ষুদ্র অংশস্বরূপ। উহা হইতে অহংজ্ঞানের উদ্ভব, তাহা হইতে অনুভবাত্মক ও গত্যাত্মক স্নায়ুসকল এবং সূক্ষ্ম পরমাণু বা তন্মাত্রা। ঐ তন্মাত্রা হইতেই স্থূল দেহ বিরচিত হয়। আমি এখানে বলিতে চাই, শোপেনহাওয়ারের দর্শন ও বেদান্তে একটি প্রভেদ আছে। শোপেনহাওয়ার বলেন, বাসনা বা ইচ্ছা সমুদয়ের কারণ। আমাদের এই ব্যক্তভাবাপন্ন হইবার কারণ প্রাণধারণের ইচ্ছা, কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা ইহা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, মহত্তত্ত্বই ইহার কারণ। এমন একটিও ইচ্ছা হইতে পারে না, যাহা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নয়। ইচ্ছার অতীত অনেক বস্তু রহিয়াছে। উহা অহং হইতে গঠিত, অহং আবার তাহা অপেক্ষা উচ্চতর বস্তু অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন এবং তাহা আবার অব্যক্ত প্রকৃতির বিকার।

মানুষের মধ্যে এই যে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহার স্বরূপ উত্তমরূপে বুঝা বিশেষ প্রয়োজন। এই মহত্তত্ত্ব—আমরা যাহাকে 'অহং' বলি, তাহাতে পরিণত হয়, আর এই মহত্তত্ত্বই সেই-সকল পরিবর্তনের কারণ, যেগুলির ফলে এই শরীর নির্মিত হইয়াছে। জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানের অবস্থা ও জ্ঞানাতীত অবস্থা—এই সব মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত। এই তিনটি অবস্থা কি? জ্ঞানের নিম্নভূমি আমরা পশুদের মধ্যে দেখিয়া থাকি এবং উহাকে সহজাত জ্ঞান (Instinct) বলি। ইহা প্রায় অভ্রান্ত, তবে উহা দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সীমা বড় অল্প। সহজাত জ্ঞানে প্রায় কখনই ভুল হয় না। একটি পশু ঐ সহজাতজ্ঞান-প্রভাবে কোন্ শস্যটি আহার্য, কোন্‌টি বা বিষাক্ত, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু ঐ সহজাত জ্ঞান

দু-একটি সামান্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ, উহা যন্ত্রবৎ কার্য করিয়া থাকে। তারপর আমাদের সাধারণ জ্ঞান—উহা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থা। আমাদের এই সাধারণ জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ, উহা পদে পদে ভ্রমে পতিত হয়, কিন্তু উহার গতি এরূপ মৃদু হইলেও উহার বিস্তৃতি অনেকদূর। ইহাকেই আপনারা যুক্তি বা বিচারশক্তি বলিয়া থাকেন। সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা উহার প্রসার অধিকদূর বটে, কিন্তু সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা যুক্তিবিচারে অধিক ভ্রমের আশঙ্কা। ইহা অপেক্ষা মনের আর এক উচ্চতর অবস্থা আছে, জ্ঞানাতীত অবস্থা—ঐ অবস্থায় কেবল যোগীদের অর্থাৎ যাঁহারা চেষ্টা করিয়া ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অধিকার। উহা সহজাত জ্ঞানের ন্যায় অভ্রান্ত, আবার যুক্তিবিচার অপেক্ষাও উহার অধিক প্রসার। উহা সর্বোচ্চ অবস্থা। আমাদের স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, যেমন মানুষের ভিতর মহৎই—জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি ও জ্ঞানাতীত ভূমি—জ্ঞানের এই তিন অবস্থায় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইতেছে, সেইরূপ এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও এই সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহৎ—সহজাত জ্ঞান, যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞান ও বিচারাতীত জ্ঞান—এই ত্রিবিধ ভাবে অবস্থিত।

এখন একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসিতেছে, আর এই প্রশ্ন সর্বদাই জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। যদি পূর্ণ ঈশ্বর এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে এখানে অপূর্ণতা কেন? আমরা যতটুকু দেখিতেছি, ততটুকুকেই ব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ বলি এবং উহা আমাদের সাধারণ জ্ঞান বা যুক্তিবিচার-জনিত জ্ঞানের ক্ষুদ্র ভূমি ব্যতীত আর কিছুই নয়। উহার বাহিরে আমরা আর কিছুই দেখিতে পাই না। এই প্রশ্নটিই একটি অসম্ভব প্রশ্ন। যদি আমি এক বৃহৎ বস্তুরাশি হইতে ক্ষুদ্র অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া উহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, স্বভাবতই উহা অসম্পূর্ণ বোধ হইবে। এই জগৎ অসম্পূর্ণ বোধ হয়, কারণ আমরাই উহাকে অসম্পূর্ণ করিয়াছি। কিরূপে করিলাম? প্রথমে বুঝিয়া দেখা যাক—যুক্তিবিচার কাহাকে বলে, জ্ঞান কাহাকে বলে? জ্ঞান অর্থে সাদৃশ্য অনুসন্ধান। রাস্তায় গিয়া একটি মানুষকে দেখিলেন, দেখিয়া জানিলেন—সে-টি মানুষ। আপনারা অনেক মানুষ দেখিয়াছেন, প্রত্যেকেই আপনাদের মনে একটি সংস্কার উৎপন্ন করিয়াছে। একটি নূতন মানুষকে দেখিবামাত্র আপনারা তাহাকে নিজ নিজ সংস্কারের ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া দেখিলেন, সেখানে

মানুষের অনেক ছবি রহিয়াছে। তখন এই নূতন ছবিটি অবশিষ্টগুলির সহিত উহাদের জন্য নির্দিষ্ট খোপে রাখিলেন—তখন আপনারা তৃপ্ত হইলেন। কোন নূতন সংস্কার আসিলে যদি আপনাদের মনে উহার সদৃশ সংস্কার-সকল পূর্ব হইতেই বর্তমান থাকে, তবেই আপনারা তৃপ্ত হন, আর এই সংযোগ বা সহযোগকেই জ্ঞান বলে। অতএব জ্ঞান অর্থে পূর্ব হইতে আমাদের যে অনুভূতি-সমষ্টি রহিয়াছে, ঐগুলির সহিত আর একটি অনুভূতিকে এক খোপে পোরা। আর আপনাদের পূর্ব হইতেই একটি জ্ঞানভাণ্ডার না থাকিলে যে নূতন কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, ইহাই তাহার অন্যতম প্রবল প্রমাণ। যদি আপনাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছু না থাকে, অথবা কতকগুলি ইওরোপীয় দার্শনিকের যেমন মত—মন যদি 'অনুৎকীর্ণ ফলক' (Tabula Rasa)-স্বরূপ হয়, তবে উহার পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব; কারণ জ্ঞান-অর্থে পূর্ব হইতেই যে সংস্কার-সমষ্টি অবস্থিত, তাহার সহিত তুলনা করিয়া নূতনের গ্রহণ-মাত্র। একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ব হইতেই থাকা চাই, যাহার সহিত নূতন সংস্কারটি মিলাইয়া লইতে হইবে। মনে করুন, এই প্রকার জ্ঞানভাণ্ডার ছাড়াই একটি শিশু এই জগতে জন্মগ্রহণ করিল, তাহার পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ করা একেবারে অসম্ভব। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঐ শিশুর অবশ্যই ঐরূপ একটি জ্ঞানভাণ্ডার ছিল, আর এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া জ্ঞানলাভ হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত এড়াইবার কোনপথ দেখাইয়া দিন। ইহা গণিতের অভিজ্ঞতার মতো। ইহা অনেকটা স্পেন্সার ও অন্যান্য কতকগুলি ইওরোপীয় দার্শনিকের সিদ্ধান্তের মতো। তাঁহারা এই পর্যন্ত দেখিয়াছেন যে, অতীত জ্ঞানের ভাণ্ডার না থাকিলে কোনপ্রকার জ্ঞানলাভ অসম্ভব; অতএব শিশু পূর্বজ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা এই সত্য বুঝিয়াছেন যে, কারণ কার্যে অন্তর্নিহিত থাকে, উহা সূক্ষ্মাকারে আসিয়া পরে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তবে এই দার্শনিকেরা বলেন যে, শিশু যে-সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা তাহার নিজের অতীত অবস্থার জ্ঞান হইতে লব্ধ নয়, উহা তাহার পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত সংস্কার; বংশানুক্রমিক সঞ্চারণের দ্বারা উহা সেই শিশুর ভিতর আসিয়াছে। অতি শীঘ্রই ইহারা বুঝিবেন যে, এই মতবাদ প্রমাণসহ নয়, আর ইতিমধ্যেই অনেকে এই 'বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ' মতের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন।

এই মত অসত্য নয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ। উহা কেবল মানুষের জড়ের ভাগটাকে ব্যাখ্যা করে মাত্র। যদি বলেন—এই মতানুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়? তাহাতে ইহারা বলিয়া থাকেন, অনেক কারণ মিলিয়া একটি কার্য হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাদের মধ্যে একটি। অপরদিকে হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, আমরা নিজেরাই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা গড়িয়া তুলি; কারণ আমরা অতীত জীবনে যেরূপ ছিলাম, বর্তমানেও সেরূপ হইব। অন্য ভাবে বলা যায়, আমরা অতীতে যেরূপ ছিলাম, তাহার ফলেই বর্তমানে যেরূপ হইবার সেরূপ হইয়াছি।

এখন আপনারা বুঝিলেন, জ্ঞান বলিতে কি বুঝায়। জ্ঞান আর কিছুই নয়, পুরাতন সংস্কারগুলির সহিত একটি নূতন সংস্কারকে এক খোপে পোরা—নূতন সংস্কারটিকে চিনিয়া লওয়া। চিনিয়া লওয়া বা 'প্রত্যভিজ্ঞা'র অর্থ কি? পূর্ব হইতেই আমাদের যে সদৃশ সংস্কার-সকল আছে, সেগুলির সহিত উহার মিলন আবিষ্কার করা। জ্ঞান বলিতে ইহা ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। তাই যদি হইল, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই প্রণালীতে সদৃশ বস্তুশ্রেণীর সবটুকু আমাদের দেখিতে হইবে। তাই নয় কি? মনে করুন, আপনাকে একটি প্রস্তরখণ্ড জানিতে হইবে, তাহা হইলে উহার সহিত মিল খাওয়াইবার জন্য আপনাকে উহার সদৃশ প্রস্তরখণ্ডগুলি দেখিতে হইবে। কিন্তু জগৎসম্বন্ধে আমরা তাহা করিতে পারি না, কারণ আমাদের সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা আমরা উহার একপ্রকার অনুভব-মাত্র পাইয়া থাকি—উহার এদিক-ওদিকে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, যাহাতে উহার সদৃশ বস্তুর সহিত উহাকে মিলাইয়া লইতে পারি। সেইজন্য জগৎ আমাদের নিকট অবোধ্য মনে হয়, কারণ জ্ঞান ও বিচার সর্বদাই সদৃশ বস্তুর সহিত সংযোগ-সাধনেই নিযুক্ত। ব্রহ্মাণ্ডের এই অংশটি—যাহা আমাদের জ্ঞানাবচ্ছিন্ন, তাহা আমাদের নিকট একটি বিস্ময়কর নূতন পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, উহার সহিত মিল খাইবে এমন কোন সদৃশ বস্তু আমরা পাই না। এইজন্য উহাকে লইয়া এত মুশকিল, —আমরা ভাবি, জগৎ অতি ভয়ানক ও মন্দ; কখন কখন আমরা উহাকে ভাল বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাকে অসম্পূর্ণ ভাবিয়া থাকি। জগৎকে তখনই জানা যাইবে, যখন আমরা ইহার অনুরূপ কোন

ভাব বা সত্তার সন্ধান পাইব। আমরা তখনই ঐগুলি ধরিতে পারিব, যখন আমরা এই জগতের—আমাদের এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানের বাহিরে যাইব, তখনই কেবল জগৎ আমাদের নিকট জ্ঞাত হইবে। যতদিন না আমরা তাহা করিতেছি, ততদিন আমাদের সমুদয় নিষ্ফল চেষ্টার দ্বারা কখনই উহার ব্যাখ্যা হইবে না, কারণ জ্ঞান-অর্থে সদৃশ বিষয়ের আবিষ্কার, আর আমাদের এই সাধারণ জ্ঞানভূমি আমাদিগকে কেবল জগতের একটি আংশিক ভাব দিতেছে মাত্র। এই সমষ্টি মহৎ অথবা আমরা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক ব্যবহার্য ভাষায় যাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলি, তাঁহার ধারণা সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা যতটুকু আছে, তাহা তাঁহার সম্বন্ধে এক বিশেষপ্রকার জ্ঞানমাত্র, তাঁহার আংশিক ধারণামাত্র—তাঁহার অন্যান্য সমুদয় ভাব আমাদের মানবীয় অসম্পূর্ণতার দ্বারা আবৃত।

'সর্বব্যাপী আমি এত বৃহৎ যে, এই জগৎ পর্যন্ত আমার অংশমাত্র।'[১]

এই কারণেই আমরা ঈশ্বরকে অসম্পূর্ণ দেখিয়া থাকি, আর আমরা তাঁহার ভাব কখনই বুঝিতে পারি না, কারণ উহা অসম্ভব। তাঁহাকে বুঝিবার একমাত্র উপায় যুক্তিবিচারের অতীত প্রদেশে যাওয়া—অহং-জ্ঞানের বাহিরে যাওয়া।

'যখন শ্রুত ও শ্রবণ, চিন্তিত ও চিন্তা—এই সমুদয়ের বাহিরে যাইবে, তখনই কেবল সত্য লাভ করিবে।'[২]

'শাস্ত্রের পারে চলিয়া যাও, কারণ শাস্ত্র প্রকৃতির তত্ত্ব পর্যন্ত, প্রকৃতি যে তিনটি গুণে নির্মিত—সেই পর্যন্ত (যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে) শিক্ষা দিয়া থাকে।'[৩]

ইহাদের বাহিরে যাইলেই আমরা সামঞ্জস্য ও মিলন দেখিতে পাই, তাহার পূর্বে নয়।

এ পর্যন্ত এটি স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একই নিয়মে নির্মিত, আর এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের একটি খুব সামান্য অংশই আমরা জানি।

---

১ বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।—গীতা, ১০।৪২

২ তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।—ঐ, ২।৫২

৩ ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।—ঐ, ২।৪৫

আমরা জ্ঞানের নিম্নভূমিও জানি না, জ্ঞানাতীত ভূমিও জানি না; আমরা কেবল সাধারণ জ্ঞানভূমিই জানি। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি পাপী—সে নির্বোধমাত্র, কারণ সে নিজেকে জানে না। সে নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ। সে নিজের একটি অংশ মাত্র জানে, কারণ জ্ঞান তাহার মানসভূমির মাত্র একাংশব্যাপী। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও ঐরূপ; যুক্তিবিচার দ্বারা উহার একাংশমাত্র জানাই সম্ভব; কিন্তু প্রকৃতি বা জগৎপ্রপঞ্চ বলিতে জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি, জ্ঞানাতীত ভূমি, ব্যষ্টিমহৎ, সমষ্টিমহৎ এবং তাহাদের পরবর্তী সমুদয় বিকার—এই সবগুলি বুঝাইয়া থাকে, আর এইগুলি সাধারণ জ্ঞানের বা যুক্তির অতীত।

কিসের দ্বারা প্রকৃতি পরিণামপ্রাপ্ত হয়? এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, প্রাকৃতিক সকল বস্তু, এমন কি প্রকৃতি নিজেও জড় বা অচেতন। উহারা নিয়মাধীন হইয়া কার্য করিতেছে—সমুদয়ই বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ এবং অচেতন। মন, মহত্তত্ত্ব, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি—এ-সবই অচেতন। কিন্তু এগুলি এমন এক পুরুষের চিৎ বা চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, যিনি এই-সবের অতীত, আর সাংখ্যমতাবলম্বিগণ ইহাকেই 'পুরুষ'-নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই পুরুষ জগতের মধ্যে—প্রকৃতির মধ্যে যে-সকল পরিণাম হইতেছে, সেগুলির সাক্ষিস্বরূপ কারণ, অর্থাৎ এই পুরুষকে যদি বিশ্বজনীন অর্থে ধরা যায়, তবে ইনিই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।[১] ইহা কথিত হইয়া থাকে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। সাধারণ দৈনিক ব্যবহার্য বাক্য হিসাবে ইহা অতি সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু ইহার আর অধিক মূল্য নাই। ইচ্ছা কিরূপে সৃষ্টির কারণ হইতে পারে? ইচ্ছা—প্রকৃতির তৃতীয় বা চতুর্থ বিকার। অনেক বস্তু উহার পূর্বেই সৃষ্ট হইয়াছে। সেগুলি কে সৃষ্টি করিল? ইচ্ছা একটি যৌগিক পদার্থমাত্র, আর যাহা-কিছু যৌগিক, সে-সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইচ্ছাও নিজে কখন প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিতে পারে না। উহা একটি অমিশ্র বস্তু নয়। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—এরূপ বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। মানুষের ভিতর ইচ্ছা

---

১ ইতিপূর্বে মহত্তত্ত্বকে 'ঈশ্বর' বলা হইয়াছে, এখানে আবার পুরুষের সর্বজনীন ভাবকে ঈশ্বর বলা হইল। এই দুইটি কথা আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হয়। এখানে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, পুরুষ মহত্তত্ত্বরূপ উপাধি পরিগ্রহ করিলেই তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলা যায়।

অহংজ্ঞানের অল্পাংশমাত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উহা আমাদের মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করে। তাই যদি করিত, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই মস্তিষ্কের কার্য বন্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তো পারেন না। সুতরাং ইচ্ছা মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করিতেছে না। হৃদয়কে গতিশীল করিতেছে কে? ইচ্ছা কখনই নয়; কারণ যদি তাই হইত, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই হৃদয়ের গতিরোধ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা আপনাদের দেহকেও পরিচালিত করিতেছে না, ব্রহ্মাণ্ডকেও নিয়মিত করিতেছে না। অপর কোন বস্তু উহাদের নিয়ামক—ইচ্ছা যাহার একটি বিকাশমাত্র। এই দেহকে এমন একটি শক্তি পরিচালিত করিতেছে, ইচ্ছা যাহার বিকাশমাত্র। সমগ্র জগৎ ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না, সেজন্যই 'ইচ্ছা' বলিলে ইহার ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। মনে করুন, আমি মানিয়া লইলাম, ইচ্ছাই আমাদের দেহকে চালাইতেছে, তারপর ইচ্ছানুসারে আমি এই দেহ পরিচালিত করিতে পারিতেছি না বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা তো আমারই দোষ, কারণ ইচ্ছাই আমাদের দেহ-পরিচালক—ইহা মানিয়া লইবার আমার কোন অধিকার ছিল না। এরূপই যদি আমরা মানিয়া লই যে, ইচ্ছাই জগৎ পরিচালন করিতেছে, তারপর দেখি প্রকৃত ঘটনার সহিত ইহা মিলিতেছে না, তবে ইহা আমারই দোষ। এই পুরুষ ইচ্ছা নন বা বুদ্ধি নন, কারণ বুদ্ধি একটি যৌগিক পদার্থমাত্র। কোনরূপ জড়পদার্থ না থাকিলে কোনরূপ বুদ্ধিও থাকিতে পারে না। এই জড় মানুষে মস্তিষ্কের আকার ধারণ করিয়াছে। যেখানেই বুদ্ধি আছে, সেখানেই কোন-না-কোন আকারে জড় পদার্থ থাকিবেই থাকিবে। অতএব বুদ্ধি যখন যৌগিক পদার্থ হইল, তখন পুরুষ কি? উহা মহত্তত্ত্বও নয়, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিও নয়, কিন্তু উভয়েরই কারণ। তাঁহার সান্নিধ্যই উহাদের সবগুলিকে ক্রিয়াশীল করে ও পরস্পরকে মিলিত করায়। পুরুষকে সেই-সকল বস্তুর কয়েকটির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যেগুলির শুধু সান্নিধ্যই রাসায়নিক কার্য ত্বরান্বিত করে, যেমন সোনা গলাইতে গেলে তাহাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড (Cyanide of Potassium) মিশাইতে হয়। পটাসিয়াম সায়ানাইড পৃথক্ থাকিয়া যায়, (শেষ পর্যন্ত) উহার উপর কোন রাসায়নিক কার্য হয় না, কিন্তু সোনা গলানো-

রূপ কার্য সফল করিবার জন্য উহার সান্নিধ্য প্রয়োজন। পুরুষ সম্বন্ধেও এই কথা। উহা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হয় না, উহা বুদ্ধি বা মহৎ বা উহার কোনরূপ বিকার নয়, উহা শুদ্ধ পূর্ণ আত্মা।

'আমি সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিত থাকায় প্রকৃতি চেতন ও অচেতন সব কিছু সৃজন করিতেছে।'[১]

তাহা হইলে প্রকৃতিতে এই চেতনা কোথা হইতে আসিল? পুরুষেই এই চেতনার ভিত্তি, আর ঐ চেতনাই পুরুষের স্বরূপ। উহা এমন এক বস্তু, যাহা বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না, বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায় না, কিন্তু আমরা যাহাকে 'জ্ঞান' বলি, উহা তাহার উপাদান-স্বরূপ। এই পুরুষ আমাদের সাধারণ জ্ঞান নয়, কারণ জ্ঞান একটি যৌগিক পদার্থ, তবে এই জ্ঞানে যাহা কিছু উজ্জ্বল ও উত্তম, তাহা ঐ পুরুষেরই। পুরুষে চৈতন্য আছে, কিন্তু পুরুষকে বুদ্ধিমান্ বা জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা এমন বস্তু, যিনি থাকাতেই জ্ঞান সম্ভব হয়। পুরুষের মধ্যে যে চিৎ, তাহা প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া আমাদের নিকট 'বুদ্ধি' বা 'জ্ঞান' নামে পরিচিত হয়। জগতে যে কিছু সুখ আনন্দ শান্তি আছে, সমুদয়ই পুরুষের, কিন্তু ঐগুলি মিশ্র, কেন না উহাতে পুরুষ ও প্রকৃতি সংযুক্ত আছে।

'যেখানে কোনপ্রকার সুখ, যেখানে কোনরূপ আনন্দ, সেখানে সেই অমৃতস্বরূপ পুরুষের এক কণা আছে, বুঝিতে হইবে।'[২]

এই পুরুষই সমগ্র জগতের মহা আকর্ষণস্বরূপ, তিনি যদিও উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট ও উহার সহিত অসংসৃষ্ট, তথাপি তিনি সমগ্র জগৎকে আকর্ষণ করিতেছেন। মানুষকে যে কাঞ্চনের অন্বেষণে ধাবমান দেখিতে পান, তাহার কারণ সে না জানিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই কাঞ্চনের মধ্যে পুরুষের এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। যখন মানুষ সন্তান প্রার্থনা করে, অথবা নারী যখন স্বামীকে চায়, তখন কোন্ শক্তি তাহাদিগকে আকর্ষণ করে? সেই সন্তান ও সেই স্বামীর ভিতর যে সেই পুরুষের অংশ আছে, তাহাই সেই আকর্ষণী শক্তি। তিনি সকলেরই পশ্চাতে রহিয়াছেন, কেবল উহাতে জড়ের আবরণ

১ ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।—গীতা, ৯।১০

২ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।—বৃহ. উপ., ৪।৩।৩২

পড়িয়াছে। অন্য কিছুই কাহাকেও আকর্ষণ করিতে পারে না। এই অচেতনাত্মক জগতের মধ্যে সেই পুরুষই একমাত্র চেতন। ইনিই সাংখ্যের পুরুষ। অতএব ইহা হইতে নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে, এই পুরুষ অবশ্যই সর্বব্যাপী, কারণ যাহা সর্বব্যাপী নয়, তাহা অবশ্যই সসীম। সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাবই কোন কারণের কার্যস্বরূপ, আর যাহা কার্যস্বরূপ, তাহার অবশ্য আদি-অন্ত থাকিবে। যদি পুরুষ সীমাবদ্ধ হন, তবে তিনি অবশ্য বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন, তিনি তাহা হইলে আর চরম তত্ত্ব হইলেন না, তিনি মুক্তস্বরূপ হইলেন না, তিনি কোন কারণের কার্যস্বরূপ—উৎপন্ন পদার্থ হইলেন। অতএব যদি তিনি সীমাবদ্ধ না হন, তবে তিনি সর্বব্যাপী। কপিলের মতে পুরুষের সংখ্যা এক নয়, বহু। অনন্তসংখ্যক পুরুষ রহিয়াছেন, আপনিও একজন পুরুষ, আমিও একজন পুরুষ, প্রত্যেকেই এক একজন পুরুষ—উহারা যেন অনন্তসংখ্যক বৃত্তস্বরূপ। তাহার প্রত্যেকটি আবার অনন্ত বিস্তৃত। পুরুষ জন্মানও না, মরেনও না। তিনি মনও নন, জড়ও নন। আর আমরা যাহা কিছু জানি, সকলই তাঁহার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে, যদি তিনি সর্বব্যাপী হন, তবে তাঁহার জন্মমৃত্যু কখনই হইতে পারে না। প্রকৃতি তাঁহার উপর নিজ ছায়া—জন্ম ও মৃত্যুর ছায়া প্রক্ষেপ করিতেছে, কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ নিত্য। এতদূর পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, কপিলের মত অতি অপূর্ব।

এইবার আমরা এই সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলিবার আছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করিব। যতদূর পর্যন্ত দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, এই বিশ্লেষণ নির্দোষ, ইহার মনোবিজ্ঞান অখণ্ডনীয়, ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। আমরা কপিলকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, প্রকৃতি কে সৃষ্টি করিল? আর তাহার উত্তর পাইলাম—উহা সৃষ্ট নয়। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, পুরুষ অসৃষ্ট ও সর্বব্যাপী, আর এই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। আমাদিগকে সাংখ্যের এই শেষ সিদ্ধান্তটির প্রতিবাদ করিয়া উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং তাহা করিলেই আমরা বেদান্তের অধিকারে আসিয়া উপস্থিত হইব। আমরা প্রথমেই এই আশঙ্কা উত্থাপন করিব: প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি অনন্ত কি করিয়া থাকিতে পারে? তার পর আমরা এই যুক্তি উত্থাপন করিব—উহা সম্পূর্ণ সামান্যীকরণ

(generalisation)[1] নয়, অতএব আমরা সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। তার পর আমরা দেখিব, বেদান্তবাদীরা কিরূপে এই-সকল আপত্তি ও আশঙ্কা কাটাইয়া নিখুঁত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব গৌরব কপিলেরই প্রাপ্য। প্রায়-সম্পূর্ণ অট্টালিকাকে সমাপ্ত করা অতি সহজ কাজ।

১ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া ঐগুলির মধ্যে সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করাকে generalisation বা সামান্যীকরণ বলে।

সাংখ্য ও অদ্বৈত

প্রথমে আপনাদের নিকট যে সাংখ্যদর্শনের আলোচনা করিতেছিলাম, এখন তাহার মোট কথাগুলি সংক্ষেপে বলিব। কারণ এই বক্তৃতায় আমরা ইহার ত্রুটি কোন্‌গুলি, তাহা বাহির করিতে এবং বেদান্ত আসিয়া কিরূপে ঐ অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া দেন, তাহা বুঝিতে চাই। আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি হইতেই চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার, রাগ, দ্বেষ, স্পর্শ, রস—এক কথায় সব-কিছুরই বিকাশ হইতেছে। এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিন প্রকার উপাদানে গঠিত। এগুলি গুণ নয়,—জগতের উপাদান-কারণ; এইগুলি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, আর যুগ-প্রারম্ভে এগুলি সামঞ্জস্যভাবে বা সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টি আরম্ভ হইলেই এই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। তখন এই দ্রব্যগুলি পরস্পর নানারূপে মিলিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। ইহাদের প্রথম বিকাশকে সাংখ্যেরা মহৎ (অর্থাৎ সর্বব্যাপী বুদ্ধি) বলেন। আর তাহা হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অহংজ্ঞান হইতে মন অর্থাৎ সর্বব্যাপী মনস্তত্ত্বের উদ্ভব। ঐ অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার হইতেই জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রা অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রস প্রভৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কার হইতেই সমুদয় সূক্ষ্ম পরমাণুর উদ্ভব, আর ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ হইতেই স্থূল পরমাণুসমূহের উৎপত্তি হয়, যাহাকে আমরা জড় বলি। তন্মাত্রার (অর্থাৎ যে-সকল পরমাণু দেখা যায় না বা যাহাদের পরিমাণ করা যায় না) পর স্থূল পরমাণুসকলের উৎপত্তি—এগুলি আমরা অনুভব ও ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন—এই ত্রিবিধ কার্য-সমন্বিত চিত্ত প্রাণনামক শক্তিসমূহকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। এই প্রাণের সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, আপনাদের ঐ ধারণা এখনই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস এই প্রাণ বা সর্বব্যাপী শক্তির একটি কার্য মাত্র। কিন্তু এখানে 'প্রাণসমূহ' অর্থে সেই স্নায়বীয় শক্তিসমূহ বুঝায়, যেগুলি সমুদয় দেহটিকে চালাইতেছে এবং চিন্তা ও দেহের নানাবিধ ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পাইতেছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি এই প্রাণসমূহের প্রধান ও প্রত্যক্ষতম

প্রকাশ। যদি বায়ু দ্বারাই এই শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য হইত, তবে মৃত ব্যক্তিও শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া করিত। প্রাণই বায়ুর উপর কার্য করিতেছে, বায়ু প্রাণের উপর করিতেছে না। এই প্রাণসমূহ জীবনশক্তিরূপে সমুদয় শরীরের উপর কার্য করিতেছে, উহারা আবার মন এবং ইন্দ্রিয়গণ (অর্থাৎ দুই প্রকার স্নায়ুকেন্দ্র) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এ পর্যন্ত বেশ কথা। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার, আর ভাবিয়া দেখুন, কত যুগ পূর্বে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহা জগতের মধ্যে প্রাচীনতম যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী। যেখানেই কোনরূপ দর্শন বা যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কপিলের নিকট কিছু না কিছু ঋণী। যেখানেই মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের কিছু না কিছু চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ চেষ্টা এই চিন্তা-প্রণালীর জনক কপিল-নামক ব্যক্তির নিকট ঋণী।

এতদূর পর্যন্ত আমরা দেখিলাম যে, এই মনোবিজ্ঞান বড়ই অপূর্ব ; কিন্তু আমরা যত অগ্রসর হইব, ততই দেখিব, কোন কোন বিষয়ে ইহার সহিত আমাদিগকে ভিন্ন মত অবলম্বন করিতে হইবে। কপিলের প্রধান মত—পরিণাম। তিনি বলেন, এক বস্তু অপর বস্তুর পরিণাম বা বিকার ; কারণ তাঁহার মতে কার্যকারণভাবের লক্ষণ এই যে, কার্য অন্যরূপে পরিণত কারণমাত্র[১] আর যেহেতু আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে সমগ্র জগৎই ক্রমাগত পরিণাম-প্রাপ্ত হইতেছে। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চয়ই কোন উপাদান হইতে অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃতি উহার কারণ হইতে স্বরূপতঃ কখন বিভিন্ন হইতে পারে না, কেবল যখন প্রকৃতি বিশিষ্ট আকার ধারণ করে, তখন সীমাবদ্ধ হয়। ঐ উপাদানটি স্বয়ং নিরাকার। কিন্তু কপিলের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বৈষম্যপ্রাপ্তির শেষ সোপান পর্যন্ত কোনটিই 'পুরুষ' অর্থাৎ ভোক্তা বা প্রকাশকের সহিত সমপর্যায়ে নয়। একটা কাদার তাল যেমন, সমষ্টিমনও তেমনি, সমগ্র জগৎও তেমনি। স্বরূপতঃ উহাদের চৈতন্য নাই, কিন্তু উহাদের মধ্যে আমরা বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দেখিতে পাই, অতএব উহাদের পশ্চাতে—সমগ্র প্রকৃতির

---

১ কারণভাবাচ্চ। —সাংখ্যসূত্র, ১।১১৮

পশ্চাতে—নিশ্চয়ই এমন কোন সত্তা আছে, যাহার আলোক উহার উপর পড়িয়া মহৎ, অহংজ্ঞান ও এই-সব নানা বস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। আর এই সত্তাকেই কপিল 'পুরুষ' বা আত্মা বলেন, বেদান্তীরাও উহাকে 'আত্মা' বলিয়া থাকেন। কপিলের মতে পুরুষ অমিশ্র পদার্থ—উহা যৌগিক পদার্থ নয়। উহাই একমাত্র অজড় পদার্থ, আর সমুদয় প্রপঞ্চবিকারই জড়। পুরুষই একমাত্র জ্ঞাতা। মনে করুন, আমি একটা বোর্ড দেখিতেছি। প্রথমে বাহিরের যন্ত্রগুলি মস্তিষ্ককেন্দ্রে (কপিলের মতে ইন্দ্রিয়ে) ঐ বিষয়টিকে লইয়া আসিবে; উহা আবার ঐ কেন্দ্র হইতে মনে যাইয়া তাহার উপর আঘাত করিবে, মন আবার উহাকে অহংজ্ঞানরূপ অপর একটি পদার্থে আবৃত করিয়া 'মহৎ' বা বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিবে। কিন্তু মহতের স্বয়ং কার্যের শক্তি নাই—উহার পশ্চাতে যে পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্তা। এইগুলি সবই ভৃত্যরূপে বিষয়ের আঘাত তাঁহার নিকট আনিয়া দেয়, তখন তিনি আদেশ দিলে 'মহৎ' প্রতিঘাত বা প্রতিক্রিয়া করে। পুরুষই ভোক্তা, বোদ্ধা, যথার্থ সত্তা, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা, মানবের আত্মা; তিনি কোন জড়বস্তু নন। যেহেতু তিনি জড় নন, সেহেতু তিনি অবশ্যই অনন্ত, তাঁহার কোনরূপ সীমা থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ পুরুষগণের প্রত্যেকেই সর্বব্যাপী, তবে কেবল সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়পদার্থের মধ্য দিয়া কার্য করিতে পারেন। মন, অহংজ্ঞান, মস্তিষ্ককেন্দ্র বা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ—এই কয়েকটি লইয়া সূক্ষ্ম-শরীর অথবা খ্রীষ্টীয় দর্শনে যাহাকে মানবের 'আধ্যাত্মিক দেহ' বলে, তাহা গঠিত। এই দেহেরই পুরস্কার বা দণ্ড হয়, ইহাই বিভিন্ন স্বর্গে যাইয়া থাকে, ইহারই বারবার জন্ম হয়। কারণ আমরা প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, পুরুষ বা আত্মার পক্ষে আসা-যাওয়া অসম্ভব। 'গতি'-অর্থে যাওয়া-আসা, আর যাহা একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করে, তাহা কখনও সর্বব্যাপী হইতে পারে না। এই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীরই আসে যায়। এই পর্যন্ত আমরা কপিলের দর্শন হইতে দেখিলাম, আত্মা অনন্ত এবং একমাত্র উহাই প্রকৃতির পরিণাম নয়। একমাত্র আত্মাই প্রকৃতির বাহিরে, কিন্তু উহা প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে বেড়িয়া আছে, সেইজন্য পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। পুরুষ ভাবিতেছেন, 'আমি লিঙ্গশরীর, আমি স্থূলশরীর', আর সেই জন্যই তিনি

সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখদুঃখ আত্মার নয়, উহারা লিঙ্গশরীরের এবং স্থূলশরীরের। যখনই কতকগুলি স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আমরা কষ্ট অনুভব করি, তখনই তৎক্ষণাৎ আমরা উহা উপলব্ধি করিয়া থাকি। যদি আমার অঙ্গুলির স্নায়ুগুলি নষ্ট হয়, তবে আমার অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলেও কিছু বোধ করিব না। অতএব সুখদুঃখ স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের। মনে করুন, আমার দর্শনেন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া গেল, তাহা হইলে আমার চক্ষুযন্ত্র থাকিলেও আমি রূপ হইতে কোন সুখ-দুঃখ অনুভব করিব না। অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সুখ-দুঃখ আত্মার নয়; উহারা মনের ও দেহের।

আত্মার সুখ দুঃখ কিছুই নাই; আত্মা সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ, যাহা কিছু হইতেছে, তাহারই নিত্য সাক্ষিস্বরূপ, কিন্তু আত্মা কোন কর্মের ফল গ্রহণ করে না।

'সূর্য যেমন সকল লোকের চক্ষুর দৃষ্টির কারণ হইলেও স্বয়ং কোন চক্ষুর দোষে লিপ্ত হয় না, পুরুষও তেমনি।'[১]

'যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সম্মুখে লাল ফুল রাখিলে উহা লাল দেখায়, এইরূপ পুরুষকেও প্রকৃতির প্রতিবিম্ব-দ্বারা সুখদুঃখে লিপ্ত বোধ হয়, কিন্তু উহা সদাই অপরিণামী।'[২]

উহার অবস্থা যতটা সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয়, ধ্যানকালে আমরা যে-ভাব অনুভব করি, উহা প্রায় সেইরূপ। এই ধ্যানাবস্থাতেই আপনারা পুরুষের খুব সন্নিহিত হইয়া থাকেন। অতএব আমরা দেখিতেছি, যোগীরা এই ধ্যানাবস্থাকে কেন সর্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া থাকেন; কারণ পুরুষের সহিত আপনার এই একত্ববোধ—জড়াবস্থা বা ক্রিয়াশীল অবস্থা নয়, উহা ধ্যানাবস্থা। ইহাই সাংখ্যদর্শন।

তার পর সাংখ্যেরা আরও বলেন যে, প্রকৃতির এই-সকল বিকার আত্মার জন্য, উহার বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলনাদি সমস্তই উহা হইতে স্বতন্ত্র অপর কাহারও জন্য। সুতরাং এই যে নানাবিধ মিশ্রণকে আমরা প্রকৃতি বা

১ কঠোপনিষদ্, ২।২।২২

২ কুসুমবচ্চ মণিঃ।—সাংখ্যসূত্র, ২।৩৫

জগৎপ্রপঞ্চ বলি—এই যে আমাদের ভিতরে এবং চতুর্দিকে ক্রমাগত পরিবর্তন-পরম্পরা হইতেছে, তাহা আত্মার ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তির জন্য। আত্মা সর্বনিম্ন অবস্থা হইতে সর্বোচ্চ অবস্থা পর্যন্ত স্বয়ং ভোগ করিয়া তাহা হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন, আর যখন আত্মা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি কোন কালেই প্রকৃতিতে বদ্ধ ছিলেন না, তিনি সর্বদাই উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন ; তখন তিনি আরও দেখিতে পান যে, তিনি অবিনাশী, তাঁহার আসা-যাওয়া কিছুই নাই ; স্বর্গে যাওয়া, আবার এখানে আসিয়া জন্মানো—সবই প্রকৃতির, তাঁহার নিজের নয় ; তখনই আত্মা মুক্ত হইয়া যান। এইরূপে সমুদয় প্রকৃতি আত্মার ভোগ বা অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের জন্য কার্য করিয়া যাইতেছে, আর আত্মা সেই চরম লক্ষ্যে যাইবার জন্য এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। মুক্তিই সেই চরম লক্ষ্য। সাংখ্যদর্শনের মতে এরূপ আত্মার সংখ্যা বহু। অনন্তসংখ্যক আত্মা রহিয়াছেন। সাংখ্যের আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর নাই—জগতের সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই যখন এই-সকল বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তখন আর ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

এখন আমাদিগকে সাংখ্যদের এই তিনটি মত খণ্ডন করিতে হইবে। প্রথমটি এই যে, জ্ঞান বা ঐরূপ যাহা কিছু তাহা আত্মার নয়, উহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মা নির্গুণ ও অরূপ। সাংখ্যের যে দ্বিতীয় মত আমরা খণ্ডন করিব, তাহা এই যে, ঈশ্বর নাই ; বেদান্ত দেখাইবেন, ঈশ্বর স্বীকার না করিলে জগতের কোনপ্রকার ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, বহু আত্মা থাকিতে পারে না, আত্মা অনন্তসংখ্যক হইতে পারে না, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে মাত্র এক আত্মা আছেন, এবং সেই একই বহুরূপে প্রতীত হইতেছেন।

প্রথমে আমরা সাংখ্যের প্রথম সিদ্ধান্তটি লইয়া আলোচনা করিব যে, বুদ্ধি ও যুক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মাতে ওগুলি নাই। বেদান্ত বলেন, আত্মার স্বরূপ অসীম অর্থাৎ তিনি পূর্ণ সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তবে আমাদের সাংখ্যের সহিত এই বিষয়ে একমত যে, তাঁহারা যাহাকে বুদ্ধিজাত জ্ঞান বলেন, তাহা একটি যৌগিক পদার্থমাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের বিষয়ানুভূতি

কিরূপে হয়, সেই ব্যাপারটি আলোচনা করা যাক। আমাদের স্মরণ আছে যে, চিত্তই বাহিরের বিভিন্ন বস্তুকে লইতেছে, উহারই উপর বহির্বিষয়ের আঘাত আসিয়াছে এবং উহা হইতেই প্রতিক্রিয়া হইতেছে। মনে করুন, বাহিরে কোন বস্তু রহিয়াছে ; আমি একটি বোর্ড দেখিতেছি। উহার জ্ঞান কিরূপে হইতেছে ? বোর্ডটির স্বরূপ অজ্ঞাত, আমরা কখনই উহা জানিতে পারি না। জার্মান দার্শনিকেরা উহাকে 'বস্তুর স্বরূপ' (Thing in itself) বলিয়া থাকেন। সেই বোর্ড স্বরূপতঃ যাহা, সেই অজ্ঞেয় সত্তা 'ক' আমার চিত্তের উপর কার্য করিতেছে, আর চিত্ত প্রতিক্রিয়া করিতেছে। চিত্ত একটি হ্রদের মতো। যদি হ্রদের উপর আপনি একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করেন, যখনই প্রস্তর ঐ হ্রদের উপর আঘাত করে, তখনই প্রস্তরের দিকে হ্রদের প্রতিক্রিয়া-রূপ একটি তরঙ্গ আসিবে। আপনারা বিষয়ানুভূতি-কালে বাস্তবিক এই তরঙ্গটিকেই দেখিয়া থাকেন। আর ঐ তরঙ্গটি মোটেই সেই প্রস্তরটির মতো নয়—উহা একটি তরঙ্গ। অতএব সেই যথার্থ বোর্ড 'ক'-ই প্রস্তররূপে মনের উপর আঘাত করিতেছে, আর মন সেই আঘাতকারী পদার্থের দিকে একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছে। উহার দিকে এই যে তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাকেই আমরা বোর্ড-নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমি আপনাকে দেখিতেছি। আপনি স্বরূপতঃ যাহা, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আপনি সেই অজ্ঞাত সত্তা 'ক'-স্বরূপ ; আপনি আমার মনের উপর কার্য করিতেছেন, এবং যেদিক হইতে ঐ কার্য হইয়াছিল, তাহার দিকে মন একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর সেই তরঙ্গকেই আমরা 'অমুক নর' বা 'অমুক নারী' বলিয়া থাকি।

এই জ্ঞানক্রিয়ার দুইটি উপাদান—একটি ভিতর হইতে ও অপরটি বাহির হইতে আসিতেছে, আর এই দুইটির মিশ্রণ (ক+মন) আমাদের বাহ্য জগৎ। সমুদয় জ্ঞান প্রতিক্রিয়ার ফল। তিমি মৎস্য সম্বন্ধে গণনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, উহার লেজে আঘাত করিবার কতকক্ষণ পরে উহার মন ঐ লেজের উপর প্রতিক্রিয়া করে এবং ঐ লেজে কষ্ট অনুভব হয়। শুক্তির কথা ধরুন, একটি বালুকাকণা[১] ঐ শুক্তির খোলার ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাকে

[১] বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে বালুকাকণা হইতে মুক্তার উৎপত্তি—এই লোক-প্রচলিত বিশ্বাসটির কোন ভিত্তি নাই। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রকীটাণুবিশেষ (Parasite) হইতে মুক্তার উৎপত্তি।

উত্তেজিত করিতে থাকে—তখন ঐ শুক্তি বালুকাকণার চতুর্দিকে নিজ রস প্রক্ষেপ করে—তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। দুইটি জিনিসে মুক্তা প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমতঃ শুক্তির শরীর-নিঃসৃত রস, আর দ্বিতীয়তঃ বহির্দেশ হইতে প্রদত্ত আঘাত। আমার এই টেবিলটির জ্ঞানও সেরূপ—'ক'+মন। ঐ বস্তুকে জানিবার চেষ্টাটা তো মনই করিবে; সুতরাং মন উহাকে বুঝিবার জন্য নিজের সত্তা কতকটা উহাতে প্রদান করিবে, আর যখনই আমরা উহা জানিলাম, তখনই উহা হইয়া দাঁড়াইল একটি যৌগিক পদার্থ—'ক+মন'। আভ্যন্তরিক অনুভূতি সম্বন্ধে অর্থাৎ যখন আমরা নিজেকে জানিতে ইচ্ছা করি, তখনও ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। যথার্থ আত্মা বা আমি, যাহা আমাদের ভিতরে রহিয়াছে, তাহাও অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। উহাকে 'খ' বলা যাক। যখন আমি আমাকে শ্রীঅমুক বলিয়া জানিতে চাই, তখন ঐ 'খ' 'খ+মন' এইরূপে প্রতীত হয়। যখন আমি আমাকে জানিতে চাই, তখন ঐ 'খ' মনের উপর একটি আঘাত করে, মনও আবার ঐ 'খ'-এর উপর আঘাত করিয়া থাকে। অতএব আমাদের সমগ্র জগতে জ্ঞানকে 'ক+মন' (বাহ্যজগৎ) এবং 'খ+মন' (অন্তর্জগৎ) রূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা পরে দেখিব, অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্ত কিরূপে গণিতের ন্যায় প্রমাণ করা যাইতে পারে।

'ক' ও 'খ' কেবল বীজগণিতের অজ্ঞাত সংখ্যামাত্র। আমরা দেখিয়াছি, সকল জ্ঞানই যৌগিক—বাহ্যজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানও যৌগিক, এবং বুদ্ধি বা অহংজ্ঞানও সেরূপ একটি যৌগিক ব্যাপার। যদি উহা ভিতরের জ্ঞান বা মানসিক অনুভূতি হয়, তবে উহা 'খ+মন', আর যদি উহা বাহিরের জ্ঞান বা বিষয়ানুভূতি হয়, তবে উহা 'ক+মন'। সমুদয় ভিতরের জ্ঞান 'খ'-এর সহিত মনের সংযোগলব্ধ এবং বাহিরের জড় পদার্থের সমুদয় জ্ঞান 'ক'-এর সহিত মনের সংযোগের ফল। প্রথমে ভিতরের ব্যাপারটি গ্রহণ করিলাম। আমরা প্রকৃতিতে যে জ্ঞান দেখিতে পাই, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান 'খ' ও মনের সংযোগলব্ধ, আর ঐ 'খ' আত্মা হইতে আসিতেছে। অতএব আমরা যে জ্ঞানের সহিত পরিচিত, তাহা আত্মচৈতন্যের শক্তির সহিত প্রকৃতির সংযোগের ফল। এইরূপে আমরা বাহিরের সত্তা যাহা জানিতেছি, তাহাও অবশ্য মনের সহিত 'ক'-এর সংযোগে উৎপন্ন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, আমি আছি, আমি জানিতেছি ও আমি সুখী অর্থাৎ সময়ে সময়ে আমাদের ভাব

আসে যে, আমার কোন অভাব নাই—এই তিনটি তত্ত্বে আমাদের জীবনের কেন্দ্রগত ভাব, আমাদের জীবনের মহান্ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আর ঐ কেন্দ্র বা ভিত্তি সীমাবিশিষ্ট হইয়া অপর বস্তুসংযোগে যৌগিক ভাব ধারণ করিলে আমরা উহাকে সুখ বা দুঃখ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এই তিনটি তত্ত্বই ব্যাবহারিক সত্তা, ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ব্যাবহারিক আনন্দ বা প্রেমরূপে প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেককেই জানিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই আনন্দের জন্য হইয়াছে। ইহা অতিক্রম করিবার সাধ্য তাহার নাই। সমগ্র জগতেই এইরূপ। পশুগণ, উদ্ভিদ্‌গণ ও নিম্নতম হইতে উচ্চতম সত্তা পর্যন্ত সকলেই ভালবাসিয়া থাকে। আপনারা উহাকে ভালবাসা না বলিতে পারেন, কিন্তু অবশ্যই তাহারা সকলেই জগতে থাকিবে, তাহারা সকলেই জানিবে এবং সকলেই ভালবাসিবে। অতএব এই যে সত্তা আমরা জানিতেছি, তাহা পূর্বোক্ত 'ক' ও মনের সংযোগফল, আর আমাদের জ্ঞানও সেই ভিতরের 'খ' ও মনের সংযোগফল, আর প্রেমও ঐ 'খ' ও মনের সংযোগ-ফল। অতএব এই যে তিনটি বস্তু বা তত্ত্ব ভিতর হইতে আসিয়া বাহিরের বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যাবহারিক সত্তা, ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ব্যাবহারিক প্রেমের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদিগকেই বৈদান্তিকেরা নিরপেক্ষ বা পারমার্থিক সত্তা (সৎ), পারমার্থিক জ্ঞান (চিৎ) ও পারমার্থিক 'আনন্দ' বলিয়া থাকেন।

সেই পারমার্থিক সত্তা, যাহা অসীম অমিশ্র অযৌগিক, যাহার কোন পরিণাম নাই, তাহাই সেই মুক্ত আত্মা, আর যখন সেই প্রকৃত সত্তা প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যেন মলিন হইয়া যায়, তাহাকেই আমরা মানব-নামে অভিহিত করি। উহা সীমাবদ্ধ হইয়া উদ্ভিদ্‌জীবন, পশুজীবন বা মানব-জীবনরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন অনন্ত দেশ এই গৃহের দেয়াল বা অন্য কোনরূপ বেষ্টনের দ্বারা আপাততঃ সীমাবদ্ধ বোধ হয়। সেই পারমার্থিক জ্ঞান বলিতে যে জ্ঞানের বিষয় আমরা জানি, তাহাকে বুঝায় না—বুদ্ধি বা বিচারশক্তি বা সহজাত জ্ঞান কিছুই বুঝায় না, উহা সেই বস্তুকে বুঝায়, যাহা বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইলে আমরা এই-সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যখন সেই নিরপেক্ষ বা পূর্ণজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়, তখন আমরা উহাকে দিব্য বা প্রাতিভ জ্ঞান বলি, যখন আরও অধিক সীমাবদ্ধ হয়, তখন উহাকে যুক্তিবিচার, সহজাত জ্ঞান ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। সেই নিরপেক্ষ

জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলে। উহাকে 'সর্বজ্ঞতা' বলিলে উহার ভাব অনেকটা প্রকাশ হইতে পারে। উহা কোন প্রকার যৌগিক পদার্থ নয়। উহা আত্মার স্বভাব। যখন সেই নিরপেক্ষ আনন্দ সীমাবদ্ধ ভাব ধারণ করে, তখনই উহাকে আমরা 'প্রেম' বলি—যাহা স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর বা ভাবসমূহের প্রতি আকর্ষণ-স্বরূপ। এইগুলি সেই আনন্দের বিকৃত প্রকাশমাত্র আর ঐ আনন্দ আত্মার গুণবিশেষ নয়, উহা আত্মার স্বরূপ—উহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতি। নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দ আত্মার গুণ নয়, উহারা আত্মার স্বরূপ, উহাদের সহিত আত্মার কোন প্রভেদ নাই। আর ঐ তিনটি একই জিনিস, আমরা এক বস্তুকে তিন বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকি মাত্র। উহারা সমুদয় সাধারণ জ্ঞানের অতীত, আর তাহাদের প্রতিবিম্বে প্রকৃতিকে চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়।

আত্মার সেই নিত্য নিরপেক্ষ জ্ঞানই মানব-মনের মধ্য দিয়া আসিয়া আমাদের বিচার-যুক্তি ও বুদ্ধি হইয়াছে। যে উপাধি বা মাধ্যমের ভিতর দিয়া উহা প্রকাশ পায়, তাহার বিভিন্নতা অনুসারে উহার বিভিন্নতা হয়। আত্মা হিসাবে আমাতে এবং অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণীতে কোন প্রভেদ নাই, কেবল তাহার মস্তিষ্ক জ্ঞানপ্রকাশের অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী যন্ত্র, এইজন্য তাহার জ্ঞানকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলিয়া থাকি। মানবের মস্তিষ্ক অতি সূক্ষ্মতর ও জ্ঞানপ্রকাশের উপযোগী, সেইজন্য তাহার নিকট জ্ঞানের প্রকাশ স্পষ্টতর, আর উচ্চতম মানবে উহা একখণ্ড কাচের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। অস্তিত্ব বা সত্তা সম্বন্ধেও এইরূপ; আমরা যে অস্তিত্বকে জানি, এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র অস্তিত্ব সেই নিরপেক্ষ সত্তার প্রতিবিম্বমাত্র, এই নিরপেক্ষ সত্তাই আত্মার স্বরূপ। আনন্দ সম্বন্ধেও এইরূপ; যাহাকে আমরা প্রেম বা আকর্ষণ বলি, তাহা সেই আত্মার নিত্য আনন্দের প্রতিবিম্বস্বরূপ, কারণ যেমন ব্যক্তভাব বা প্রকাশ হইতে থাকে, অমনি সসীমতা আসিয়া থাকে, কিন্তু আত্মার সেই অব্যক্ত স্বাভাবিক স্বরূপগত সত্তা অসীম ও অনন্ত, সেই আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু মানবীয় প্রেমে সীমা আছে। আমি আজ আপনাকে ভালবাসিলাম, তার পরদিনই আমি আপনাকে আর ভালবাসিতে নাও পারি। একদিন আমার ভালবাসা বাড়িয়া উঠিল, তার পরদিন আবার কমিয়া গেল, কারণ উহা একটি সীমাবদ্ধ প্রকাশমাত্র। অতএব কপিলের মতের বিরুদ্ধে এই

প্রথম কথা পাইলাম, তিনি আত্মাকে নির্গুণ, অরূপ, নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্ত উপদেশ দিতেছেন—উহা সমুদয় সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সারস্বরূপ, আমরা যতপ্রকার জ্ঞানের বিষয় জানি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে মহত্তর, আমরা মানবীয় প্রেম বা আনন্দের যতদূর পর্যন্ত কল্পনা করিতে পারি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে অধিক আনন্দময়, আর তিনি অনন্ত সত্তাবান্। আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম-মরণের কথা ভাবিতেই পারা যায় না, কারণ তিনি অনন্ত সত্তাস্বরূপ।

কপিলের সহিত আমাদের দ্বিতীয় বিষয়ে মতভেদ—তাঁহার ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণা লইয়া। যেমন ব্যষ্টিবুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যষ্টিশরীর পর্যন্ত এই প্রাকৃতিক সান্ত প্রকাশ-শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও স্বরূপ আত্মাকে স্বীকার করা প্রয়োজন, সমষ্টিতেও—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও সমষ্টি বুদ্ধি, সমষ্টি মন, সমষ্টি সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়ের পশ্চাতে তাহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তারূপে কে আছেন, আমরা তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব। এই সমষ্টিবুদ্ধ্যাদি শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরূপ এক সর্বব্যাপী আত্মা স্বীকার না করিলে ঐ শ্রেণী সম্পূর্ণ হইবে কিরূপে? যদি আমরা অস্বীকার করি, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের একজন শাস্তা আছেন—তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর পশ্চাতেও যে একজন আত্মা আছেন, ইহাও অস্বীকার করিতে হইবে; কারণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একই নির্মাণপ্রণালীর পৌনঃপুনিকতা মাত্র। আমরা একতাল মাটিকে জানিতে পারিলে সকল মৃত্তিকার স্বরূপ জানিতে পারিব। যদি আমরা একটি মানবকে বিশ্লেষণ করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎকে বিশ্লেষণ করা হইল; কারণ সবই এক নিয়মে নির্মিত। অতএব যদি ইহা সত্য হয় যে, এই ব্যষ্টিশ্রেণীর পশ্চাতে এমন একজন আছেন, যিনি সমুদয় প্রকৃতির অতীত, যিনি পুরুষ, যিনি কোন উপাদানে নির্মিত নন, তাহা হইলে ঐ একই যুক্তি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের উপরও খাটিবে এবং উহার পশ্চাতেও একটি চৈতন্যকে স্বীকার করার প্রয়োজন হইবে। যে সর্বব্যাপী চৈতন্য প্রকৃতির সমুদয় বিকারের পশ্চাতে রহিয়াছে, বেদান্ত তাহাকে সকলের নিয়ন্তা 'ঈশ্বর' বলেন।

এখন পূর্বোক্ত দুইটি বিষয় অপেক্ষা গুরুতর বিষয় লইয়া সাংখ্যের সহিত আমাদিগকে বিবাদ করিতে হইবে। বেদান্তের মত এই যে, আত্মা একটিমাত্রই থাকিতে পারেন। যেহেতু আত্মা কোন প্রকার বস্তু দ্বারা গঠিত নয়, সেই

হেতু প্রত্যেক আত্মা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে—সাংখ্যের এই মত প্রমাণ করিয়া বিবাদের প্রারম্ভেই আমরা উহাদিগকে বেশ ধাক্কা দিতে পারি। যে-কোন বস্তু সীমাবদ্ধ, তাহা অপর কিছুর দ্বারা সীমিত। এই টেবিলটি রহিয়াছে—ইহার অস্তিত্ব অনেক বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর সীমাবদ্ধ বস্তু বলিলেই পূর্ব হইতে এমন একটি বস্তুর কল্পনা করিতে হয় যাহা উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। যদি আমরা 'দেশ' সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাই, তবে উহাকে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মতো চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু তাহারও বাহিরে আরও 'দেশ' রহিয়াছে। আমরা অন্য কোন উপায়ে সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় কল্পনা করিতে পারি না। উহাকে কেবল অনন্তের মধ্য দিয়াই বুঝা ও অনুভব করা যাইতে পারে। সসীমকে অনুভব করিতে হইলে সর্বস্থলেই আমাদিগকে অসীমের উপলব্ধি করিতে হয়। হয় দুইটিই স্বীকার করিতে হয় নতুবা কোনটিকেই স্বীকার করা চলে না। যখন আপনারা 'কাল' সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তখন আপনাদিগকে নির্দিষ্ট একটা 'কালের অতীত কাল' সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হয়। উহাদের একটি সীমাবদ্ধ কাল, আর বৃহত্তরটি অসীম কাল। যখনই আপনারা সসীমকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিবেন, তখনই দেখিবেন—উহাকে অসীম হইতে পৃথক করা অসম্ভব। যদি তাই হয়, তবে আমরা তাহা হইতেই প্রমাণ করিব যে, এই আত্মা অসীম ও সর্বব্যাপী। এখন একটি গভীর সমস্যা আসিতেছে। সর্বব্যাপী ও অনন্ত পদার্থ কি দুইটি হইতে পারে? মনে করুন, অসীম বস্তু দুইটি হইল—তাহা হইলে উহাদের মধ্যে একটি অপরটিকে সীমাবদ্ধ করিবে। মনে করুন, 'ক' ও 'খ' দুইটি অনন্ত বস্তু রহিয়াছে। তাহা হইলে অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ'কে সীমাবদ্ধ করিবে। কারণ আপনি ইহা বলিতে পারেন যে, অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ' নয়, আবার অনন্ত 'খ'-এর সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, উহা অনন্ত 'ক' নয়। অতএব অনন্ত একটিই থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনন্তের ভাগ হইতে পারে না। অনন্তকে যত ভাগ করা যাক না কেন, তথাপি উহা অনন্তই হইবে, কারণ উহাকে স্বরূপ হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে না। মনে করুন, এক অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, উহা হইতে কি আপনি এক ফোঁটা জলও লইতে পারেন? যদি পারিতেন, তাহা হইলে সমুদ্র আর অনন্ত থাকিত না, ঐ এক ফোঁটা জলই উহাকে সীমাবদ্ধ করিত। অনন্তকে কোন উপায়ে ভাগ করা যাইতে পারে না।

কিন্তু আত্মা যে এক, ইহা অপেক্ষাও তাহার প্রবলতর প্রমাণ আছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে এক অখণ্ড সত্তা—ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। আর একবার আমরা পূর্বকথিত 'ক' ও 'খ' নামক অজ্ঞাতবস্তুসূচক চিহ্নের সাহায্য গ্রহণ করিব। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যাহাকে আমরা বহির্জগৎ বলি, তাহা 'ক+মন', এবং অন্তর্জগৎ 'খ+মন'। 'ক' ও 'খ' এই দুইটিই অজ্ঞাত-পরিমাণ বস্তু—দুইই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এখন দেখা যাক্, মন কি? দেশ-কাল-নিমিত্ত ছাড়া মন আর কিছুই নয়—উহারাই মনের স্বরূপ। আপনারা কাল ব্যতীত কখন চিন্তা করিতে পারেন না, দেশ ব্যতীত কোন বস্তুর ধারণা করিতে পারেন না এবং নিমিত্ত বা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ ছাড়িয়া কোন বস্তুর কল্পনা করিতে পারেন না। পূর্বোক্ত 'ক' ও 'খ' এই তিনটি ছাঁচে পড়িয়া মন দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেছে। ঐগুলি ব্যতীত মনের স্বরূপ আর কিছুই নয়। এখন ঐ তিনটি ছাঁচ, যাহাদের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই, সেগুলি তুলিয়া লউন। কি অবশিষ্ট থাকে? তখন সবই এক হইয়া যায়। 'ক' ও 'খ' এক বলিয়া বোধ হয়। কেবল এই মন—এই ছাঁচই উহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল এবং উহাদিগকে অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ—এই দুই রূপে ভিন্ন করিয়াছিল। 'ক' ও 'খ' উভয়ই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমরা উহাদিগের উপর কোন গুণের আরোপ করিতে পারি না। সুতরাং গুণ- বা বিশেষণ-রহিত বলিয়া উভয়েই এক। যাহা গুণরহিত ও নিরপেক্ষ পূর্ণ, তাহা অবশ্যই এক হইবে। নিরপেক্ষ পূর্ণ বস্তু দুইটি হইতে পারে না। যেখানে কোন গুণ নাই, সেখানে কেবল এক বস্তুই থাকিতে পারে। 'ক' ও 'খ' উভয়ই নির্গুণ, কারণ উহারা মন হইতেই গুণ পাইতেছে। অতএব এই 'ক' ও 'খ' এক।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তামাত্র। জগতে কেবল এক আত্মা, এক সত্তা আছে; আর সেই এক সত্তা যখন দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচের মধ্যে পড়ে, তখনই তাহাকে বুদ্ধি, অহংজ্ঞান, সূক্ষ্ম-ভূত, স্থূল-ভূত প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। সমুদয় ভৌতিক ও মানসিক আকার বা রূপ, যাহা কিছু এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহা সেই এক বস্তু—কেবল বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। যখন উহার একটু অংশ এই দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে পড়ে, তখন উহা আকার গ্রহণ করে বলিয়া বোধ হয়; ঐ জাল সরাইয়া দেখুন—সবই এক। এই সমগ্র

জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ, আর উহাকেই অদ্বৈত-বেদান্তদর্শনে 'ব্রহ্ম' বলে। ব্রহ্ম যখন ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে আছেন বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলে, আর যখন তিনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে বিদ্যমান বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে 'আত্মা' বলে। অতএব এই আত্মাই মানুষের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর। একটিমাত্র পুরুষ আছেন—তাঁহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন ঈশ্বর ও মানবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়, তখন বুঝা যায়—উভয়ই এক। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনি স্বয়ং, অবিভক্ত আপনি। আপনি এই সমগ্র জগতের মধ্যে রহিয়াছেন। 'সকল হস্তে আপনি কাজ করিতেছেন, সকল মুখে আপনি খাইতেছেন, সকল নাসিকায় আপনি শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতেছেন, সকল মনে আপনি চিন্তা করিতেছেন।'[১] সমগ্র জগৎই আপনি। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার শরীর। আপনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় জগৎ; আপনিই জগতের আত্মা, আবার আপনিই উহার শরীরও বটে। আপনিই ঈশ্বর, আপনিই দেবতা, আপনিই মানুষ, আপনিই পশু, আপনিই উদ্ভিদ্, আপনিই খনিজ, আপনিই সব—সমুদয় ব্যক্ত জগৎ আপনিই। যাহা কিছু আছে সবই 'আপনি'; যথার্থ 'আপনি' যাহা—সেই এক অবিভক্ত আত্মা; যে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষকে আপনি 'আমি' বলিয়া মনে করেন, তাহা নয়।

এখন এই প্রশ্ন উঠিতেছে, আপনি অনন্ত পুরুষ হইয়া কিভাবে এইরূপ খণ্ড খণ্ড হইলেন?—কিভাবে শ্রী অমুক, পশুপক্ষী বা অন্যান্য বস্তু হইলেন? ইহার উত্তর: এই-সমুদয় বিভাগই আপাতপ্রতীয়মান। আমরা জানি, অনন্তের কখন বিভাগ হইতে পারে না। অতএব আপনি একটা অংশমাত্র—এ-কথা মিথ্যা, উহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আর আপনি যে শ্রী অমুক—এ-কথাও কোনকালে সত্য নয়, উহা কেবল স্বপ্নমাত্র। এটি জানিয়া মুক্ত হউন। ইহাই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত।

'আমি মনও নই, দেহও নই, ইন্দ্রিয়ও নই—আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমি সেই, আমিই সেই।'[২]

---

১ গীতা, ১৩।১৩

২ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমি র্ন তেজো ন বায়ু শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
—নির্বাণষট্‌কম্, শংকরাচার্য

ইহাই জ্ঞান এবং ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই অজ্ঞান। যাহা কিছু আছে, সবই অজ্ঞান—অজ্ঞানের ফলস্বরূপ। আমি আবার কি জ্ঞান লাভ করিব? আমি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। আমি আবার জীবন লাভ করিব কি? আমি স্বয়ং প্রাণস্বরূপ। জীবন আমার স্বরূপের গৌণ বিকাশমাত্র। আমি নিশ্চয়ই জানি যে, আমি জীবিত, তাহার কারণ আমিই জীবনস্বরূপ সেই এক পুরুষ। এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমার মধ্য দিয়া প্রকাশিত নয়, যাহা আমাতে নাই এবং যাহা আমার স্বরূপে অবস্থিত নয়। আমিই পঞ্চভূত-রূপে প্রকাশিত; কিন্তু আমি এক ও মুক্তস্বরূপ। কে মুক্তি চায়? কেহই মুক্তি চায় না। যদি আপনি নিজেকে বদ্ধ বলিয়া ভাবেন তো বদ্ধই থাকিবেন, আপনি নিজেই নিজের বন্ধনের কারণ হইবেন। আর যদি আপনি উপলব্ধি করেন যে আপনি মুক্ত, তবে এই মুহূর্তেই আপনি মুক্ত। ইহাই জ্ঞান—মুক্তির জ্ঞান, এবং মুক্তিই সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্য।

মুক্ত আত্মা

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যের বিশ্লেষণ দ্বৈতবাদে পর্যবসিত—উহার সিদ্ধান্ত এই যে, চরমতত্ত্ব—প্রকৃতি ও আত্মাসমূহ। আত্মার সংখ্যা অনন্ত, আর যেহেতু আত্মা অমিশ্র পদার্থ, সেইজন্য উহার বিনাশ নাই, সুতরাং উহা প্রকৃতি হইতে অবশ্যই স্বতন্ত্র। প্রকৃতির পরিণাম হয় এবং তিনি এই সমুদয় প্রপঞ্চ প্রকাশ করেন। সাংখ্যের মতে আত্মা নিষ্ক্রিয়। উহা অমিশ্র, আর প্রকৃতি আত্মার অপবর্গ বা মুক্তি-সাধনের জন্যই এই সমুদয় প্রপঞ্চজাল বিস্তার করেন, আর আত্মা যখন বুঝিতে পারেন, তিনি প্রকৃতি নন, তখনই তাঁহার মুক্তি। অপর দিকে আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়, প্রত্যেক আত্মাই সর্বব্যাপী। আত্মা যখন অমিশ্র পদার্থ, তখন তিনি সসীম হইতে পারেন না ; কারণ সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাব দেশ কাল বা নিমিত্তের মধ্য দিয়া আসিয়া থাকে। আত্মা যখন সম্পূর্ণরূপে ইহাদের অতীত, তখন তাঁহাতে সসীম ভাব কিছু থাকিতে পারে না। সসীম হইতে গেলে তাঁহাকে দেশের মধ্যে থাকিতে হইবে, আর তাহার অর্থ—উহার একটি দেহ অবশ্যই থাকিবে ; আবার যাঁহার দেহ আছে, তিনি অবশ্য প্রকৃতির অন্তর্গত। যদি আত্মার আকার থাকিত, তবে তো আত্মা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইতেন। অতএব আত্মা নিরাকার ; আর যাহা নিরাকার তাহা এখানে, সেখানে বা অন্য কোন স্থানে আছে—এ কথা বলা যায় না। উহা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে। সাংখ্যদর্শন ইহার উপরে আর যায় নাই।

সাংখ্যদের এই মতের বিরুদ্ধে বেদান্তীদের প্রথম আপত্তি এই যে, সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নয়। যদি প্রকৃতি একটি অমিশ্র বস্তু হয় এবং আত্মাও যদি অমিশ্র বস্তু হয়, তবে দুইটি অমিশ্র বস্তু হইল, আর যে-সকল যুক্তিতে আত্মার সর্বব্যাপিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা প্রকৃতির পক্ষেও খাটিবে, সুতরাং উহাও সমুদয় দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত হইবে। প্রকৃতি যদি এইরূপই হয়, তবে উহার কোনরূপ পরিবর্তন বা বিকাশ হইবে না। ইহাতে মুশকিল হয় এই যে, দুইটি অমিশ্র বা পূর্ণ বস্তু স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা অসম্ভব।

এ বিষয়ে বেদান্তীদের সিদ্ধান্ত কি? তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, স্থূল জড় হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব পর্যন্ত প্রকৃতির সমুদয় বিকার যখন অচেতন, তখন যাহাতে মন চিন্তা করিতে পারে এবং প্রকৃতি কার্য করিতে পারে, তাহার জন্য উহাদের পশ্চাতে উহাদের পরিচালক শক্তিস্বরূপ একজন চৈতন্যবান্ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। বেদান্তী বলেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে এই চৈতন্যবান্ পুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা 'ঈশ্বর' বলি, সুতরাং এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নয়। তিনি জগতের শুধু নিমিত্তকারণ নন, উপাদানকারণও বটে। কারণ কখনও কার্য হইতে পৃথক্ নয়। কার্য কারণেরই রূপান্তর মাত্র। ইহা তো আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি। অতএব ইনিই প্রকৃতির কারণস্বরূপ। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত—বেদান্তের যত বিভিন্ন মত বা বিভাগ আছে, সকলেরই এই প্রথম সিদ্ধান্ত যে, ঈশ্বর এই জগতের শুধু নিমিত্ত-কারণ নন, তিনি ইহার উপাদান-কারণও বটে; যাহা কিছু জগতে আছে, সবই তিনি। বেদান্তের দ্বিতীয় সোপান—এই আত্মাগণও ঈশ্বরের অংশ, সেই অনন্ত বহ্নির এক-একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র। অর্থাৎ যেমন এক বৃহৎ অগ্নিরাশি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনি সেই পুরাতন পুরুষ হইতে এই সমুদয় আত্মা বাহির হইয়াছে।[১]

এ পর্যন্ত তো বেশ হইল, কিন্তু এই সিদ্ধান্তেও তৃপ্তি হইতেছে না। অনন্তের অংশ—এ কথার অর্থ কি? অনন্ত যাহা, তাহা তো অবিভাজ্য। অনন্তের কখনও অংশ হইতে পারে না। পূর্ণ বস্তু কখনও বিভক্ত হইতে পারে না। তবে যে বলা হইল, আত্মাসমূহ তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের মতো বাহির হইয়াছে—এ কথার তাৎপর্য কি? অদ্বৈতবেদান্তী এই সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে পূর্ণের অংশ নাই। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক আত্মা তাঁহার অংশ নন, প্রত্যেকে প্রকৃতপক্ষে সেই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। তবে এত আত্মা কিরূপে আসিল? লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া লক্ষ লক্ষ সূর্য দেখাইতেছে, আর প্রত্যেক জলকণাতেই ক্ষুদ্রাকারে সূর্যের মূর্তি রহিয়াছে। এইরূপে এই-সকল্ আত্মা প্রতিবিম্ব মাত্র,

---

১ যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।—মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।১।১

সত্য নয়। তাহারা প্রকৃতপক্ষে সেই 'আমি' নয়, যিনি এই জগতের ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের এই অবিভক্ত সত্তাস্বরূপ। অতএব এই-সকল বিভিন্ন প্রাণী, মানুষ, পশু ইত্যাদি প্রতিবিম্ব মাত্র, সত্য নয়। উহারা প্রকৃতির উপর পতিত মায়াময় প্রতিবিম্ব মাত্র। জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আছেন, আর সেই পুরুষ 'আপনি', 'আমি' ইত্যাদি রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, কিন্তু এই ভেদপ্রতীতি মিথ্যা বই আর কিছুই নয়। তিনি বিভক্ত হন নাই, বিভক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে মাত্র। আর তাঁহাকে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখাতেই এই আপাতপ্রতীয়মান বিভাগ বা ভেদ হইয়াছে। আমি যখন ঈশ্বরকে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখি, তখন আমি তাঁহাকে জড়জগৎ বলিয়া দেখি; যখন আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে অথচ সেই জালের মধ্যে দিয়াই তাঁহাকে দেখি, তখন তাঁহাকে পশুপক্ষী-রূপে দেখি; আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে মানবরূপে, আরও উচ্চে যাইলে দেবরূপে দেখিয়া থাকি। তথাপি ঈশ্বর জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের এক অনন্ত সত্তা এবং আমরাই সেই সত্তাস্বরূপ। আমিও সেই, আপনিও সেই—তাঁহার অংশ নয়, পূর্ণই। 'তিনি অনন্ত জ্ঞাতারূপে সমুদয় প্রপঞ্চের পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন, আবার তিনি স্বয়ং সমুদয় প্রপঞ্চস্বরূপ।' তিনি বিষয় ও বিষয়ী—উভয়ই। তিনিই 'আমি', তিনিই 'তুমি'। ইহা কিরূপে হইল?

এই বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে বুঝানো যাইতে পারে। জ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইবে?[১] জ্ঞাতা কখনও নিজেকে জানিতে পারে না। আমি সবই দেখিতে পাই, কিন্তু নিজেকে দেখিতে পাই না। সেই আত্মা—যিনি জ্ঞাতা ও সকলের প্রভু, যিনি প্রকৃত বস্তু—তিনিই জগতের সমুদয় দৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রতিবিম্ব ব্যতীত নিজেকে দেখা বা নিজেকে জানা অসম্ভব। আপনি আরশি ব্যতীত আপনার মুখ দেখিতে পান না, সেরূপ আত্মাও প্রতিবিম্বিত না হইলে নিজের স্বরূপ দেখিতে পান না। সুতরাং এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আত্মার নিজেকে উপলব্ধির চেষ্টাস্বরূপ। আদি প্রাণকোষ (Protoplasm) তাঁহার প্রথম প্রতিবিম্ব, তারপর উদ্ভিদ্, পশু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টতর প্রতিবিম্ব-গ্রাহক হইতে সর্বোত্তম প্রতিবিম্ব-গ্রাহক—পূর্ণ মানবের

১ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৫।১৫

প্রকাশ হয়। যেমন কোন মানুষ নিজমুখ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া একটি ক্ষুদ্র কর্দমাবিল জলপল্বলে দেখিতে চেষ্টা করিয়া মুখের একটা বাহ্য সীমারেখা দেখিতে পাইল। তারপর সে অপেক্ষাকৃত নির্মল জলে অপেক্ষাকৃত উত্তম প্রতিবিম্ব দেখিল, তারপর উজ্জ্বল ধাতুতে ইহা অপেক্ষাও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখিল। শেষে একখানি আরশি লইয়া তাহাতে মুখ দেখিল—তখন সে নিজেকে যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত দেখিল। অতএব বিষয় ও বিষয়ী উভয়-স্বরূপ সেই পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব—'পূর্ণ মানব'। আপনারা এখন দেখিতে পাইলেন, মানব সহজ প্রেরণায় কেন সকল বস্তুর উপাসনা করিয়া থাকে, আর সকল দেশেই পূর্ণমানবগণ কেন স্বভাবতই ঈশ্বর-রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আপনারা মুখে যাই বলুন না কেন, ইঁহাদের উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। এইজন্যই লোকে খ্রীষ্ট-বুদ্ধাদি অবতারগণের উপাসনা করিয়া থাকে। তাঁহারা অনন্ত আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-স্বরূপ। আপনি বা আমি ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে-কোন ধারণা করি না কেন, ইঁহারা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর। একজন পূর্ণমানব এই-সকল ধারণা হইতে অনেক উচ্চে। তাঁহাতেই জগৎরূপ বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়—বিষয় ও বিষয়ী এক হইয়া যায়। তাঁহার সকল ভ্রম ও মোহ চলিয়া যায়; পরিবর্তে তাঁহার এই অনুভূতি হয় যে, তিনি চিরকাল সেই পূর্ণ পুরুষই রহিয়াছেন। তবে এই বন্ধন কিরূপে আসিল? এই পূর্ণপুরুষের পক্ষে অবনত হইয়া অপূর্ণ-স্বভাব হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? মুক্তের পক্ষে বদ্ধ হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন, তিনি কোনকালেই বদ্ধ হন নাই, তিনি নিত্যমুক্ত। আকাশে নানাবর্ণের নানা মেঘ আসিতেছে। উহারা মুহূর্তকাল সেখানে থাকিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সেই এক নীল আকাশ বরাবর সমভাবে রহিয়াছে। আকাশের কখন পরিবর্তন হয় নাই, মেঘেরই কেবল পরিবর্তন হইতেছে। এইরূপ আপনারাও পূর্ব হইতেই পূর্ণস্বভাব, অনন্তকাল ধরিয়া পূর্ণই আছেন। কিছুই আপনাদের প্রকৃতিকে কখন পরিবর্তিত করিতে পারে না, কখন করিবেও না। আমি অপূর্ণ, আমি নর, আমি নারী, আমি পাপী, আমি মন, আমি চিন্তা করিয়াছি, আমি চিন্তা করিব—এই-সব ধারণা ভ্রমমাত্র। আপনি কখনই চিন্তা করেন না, আপনার কোনকালে দেহ ছিল না, আপনি কোনকালে অপূর্ণ ছিলেন না। আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় প্রভু। যাহা কিছু আছে বা হইবে,

আপনি তৎসমুদয়ের সর্বশক্তিমান্ নিয়ন্তা—এই সূর্য চন্দ্র তারা পৃথিবী উদ্ভিদ্, আমাদের এই জগতের প্রত্যেক অংশের মহান্ শাস্তা। আপনার শক্তিতেই সূর্য কিরণ দিতেছে, তারাগণ তাহাদের প্রভা বিকিরণ করিতেছে, পৃথিবী সুন্দর হইয়াছে। আপনার আনন্দের শক্তিতেই সকলে পরস্পরকে ভালবাসিতেছে এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। আপনিই সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, আপনিই সর্বস্বরূপ। কাহাকে ত্যাগ করিবেন, কাহাকেই বা গ্রহণ করিবেন? আপনিই সর্বেসর্বা। এই জ্ঞানের উদয় হইলে মায়ামোহ তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়।

আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম; এক মাসের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আর প্রত্যহই আমার সম্মুখে অতিশয় মনোরম দৃশ্যসমূহ—অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ-হ্রদাদি দেখিতে পাইতাম। একদিন অতিশয় পিপাসার্ত হইয়া একটি হ্রদে জলপান করিব, ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু যেমন হ্রদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি. অমনি উহা অন্তর্হিত হইল। তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রবল আঘাতের সহিত এই জ্ঞান আসিল—সারা জীবন ধরিয়া যে মরীচিকার কথা পড়িয়া আসিয়াছি, এ সেই মরীচিকা। তখন আমি আমার নিজের নির্বুদ্ধিতা স্মরণ করিয়া হাসিতে লাগিলাম, গত এক মাস ধরিয়া এই যে-সব সুন্দর দৃশ্য ও হ্রদাদি দেখিতে পাইতেছিলাম, ঐগুলি মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়, অথচ আমি তখন উহা বুঝিতে পারি নাই। পরদিন প্রভাতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম—সেই হ্রদ ও সেই-সব দৃশ্য আবার দেখা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার এই জ্ঞানও আসিল যে, উহা মরীচিকা মাত্র। একবার জানিতে পারায় উহার ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এইরূপেই এই জগদ্‌ভ্রান্তি একদিন ঘুচিয়া যাইবে। এই-সকল ব্রহ্মাণ্ড একদিন আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে। ইহারই নাম প্রত্যক্ষানুভূতি। 'দর্শন' কেবল কথার কথা বা তামাসা নয়; ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে। এই শরীর যাইবে, এই পৃথিবী এবং আর যাহা কিছু, সবই যাইবে—আমি দেহ বা আমি মন, এই বোধ কিছুক্ষণের জন্য চলিয়া যাইবে, অথবা যদি কর্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া থাকে, তবে একেবারে চলিয়া যাইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না; আর যদি কর্মের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে, তবে যেমন কুম্ভকারের চক্র—

মৃৎপাত্র প্রস্তুত হইয়া গেলেও পূর্ববেগে কিয়ৎক্ষণ ঘুরিতে থাকে, সেরূপ মায়ামোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেলেও এই দেহ কিছুদিন থাকিবে। এই জগৎ, নরনারী, প্রাণী—সবই আবার আসিবে, যেমন পরদিনেও মরীচিকা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বের ন্যায় উহারা শক্তি বিস্তার করিতে পারিবে না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিবে যে, আমি ঐগুলির স্বরূপ জানিয়াছি। তখন ঐগুলি আর আমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না, কোনরূপ দুঃখ কষ্ট শোক আর আসিতে পারিবে না। যখন কোন দুঃখকর বিষয় আসিবে, মন তাহাকে বলিতে পারিবে—আমি জানি, তুমি ভ্রমমাত্র। যখন মানুষ এই অবস্থা লাভ করে, তখন তাহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলে। জীবন্মুক্ত-অর্থে জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত। জ্ঞানযোগীর জীবনের উদ্দেশ্য—এই জীবন্মুক্ত হওয়া। তিনিই জীবন্মুক্ত, যিনি এই জগতে অনাসক্ত হইয়া বাস করিতে পারেন। তিনি জলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় থাকেন—উহা যেমন জলের মধ্যে থাকিলেও জল উহাকে কখনই ভিজাইতে পারে না, সেরূপ তিনি জগতে নির্লিপ্তভাবে থাকেন। তিনি মনুষ্যজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শুধু তাই কেন, সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি সেই পূর্ণস্বরূপের সহিত অভেদভাব উপলব্ধি করিয়াছেন; তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তিনি ভগবানের সহিত অভিন্ন। যতদিন আপনার জ্ঞান থাকে যে, ভগবানের সহিত আপনার অতি সামান্য ভেদও আছে, ততদিন আপনার ভয় থাকিবে। কিন্তু যখন আপনি জানিবেন যে, আপনিই তিনি, তাঁহাতে আপনাতে কোন ভেদ নাই, বিন্দুমাত্র ভেদ নাই, তাঁহার সবটুকুই আপনি, তখন সকল ভয় দূর হইয়া যায়। 'সেখানে কে কাহাকে দেখে? কে কাহার উপাসনা করে? কে কাহার সহিত কথা বলে? কে কাহার কথা শুনে? যেখানে একজন অপরকে দেখে, একজন অপরকে কথা বলে, একজন অপরের কথা শুনে, উহা নিয়মের রাজ্য। যেখানে কেহ কাহাকেও দেখে না, কেহ কাহাকেও বলে না, তাহাই শ্রেষ্ঠ, তাহাই ভূমা, তাহাই ব্রহ্ম।'[১] আপনিই তাহা এবং সর্বদাই তাহা আছেন। তখন জগতের কি হইবে? আমরা কি জগতের উপকার করিতে পারিব? এরূপ প্রশ্নই সেখানে উদিত হয় না। এ সেই শিশুর কথার মতো—বড় হইয়া গেলে আমার

১ বৃহ. উপ., ৫।১৫ দ্রষ্টব্য।

মিঠাইয়ের কি হইবে? বালকও বলিয়া থাকে, আমি বড় হইলে আমার মার্বেলগুলির কি দশা হইবে? তবে আমি বড় হইব না। ছোট শিশু বলে, আমি বড় হইলে আমার পুতুলগুলির কি দশা হইবে? এই জগৎ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলিও সেরূপ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—এ তিন কালেই জগতের অস্তিত্ব নাই। যদি আমরা আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি, যদি জানিতে পারি—এই আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর যাহা কিছু সব স্বপ্নমাত্র, উহাদের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, তবে এই জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য, পাপ-পুণ্য কিছুই আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারিবে না। যদি উহাদের অস্তিত্বই না থাকে, তবে কাহার জন্য এবং কিসের জন্য আমি কষ্ট করিব? জ্ঞানযোগীরা ইহাই শিক্ষা দেন। অতএব সাহস অবলম্বন করিয়া মুক্ত হউন, আপনাদের চিন্তাশক্তি আপনাদিগকে যতদূর পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে, সাহসপূর্বক ততদূর অগ্রসর হউন এবং সাহসপূর্বক উহা জীবনে পরিণত করুন। এই জ্ঞানলাভ করা বড় কঠিন। ইহা মহা সাহসীর কার্য। যে সব পুতুল ভাঙিয়া ফেলিতে সাহস করে—শুধু মানসিক বা কুসংস্কাররূপ পুতুল নয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহরূপ পুতুলগুলিকেও যে ভাঙিয়া ফেলিতে পারে—ইহা তাঁহারই কার্য।

এই শরীর আমি নই, ইহার নাশ অবশ্যম্ভাবী—ইহা তো উপদেশ। কিন্তু এই উপদেশের দোহাই দিয়া লোকে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার করিতে পারে। একজন লোক উঠিয়া বলিল, 'আমি দেহ নই, অতএব আমার মাথাধরা আরাম হইয়া যাক।' কিন্তু তাহার শিরঃপীড়া যদি তাহার দেহে না থাকে, তবে আর কোথায় আছে? সহস্র শিরঃপীড়া ও সহস্র দেহ আসুক, যাক্ —তাহাতে আমার কি?

'আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; আমার পিতাও নাই, মাতাও নাই; আমার শত্রুও নাই, মিত্রও নাই; কারণ তাহারা সকলেই আমি। (আমিই আমার বন্ধু, আমিই আমার শত্রু), আমিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আমি সেই, আমিই সেই।'[১]

১ ন মে মৃত্যুশঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।
—নির্বাণষট্‌কম্, ৫, শঙ্করাচার্য

যদি আমি সহস্র দেহে জ্বর ও অন্যান্য রোগ ভোগ করিতে থাকি, আবার লক্ষ লক্ষ দেহে আমি স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেছি। যদি সহস্র দেহে আমি উপবাস করি, আবার অন্য সহস্র দেহে প্রচুর পরিমাণে আহার করিতেছি। যদি সহস্র দেহে আমি দুঃখ ভোগ করিতে থাকি, আবার সহস্র দেহে আমি সুখ ভোগ করিতেছি। কে কাহার নিন্দা করিবে? কে কাহার স্তুতি করিবে? কাহাকে চাহিবে, কাহাকে ছাড়িবে? আমি কাহাকেও চাই না, কাহাকেও ত্যাগ করি না; কারণ আমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ। আমিই আমার স্তুতি করিতেছি, আমিই আমার নিন্দা করিতেছি, আমি নিজের দোষে নিজে কষ্ট পাইতেছি; আর আমি যে সুখী, তাহাও আমার নিজের ইচ্ছায়। আমি স্বাধীন। ইহাই জ্ঞানীর ভাব—তিনি মহা সাহসী, অকুতোভয়, নির্ভীক। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যাক্ না কেন, তিনি হাস্য করিয়া বলেন, উহার কখনও অস্তিত্বই ছিল না, উহা কেবল মায়া ও ভ্রমমাত্র। এইরূপে তিনি তাঁহার চক্ষের সমক্ষে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডকে যথার্থই অন্তর্হিত হইতে দেখেন, ও বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করেন, 'এ জগৎ কোথায় ছিল? কোথায়ই বা মিলাইয়া গেল?'[১]

এই জ্ঞানের সাধন-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আর একটি আশঙ্কার আলোচনা ও তৎ-সমাধানের চেষ্টা করিব। এ পর্যন্ত যাহা বিচার করা হইল, তাহা ন্যায়শাস্ত্রের সীমা বিন্দুমাত্র উল্লঙ্ঘন করে নাই। যদি কোনও ব্যক্তি বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সিদ্ধান্ত করে যে, একমাত্র সত্তাই বর্তমান, আর সমুদয় কিছুই নয়, ততক্ষণ তাহার থামিবার উপায় নাই। যুক্তিপরায়ণ মানবজাতির পক্ষে এই সিদ্ধান্ত-অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই: যিনি অসীম, সদা পূর্ণ, সদানন্দময়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, তিনি এই-সব ভ্রমের অধীন হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্নই জগতের সর্বত্র সকল সময়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে। সাধারণ চলিত কথায় প্রশ্নটি এইরূপে করা হয়: এই জগতে পাপ কিরূপে আসিল? ইহাই প্রশ্নটির চলিত ও ব্যাবহারিক রূপ, আর অপরটি অপেক্ষাকৃত দার্শনিক রূপ। কিন্তু উত্তর একই। নানা স্তর হইতে নানাভাবে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, কিন্তু নিম্নতরভাবে উপস্থাপিত হইলে প্রশ্নটির কোন মীমাংসা হয় না;

---

১ ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ। —বিবেকচূড়ামণি, ৪৮৫

কারণ আপেল, সাপ ও নারীর গল্পে[১] এই তত্ত্বের কিছুই ব্যাখ্যা হয় না। ঐ অবস্থায় প্রশ্নটিও যেমন বালকোচিত, উহার উত্তরও তেমনি। কিন্তু বেদান্তে এই প্রশ্নটি অতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে—এই ভ্রম কিরূপে আসিল? আর উত্তরও সেইরূপ গভীর। উত্তরটি এই: অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর আশা করিও না। ঐ প্রশ্নটির অন্তর্গত বাক্যগুলি পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রশ্নটিই অসম্ভব। কেন? পূর্ণতা বলিতে কি বুঝায়? যাহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত, তাহাই পূর্ণ। তারপর আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্ণ কিরূপে অপূর্ণ হইল? ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত ভাষায় নিবদ্ধ করিলে প্রশ্নটি এই আকারে দাঁড়ায়—'যে-বস্তু কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তাহা কিরূপে কার্যরূপে পরিণত হয়?' এখানে তো আপনিই আপনাকে খণ্ডন করিতেছেন। আপনি প্রথমেই মানিয়া লইয়াছেন, উহা কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তারপর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিরূপে উহা কার্যে পরিণত হয়? কার্য-কারণ-সম্বন্ধের সীমার ভিতরেই কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। যতদূর পর্যন্ত দেশ-কাল-নিমিত্তের অধিকার, ততদূর পর্যন্ত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অতীত বস্তুসম্বন্ধে প্রশ্ন করাই নিরর্থক; কারণ প্রশ্নটি যুক্তি-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। দেশ-কাল-নিমিত্তের গণ্ডির ভিতরে কোনকালে উহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না, আর উহাদের অতীত প্রদেশে কি উত্তর পাওয়া যাইবে, তাহা সেখানে গেলেই জানা যাইতে পারে। এই জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন না। যখন লোকে পীড়িত হয়, তখন 'কিরূপে ঐ রোগের উৎপত্তি হইল, তাহা প্রথমে জানিতে হইবে'—এই বিষয়ে বিশেষ জেদ না করিয়া রোগ যাহাতে সারিয়া যায়, তাহারই জন্য প্রাণপণ যত্ন করে।

এই প্রশ্ন আর এক আকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ইহা একটু নিম্নতর স্তরের কথা বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্মজীবনের সঙ্গে অনেকটা সম্বন্ধ

---

১ বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' আছে—ঈশ্বর আদি নর আদম ও আদি নারী ইভকে সৃজন করিয়া তাহাদিগকে ইডেন নামক সুরম্য উদ্যানে স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে ঐ উদ্যানস্থ জ্ঞান-বৃক্ষের ফলভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান সর্পরূপধারী হইয়া প্রথমে ইভকে প্রলোভিত করিয়া তৎপর তাহার দ্বারা আদমকে ঐ বৃক্ষের ফলভক্ষণে প্রলোভিত করে। উহাতেই তাহাদের ভালমন্দ-জ্ঞান উপস্থিত হইয়া পাপ প্রথম পৃথিবীতে প্রবেশ করিল।

আছে এবং ইহাতে তত্ত্ব অনেকটা স্পষ্টতর হইয়া আসে। প্রশ্নটি এই : এই ভ্রম কে উৎপন্ন করিল? কোন সত্য কি কখন ভ্রম জন্মাইতে পারে? কখনই নয়। আমরা দেখিতে পাই, একটা ভ্রমই আর একটা ভ্রম জন্মাইয়া থাকে, সেটি আবার একটি ভ্রম জন্মায়, এইরূপ চলিতে থাকে। ভ্রমই চিরকাল ভ্রম উৎপন্ন করিয়া থাকে। রোগ হইতেই রোগ জন্মায়, স্বাস্থ্য হইতে কখন রোগ জন্মায় না। জল ও জলের তরঙ্গে কোন ভেদ নাই—কার্য কারণেরই আর এক রূপমাত্র। কার্য যখন ভ্রম, তখন তাহার কারণও অবশ্য ভ্রম হইবে। এই ভ্রম কে উৎপন্ন করিল? অবশ্য আর একটি ভ্রম। এইরূপে তর্ক করিলে তর্কের আর শেষ হইবে না—ভ্রমের আর আদি পাওয়া যাইবে না। এখন আপনাদের একটি মাত্র প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকিবে : ভ্রমের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে কি আপনার অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল না? কারণ আপনি জগতে দুইটি সত্তা স্বীকার করিতেছেন—একটি আপনি, আর একটি ঐ ভ্রম। ইহার উত্তর এই যে, ভ্রমকে সত্তা বলা যাইতে পারে না। আপনারা জীবনে সহস্র সহস্র স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু সেগুলি আপনাদের জীবনের অংশস্বরূপ নয়। স্বপ্ন আসে, আবার চলিয়া যায়। উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ভ্রমকে একটা সত্তা বা অস্তিত্ব বলিলে উহা আপাততঃ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় বটে, বাস্তবিক কিন্তু উহা অযৌক্তিক কথামাত্র। অতএব জগতে নিত্যমুক্ত ও নিত্যানন্দস্বরূপ একমাত্র সত্তা আছে, আর তাহাই আপনি। অদ্বৈতবাদীদের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এই যে-সকল বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী রহিয়াছে, এগুলির কি হইবে?—এগুলি সবই থাকিবে। এ-সব কেবল আলোর জন্য অন্ধকারে হাতড়ানো, আর ঐরূপ হাতড়াইতে হাতড়াইতে আলোক আসিবে। আমরা এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছি যে, আত্মা নিজেকে দেখিতে পায় না। আমাদের সমুদয় জ্ঞান মায়ার (মিথ্যার) জালের মধ্যে অবস্থিত, মুক্তি উহার বাহিরে; এই জালের মধ্যে দাসত্ব, ইহার সব কিছুই নিয়মাধীন। উহার বাহিরে আর কোন নিয়ম নাই। এই ব্রহ্মাণ্ড যতদূর, ততদূর পর্যন্ত সত্তা নিয়মাধীন, মুক্তি তাহার বাহিরে। যে পর্যন্ত আপনি দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্যে রহিয়াছেন, সে পর্যন্ত আপনি মুক্ত—এ কথা বলা নিরর্থক। কারণ ঐ জালের মধ্যে সবই কঠোর নিয়মে—কার্য-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ। আপনি যে-কোন চিন্তা

করেন, তাহা পূর্ব কারণের কার্যস্বরূপ, প্রত্যেক ভাবই কারণের কার্য-রূপ। ইচ্ছাকে স্বাধীন বলা একেবারে নিরর্থক। যখনই সেই অনন্ত সত্তা যেন এই মায়াজালের মধ্যে পড়ে, তখনই উহা ইচ্ছার আকার ধারণ করে। ইচ্ছা মায়াজালে আবদ্ধ সেই পুরুষের কিঞ্চিদংশমাত্র, সুতরাং 'স্বাধীন ইচ্ছা' বাক্যটির কোন অর্থ নাই, উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। স্বাধীনতা বা মুক্তি-সম্বন্ধে এই-সকল বাগাড়ম্বরও বৃথা। মায়ার ভিতর স্বাধীনতা নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তায় মনে কার্যে একখণ্ড প্রস্তর বা এই টেবিলটার মতো বদ্ধ। আমি আপনাদের নিকট বক্তৃতা দিতেছি, আর আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন—এই উভয়ই কঠোর কার্য-কারণ-নিয়মের অধীন। মায়া হইতে যতদিন না বাহিরে যাইতেছেন, ততদিন স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই। ঐ মায়াতীত অবস্থাই আত্মার যথার্থ স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ যতই তীক্ষ্ণবুদ্ধি হউক না কেন, এখানকার কোন বস্তুই যে স্বাধীন বা মুক্ত হইতে পারে না—এই যুক্তির বল মানুষ যতই স্পষ্টরূপে দেখুক না কেন, সকলকেই বাধ্য হইয়া নিজেদের স্বাধীন বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, তাহা না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। যতক্ষণ না আমরা বলি যে আমরা স্বাধীন, ততক্ষণ কোন কাজ করাই সম্ভব নয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, আমরা যে স্বাধীনতার কথা বলিয়া থাকি, তাহা অজ্ঞানরূপ মেঘরাশির মধ্য দিয়া নির্মল নীলাকাশরূপ সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মার চকিতদর্শন-মাত্র, আর নীলাকাশরূপ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তস্বভাব আত্মা উহার বাহিরে রহিয়াছেন। যথার্থ স্বাধীনতা এই ভ্রমের মধ্যে, এই মিথ্যার মধ্যে, এই অর্থহীন সংসারে, ইন্দ্রিয়-মন-দেহ-সমন্বিত এই বিশ্বজগতে থাকিতে পারে না। এই-সকল অনাদি অনন্ত স্বপ্ন—যেগুলি আমাদের বশে নাই, যেগুলিকে বশে আনাও যায় না, যেগুলি অযথা-সন্নিবেশিত, ভগ্ন ও অসামঞ্জস্যময়—সেই-সব স্বপ্নকে লইয়া আমাদের এই জগৎ। আপনি যখন স্বপ্নে দেখেন যে, বিশ-মুণ্ড একটা দৈত্য আপনাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে, আর আপনি তাহার নিকট হইতে পলাইতেছেন, আপনি উহাকে অসংলগ্ন মনে করেন না। আপনি মনে করেন, এ তো ঠিকই হইতেছে। আমরা যাহাকে নিয়ম বলি, তাহাও এইরূপ। যাহা কিছু আপনি নিয়ম বলিয়া নির্দিষ্ট করেন, তাহা আকস্মিক ঘটনামাত্র, উহার কোন অর্থ নাই। এই স্বপ্নাবস্থায় আপনি উহাকে নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। মায়ার

ভিতর যতদূর পর্যন্ত এই দেশ-কাল-নিমিত্তের নিয়ম বিদ্যমান, ততদূর পর্যন্ত স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই, আর এই বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালী এই মায়ার অন্তর্গত। ঈশ্বরের ধারণা এবং পশু ও মানবের ধারণা—সবই এই মায়ার মধ্যে, সুতরাং সবই সমভাবে ভ্রমাত্মক, সবই স্বপ্নমাত্র। তবে আজকাল আমরা কতকগুলি অতিবুদ্ধি দিগ্‌গজ দেখিতে পাই। আপনারা যেন তাঁহাদের মতো তর্ক বা সিদ্ধান্ত না করিয়া বসেন, সেই বিষয়ে সাবধান হইবেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর-ধারণা ভ্রমাত্মক, কিন্তু এই জগতের ধারণা সত্য। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই উভয় ধারণা একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই কেবল যথার্থ নাস্তিক হইবার অধিকার আছে, যিনি ইহজগৎ পরজগৎ উভয়ই অস্বীকার করেন। উভয়টিই একই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতম জীব পর্যন্ত, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সেই এক মায়ার রাজত্ব। একই প্রকার যুক্তিতে ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বা নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বর-ধারণা ভ্রমাত্মক জ্ঞান করে, তাহার নিজ দেহ এবং মনের ধারণাও ভ্রমাত্মক জ্ঞান করা উচিত। যখন ঈশ্বর উড়িয়া যান, তখন দেহ ও মন উড়িয়া যায়, আর যখন উভয়ই লোপ পায়, তখনই যাহা যথার্থ সত্তা, তাহা চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়।

'সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না, মনও নয়। আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বা জানিতেও পারি না।'[১]

ইহার তাৎপর্য আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, যতদূর বাক্য, চিন্তা বা বুদ্ধি যাইতে পারে, ততদূর পর্যন্ত মায়ার অধিকার, ততদূর পর্যন্ত বন্ধনের ভিতর। সত্য উহাদের বাহিরে। সেখানে চিন্তা মন বা বাক্য কিছুই পৌঁছিতে পারে না।

এতক্ষণ পর্যন্ত বিচারের দ্বারা তো বেশ বুঝা গেল, কিন্তু এইবার সাধনের কথা আসিতেছে। এই-সব ক্লাসে আসল শিক্ষার বিষয় সাধন। এই একত্ব-উপলব্ধির জন্য কোনপ্রকার সাধনের প্রয়োজন আছে কি?—নিশ্চয়ই আছে। সাধনার দ্বারা যে আপনাদিগকে এই ব্রহ্ম হইতে হইবে তাহা নয়, আপনারা

১ ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।—কেন উপ, ১।৩

তো পূর্ব হইতেই 'ব্রহ্ম' আছেন। আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে হইবে বা পূর্ণ হইতে হইবে, এ কথা সত্য নয়। আপনারা সর্বদা পূর্ণস্বরূপই আছেন, আর যখনই মনে করেন—আপনারা পূর্ণ নন, সে তো একটা ভ্রম। এই ভ্রম—যাহাতে আপনাদের বোধ হইতেছে, অমুক পুরুষ, অমুক নারী, তাহা আর একটি ভ্রমের দ্বারা দূর হইতে পারে, আর সাধন বা অভ্যাসই সেই অপর ভ্রম। আগুন আগুনকে খাইয়া ফেলিবে—আপনারা একটি ভ্রম নাশ করিবার জন্য অপর একটি ভ্রমের সাহায্য লইতে পারেন। একখণ্ড মেঘ আসিয়া এই মেঘকে সরাইয়া দিবে, শেষে উভয়েই চলিয়া যাইবে। তবে এই সাধনাগুলি কি? আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে মুক্ত হইব, তাহা নয়; আমরা সদাই মুক্ত। আমরা বদ্ধ—এরূপ ভাবনামাত্রই ভ্রম; আমরা সুখী বা আমরা অসুখী—এরূপ ভাবনামাত্রই গুরুতর ভ্রম। আর এক ভ্রম আসিবে যে, আমাদিগকে মুক্ত হইবার জন্য সাধনা, উপাসনা ও চেষ্টা করিতে হইবে; এই ভ্রম আসিয়া প্রথম ভ্রমটিকে সরাইয়া দিবে; তখন উভয় ভ্রমই দূর হইয়া যাইবে।

মুসলমানেরা শিয়ালকে অতিশয় অপবিত্র মনে করিয়া থাকে, হিন্দুরাও তেমনি কুকুরকে অশুচি ভাবিয়া থাকে। অতএব শিয়াল বা কুকুর খাবার ছুঁইলে উহা ফেলিয়া দিতে হয়, উহা আর কাহারও খাইবার উপায় নাই। কোন মুসলমানের বাটিতে একটি শিয়াল প্রবেশ করিয়া টেবিল হইতে কিছু খাদ্য খাইয়া পলাইল। লোকটি বড়ই দরিদ্র ছিল। সে নিজের জন্য সেদিন অতি উত্তম ভোজের আয়োজন করিয়াছিল, আর সেই ভোজ্যদ্রব্যগুলি শিয়ালের স্পর্শে অপবিত্র হইয়া গেল! আর তাহার খাইবার উপায় নাই। কাজেকাজেই সে একজন মোল্লার কাছে গিয়া নিবেদন করিল, 'সাহেব, গরিবের এক নিবেদন শুনুন। একটা শিয়াল আসিয়া আমার খাদ্য হইতে খানিকটা খাইয়া গিয়াছে, এখন ইহার একটা উপায় করুন। আমি অতি সুখাদ্য সব প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমার বড়ই বাসনা ছিল যে, পরম তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন করিব। এখন শিয়ালটা আসিয়া সব নষ্ট করিয়া দিয়া গেল। আপনি ইহার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা দিন।' মোল্লা মুহূর্তের জন্য একটু ভাবিলেন, তারপর উহার একমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, 'ইহার একমাত্র উপায়—একটা কুকুর লইয়া আসিয়া যে থালা হইতে শিয়ালটা খাইয়া

গিয়াছে, সেই থালা হইতে তাহাকে একটু খাওয়ানো। এখন কুকুর-শিয়ালে নিত্য বিবাদ। তা শিয়ালের উচ্ছিষ্টটাও তোমার পেটে যাইবে, কুকুরের উচ্ছিষ্টটাও যাইবে, ঐ তুই উচ্ছিষ্টে পরস্পর সেখানে ঝগড়া লাগিবে, তখন সব শুদ্ধ হইয়া যাইবে।' আমরাও অনেকটা এইরূপ সমস্যায় পড়িয়াছি। আমরা যে অপূর্ণ, ইহা একটি ভ্রম; আমরা উহা দূর করিবার জন্য আর একটি ভ্রমের সাহায্য লইলাম—পূর্ণতা-লাভের জন্য আমাদিগকে সাধনা করিতে হইবে। তখন একটি ভ্রম আর একটি ভ্রমকে দূর করিয়া দিবে, যেমন আমরা একটি কাঁটা তুলিবার জন্য আর একটি কাঁটার সাহায্য লইতে পারি এবং শেষে উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দিতে পারি। এমন লোক আছেন, যাঁহাদের পক্ষে একবার 'তত্ত্বমসি' শুনিলে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের উদয় হয়। চকিতের মধ্যে এই জগৎ উড়িয়া যায়, আর আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু আর সকলকে এই বন্ধনের ধারণা দূর করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়।

প্রথম প্রশ্ন এই: জ্ঞানযোগী হইবার অধিকারী কাহারা? যাহাদের নিম্নলিখিত সাধন-সম্পত্তিগুলি আছে। প্রথমতঃ 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ'—এই জীবনে বা পরজীবনে সর্বপ্রকার কর্মফল ও সর্বপ্রকার ভোগবাসনা ত্যাগ। যদি আপনিই এই জগতের স্রষ্টা হন, তবে আপনি যাহা বাসনা করিবেন, তাহাই পাইবেন; কারণ আপনি উহা স্বীয় ভোগের জন্য সৃষ্টি করিবেন। কেবল কাহারও শীঘ্র, কাহারও বা বিলম্বে ঐ ফললাভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ উহা প্রাপ্ত হয়; অপরের পক্ষে অতীত সংস্কারসমষ্টি তাহাদের বাসনাপূর্তির ব্যাঘাত করিতে থাকে। আমরা ইহজন্ম বা পরজন্মের ভোগ-বাসনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকি। ইহজন্ম, পরজন্ম বা আপনার কোনরূপ জন্ম আছে—ইহা একেবারে অস্বীকার করুন; কারণ জীবন মৃত্যুরই নামান্তরমাত্র। আপনি যে জীবনসম্পন্ন প্রাণী, ইহাও অস্বীকার করুন। জীবনের জন্য কে ব্যস্ত? জীবন একটা ভ্রমমাত্র, মৃত্যু উহার আর এক দিক মাত্র। সুখ এই ভ্রমের এক দিক, দুঃখ আর একটা দিক। সকল বিষয়েই এইরূপ। আপনার জীবন বা মৃত্যু লইয়া কি হইবে? এ-সকলই তো মনের সৃষ্টিমাত্র। ইহাকেই 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ' বলে।

তারপর 'শম' বা মনঃসংযমের প্রয়োজন। মনকে এমন শান্ত করিতে হইবে যে, উহা আর তরঙ্গাকারে ভগ্ন হইয়া সর্ববিধ বাসনার লীলাক্ষেত্র হইবে না।

মনকে স্থির রাখিতে হইবে, বাহিরের বা ভিতরের কোন কারণ হইতে উহাতে যেন তরঙ্গ না উঠে—কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে হইবে। জ্ঞানযোগী শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ সাহায্য লন না। তিনি কেবল দার্শনিক বিচার, জ্ঞান ও নিজ ইচ্ছাশক্তি—এই-সকল সাধনেই বিশ্বাসী।

তারপর 'তিতিক্ষা'—কোনরূপ বিলাপ না করিয়া সর্বদুঃখসহন। যখন আপনার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, সেদিকে খেয়াল করিবেন না। যদি সম্মুখে একটি ব্যাঘ্র আসে, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকুন। পলাইবে কে ?.অনেক লোক আছেন, যাঁহারা তিতিক্ষা অভ্যাস করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য হন। এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা ভারতে গ্রীষ্মকালে প্রখর মধ্যাহ্নসূর্যের তাপে গঙ্গাতীরে শুইয়া থাকেন, আবার শীতকালে গঙ্গাজলে সারাদিন ধরিয়া ভাসেন। তাঁহারা এ-সকল গ্রাহ্যই করেন না। অনেকে হিমালয়ের তুষাররাশির মধ্যে বসিয়া থাকে, কোন প্রকার বস্ত্রাদির জন্য খেয়ালও করে না। গ্রীষ্মই বা কি ? শীতই বা কি ? এ-সকল আসুক, যাক—আমার তাহাতে কি ? 'আমি' তো শরীর নই। এই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু লোকে যে এইরূপ করিয়া থাকে, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। যেমন আপনাদের দেশের লোকে কামানের মুখে বা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে লাফাইয়া পড়িতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন, আমাদের দেশের লোকও সেরূপ তাঁহাদের দর্শন-অনুসারে চিন্তাপ্রণালী নিয়মিত করিতে এবং তদনুসারে কার্য করিতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিয়া থাকেন। 'আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—সোঽহং, সোঽহম্।' দৈনন্দিন কর্মজীবনের বিলাসিতাকে বজায় রাখা যেমন পাশ্চাত্য আদর্শ, তেমনি আমাদের আদর্শ—কর্মজীবনে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব রক্ষা করা। আমরা ইহাই প্রমাণ করিতে চাই যে, ধর্ম কেবল ভুয়া কথামাত্র নয়, কিন্তু এই জীবনেই ধর্মের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে। ইহাই তিতিক্ষা—সমুদয় সহ্য করা—কোন বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ না করা। আমি নিজে এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা বলেন, 'আমি আত্মা—আমার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের আবার গৌরব কি ? সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, শীত-উষ্ণ—এ-সকল আমার পক্ষে কিছুই নয়।' ইহাই তিতিক্ষা—দেহের ভোগসুখের জন্য ধাবমান হওয়া নয়। ধর্ম কি ?—ধর্ম মানে কি এইরূপ প্রার্থনা 'আমাকে ইহা দাও, উহা দাও' ? ধর্ম সম্বন্ধে

এ-সকল আহাম্মকি ধারণা! যাহারা ধর্মকে ঐরূপ মনে করে, তাহাদের ঈশ্বর ও আত্মার যথার্থ ধারণা নাই। আমার গুরুদেব বলিতেন, 'চিল-শকুনি খুব উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু তার নজর থাকে গো-ভাগাড়ে।' যাহা হউক, আপনাদের ধর্মসম্বন্ধীয় যে-সকল ধারণা আছে, তাহার ফলটা কি বলুন দেখি? —রাস্তা সাফ করা, আর ভাল অন্নবস্ত্রের যোগাড় করা? অন্নবস্ত্রের জন্য কে ভাবে? প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লোক আসিতেছে, লক্ষ লোক যাইতেছে—কে গ্রাহ্য করে? এই ক্ষুদ্র জগতের সুখ-দুঃখ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন কেন? যদি সাহস থাকে, ঐ-সকলের বাইরে চলিয়া যান। সমুদয় নিয়মের বাইরে চলিয়া যান, সমগ্র জগৎ উড়িয়া যাক—আপনি একলা আসিয়া দাঁড়ান। 'আমি নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দস্বরূপ—সৎ-চিৎ-আনন্দ—সোঽহং, সোঽহম্।'

বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা

আমরা দেখিয়াছি, বৈরাগ্য বা ত্যাগই এই-সকল বিভিন্ন যোগপথের সন্ধিস্থল। কর্মী কর্মফল ত্যাগ করেন। ভক্ত সেই সর্বশক্তিমান্ সর্বব্যাপী প্রেমস্বরূপের জন্য সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেম ত্যাগ করেন; যোগী যাহা কিছু অনুভব করেন, তাঁহার যাহা কিছু অভিজ্ঞতা—সব পরিত্যাগ করেন, কারণ তাঁহার যোগশাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, সমগ্র প্রকৃতি যদিও আত্মার ভোগ ও অভিজ্ঞতার জন্য, তথাপি উহা শেষে তাঁহাকে জানাইয়া দেয়, তিনি প্রকৃতিতে অবস্থিত নন, প্রকৃতি হইতে তিনি নিত্য-স্বতন্ত্র। জ্ঞানী সব ত্যাগ করেন, কারণ জ্ঞানশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কোনকালেই প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই। আমরা ইহাও দেখিয়াছি, এই-সকল উচ্চতর বিষয়ে এ প্রশ্নই করা যাইতে পারে না: ইহাতে কি লাভ? লাভালাভের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা করাই এখানে অসম্ভব, আর যদিই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, তাহা হইলেও আমরা উহা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া কি পাই?—যাহা মানুষের সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধন করে না, তাহার সুখবৃদ্ধি করে না, তাহা অপেক্ষা যাহাতে তাহার বেশী সুখ, তাহার বেশী লাভ—বেশী হিত তাহাই সুখের আদর্শ। সমুদয় বিজ্ঞান ঐ এক লক্ষ্যসাধনে অর্থাৎ মনুষ্যজাতিকে সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, আর যাহা বেশী পরিমাণ সুখ আনে, মানুষ তাহাই গ্রহণ করে; যাহাতে অল্প সুখ, তাহা ত্যাগ করে। আমরা দেখিয়াছি, সুখ হয় দেহে না হয় মনে বা আত্মায় অবস্থিত। পশুদের এবং পশুপ্রায় অনুন্নত মনুষ্যগণের সকল সুখ দেহে। একটা ক্ষুধার্ত কুকুর বা ব্যাঘ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত আহার করে, কোন মানুষ তাহা পারে না। সুতরাং কুকুর ও ব্যাঘ্রের সুখের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে দেহগত। মানুষের ভিতর আমরা একটা উচ্চস্তরের চিন্তাগত সুখ দেখিয়া থাকি—মানুষ জ্ঞানালোচনায় সুখী হয়। সর্বোচ্চ স্তরের সুখ জ্ঞানীর—তিনি আত্মানন্দে বিভোর থাকেন। আত্মাই তাঁহার সুখের একমাত্র উপকরণ। অতএব দার্শনিকের পক্ষে এই আত্ম-জ্ঞানই পরম লাভ বা হিত, কারণ ইহাতেই তিনি পরম সুখ পাইয়া থাকেন। জড়বিষয়সমূহ বা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা তাঁহার নিকট সর্বোচ্চ লাভের বিষয় হইতে

পারে না, কারণ তিনি জ্ঞানে যেরূপ সুখ পাইয়া থাকেন, উহাতে সেরূপ পান না। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই সকলের একমাত্র লক্ষ্য, আর আমরা যত প্রকার সুখের বিষয় অবগত আছি, তন্মধ্যে জ্ঞানই সর্বোচ্চ সুখ। 'যাহারা অজ্ঞানে কাজ করিয়া থাকে, তাহারা যেন দেবগণের ভারবাহী পশু'—এখানে দেব-অর্থে বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে। যে-সকল ব্যক্তি যন্ত্রবৎ কার্য ও পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে জীবনটাকে উপভোগ করে না, বিজ্ঞ ব্যক্তিই জীবনটাকে উপভোগ করেন। একজন বড় লোক হয়তো এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একখানা ছবি কিনিল, কিন্তু যে শিল্প বুঝিতে পারে, সেই উহা উপভোগ করিবে। ক্রেতা যদি শিল্পজ্ঞানশূন্য হয়, তবে তাহার পক্ষে উহা নিরর্থক, সে কেবল উহার অধিকারী মাত্র। সমগ্র জগতে বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিই কেবল সংসারের সুখ উপভোগ করেন। অজ্ঞান ব্যক্তি কখনও সুখভোগ করিতে পারে না, তাহাকে অজ্ঞাতসারে অপরের জন্যই পরিশ্রম করিতে হয়।

এ পর্যন্ত আমরা অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্তসমূহ দেখিলাম, দেখিলাম তাঁহাদের মতে একমাত্র আত্মা আছে, দুই আত্মা থাকিতে পারে না। আমরা দেখিলাম—সমগ্র জগতে একটি মাত্র সত্তা বিদ্যমান, আর সেই এক সত্তা ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া দৃষ্ট হইলে উহাকেই এই জড়জগৎ বলিয়া বোধ হয়। যখন কেবল মনের ভিতর দিয়া উহা দৃষ্ট হয়, তখন উহাকে চিন্তা ও ভাবজগৎ বলে, আর যখন উহার যথার্থ জ্ঞান হয়, তখন উহা এক অনন্ত পুরুষ বলিয়া প্রতীত হয়। এই বিষয়টি আপনারা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন—ইহা বলা ঠিক নয় যে, মানুষের ভিতর একটি আত্মা আছে, যদিও বুঝাইবার জন্য প্রথমে আমাকে ঐরূপ ধরিয়া লইতে হইয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে কেবল এক সত্তা রহিয়াছে এবং সেই সত্তা আত্মা—আর তাহাই যখন ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া অনুভূত হয়, তখন তাহাকেই দেহ বলে; যখন উহা চিন্তা বা ভাবের মধ্য দিয়া অনুভূত হয়, তখন উহাকেই মন বলে; আর যখন উহা স্ব-স্বরূপে উপলব্ধ হয়, তখন উহা আত্মারূপে—সেই এক অদ্বিতীয় সত্তারূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব ইহা ঠিক নয় যে, দেহ, মন ও আত্মা—একত্র এই তিনটি জিনিস রহিয়াছে, যদিও বুঝাইবার সময় ঐরূপে ব্যাখ্যা করায় বুঝাইবার পক্ষে বেশ সহজ হইয়াছিল; কিন্তু

সবই সেই আত্মা, আর সেই এক পুরুষই বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে কখন দেহ, কখন মন, কখন বা আত্মারূপে কথিত হয়। একমাত্র পুরুষই আছেন, অজ্ঞানীরা তাঁহাকেই জগৎ বলিয়া থাকে। যখন সেই ব্যক্তিই জ্ঞানে অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়, তখন সে সেই পুরুষকেই ভাবজগৎ বলিয়া থাকে। আর যখন পূর্ণ জ্ঞানোদয়ে সকল ভ্রম দূর হয়, তখন মানুষ দেখিতে পায়, এ-সবই আত্মা ব্যতীত আর কিছু নয়। চরম সিদ্ধান্ত এই যে, 'আমি সেই এক সত্তা'। জগতে দুইটি অথবা তিনটি সত্তা নাই, সবই এক। সেই এক সত্তাই মায়ার প্রভাবে বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছে, যেমন অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে। সেই দড়িটাই সাপ বলিয়া দৃষ্ট হয়। এখানে দড়ি আলাদা ও সাপ আলাদা—এরূপ দুইটি পৃথক্ বস্তু নাই। কেহই সেখানে দুইটি বস্তু দেখে না। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ বেশ সুন্দর দার্শনিক পারিভাষিক শব্দ হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ অনুভূতির সময় আমরা একইসময়ে সত্য ও মিথ্যা কখনই দেখিতে পাই না। আমরা সকলেই জন্ম হইতে একত্ববাদী, উহা হইতে পলাইবার উপায় নাই। আমরা সকল সময়েই 'এক' দেখিয়া থাকি। যখন আমরা রজ্জু দেখি, তখন মোটেই সর্প দেখি না; আবার যখন সর্প দেখি, তখন মোটেই রজ্জু দেখি না—উহা তখন উড়িয়া যায়। যখন আপনাদের ভ্রম হয়, তখন আপনারা যথার্থ বস্তু দেখেন না। মনে করুন, দূর হইতে রাস্তায় আপনার একজন বন্ধু আসিতেছেন। আপনি তাঁহাকে অতি ভালভাবেই জানেন, কিন্তু আপনার সম্মুখে কুজ্ঝটিকা থাকায় আপনি তাঁহাকে অন্য লোক বলিয়া মনে করিতেছেন। যখন আপনি আপনার বন্ধুকে অপর লোক বলিয়া মনে করিতেছেন, তখন আপনি আর আপনার বন্ধুকে দেখিতেছেন না, তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। আপনি একটি মাত্র লোককে দেখিতেছেন। মনে করুন, আপনার বন্ধুকে 'ক' বলিয়া অভিহিত করা গেল। তাহা হইলে আপনি যখন 'ক'কে 'খ' বলিয়া দেখিতেছেন, তখন আপনি 'ক'কে মোটেই দেখিতেছেন না। এইরূপ সকল স্থলে আপনাদের একেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। যখন আপনি নিজেকে দেহরূপে দর্শন করেন, তখন আপনি দেহমাত্র, আর কিছুই নন, আর জগতের অধিকাংশ মানুষেরই এইরূপ উপলব্ধি। তাহারা মুখে আত্মা মন ইত্যাদি কথা বলিতে পারে, কিন্তু তাহারা অনুভব করে, এই স্থূল দেহ—স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদ ইত্যাদি।

আবার কেহ কেহ কোন চেতন অবস্থায় নিজদিগকে চিন্তা বা ভাবরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। আপনারা অবশ্য স্যর হাম্ফ্রি ডেভি সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পটি জানেন। তিনি তাঁহার ক্লাসে 'হাস্যজনক বাষ্প' (Laughing gas) লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা নল ভাঙিয়া ঐ বাষ্প বাহির হইয়া যায় এবং তিনি নিঃশ্বাসযোগে উহা গ্রহণ করেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি প্রস্তরমূর্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে তিনি ক্লাসের ছেলেদের বলিলেন, যখন আমি ঐ অবস্থায় ছিলাম, আমি বাস্তবিক অনুভব করিতেছিলাম যে, সমগ্র জগৎ চিন্তা বা ভাবে গঠিত। ঐ বাষ্পের শক্তিতে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার দেহবোধ চলিয়া গিয়াছিল, আর যাহা পূর্বে তিনি শরীর বলিয়া দেখিতেছিলেন, তাহাই এক্ষণে চিন্তা বা ভাবরূপে দেখিতে পাইলেন। যখন অনুভূতি আরও উচ্চতর অবস্থায় যায়, যখন এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে চিরদিনের জন্য অতিক্রম করা যায়, তখন সকলের পশ্চাতে যে সত্য বস্তু রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইতে থাকে। উহাকে তখন আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপে—সেই এক আত্মারূপে—বিরাট পুরুষরূপে দর্শন করি। 'জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধিকালে অনির্বচনীয়, নিত্যবোধ, কেবলানন্দ, নিরুপম, অপার, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসীম, গগনসম, নিষ্কল, নির্বিকল্প পূর্ণব্রহ্মমাত্র হৃদয়ে সাক্ষাৎ করেন।'[১]

অদ্বৈতমত এই বিভিন্ন প্রকার স্বর্গ ও নরকের এবং আমরা বিভিন্ন ধর্মে যে নানাবিধ ভাব দেখিতে পাই, সেই-সকলের কিরূপ ব্যাখ্যা করে? মানুষের মৃত্যু হইলে বলা হয় যে, সে স্বর্গে বা নরকে যায়, এখানে ওখানে নানাস্থানে যায়, অথবা স্বর্গে বা অন্য কোন লোকে দেহধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহ করে। এ-সমুদয়ই ভ্রম। প্রকৃতপক্ষে কেহই জন্মায় না বা মরে না; স্বর্গও নাই, নরকও নাই অথবা ইহলোকও নাই; এই তিনটির কোন কালেই অস্তিত্ব নাই। একটি ছেলেকে অনেক ভূতের গল্প বলিয়া সন্ধ্যাবেলা বাহিরে যাইতে বলো। একটা 'স্থাণু' রহিয়াছে। বালক কি দেখে? সে দেখে—একটা ভূত হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। মনে করুন,

১ কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥
—বিবেকচূড়ামণি, ৪১০

একজন প্রণয়ী রাস্তার এক কোণ হইতে তাহার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে—সে ঐ শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডটিকে তাহার প্রণয়িনী মনে করে। একজন পাহারাওয়ালা উহাকে চোর বলিয়া মনে করিবে, আবার চোর উহাকে পাহারাওয়ালা মনে করিবে। সেই একই স্থাণু বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হইতেছে। স্থাণুটিই সত্য, আর এই যে বিভিন্নভাবে উহাকে দর্শন করা—তাহা নানাপ্রকার মনের বিকারমাত্র। একমাত্র পুরুষ—এই আত্মাই আছেন। তিনি কোথাও যানও না, আসেনও না। অজ্ঞান মানুষ স্বর্গ বা সেরূপ কোন স্থানে যাইবার বাসনা করে, সারাজীবন সে কেবল ক্রমাগত উহারই চিন্তা করিয়াছে। এই পৃথিবীর স্বপ্ন—যখন তাহার চলিয়া যায়, তখন সে এই জগৎকেই স্বর্গরূপে দেখিতে পায়; দেখে—এখানে দেব ও দেবদূতেরা বিচরণ করিতেছেন। যদি কোন ব্যক্তি সারাজীবন তাহার পূর্বপুরুষদিগকে দেখিতে চায়, সে আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই দেখিতে পায়, কারণ সে নিজেই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি কেহ আরও অধিক অজ্ঞান হয় এবং ধর্মান্ধেরা চিরকাল তাহাকে নরকের ভয় দেখায় তবে সে মৃত্যুর পর এই জগৎকেই নরকরূপে দর্শন করে, আর ইহাও দেখে যে, সেখানে লোকে নানাবিধ শাস্তিভোগ করিতেছে। মৃত্যু বা জন্মের আর কিছুই অর্থ নাই, কেবল দৃষ্টির পরিবর্তন। আপনি কোথাও যান না, বা যাহা কিছুর উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, সেগুলিও কোথাও যায় না। আপনি তো নিত্য, অপরিণামী। আপনার আবার যাওয়া-আসা কি? ইহা অসম্ভব, আপনি তো সর্বব্যাপী। আকাশ কখন গতিশীল নয়, কিন্তু উহার উপরে মেঘ এদিক ওদিক যাইয়া থাকে—আমরা মনে করি, আকাশই গতিশীল হইয়াছে। রেলগাড়ি চড়িয়া যাইবার সময় যেমন পৃথিবীকে গতিশীল বোধ হয়, এও ঠিক সেরূপ। বাস্তবিক পৃথিবী তো নড়িতেছে না, রেলগাড়িই চলিতেছে। এইরূপে আপনি যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন, কেবল এই-সকল বিভিন্ন স্বপ্ন মেঘগুলির মতো এদিক ওদিক যাইতেছে। একটা স্বপ্নের পর আর একটা স্বপ্ন আসিতেছে—ঐগুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। এই জগতে নিয়ম বা সম্বন্ধ বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, পরস্পর যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ 'এলিসের অদ্ভুত দেশদর্শন' (Alice in Wonderland) নামক গ্রন্থ পড়িয়াছেন। এই শতাব্দীতে শিশুদের জন্য

লেখা এ একখানি আশ্চর্য পুস্তক। আমি ঐ বইখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম—আমার মাথায় বরাবর ছোটদের জন্য ঐরূপ বই লেখার ইচ্ছা ছিল। এই পুস্তকে আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল এই ভাবটি যে, আপনারা যাহা সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত জ্ঞান করেন, তাহাই উহার মধ্যে আছে—কোনটির সহিত কোনটির কোন সম্বন্ধ নাই। একটা ভাব আসিয়া যেন আর একটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতেছে—পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই। যখন আপনারা শিশু ছিলেন, আপনারা ভাবিতেন—ঐগুলির মধ্যে অদ্ভুত সম্বন্ধ আছে। এই গ্রন্থকার তাঁহার শৈশবাবস্থার চিন্তাগুলি—শৈশবাবস্থায় যাহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হইত, সেইগুলি লইয়া শিশুদের জন্য এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। আর অনেকে ছোটদের জন্য যে-সব গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলিতে বড় হইলে তাঁহাদের যে-সকল চিন্তা ও ভাব আসিয়াছে, সেই সব ভাব ছোটদের গিলাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐ বইগুলি তাহাদের কিছুমাত্র উপযোগী নয়—বাজে অনর্থক লেখামাত্র। যাহা হউক, আমরাও সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুমাত্র। আমাদের জগৎও ঐরূপ অসম্বদ্ধ—যেন ঐ এলিসের অদ্ভুত রাজ্য—কোনটির সহিত কোনটির কোন-প্রকার সম্বন্ধ নাই। আমরা যখন কয়েকবার ধরিয়া কতকগুলি ঘটনাকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটিতে দেখি, আমরা তাহাকেই কার্য-কারণ নামে অভিহিত করি, আর বলি, উহা আবার ঘটিবে। যখন এই স্বপ্ন চলিয়া গিয়া তাহার স্থলে অন্য স্বপ্ন আসিবে, তাহাকেও ইহারই মতো সম্বন্ধযুক্ত বোধ হইবে। স্বপ্নদর্শনের সময় আমরা যাহা কিছু দেখি, সবই সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নাবস্থায় আমরা সেগুলিকে কখনই অসম্বদ্ধ বা অসঙ্গত মনে করি না—কেবল যখন জাগিয়া উঠি, তখনই সম্বন্ধের অভাব দেখিতে পাই। এইরূপ যখন আমরা এই জগদ্রূপ স্বপ্নদর্শন হইতে জাগিয়া উঠিয়া ঐ স্বপ্নকে সত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিব, তখন ঐ সমুদয়ই অসম্বদ্ধ ও নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইবে—কতকগুলি অসম্বদ্ধ জিনিস যেন আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল—কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইতেছে, কিছুই জানি না। কিন্তু আমরা জানি যে, উহা শেষ হইবে। আর ইহাকেই 'মায়া' বলে। এই সমুদয় পরিমাণশীল বস্তু—রাশি রাশি সঞ্চরমাণ মেষলোমতুল্য মেঘের ন্যায় এবং তাহার পশ্চাতে অপরিণামী সূর্য

আপনি স্বয়ং। যখন সেই অপরিণামী সত্তাকে বাহির হইতে দেখেন, তখন তাহাকে 'ঈশ্বর' বলেন, আর ভিতর হইতে দেখিলে উহাকে আপনার নিজ আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া দেখেন। উভয়ই এক। আপনা হইতে পৃথক্ দেবতা বা ঈশ্বর নাই, আপনা অপেক্ষা—যথার্থ যে আপনি তাহা অপেক্ষা—মহত্তর দেবতা নাই; সকল দেবতাই আপনার তুলনায় ক্ষুদ্রতর; ঈশ্বর, স্বর্গস্থ পিতা প্রভৃতি সমুদয় ধারণা আপনারই প্রতিবিম্বমাত্র। ঈশ্বর স্বয়ং আপনার প্রতিবিম্ব বা প্রতিমাস্বরূপ। 'ঈশ্বর মানুষকে নিজ প্রতিবিম্বরূপে সৃষ্টি করিলেন'—এ কথা ভুল। মানুষ নিজ প্রতিবিম্ব অনুযায়ী ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে—এই কথাই সত্য। সমগ্র জগতে আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব অনুযায়ী ঈশ্বর বা দেবতা সৃষ্টি করিতেছি। আমরাই দেবতা সৃষ্টি করি, তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করি, আর যখনই ঐ স্বপ্ন আমাদের নিকট আসে, তখন আমরা তাঁহাকে ভালবাসিয়া থাকি।

এই বিষয়টি বুঝিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, আজ সকালের বক্তৃতার সার কথাটি এই যে, একটি সত্তামাত্র আছে, আর সেই এক সত্তাই বিভিন্ন মধ্যবর্তী বস্তুর ভিতর দিয়া দৃষ্ট হইলে তাহাকেই পৃথিবী স্বর্গ বা নরক, ঈশ্বর ভূতপ্রেত মানব বা দৈত্য, জগৎ বা এই সব যত কিছু বোধ হয়। কিন্তু এই বিভিন্ন পরিণামী বস্তুর মধ্যে যাঁহার কখন পরিণাম হয় না—যিনি এই চঞ্চল মর্ত্য জগতের একমাত্র জীবনস্বরূপ, যে পুরুষ বহু ব্যক্তির কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে-সকল ধীর ব্যক্তি নিজ আত্মার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তিলাভ হয়—আর কাহারও নয়।[১]

সেই 'এক সত্তা'র সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইবে। কিরূপে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি হইবে—কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইবে, ইহাই এখন জিজ্ঞাস্য। কিরূপে এই স্বপ্নভঙ্গ হইবে, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারী—আমাদের ইহা চাই, ইহা করিতে হইবে, এই যে স্বপ্ন—ইহা হইতে কিরূপে আমরা জাগিব? আমরাই জগতের সেই অনন্ত পুরুষ আর আমরা জড়ভাবাপন্ন হইয়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারীরূপ ধারণ করিয়াছি—একজনের মিষ্ট কথায়

---

১ কঠোপনিষদ্, ৫।১৩

গলিয়া যাইতেছি, আবার আর একজনের কড়া কথায় গরম হইয়া পড়িতেছি—ভালমন্দ সুখদুঃখ আমাদিগকে নাচাইতেছে! কি ভয়ানক পরনির্ভরতা, কি ভয়ানক দাসত্ব! আমি, যে সকল সুখদুঃখের অতীত, সমগ্র জগৎই যাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ, সূর্য চন্দ্র তারা যাহার মহাপ্রাণের ক্ষুদ্র উৎসমাত্র—সেই আমি এইরূপ ভয়ানক দাসভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি! আপনি আমার গায়ে একটা চিমটি কাটিলে আমার ব্যথা লাগে। কেহ যদি একটি মিষ্ট কথা বলে, অমনি আমার আনন্দ হইতে থাকে। আমার কি দুর্দশা দেখুন—দেহের দাস, মনের দাস, জগতের দাস, একটা ভাল কথার দাস, একটা মন্দ কথার দাস, বাসনার দাস, সুখের দাস, জীবনের দাস, মৃত্যুর দাস—সব জিনিষের দাস! এই দাসত্ব ঘুচাইতে হইবে কিরূপে?

এই আত্মার সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, উহা লইয়া মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে, অতঃপর উহার নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে।[১]

অদ্বৈতজ্ঞানীর ইহাই সাধনপ্রণালী। সত্যের সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে উহার বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, তৎপরে ক্রমাগত সেইটি মনে মনে দৃঢ়ভাবে বলিতে হইবে। সর্বদাই ভাবুন—'আমি ব্রহ্ম', অন্য চিন্তা দুর্বলতাজনক বলিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। যে-কোন চিন্তায় আপনাদিগকে নর-নারী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা দূর করিয়া দিন। দেহ যাক, মন যাক, দেবতারাও যাক, ভূত-প্রেতাদিও যাক, সেই এক সত্তা ব্যতীত আর সবই যাক।

যেখানে একজন অপর কিছু দেখে, একজন অপর কিছু শুনে, একজন অন্য কিছু জানে, তাহা ক্ষুদ্র বা সসীম; আর যেখানে একজন অপর কিছু দেখে না, একজন অপর কিছু শুনে না, একজন অপর কিছু জানে না, তাহাই ভূমা অর্থাৎ মহান্ বা অনন্ত।[২]

তাহাই সর্বোত্তম বস্তু, যেখানে বিষয়ী ও বিষয় এক হইয়া যায়। যখন আমিই শ্রোতা ও আমিই বক্তা, যখন আমিই আচার্য ও আমিই শিষ্য, যখন আমিই স্রষ্টা ও আমিই সৃষ্ট, তখনই কেবল ভয় চলিয়া যায়। কারণ আমাকে

১ বৃহ উপ., ৫।৬

২ যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা।
অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্ বিজানাতি তদল্পম্।—ছান্দোগ্য উপ., ৭।২৪

ভীত করিবার অপর কেহ বা কিছু নাই। আমি ব্যতীত যখন আর কিছুই নাই, তখন আমাকে ভয় দেখাইবে কে? দিনের পর দিন এই তত্ত্ব শুনিতে হইবে। অন্য সকল চিন্তা দূর করিয়া দিন। আর সব কিছু দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিন, নিরন্তর ইহাই আবৃত্তি করুন। যতক্ষণ না উহা হৃদয়ে পৌঁছায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক স্নায়ু, প্রত্যেক মাংসপেশী, এমন কি প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু পর্যন্ত 'আমি সেই, আমিই সেই'—এইভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, ততক্ষণ কর্ণের ভিতর দিয়া ঐ তত্ত্ব ক্রমাগত ভিতরে প্রবেশ করাইতে হইবে। এমন কি মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও বলুন—'আমিই সেই।' ভারতে এক সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি 'শিবোঽহং, শিবোঽহং' আবৃত্তি করিতেন। একদিন একটা ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিল। যতক্ষণ তিনি জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ 'শিবোঽহং, শিবোঽহং' ধ্বনি শুনা গিয়াছিল! মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরতর বিপদে, রণক্ষেত্রে, সমুদ্রতলে, উচ্চতম পর্বতশিখরে, গভীরতম অরণ্যে—যেখানেই থাকুন না কেন, সর্বদা মনে মনে বলিতে থাকুন—'আমি সেই, আমিই সেই'। দিনরাত্রি বলিতে থাকুন—'আমিই সেই।' ইহা শ্রেষ্ঠ তেজের পরিচয়, ইহাই ধর্ম।

দুর্বল ব্যক্তি কখন আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।[১] কখনই বলিবেন না, 'হে প্রভো, আমি অতি অধম পাপী।' কে আপনাকে সাহায্য করিবে? আপনি জগতের সাহায্যকর্তা—আপনাকে আবার এ জগতে কে সাহায্য করিতে পারে? আপনাকে সাহায্য করিতে কোন্ মানুষ, কোন্ দেবতা বা কোন্ দৈত্য সমর্থ? আপনার উপর আবার কাহার শক্তি খাটিবে? আপনিই জগতের ঈশ্বর—আপনি আবার কোথায় সাহায্য অন্বেষণ করিবেন? যাহা কিছু সাহায্য পাইয়াছেন, আপনার নিজের নিকট হইতে ব্যতীত আর কাহারও নিকট পান নাই। আপনি প্রার্থনা করিয়া যাহার উত্তর পাইয়াছেন, অজ্ঞতাবশতঃ আপনি মনে করিয়াছেন, অপর কোন পুরুষ তাহার উত্তর দিয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে আপনি স্বয়ং সেই প্রার্থনার উত্তর দিয়াছেন। আপনার নিকট হইতেই সাহায্য আসিয়াছিল, আর আপনি সাগ্রহে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন যে, অপর কেহ আপনাকে সাহায্য প্রেরণ

১ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।—মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।২।৪

করিতেছে। আপনার বাহিরে আপনার সাহায্যকর্তা আর কেহ নাই—আপনিই জগতের স্রষ্টা। গুটিপোকার মতো আপনিই আপনার চারিদিকে গুটি নির্মাণ করিয়াছেন। কে আপনাকে উদ্ধার করিবে? আপনার ঐ গুটি কাটিয়া ফেলিয়া সুন্দর প্রজাপতিরূপে—মুক্ত আত্মারূপে বাহির হইয়া আসুন। তখনই—কেবল তখনই আপনি সত্যদর্শন করিবেন। সর্বদা নিজের মনকে বলিতে থাকুন, 'আমিই সেই'। এই বাক্যগুলি আপনার মনের অপবিত্রতারূপ আবর্জনারাশি পুড়াইয়া ফেলিবে, আপনার ভিতরে পূর্ব হইতেই যে মহাশক্তি আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিবে, আপনার হৃদয়ে যে অনন্ত শক্তি সুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহা জাগাইয়া তুলিবে। সর্বদাই সত্য—কেবল সত্য শ্রবণ করিয়াই এই মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। যেখানে দুর্বলতার চিন্তা আছে, সেদিকে ঘেঁষিবেন না। যদি জ্ঞানী হইতে চান, সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিহার করুন।

সাধন আরম্ভ করিবার পূর্বে মনে যত প্রকার সন্দেহ আসিতে পারে, সব দূর করুন। যতদূর পারেন, যুক্তি-তর্ক-বিচার করুন। তারপর যখন মনের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন যে, ইহাই—কেবল ইহাই সত্য, আর কিছু নয়, তখন আর তর্ক করিবেন না, তখন মুখ একেবারে বন্ধ করুন। তখন আর তর্কযুক্তি শুনিবেন না, নিজেও তর্ক করিবেন না। আর তর্কযুক্তির প্রয়োজন কি? আপনি তো বিচার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, আপনি তো সমস্যার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তবে আর এখন বাকি কি? এখন সত্যের সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। অতএব বৃথা তর্কে এবং অমূল্যকাল-হরণে কি ফল? এখন ঐ সত্যকে ধ্যান করিতে হইবে, আর যে-কোন চিন্তা আপনাকে তেজস্বী করে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং যাহা দুর্বল করে, তাহাই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত মূর্তি-প্রতিমাদি এবং ঈশ্বরের ধ্যান করেন। ইহাই স্বাভাবিক সাধনপ্রণালী, কিন্তু ইহাতে অতি মৃদু গতিতে অগ্রসর হইতে হয়। যোগীরা তাঁহাদের দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কেন্দ্র বা চক্রের উপর ধ্যান করেন এবং মনোমধ্যস্থ শক্তিসমূহ পরিচালনা করেন। জ্ঞানী বলেন, মনের অস্তিত্ব নাই, দেহেরও নাই। এই দেহ ও মনের চিন্তা দূর করিয়া দিতে হইবে, অতএব উহাদের চিন্তা করা অজ্ঞানোচিত কার্য। ঐরূপ করা যেন একটা রোগ আনিয়া আর একটা রোগ আরোগ্য করার

মতো। জ্ঞানীর ধ্যানই সর্বাপেক্ষা কঠিন—নেতি নেতি; তিনি সব কিছুই অস্বীকার করেন, আর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা। ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণাত্মক (বিলোম) সাধন। জ্ঞানী কেবল বিশ্লেষণ-বলে জগৎটা আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চান। 'আমি জ্ঞানী'—এ কথা বলা খুব সহজ, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী হওয়া বড়ই কঠিন। বেদ বলিতেছেন:

পথ অতি দীর্ঘ, এ যেন শাণিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া ভ্রমণ; কিন্তু নিরাশ হইও না। উঠ, জাগো, যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন ক্ষান্ত হইও না।[১]

অতএব জ্ঞানীর ধ্যান কি প্রকার? জ্ঞানী দেহমন-বিষয়ক সর্বপ্রকার চিন্তা অতিক্রম করিতে চান। তিনি যে দেহ, এই ধারণা দূর করিয়া দিতে চান। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, যখনই আমি বলি, 'আমি স্বামী অমুক' তৎক্ষণাৎ দেহের ভাব আসিয়া থাকে। তবে কি করিতে হইবে? মনের উপর সবলে আঘাত করিয়া বলিতে হইবে, 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা।' রোগই আসুক, অথবা অতি ভয়াবহ আকারে মৃত্যুই আসিয়া উপস্থিত হউক, কে তাহা গ্রাহ্য করে? আমি দেহ নই। দেহ সুন্দর রাখিবার চেষ্টা কেন? এই মায়া এই ভ্রান্তি—আর একবার উপভোগের জন্য? এই দাসত্ব বজায় রাখিবার জন্য? দেহ যাক, আমি দেহ নই। ইহাই জ্ঞানীর সাধনপ্রণালী। ভক্ত বলেন, 'প্রভু আমাকে এই জীবনসমুদ্র সহজে উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই দেহ দিয়াছেন, অতএব যতদিন না সেই যাত্রা শেষ হয়, ততদিন ইহাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করিতে হইবে।' যোগী বলেন, 'আমাকে অবশ্যই দেহের যত্ন করিতে হইবে, যাহাতে আমি ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইয়া পরিণামে মুক্তিলাভ করিতে পারি।' জ্ঞানী মনে করেন, তিনি আর বিলম্ব করিতে পারেন না। তিনি এই মুহূর্তেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবেন। তিনি বলেন, 'আমি নিত্যমুক্ত, কোন কালেই বদ্ধ নই; অনন্তকাল ধরিয়া আমি এই জগতের ঈশ্বর। আমাকে আবার পূর্ণ করিবে কে? আমি নিত্য পূর্ণস্বরূপ।' যখন কোন মানুষ স্বয়ং

---

১ তুলনীয়: উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥—কঠ. উপ, ১।৩।১৪

পূর্ণতা লাভ করে, সে অপরের মধ্যেও পূর্ণতা দেখিয়া থাকে। যখন অপরের মধ্যে অপূর্ণতা দেখে, তখন তাহার নিজ-মনেরই ভাব বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, বুঝিতে হইবে। তাহার নিজের ভিতর যদি অপূর্ণতা না থাকে, তবে সে কিরূপে অপূর্ণতা দেখিবে? অতএব জ্ঞানী পূর্ণতা বা অপূর্ণতা কিছুই গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার পক্ষে উহাদের কোনটিরই অস্তিত্ব নাই। যখন তিনি মুক্ত হন, তখন হইতেই তিনি আর ভাল-মন্দ দেখেন না। ভালমন্দ কে দেখে? —যাহার নিজের ভিতর ভাল-মন্দ আছে। দেহ কে দেখে?—যে নিজেকে দেহ মনে করে। যে মুহূর্তে আপনি দেহভাব-রহিত হইবেন, সেই মুহূর্তেই আপনি আর জগৎ দেখিতে পাইবেন না। উহা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। জ্ঞানী কেবল বিচার-জনিত সিদ্ধান্তবলে এই জড়বন্ধন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাই 'নেতি, নেতি' মার্গ।

আত্মার একত্ব

পূর্ব বক্তৃতায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ়তর করিবার জন্য আমি একখানি উপনিষদ্[১] হইতে কিছু পাঠ করিয়া শুনাইব। তাহাতে দেখিবেন, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে কিরূপে এই-সকল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত।

যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। আপনারা অবশ্য জানেন, ভারতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বয়স হইলে সকলকেই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, 'প্রিয়ে মৈত্রেয়ী, আমি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলাম, এই আমার যাহা-কিছু অর্থ, বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়া লও।'

মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'ভগবান্, ধনরত্নে পূর্ণা সমুদয় পৃথিবী যদি আমার হয়, তাহা হইলে কি তাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিব?'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'না, তাহা হইতে পারে না। ধনী লোকেরা যেরূপে জীবনধারণ করে, তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে; কারণ ধনের দ্বারা কখনও অমৃতত্ব লাভ করা যায় না।'

মৈত্রেয়ী কহিলেন, 'যাহা দ্বারা আমি অমৃত লাভ করিতে পারি, তাহা লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? যদি সে-উপায় আপনার জানা থাকে, আমাকে তাহাই বলুন।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'তুমি বরাবরই আমার প্রিয়া ছিলে, এখন এই প্রশ্ন করাতে তুমি প্রিয়তরা হইলে। এস, আসন গ্রহণ কর, আমি তোমাকে তোমার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব। তুমি উহা শুনিয়া ধ্যান করিতে থাকো।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন:

'হে মৈত্রেয়ি, স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, তাহা স্বামীর জন্য নয়, কিন্তু আত্মার জন্যই স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে; কারণ সে আত্মাকে ভালবাসিয়া থাকে। স্ত্রীর জন্যই কেহ স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ ও ৪র্থ অধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য। এই অধ্যায়ের প্রায় সমুদয়ই ঐ দুই অংশের ভাবানুবাদ ও ব্যাখ্যামাত্র।

ভালবাসে, সেইহেতু স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে। সন্তানগণকে কেহ তাহাদের জন্যই ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতুই সন্তানগণকে ভালবাসিয়া থাকে। অর্থকে কেহ অর্থের জন্যই ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু অর্থ ভালবাসিয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই ব্রাহ্মণের জন্য নয়, কিন্তু আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে ব্রাহ্মণকে ভালবাসিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়কেও লোকে ক্ষত্রিয়ের জন্য ভালবাসে না, আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে ক্ষত্রিয়কে ভালবাসিয়া থাকে। এই জগৎকেও লোকে যে ভালবাসে, তাহা জগতের জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু জগৎ তাহার প্রিয়। দেবগণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই দেবগণের জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু দেবগণ তাহার প্রিয়। অধিক কি, কোন বস্তুকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই বস্তুর জন্য নয়, কিন্তু তাহার যে আত্মা বিদ্যমান, তাহার জন্যই সে ঐ বস্তুকে ভালবাসে। অতএব এই আত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ করিতে হইবে, তারপর মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে, তারপর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ উহার ধ্যান করিতে হইবে। হে মৈত্রেয়ি, আত্মার শ্রবণ, আত্মার দর্শন, আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা এই সবই জ্ঞাত হয়।'

এই উপদেশের তাৎপর্য কি? এ এক অদ্ভুত রকমের দর্শন। আমরা জগৎ বলিতে যাহা কিছু বুঝি, সকলের ভিতর দিয়াই আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন। লোকে বলিয়া থাকে, সর্বপ্রকার প্রেমই স্বার্থপরতা—স্বার্থপরতার যতদূর নিম্নতম অর্থ হইতে পারে, সেই অর্থে সকল প্রেমই স্বার্থপরতাপ্রসূত; যেহেতু আমি আমাকে ভালবাসি, সেইহেতু অপরকে ভালবাসিয়া থাকি। বর্তমানকালেও অনেক দার্শনিক আছেন, যাঁহাদের মত এই যে, 'স্বার্থ ই জগতে সকল কার্যের একমাত্র প্রেরণাদায়িনী শক্তি।' এ-কথা এক হিসাবে সত্য, আবার অন্য হিসাবে ভুল। আমাদের এই 'আমি' সেই প্রকৃত 'আমি' বা আত্মার ছায়ামাত্র, যিনি আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছেন। আর সসীম বলিয়াই এই ক্ষুদ্র 'আমি'র উপর ভালবাসা অন্যায় ও মন্দ বলিয়া বোধ হয়। বিশ্ব-আত্মার প্রতি যে ভালবাসা, তাহাই সসীমভাবে দৃষ্ট হইলে মন্দ বলিয়া বোধ হয়, স্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হয়। এমনকি স্ত্রীও যখন

স্বামীকে ভালবাসে, সে জানুক বা নাই জানুক, সে সেই আত্মার জন্যই স্বামীকে ভালবাসিতেছে। জগতে উহা স্বার্থপরতা-রূপে ব্যক্ত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আত্মপরতা বা আত্মভাবেরই ক্ষুদ্র অংশ। যখনই কেহ কিছু ভালবাসে, তাহাকে সেই আত্মার মধ্য দিয়াই ভালবাসিতে হয়।

এই আত্মাকে জানিতে হইবে। যাহারা আত্মার স্বরূপ না জানিয়া উহাকে ভালবাসে, তাহাদের ভালবাসাই স্বার্থপরতা। যাঁহারা আত্মাকে জানিয়া উহাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের ভালবাসায় কোনরূপ বন্ধন নাই, তাঁহারা পরম জ্ঞানী। কেহই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের জন্য ভালবাসে না, কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া যে আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই সে ব্রাহ্মণকে ভালবাসে।

'ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন; ক্ষত্রিয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ক্ষত্রিয়কে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন; লোকসমূহ বা জগৎ তাঁহাকে ত্যাগ করে, যিনি জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন; দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বিশ্বাস করেন। ...সকল বস্তুই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, যিনি তাহাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসমূহ, এই দেবগণ...এমন কি যাহা কিছু জগতে আছে, সবই আত্মা।'

এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য ভালবাসা বলিতে তিনি কি লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা বুঝাইলেন। যখনই আমরা এই প্রেমকে কোন বিশেষ বস্তুতে সীমাবদ্ধ করি, তখনই ;.ত গোলমাল। মনে করুন, আমি কোন নারীকে ভালবাসি, যদি আমি সেই নারীকে আত্মা হইতে পৃথক্‌ভাবে, বিশেষ ভাবে দেখি, তবে উহা আর শাশ্বত প্রেম হইল না। উহা স্বার্থপর ভালবাসা হইয়া পড়িল, আর দুঃখই উহার পরিণাম; কিন্তু যখনই আমি সেই নারীকে আত্মারূপে দেখি, তখনই সেই ভালবাসা যথার্থ প্রেম হইল, তাহার কখন বিনাশ নাই। এইরূপ যখনই আপনারা সমগ্র জগৎ হইতে বা আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া জগতের কোন এক বস্তুতে আসক্ত হন, তখনই তাহাতে প্রতিক্রিয়া আসিয়া থাকে। আত্মা ব্যতীত যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহারই ফল শোক ও দুঃখ। কিন্তু যদি আমরা সমুদয় বস্তুকে আত্মার অন্তর্গত ভাবিয়া ও আত্ম-রূপে

সম্ভোগ করি, তাহা হইতে কোন দুঃখ কষ্ট বা প্রতিক্রিয়া আসিবে না। ইহাই পূর্ণ আনন্দ।

এই আদর্শে উপনীত হইবার উপায় কি? যাজ্ঞবল্ক্য ঐ অবস্থা লাভ করিবার প্রণালী বলিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত; আত্মাকে না জানিয়া জগতের প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বস্তু লইয়া উহাতে আত্মদৃষ্টি করিব কিরূপে?

'যদি দুন্দুভি বাজিতে থাকে, আমরা উহা হইতে উৎপন্ন শব্দ-লহরীগুলি পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু দুন্দুভির সাধারণ ধ্বনি বা আঘাত হইতে ধ্বনিসমূহ গৃহীত হইলে ঐ বিভিন্ন শব্দলহরীও গৃহীত হইয়া থাকে।

'শঙ্খ নিনাদিত হইলে উহার স্বরলহরী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু শঙ্খের সাধারণ ধ্বনি অথবা বিভিন্নভাবে নিনাদিত শব্দরাশি গৃহীত হইলে ঐ শব্দলহরীগুলিও গৃহীত হয়।

'বীণা বাজিতে থাকিলে উহার বিভিন্ন স্বরগ্রাম পৃথক্‌ভাবে গৃহীত হয় না, কিন্তু বীণার সাধারণ স্বর অথবা বিভিন্নরূপে উত্থিত স্বরসমূহ গৃহীত হইলে ঐ স্বরগ্রামগুলিও গৃহীত হয়।

'যেমন কেহ ভিজা কাঠ জ্বালাইতে থাকিলে তাহা হইতে নানা প্রকার ধূম ও স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেরূপ সেই মহান্ পুরুষ হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যা—এই-সমস্ত নিঃশ্বাসের ন্যায় বহির্গত হয়। সমস্তই তাঁহার নিঃশ্বাস-স্বরূপ।

'যেমন সমুদয় জলের একমাত্র আশ্রয় সমুদ্র, যেমন সমুদয় স্পর্শের একমাত্র আশ্রয় ত্বক্, যেমন সমুদয় গন্ধের একমাত্র আশ্রয় নাসিকা, যেমন সমুদয় রসের একমাত্র আশ্রয় জিহ্বা, যেমন সমুদয় রূপের একমাত্র আশ্রয় চক্ষু, যেমন সমুদয় শব্দের একমাত্র আশ্রয় কর্ণ, যেমন সমুদয় চিন্তার একমাত্র আশ্রয় মন, যেমন সমুদয় জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় হৃদয়, যেমন সমুদয় কর্মের একমাত্র আশ্রয় হস্ত, যেমন সমুদয় বাক্যের একমাত্র আশ্রয় বাগিন্দ্রিয়, যেমন সমুদ্র-জলের সর্বাংশে লবণ ঘনীভূত রহিয়াছে অথচ উহা চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, সেইরূপ হে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাকে চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু তিনি এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি সব কিছু। তিনি বিজ্ঞানঘন। সমুদয়

জগৎ তাঁহা হইতে উত্থিত হয় এবং পুনরায় তাঁহাতেই ডুবিয়া যায়। কারণ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে আমরা জ্ঞানাতীত অবস্থায় চলিয়া যাই।'

এখানে আমরা এই ভাব পাইলাম যে, আমরা সকলেই স্ফুলিঙ্গাকারে তাঁহা হইতে বহির্গত হইয়াছি, আর তাঁহাকে জানিতে পারিলে তাঁহার নিকট ফিরিয়া গিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত এক হইয়া যাই।

এই উপদেশে মৈত্রেয়ী ভীত হইলেন, সর্বত্রই লোকে যেমন হইয়া থাকে। মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'ভগবন্, আপনি এইখানে আমাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিলেন। দেবতা প্রভৃতি সে অবস্থায় থাকিবে না, 'আমি'-জ্ঞানও নষ্ট হইয়া যাইবে—এ-কথা বলিয়া আপনি আমার ভীতি উৎপাদন করিতেছেন। যখন আমি ঐ অবস্থায় পৌঁছিব, তখন কি আমি আত্মাকে জানিতে পারিব? অহং-জ্ঞান হারাইয়া তখন অজ্ঞান-অবস্থা প্রাপ্ত হইব, অথবা আমি তাঁহাকে জানিতেছি, এই জ্ঞান থাকিবে? তখন কি কাহাকেও জানিবার, কিছু অনুভব করিবার, কাহাকেও ভালবাসিবার, কাহাকেও ঘৃণা করিবার থাকিবে না?'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'মৈত্রেয়ি, মনে করিও না যে আমি মোহজনক কথা বলিতেছি, তুমি ভয় পাইও না। এই আত্মা অবিনাশী, তিনি স্বরূপতঃ নিত্য। যে অবস্থায় 'দুই' থাকে অর্থাৎ যাহা দ্বৈতাবস্থা, তাহা নিম্নতর অবস্থা। যেখানে দ্বৈতভাব থাকে, সেখানে একজন অপরকে ঘ্রাণ করে, একজন অপরকে দর্শন করে, একজন অপরকে শ্রবণ করে, একজন অপরকে অভ্যর্থনা করে, একজন অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করে, একজন অপরকে জানে। কিন্তু যখন সবই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহার ঘ্রাণ লইবে, কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে শুনিবে, কে কাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, কে কাহাকে জানিবে? যাঁহা দ্বারা জানা যায়, তাঁহাকে কে জানিতে পারে? এই আত্মাকে কেবল 'নেতি নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়) এইরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। তিনি অচিন্ত্য, তাঁহাকে বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিতে পারা যায় না। তিনি অপরিণামী, তাঁহার কখন ক্ষয় হয় না। তিনি অনাসক্ত, কখনই তিনি প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন না। তিনি পূর্ণ, সমুদয় সুখদুঃখের অতীত। বিজ্ঞাতাকে কে জানিতে পারে? কি উপায়ে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি? কোন উপায়েই নয়। হে মৈত্রেয়ি, ইহাই ঋষিদিগের চরম সিদ্ধান্ত। সমুদয় জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইলেই তাঁহাকে লাভ করা হয়। তখনই অমৃতত্ব লাভ হয়।'

এতদূর পর্যন্ত এই ভাব পাওয়া গেল যে, এই-সমুদয়ই এক অনন্ত পুরুষ আর তাঁহাতেই আমাদের যথার্থ আমিত্ব—সেখানে কোন ভাগ বা অংশ নাই, ভ্রমাত্মক নিম্নভাবগুলির কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি এই ক্ষুদ্র আমিত্বের ভিতর আগাগোড়া সেই অনন্ত যথার্থ আমিত্ব প্রতিভাত হইতেছে: সমুদয়ই আত্মার অভিব্যক্তিমাত্র। কি করিয়া আমরা এই আত্মাকে লাভ করিব? যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমেই আমাদিগকে বলিয়াছেন, 'প্রথমে এই আত্মার সম্বন্ধে শুনিতে হইবে, তারপর বিচার করিতে হইবে, তারপর উহার ধ্যান করিতে হইবে।' ঐ পর্যন্ত তিনি আত্মাকে এই জগতের সর্ববস্তুর সাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তারপর সেই আত্মার অনন্ত স্বরূপ আর মানবমনের শান্তভাব সম্বন্ধে বিচার করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সকলের জ্ঞাতা আত্মাকে সীমাবদ্ধ মনের দ্বারা জানা অসম্ভব। যদি আত্মাকে জানিতে না পারা যায়, তবে কি করিতে হইবে? যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, যদিও আত্মাকে জানা যায় না, তথাপি তাঁহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহাকে কিরূপে ধ্যান করিতে হইবে, সেই বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই জগৎ সকল প্রাণীরই কল্যাণকারী এবং প্রত্যেক প্রাণীই জগতের কল্যাণকারী; কারণ উভয়েই পরস্পরের অংশী—একের উন্নতি অপরের উন্নতির সাহায্য করে। কিন্তু স্বপ্রকাশ আত্মার কল্যাণকারী বা সাহায্যকারী কেহ হইতে পারে না, কারণ তিনি পূর্ণ ও অনন্তস্বরূপ। জগতে যত কিছু আনন্দ আছে, এমন কি খুব নিম্নস্তরের আনন্দ পর্যন্ত, ইহারই প্রতিবিম্বমাত্র। যাহা কিছু ভাল, সবই সেই আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র, আর ঐ প্রতিবিম্ব যখন অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হয়, তাহাকেই মন্দ বলা যায়। যখন এই আত্মা কম অভিব্যক্ত, তখন তাহাকে তমঃ বা মন্দ বলে; যখন অধিকতর অভিব্যক্ত, তখন উহাকে প্রকাশ বা ভাল বলে। এই মাত্র প্রভেদ। ভালমন্দ কেবল মাত্রার তারতম্য, আত্মার কম বেশী অভিব্যক্তি লইয়া। আমাদের নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। ছেলেবেলা কত জিনিসকে আমরা ভাল বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক সেগুলি মন্দ। আবার কত জিনিসকে মন্দ বলিয়া দেখি, বাস্তবিক সেগুলি ভাল। আমাদের ধারণার কেমন পরিবর্তন হয়! একটা ভাব কেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে! আমরা এক সময়ে যাহা খুব ভাল বলিয়া ভাবিতাম, এখন আর তাহা সেরূপ ভাল ভাবি না। এইরূপে

ভালমন্দ আমাদের মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে, বাহিরে উহাদের অস্তিত্ব নাই। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। সবই সেই আত্মার প্রকাশমাত্র। আত্মা সব কিছুতে প্রকাশ পাইতেছেন; কেবল তাঁহার প্রকাশ অল্প হইলে আমরা মন্দ বলি এবং স্পষ্টতর হইলে ভাল বলি। কিন্তু আত্মা স্বয়ং শুভাশুভের অতীত। অতএব জগতে যাহা কিছু আছে, সবকেই প্রথমে ভাল বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে, কারণ সবই সেই পূর্ণস্বরূপের অভিব্যক্তি। তিনি ভালও নন, মন্দও নন; তিনি পূর্ণ, আর পূর্ণ বস্তু কেবল একটিই হইতে পারে। ভাল জিনিস অনেক প্রকার হইতে পারে, মন্দও অনেক থাকিতে পারে, ভাল-মন্দের মধ্যে প্রভেদের নানাবিধ মাত্রা থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ণ বস্তু কেবল একটিই; ঐ পূর্ণ বস্তু বিশেষ বিশেষ প্রকার আবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট হইলে বিভিন্ন মাত্রায় ভাল বলিয়া আমরা অভিহিত করি, অন্য প্রকার আবরণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলে উহাকেই আমরা মন্দ বলিয়া অভিহিত করি। এই বস্তু সম্পূর্ণ ভাল, ঐ বস্তু সম্পূর্ণ মন্দ—এরূপ ধারণা কুসংস্কার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, এই জিনিস বেশী ভাল, ঐ জিনিস কম ভাল, আর কম-ভালকেই আমরা মন্দ বলি। ভাল-মন্দ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই সর্বপ্রকার দ্বৈত ভ্রম প্রসূত হইয়াছে। উহারা সকল যুগের নরনারীর বিভীষিকাপ্রদ ভাবরূপে মানবজাতির হৃদয়ে দৃঢ়-নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যে অপরকে ঘৃণা করি, তাহার কারণ শৈশবকাল হইতে অভ্যস্ত এই-সব মূর্খজনোচিত ধারণা। মানবজাতি সম্বন্ধে আমাদের বিচার একেবারে ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়াছে, আমরা এই সুন্দর পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছি, কিন্তু যখনই আমরা ভাল-মন্দের এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি ছাড়িয়া দিব, তখনই ইহা স্বর্গে পরিণত হইবে।

এখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্ত্রীকে কি উপদেশ দিতেছেন, শোনা যাক:

'এই পৃথিবী সকল প্রাণীর পক্ষে মধু অর্থাৎ মিষ্ট বা আনন্দজনক, সকল প্রাণীই আবার এই পৃথিবীর পক্ষে মধু—উভয়েই পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। আর ইহাদের এই মধুরত্ব সেই তেজোময় অমৃতময় আত্মা হইতে আসিতেছে।'

সেই এক মধু বা মধুরত্ব বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। যেখানেই মানবজাতির ভিতর কোনরূপ প্রেম বা মধুরত্ব দেখা যায়, সাধুতেই হউক,

পাপীতেই হউক, মহাপুরুষেই হউক বা হত্যাকারীতেই হউক, দেহেই হউক, মনেই হউক বা ইন্দ্রিয়েই হউক, সেখানেই তিনি আছেন। সেই এক পুরুষ ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? অতি নিম্নতম ইন্দ্রিয়সুখও তিনি, আবার উচ্চতম আধ্যাত্মিক আনন্দও তিনি। তিনি ব্যতীত মধুরত্ব থাকিতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই বলিতেছেন। যখন আপনি ঐ অবস্থায় উপনীত হইবেন, যখন সকল বস্তু সমদৃষ্টিতে দেখিবেন; যখন মাতালের পানাসক্তি ও সাধুর ধ্যানে সেই এক মধুরত্ব—এক আনন্দের প্রকাশ দেখিবেন, তখনই বুঝিতে হইবে, আপনি সত্য লাভ করিয়াছেন। তখনই কেবল আপনি বুঝিবেন—সুখ কাহাকে বলে, শান্তি কাহাকে বলে, প্রেম কাহাকে বলে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আপনি এই বৃথা ভেদজ্ঞান রাখিবেন, মূর্খের মতো ছেলেমানুষী কুসংস্কারগুলি রাখিবেন, ততদিন আপনার সর্বপ্রকার দুঃখ আসিবে। সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষই সমগ্র জগতের ভিত্তিস্বরূপ উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন—সবই তাঁহার মধুরত্বের অভিব্যক্তিমাত্র। এই দেহটিও যেন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ—আর সেই দেহের সমুদয় শক্তির ভিতর দিয়া, মনের সর্বপ্রকার উপভোগের মধ্য দিয়া সেই তেজোময় পুরুষ প্রকাশ পাইতেছেন। দেহের মধ্যে সেই তেজোময় স্বপ্রকাশ পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই আত্মা। 'এই জগৎ সকল প্রাণীর পক্ষে এমন মধুময় এবং সকল প্রাণীই উহার নিকট মধুময়', কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই সমগ্র জগতের আনন্দস্বরূপ। আমাদের মধ্যেও তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনিই ব্রহ্ম।

'এই বায়ু সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, আর এই বায়ুর নিকটও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বায়ুতেও রহিয়াছেন এবং দেহেও রহিয়াছেন। তিনি সকল প্রাণীর প্রাণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।'

'এই সূর্য সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ এবং এই সূর্যের পক্ষেও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় পুরুষ সূর্যে রহিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রতিবিম্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সমুদয়ই তাঁহার প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তিনি আমাদের দেহেও রহিয়াছেন এবং তাঁহারই ঐ প্রতিবিম্ব-বলে আমরা আলোক-দর্শনে সমর্থ হইতেছি।'

'এই চন্দ্র সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, এই চন্দ্রের পক্ষে আবার সকল প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি চন্দ্রের অন্তরাত্মা-স্বরূপ, তিনিই আমাদের ভিতর মন-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন।'

'এই বিদ্যুৎ সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, সকল প্রাণীই বিদ্যুতের পক্ষে মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বিদ্যুতের আত্মাস্বরূপ আর তিনি আমাদের মধ্যেও রহিয়াছেন, কারণ সবই সেই ব্রহ্ম।'

'সেই ব্রহ্ম, সেই আত্মা সকল প্রাণীর রাজা।'

এই ভাবগুলি মানবের পক্ষে বড়ই উপকারী; ঐগুলি ধ্যানের জন্য উপদিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ: পৃথিবীকে ধ্যান করিতে থাকুন। পৃথিবীকে চিন্তা করুন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবুন যে, পৃথিবীতে যাহা আছে, আমাদের দেহেও তাহাই আছে। চিন্তাবলে পৃথিবী ও দেহ এক করিয়া ফেলুন, আর দেহস্থ আত্মার সহিত পৃথিবীর অন্তর্বর্তী আত্মার অভিন্নভাব সাধন করুন। বায়ুকে বায়ুর ও আপনার অভ্যন্তরবর্তী আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করুন। এইরূপে এই সকল ধ্যান করিতে হয়। এ-সবই এক, শুধু বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইতেছে। সকল ধ্যানেরই চরম লক্ষ্য—এই একত্ব উপলব্ধি করা, আর যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

জ্ঞানযোগের চরমাদর্শ

অদ্যকার বক্তৃতাতেই সাংখ্য ও বেদান্তবিষয়ক এই বক্তৃতাবলী সমাপ্ত হইবে ; অতএব আমি এই কয়দিন ধরিয়া যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, অদ্য সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব। বেদ ও উপনিষদে আমরা হিন্দুদের অতি প্রাচীন ধর্মভাবের কয়েকটির বিবরণ পাইয়া থাকি। মহর্ষি কপিল খুব প্রাচীন বটে, কিন্তু এই-সকল ভাব তাঁহা অপেক্ষা প্রাচীনতর। সাংখ্যদর্শন কপিলের উদ্ভাবিত নূতন কোন মতবাদ নয়। তাঁহার সময়ে ধর্মসম্বন্ধে যে-সকল বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল, তিনি নিজের অপূর্ব প্রতিভাবলে তাহা হইতে একটি যুক্তিসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রণালী গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। তিনি ভারতবর্ষে এমন এক 'মনোবিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহা হিন্দুদের বিভিন্ন আপাতবিরোধী দার্শনিকসম্প্রদায়সমূহ এখনও মানিয়া থাকে। পরবর্তী কোন দার্শনিকই এ পর্যন্ত মানবমনের ঐ অপূর্ব বিশ্লেষণ এবং জ্ঞানলাভ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত সিদ্ধান্তের উপরে যাইতে পারেন নাই ; কপিলই নিঃসন্দেহে অদ্বৈতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান ; তিনি যতদূর পর্যন্ত সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদ আর এক পদ অগ্রসর হইল। এইরূপে সাংখ্যদর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত দ্বৈতবাদ ছাড়াইয়া চরম একত্বে পৌঁছিল।

কপিলের সময়ের পূর্বে ভারতে যে-সকল ধর্মভাব প্রচলিত ছিল—আমি অবশ্য পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ধর্মভাবগুলির কথাই বলিতেছি, খুব নিম্নগুলি তো ধর্ম-নামের অযোগ্য—সেগুলির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, প্রথমগুলির ভিতরও প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্ত্র প্রভৃতির ধারণা ছিল। অতি প্রাচীন অবস্থায় সৃষ্টির ধারণা বড়ই বিচিত্র ছিল : সমগ্র জগৎ ঈশ্বরেচ্ছায় শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আদিতে এই জগৎ একেবারে ছিল না, আর সেই অভাব বা শূন্য হইতেই এই সমুদয় আসিয়াছে। পরবর্তী সোপানে আমরা দেখিতে পাই, এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। বেদান্তের প্রথম সোপানেই এই প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায় : অসৎ (অনস্তিত্ব) হইতে সতের (অস্তিত্বের) উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে ? যদি এই জগৎ সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বযুক্ত হয়,

তবে ইহা অবশ্য কিছু হইতে আসিয়াছে। প্রাচীনেরা সহজেই দেখিতে পাইলেন, কোথাও এমন কিছুই নাই, যাহা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে। মনুষ্য-হস্তের দ্বারা যাহা কিছু কৃত হয়, তাহারই তো উপাদান-কারণ প্রয়োজন। অতএব প্রাচীন হিন্দুরা স্বভাবতই এই জগৎ যে শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, এই প্রাথমিক ধারণা ত্যাগ করিলেন, আর এই জগৎসৃষ্টির কারণীভূত উপাদান কি, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র জগতের ধর্মেতিহাস—'কোন্ পদার্থ হইতে এই সমুদয়ের উৎপত্তি হইল?'—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টায় উপাদান-কারণের অন্বেষণমাত্র। নিমিত্ত-কারণ বা ঈশ্বরের বিষয় ব্যতীত, ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা—এই প্রশ্ন ব্যতীত, চিরকালই এই মহাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, 'ঈশ্বর কী উপাদান লইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন?' এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই বিভিন্ন দর্শন নির্ভর করিতেছে।

একটি সিদ্ধান্ত এই যে, এই উপাদান এবং ঈশ্বর ও আত্মা—তিনই নিত্য বস্তু, উহারা যেন তিনটি সমান্তরাল রেখার মতো অনন্তকাল পাশাপাশি চলিয়াছে; উহাদের মধ্যে প্রকৃতি ও আত্মাকে তাঁহারা অ-স্বতন্ত্র তত্ত্ব এবং ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বা পুরুষ বলেন। প্রত্যেক জড়পরমাণুর ন্যায় প্রত্যেক আত্মাই ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন। যখন কপিল সাংখ্য মনোবিজ্ঞান প্রচার করিলেন, তখন পূর্ব হইতেই এই-সকল ও অন্যান্য অনেক প্রকার ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণা বিদ্যমান ছিল। ঐ মনোবিজ্ঞানের মতে বিষয়ানুভূতির প্রণালী এইরূপ: প্রথমতঃ বাহিরের বস্তু হইতে ঘাত বা ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়-সমূহের শারীরিক দ্বারগুলি উত্তেজিত করে। যেমন প্রথমে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহ্য বিষয়ের আঘাত লাগিল, চক্ষুরাদি দ্বার বা যন্ত্র হইতে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে (স্নায়ুকেন্দ্রে), ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি হইতে এমন এক পদার্থে গিয়া লাগিল, যাহা এক তত্ত্বস্বরূপ—উহাকে তাঁহারা 'আত্মা' বলেন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞান আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, সর্বপ্রকার বিষয়ানুভূতির জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, ইহা তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথমতঃ নিম্নশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, দ্বিতীয়তঃ উচ্চশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, আর এই দুইটির সঙ্গে মন ও বুদ্ধির কার্যের সহিত ঠিক মিলে, কিন্তু তাঁহারা এমন কোন কেন্দ্র পান নাই, যাহা অপর সব কেন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছে,

সুতরাং কে এই কেন্দ্রগুলির একত্ব বিধান করিতেছে, শারীরবিজ্ঞান তাহার উত্তর দিতে অক্ষম। কোথায় এবং কিরূপে এই কেন্দ্রগুলি মিলিত হয়? মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহ পৃথক্ পৃথক্, আর এমন কোন একটি কেন্দ্র নাই, যাহা অপর কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করিতেছে। অতএব এ পর্যন্ত এ-বিষয়ে সাংখ্য-মনোবিজ্ঞানের প্রতিবাদী কেহ নাই। একটি সম্পূর্ণ ধারণা লাভের জন্য এই একীভাব, যাহার উপর বিষয়ানুভূতিগুলি প্রতিবিম্বিত হইবে, এমন কিছু প্রয়োজন। সেই 'কিছু' না থাকিলে আমি আপনার বা ঐ ছবিখানার বা অন্য কোন বস্তুরই কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। যদি আমাদের ভিতরে এই একত্ব-বিধায়ক কিছু না থাকিত, তবে আমরা হয়তো কেবল দেখিতেই লাগিলাম, খানিক পরে শুনিতে লাগিলাম, খানিক পরে স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলাম, আর এমন হইত যে, একজন কথা কহিতেছে শুনিতেছি, কিন্তু তাহাকে মোটেই দেখিতে পাইতেছি না, কারণ কেন্দ্রসমূহ ভিন্ন ভিন্ন।

এই দেহ জড়পরমাণু-গঠিত, আর ইহা জড় ও অচেতন। যাহাকে সূক্ষ্ম শরীর বলা হয়, তাহাও ঐরূপ। সাংখ্যের মতে সূক্ষ্ম শরীর অতি সূক্ষ্ম পরমাণুগঠিত একটি ক্ষুদ্র শরীর—উহার পরমাণুগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোনপ্রকার অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারাও ঐগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সূক্ষ্মদেহের প্রয়োজন কি? আমরা যাহাকে 'মন' বলি, উহা তাহার আধারস্বরূপ। যেমন এই স্থূল শরীর স্থূলতর শক্তিসমূহের আধার, সেরূপ সূক্ষ্ম শরীর চিন্তা ও উহার নানাবিধ বিকারস্বরূপ সূক্ষ্মতর শক্তিসমূহের আধার। প্রথমতঃ এই স্থূল শরীর—ইহা স্থূল জড় ও স্থূল শক্তিময়। জড় ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না, কারণ কেবল জড়ের মধ্য দিয়াই শক্তি নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে। অতএব স্থূলতর শক্তিসমূহ এই স্থূল শরীরের মধ্য দিয়াই কার্য করিতে পারে এবং অবশেষে ঐগুলি সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করে। যে-শক্তি স্থূলভাবে কার্য করিতেছে, তাহাই সূক্ষ্মতররূপে কার্য করিতে থাকে এবং চিন্তারূপে পরিণত হয়। উহাদের মধ্যে কোনরূপ বাস্তব ভেদ নাই, একই বস্তুর একটি স্থূল ও অপরটি সূক্ষ্ম প্রকাশ মাত্র। সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীরের মধ্যেও উপাদানগত কোন ভেদ নাই। সূক্ষ্ম শরীরও জড়, তবে উহা খুব সূক্ষ্ম জড়।

এই-সকল শক্তি কোথা হইতে আসে? বেদান্তদর্শনের মতে—প্রকৃতি দুইটি বস্তুতে গঠিত। একটিকে তাঁহারা 'আকাশ' বলেন, উহা অতি সূক্ষ্ম জড়, আর

অপরটিকে তাঁহারা ‘প্রাণ’ বলেন। আপনারা পৃথিবী, বায়ু বা অন্য যাহা কিছু দেখেন, শুনেন বা স্পর্শ দ্বারা অনুভব করেন, তাহাই জড়; এবং সবগুলিই এই আকাশেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র। উহা প্রাণ বা সর্বব্যাপী শক্তির প্রেরণায় কখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়, কখন স্থূল হইতে স্থূলতর হয়। আকাশের ন্যায় প্রাণও সর্বব্যাপী—সর্ববস্তুতে অনুস্যূত। আকাশ যেন জলের মতো এবং জগতে আর যাহা কিছু আছে, সবই বরফখণ্ডের মতো, ঐগুলি জল হইতে উৎপন্ন হইয়া জলেই ভাসিতেছে; আর প্রাণই সেই শক্তি, যাহা আকাশকে এই বিভিন্নরূপে পরিণত করিতেছে।

পৈশিকগতি অর্থাৎ চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, কথা বলা প্রভৃতি প্রাণের স্থূলরূপ প্রকাশের জন্য এই দেহযন্ত্র আকাশ হইতে নির্মিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম শরীরও সেই প্রাণের চিন্তারূপ সূক্ষ্ম আকারে অভিব্যক্তির জন্য আকাশ হইতে—আকাশের সূক্ষ্মতর রূপ হইতে নির্মিত হইয়াছে। অতএব প্রথমে এই স্থূল শরীর, তারপর সূক্ষ্ম শরীর, তারপর জীব বা আত্মা—উহাই যথার্থ মানব। যেমন আমাদের নখ বৎসরে শতবার কাটিয়া ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু উহা আমাদের শরীরেরই অংশ, উহা হইতে পৃথক্ নয়, তেমনি আমাদের শরীর দুইটি নয়। মানুষের একটি সূক্ষ্ম শরীর আর একটি স্থূল শরীর আছে, তাহা নয়; শরীর একই, তবে সূক্ষ্মাকারে উহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল থাকে, আর স্থূলটি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। যেমন আমি বৎসরে শতবার এই নখ কাটিয়া ফেলিতে পারি, সেরূপ এক যুগে আমি লক্ষ লক্ষ স্থূল শরীর ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর থাকিয়া যাইবে। দ্বৈতবাদীদের মতে এই জীব অর্থাৎ যথার্থ ‘মানুষ’ সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম।

এতদূর পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, মানুষের আছে প্রথমতঃ এই স্থূল শরীর, যাহা অতি শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তারপর সূক্ষ্ম শরীর—উহা যুগযুগ ধরিয়া বর্তমান থাকে, তারপর জীবাত্মা। বেদান্তদর্শনের মতে ঈশ্বর যেমন নিত্য, এই জীবও সেইরূপ নিত্য, আর প্রকৃতিও নিত্য, তবে উহা প্রবাহরূপে নিত্য। প্রকৃতির উপাদান আকাশ ও প্রাণ নিত্য, কিন্তু অনন্ত কাল ধরিয়া উহারা বিভিন্ন আকারে পরিবর্তিত হইতেছে। জড় ও শক্তি নিত্য, কিন্তু উহাদের সমবায়সমূহ সর্বদা পরিবর্তনশীল। জীব—আকাশ বা প্রাণ কিছু হইতেই নির্মিত নয়, উহা অ-জড়, অতএব চিরকাল ধরিয়া উহা থাকিবে। উহা প্রাণ

ও আকাশের কোনরূপ সংযোগের ফল নয়, আর যাহা সংযোগের ফল নয়, তাহা কখন নষ্ট হইবে না; কারণ বিনাশের অর্থ সংযোগের বিশ্লেষণ। যে-কোন বস্তু যৌগিক নয়, তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না। স্থূল শরীর আকাশ ও প্রাণের নানারূপ সংযোগের ফল, সুতরাং উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে। সূক্ষ্ম শরীরও দীর্ঘকাল পরে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু জীব অযৌগিক পদার্থ, সুতরাং উহা কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। ঐ একই কারণে আমরা বলিতে পারি না, জীবের কোনকালে জন্ম হইয়াছে। কোন অযৌগিক পদার্থের জন্ম হইতে পারে না; কেবল যাহা যৌগিক, তাহারই জন্ম হইতে পারে।

লক্ষ কোটি প্রকারে মিশ্রিত এই সমগ্র প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও নিরাকার এবং তিনি দিবারাত্র এই প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন। সমগ্র প্রকৃতিই তাঁহার শাসনাধীনে রহিয়াছে। কোন প্রাণীর স্বাধীনতা নাই—থাকিতেই পারে না। তিনিই শাস্তা। ইহাই দ্বৈত বেদান্তের উপদেশ।

তারপর এই প্রশ্ন আসিতেছে: ঈশ্বর যদি এই জগতের শাস্তা হন, তবে তিনি কেন এমন কুৎসিত জগৎ সৃষ্টি করিলেন? কেন আমরা এত কষ্ট পাইব? ইহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়া থাকে: ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। আমাদের নিজেদের দোষেই আমরা কষ্ট পাইয়া থাকি। আমরা যেরূপ বীজ বপন করি, সেরূপ শস্যই পাইয়া থাকি। ঈশ্বর আমাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য কিছু করেন না। যদি কোন ব্যক্তি দরিদ্র, অন্ধ বা খঞ্জ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, বুঝিতে হইবে সে ঐভাবে জন্মিবার পূর্বে এমন কিছু করিয়াছিল, যাহা এইরূপ ফল প্রসব করিয়াছে। জীব চিরকাল বর্তমান আছে, কখন সৃষ্ট হয় নাই; চিরকাল ধরিয়া নানারূপ কার্য করিতেছে। আমরা যাহা কিছু করি, তাহারই ফলভোগ করিতে হয়। যদি শুভকর্ম করি, তবে আমরা সুখলাভ করিব, অশুভ কর্ম করিলে দুঃখভোগ করিতে হইবে। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধস্বভাব, তবে দ্বৈতবাদী বলেন, অজ্ঞান উহার স্বরূপকে আবৃত করিয়াছে। যেমন অসৎ কর্মের দ্বারা উহা নিজেকে অজ্ঞানে আবৃত করিয়াছে, তেমনি শুভকর্মের দ্বারা উহা নিজস্বরূপ পুনরায় জানিতে পারে। জীব যেমন নিত্য, তেমনই শুদ্ধ। প্রত্যেক জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ। যখন শুভকর্মের দ্বারা উহার পাপ ও অশুভ কর্ম ধৌত

হইয়া যায়, তখন জীব আবার শুদ্ধ হয়, আর যখন সে শুদ্ধ হয়, তখন সে মৃত্যুর পর দেবযান-পথে স্বর্গে বা দেবলোকে গমন করে। যদি সে সাধারণভাবে ভাল লোক হয়, সে পিতৃলোকে গমন করে।

স্থূলদেহের পতন হইলে বাগিন্দ্রিয় মনে প্রবেশ করে। বাক্য ব্যতীত চিন্তা করিতে পারা যায় না; যেখানেই বাক্য, সেখানেই চিন্তা বিদ্যমান। মন আবার প্রাণে লীন হয়, প্রাণ জীবে লয়প্রাপ্ত হয়; তখন দেহত্যাগ করিয়া জীব তাহার অতীত জীবনের কর্ম দ্বারা অর্জিত পুরস্কার বা শাস্তির যোগ্য এক অবস্থায় গমন করে। দেবলোক-অর্থে দেবগণের বাসস্থান। 'দেব' শব্দের অর্থ উজ্জ্বল বা প্রকাশস্বভাব—খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা যাহাকে এঞ্জেল (Angel) বলেন, 'দেব' বলিতে তাহাই বুঝায়। ইহাদের মতে—দান্তে তাঁহার 'ডিভাইন কমেডি' (Divine Comedy) কাব্যগ্রন্থে যেরূপ নানাবিধ স্বর্গলোকের বর্ণনা করিয়াছেন, কতকটা তাহারই মতো নানা প্রকার স্বর্গলোক আছে। যথা—পিতৃলোক, দেবলোক, চন্দ্রলোক, বিদ্যুল্লোক, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার স্থান। ব্রহ্মলোক ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতে জীব ইহলোকে ফিরিয়া আসিয়া আবার নর-জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু যিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তিনি সেখানে অনন্তকাল ধরিয়া বাস করেন। যে-সকল শ্রেষ্ঠ মানব সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়াছেন, যাঁহারা সমুদয় বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা ও তদীয় প্রেমে নিমগ্ন হওয়া ব্যতীত আর কিছু করিতে চান না, তাঁহাদেরই এইরূপ শ্রেষ্ঠ গতি হয়। ইহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্নস্তরের দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা শুভকর্ম করেন বটে, কিন্তু সেজন্য পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা ঐ শুভকর্মের বিনিময়ে স্বর্গে যাইতে চান। মৃত্যুর পর তাঁহাদের জীবাত্মা চন্দ্রলোকে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে থাকেন। জীবাত্মা দেবতা হন। দেবগণ অমর নন, তাঁহাদিগকেও মরিতে হয়। স্বর্গেও সকলেই মরিবে। মৃত্যুশূন্য স্থান কেবল ব্রহ্মলোক, সেখানেই কেবল জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। আমাদের পুরাণে দৈত্যগণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সময়ে সময়ে দেবগণকে আক্রমণ করেন। সর্বদেশের পুরাণেই এই দেব-দৈত্যের সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে দৈত্যেরা দেবগণের উপর জয়লাভ করিয়া থাকে। সকল দেশের পুরাণে ইহাও পাওয়া যায় যে, দেবগণ

সুন্দরী মানব-দুহিতাদের ভালবাসে। দেবরূপে জীব কেবল তাঁহার অতীত কর্মের ফলভোগ করেন, কিন্তু কোন নূতন কর্ম করেন না। কর্ম-অর্থে যে-সকল কার্য ফলপ্রসব করিবে, সেইগুলি বুঝাইয়া থাকে, আবার ফলগুলিকেও বুঝাইয়া থাকে। মানুষের যখন মৃত্যু হয় এবং সে একটি দেব-দেহ লাভ করে, তখন সে কেবল সুখভোগ করে, নূতন কোন কর্ম করে না। সে তাহার অতীত শুভকর্মের পুরস্কার ভোগ করে মাত্র। কিন্তু যখন ঐ শুভকর্মের ফল শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার অন্য কর্ম ফলোন্মুখ হয়।

বেদে নরকের কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে পুরাণকারগণ—আমাদের পরবর্তী কালের শাস্ত্রকারগণ—ভাবিয়াছিলেন, নরক না থাকিলে কোন ধর্মই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহারা নানাবিধ নরক কল্পনা করিলেন। দান্তে তাঁহার 'নরকে' (Inferno) যত প্রকার শাস্তি কল্পনা করিয়াছেন, ইঁহারা ততপ্রকার, এমন কি, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রকার নরক-যন্ত্রণার কল্পনা করিলেন। তবে আমাদের শাস্ত্র দয়া করিয়া বলেন, এই শাস্তি কিছুকালের জন্য মাত্র। ঐ অবস্থায় অশুভ কর্মের ফলভোগ হইয়া উহা ক্ষয় হইয়া যায়, তখন জীবাত্মাগণ পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া আর একবার উন্নতি করিবার সুযোগ পায়। এই মানবদেহেই উন্নতিসাধনের বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়। এই মানবদেহকে 'কর্মদেহ' বলে, এই মানবদেহেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট স্থির করিয়া থাকি। আমরা একটি বৃহৎ বৃত্তপথে ভ্রমণ করিতেছি, আর মানবদেহই সেই বৃত্তের মধ্যে একটি বিন্দু, যেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। এই কারণেই অন্যান্য সর্বপ্রকার দেহ অপেক্ষা মানবদেহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দেবগণ অপেক্ষাও মানুষ মহত্তর। দেবগণও মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই পর্যন্ত দ্বৈত-বেদান্তের আলোচনা।

তারপর বেদান্ত-দর্শনের আর এক উচ্চতর ধারণা আছে—সেদিক হইতে দেখিলে এগুলি অপরিণত ভাব। যদি বলেন ঈশ্বর অনন্ত, জীবাত্মাও অনন্ত এবং প্রকৃতিও অনন্ত, তবে এইরূপ অনন্তের সংখ্যা আপনি যত ইচ্ছা বাড়াইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ করা অযৌক্তিক ; কারণ এই 'অনন্ত'গুলি পরস্পরকে সসীম করিয়া ফেলিবে এবং প্রকৃত অনন্ত বলিয়া কিছু থাকিবে না। ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত- ও উপাদান-কারণ ; তিনি নিজের ভিতর হইতে এই জগৎ

বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়াছেন। এ-কথার অর্থ কি এই যে, ঈশ্বরই এই দেওয়াল, এই টেবিল, এই পশু, এই হত্যাকারী এবং জগতের যা কিছু মন্দ সব হইয়াছেন? ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপ; তিনি কিরূপে এ-সকল মন্দ জিনিস হইতে পারেন?—না, তিনি এ-সব হন নাই। ঈশ্বর অপরিণামী, এ-সকল পরিণাম প্রকৃতিতে; —যেমন আমি অপরিণামী আত্মা, অথচ আমার দেহ আছে। এক অর্থে—এই দেহ আমা হইতে পৃথক্ নয়, কিন্তু আমি—যথার্থ আমি কখনই দেহ নই। আমি কখন বালক, কখন যুবা, কখন বা বৃদ্ধ হইতেছি, কিন্তু উহাতে আমার আত্মার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। উহা যে আত্মা, সেই আত্মাই থাকে। এইরূপে প্রকৃতি এবং অনন্ত-আত্মা-সমন্বিত এই জগৎ যেন ঈশ্বরের অনন্ত শরীর। তিনি ইহার সর্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছেন। তিনি একমাত্র অপরিণামী। কিন্তু প্রকৃতি পরিণামী এবং আত্মাগুলিও পরিণামী। প্রকৃতির কিরূপ পরিণাম হয়? প্রকৃতির রূপ বা আকার ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে, উহা নূতন নূতন আকার ধারণ করিতেছে। কিন্তু আত্মাতো এইরূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে পারে না। উহাদের কেবল জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশ হয়। প্রত্যেক আত্মাই অশুভ কর্ম দ্বারা সঙ্কোচ-প্রাপ্ত হয়। যে-সকল কার্যের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান ও পবিত্রতা সঙ্কুচিত হয়, সেগুলিকেই 'অশুভ কর্ম' বলে। যে-সকল কর্ম আবার আত্মার স্বাভাবিক মহিমা প্রকাশ করে, সেগুলিকে 'শুভ কর্ম' বলে। সকল আত্মাই শুদ্ধস্বভাব ছিল, কিন্তু নিজ নিজ কর্মদ্বারা সঙ্কোচ-প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি ঈশ্বরের কৃপায় ও শুভকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহারা আবার বিকাশপ্রাপ্ত হইবে ও পুনরায় শুদ্ধস্বরূপ হইবে। প্রত্যেক জীবাত্মার মুক্তিলাভের সমান সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে এবং কালে সকলেই শুদ্ধস্বরূপ হইয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই জগৎ শেষ হইয়া যাইবে না, কারণ উহা অনন্ত। ইহাই বেদান্তের দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। প্রথমোক্তটিকে 'দ্বৈত বেদান্ত' বলে; আর দ্বিতীয়টি—যাহার মতে ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি আছেন, আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহস্বরূপ আর ঐ তিনে মিলিয়া এক—ইহাকে 'বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত' বলে। আর এই মতাবলম্বিগণকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলে।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মত অদ্বৈতবাদ। এই মতেও ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্ত- ও উপাদান-কারণ দুই-ই। সুতরাং ঈশ্বর এই সমগ্র জগৎ হইয়াছেন।

'ঈশ্বর আত্মা-স্বরূপ আর জগৎ যেন তাঁহার দেহস্বরূপ, আর সেই দেহের পরিণাম হইতেছে'—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদী স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, তবে আর ঈশ্বরকে এই জগতের উপাদান-কারণ বলিবার কি প্রয়োজন? উপাদানকারণ অর্থে যে-কারণটি কার্যরূপ ধারণ করিয়াছে। কার্য কারণের রূপান্তর বই আর কিছুই নয়। যেখানেই কার্য দেখা যায়, সেখানেই বুঝিতে হইবে, কারণই রূপান্তরিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। যদি জগৎ কার্য হয়, আর ঈশ্বর কারণ হন, তবে এই জগৎ অবশ্যই ঈশ্বরের রূপান্তরমাত্র। যদি বলা হয়, জগৎ ঈশ্বরের শরীর, আর ঐ দেহ সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মাকার ধারণ করিয়া কারণ হয় এবং পরে আবার সেই কারণ হইতে জগতের বিকাশ হয়, তাহাতে অদ্বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর স্বয়ংই এই জগৎ হইয়াছেন। এখন একটি অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসিতেছে। যদি ঈশ্বর এই জগৎ হইয়া থাকেন, তবে সবই ঈশ্বর। অবশ্য সবই ঈশ্বর। আমার দেহও ঈশ্বর, আমার মনও ঈশ্বর, আমার আত্মাও ঈশ্বর। তবে এত জীব কোথা হইতে আসিল? ঈশ্বর কি লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়াছেন? সেই অনন্ত শক্তি, সেই অনন্ত পদার্থ, জগতের সেই এক সত্তা কিরূপে বিভক্ত হইতে পারেন? অনন্তকে বিভাগ করা অসম্ভব। তবে কিভাবে সেই শুদ্ধসত্তা (সৎস্বরূপ) এই জগৎ হইলেন? যদি তিনি জগৎ হইয়া থাকেন, তবে তিনি পরিণামী, পরিণামী হইলেই তিনি প্রকৃতির অন্তর্গত, যাহা কিছু প্রকৃতির অন্তর্গত তাহারই জন্মমৃত্যু আছে। যদি ঈশ্বর পরিণামী হন, তবে তাঁহারও একদিন মৃত্যু হইবে। এইটি মনে রাখিবেন। আর একটি প্রশ্ন: ঈশ্বরের কতখানি এই জগৎ হইয়াছে? যদি বলেন, ঈশ্বরের 'ক' অংশ জগৎ হইয়াছে, তবে ঈশ্বর = 'ঈশ্বর' − ক; অতএব সৃষ্টির পূর্বে তিনি যে ঈশ্বর ছিলেন, এখন আর সে ঈশ্বর নাই; কারণ তাঁহার কিছুটা অংশ জগৎ হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদীর উত্তর এই যে, এই জগতের বাস্তবিক সত্তা নাই, ইহার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র। এই দেবতা, স্বর্গ, জন্মমৃত্যু, অনন্তসংখ্যক আত্মা আসিতেছে, যাইতেছে—এই-সবই কেবল স্বপ্নমাত্র। সমুদয়ই সেই এক অনন্তস্বরূপ। একই সূর্য বিবিধ জলবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপ দেখাইতেছে। লক্ষ লক্ষ জলকণাতে লক্ষ লক্ষ সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, আর প্রত্যেক জলকণাতেই সূর্যের সম্পূর্ণ প্রতিমূর্তি

রহিয়াছে; কিন্তু সূর্য প্রকৃতপক্ষে একটি। এই-সকল জীব সম্বন্ধেও সেই কথা—তাহারা সেই এক অনন্ত পুরুষের প্রতিবিম্বমাত্র। স্বপ্ন কখন সত্য ব্যতীত থাকিতে পারে না, আর সেই সত্য—সেই এক অনন্ত সত্তা। শরীর, মন বা জীবাত্মাভাবে ধরিলে আপনি স্বপ্নমাত্র, কিন্তু আপনার যথার্থ স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। অদ্বৈতবাদী ইহাই বলেন। এই-সব জন্ম, পুনর্জন্ম, এই আসা-যাওয়া—এ-সব সেই স্বপ্নের অংশমাত্র। আপনি অনন্তস্বরূপ। আপনি আবার কোথায় যাইবেন? সূর্য, চন্দ্র ও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আপনার যথার্থ স্বরূপের নিকট একটি বিন্দুমাত্র। আপনার আবার জন্মমরণ কিরূপে হইবে? আত্মা কখন জন্মান নাই, কখন মরিবেনও না; আত্মার কোন কালে পিতামাতা, শত্রু-মিত্র কিছুই নাই; কারণ আত্মা অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

অদ্বৈত বেদান্তের মতে মানুষের চরম লক্ষ্য কি?—এই জ্ঞানলাভ করা ও জগতের সহিত এক হইয়া যাওয়া। যাঁহারা এই অবস্থা লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সমুদয় স্বর্গ, এমন কি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, এই-সমুদয় স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, আর তাঁহারা নিজদিগকে জগতের নিত্য ঈশ্বর বলিয়া দেখিতে পান। তাঁহারা তাঁহাদের যথার্থ 'আমিত্ব' লাভ করেন—আমরা এখন যে ক্ষুদ্র অহংকে এত বড় একটা জিনিস বলিয়া মনে করিতেছি, উহা তাহা হইতে অনেক দূরে। আমিত্ব নষ্ট হইবে না—অনন্ত ও সনাতন আমিত্ব লাভ হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখবোধ আর থাকিবে না। আমরা এখন এই ক্ষুদ্র দেহে এই ক্ষুদ্র আমিকে লইয়া সুখ পাইতেছি। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের নিজেদের দেহ বলিয়া বোধ হইবে, তখন আমরা কত অধিক সুখ পাইব? এই পৃথক্ পৃথক্ দেহে যদি এত সুখ থাকে, তবে যখন সকল দেহ এক হইয়া যাইবে, তখন আরও কত অধিক সুখ! যে ব্যক্তি ইহা অনুভব করিয়াছে, সে-ই মুক্তিলাভ করিয়াছে, সে এই স্বপ্ন কাটাইয়া তাহার পারে চলিয়া গিয়াছে, নিজের যথার্থ স্বরূপ জানিয়াছে। ইহাই অদ্বৈত-বেদান্তের উপদেশ।

বেদান্তদর্শন একটির পর একটি এই সোপানত্রয় অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, আর আমরা ঐ তৃতীয় সোপান অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারি না, কারণ আমরা একত্বের পর আর যাইতে পারি না।

যাহা হইতে জগতের সব কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পূর্ণ একত্ব
বেশী আমরা আর যাইতে পারি না। এই অদ্বৈতবাদ সকলে
পারে না; সকলের দ্বারা গৃহীত হইবার পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন
বুদ্ধিবিচারের দ্বারা এই তত্ত্ব বুঝা অতিশয় কঠিন। ইহা বুঝিতে
বুদ্ধির প্রয়োজন, নির্ভীক বোধশক্তির প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ উহা অধিকাংশ ব্যক্তিরই উপযোগী নয়।

এই তিনটি সোপানের মধ্যে প্রথমটি হইতে আরম্ভ করা ভাল। ঐ প্রথম সোপানটির সম্বন্ধে চিন্তাপূর্বক ভাল করিয়া বুঝিলে দ্বিতীয়টি আপনিই খুলিয়া যাইবে। যেমন একটি জাতি ধীরে ধীরে উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হয়, ব্যক্তিকেও সেইরূপ করিতে হয়। ধর্মজ্ঞানের উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিতে মানবজাতিকে যে-সকল সোপান অবলম্বন করিতে হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেও তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল প্রভেদ এই যে, সমগ্র মানবজাতির এক সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ লাগিয়াছে, কিন্তু ব্যক্তি মানব কয়েক বর্ষের মধ্যেই মানবজাতির সমগ্র জীবন যাপন করিয়া ফেলিতে পারেন, অথবা আরও শীঘ্র—হয়তো ছয় মাসের মধ্যেই পারেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককেই এই সোপানগুলির মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা যখন ঘোর দ্বৈতবাদী ছিলেন, নিজেদের জীবনের সেই সময়ের কথা অবশ্যই মনে করিতে পারেন। যখনই আপনারা নিজদিগকে দেহ ও মন বলিয়া ভাবেন, তখন আপনাদিগকে এই স্বপ্নের সমগ্রটাই লইতে হইবে। একটি ভাব লইলেই সমুদয়টি লইতে হইবে। যে ব্যক্তি বলে, জগৎ রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, সে নির্বোধ; কারণ যদি জগৎ থাকে, তবে জগতের একটা কারণও থাকিবে, আর সেই কারণের নামই ঈশ্বর। কার্য থাকিলেই তাহার কারণ আছে, অবশ্য জানিতে হইবে। যখন জগৎ অন্তর্হিত হইবে, তখনই ঈশ্বরও অন্তর্হিত হইবেন। যখন আপনি ঈশ্বরের সহিত নিজ একত্ব অনুভব করিবেন, তখন আপনার পক্ষে আর এই জগৎ থাকিবে না। কিন্তু যতদিন এই স্বপ্ন আছে, ততদিন আমরা আমাদিগকে জন্মমৃত্যুশীল বলিয়া মনে করিতে বাধ্য, কিন্তু যখনই 'আমরা দেহ'—এই স্বপ্ন অন্তর্হিত হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে 'আমরা জন্মাইতেছি ও মরিতেছি'—এ স্বপ্নও অন্তর্হিত হইবে, এবং 'একটা জগৎ আছে'—এই স্বপ্নও চলিয়া যাইবে।

যাহাকে আমরা এখন এই জগৎ বলিয়া দেখিতেছি, তাহাই আমাদের নিকট ঈশ্বর বলিয়া প্রতিভাত হইবে এবং যে-ঈশ্বরকে এতদিন আমরা বাহিরে অবস্থিত বলিয়া জানিতেছিলাম, তিনিই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মারূপে প্রতীত হইবেন। অদ্বৈতবাদের শেষ কথা 'তত্ত্বমসি'—তাহাই তুমি।

ধর্ম-সমীক্ষা

ধর্ম কি ?

রেল লাইনের উপর দিয়া একখানা প্রকাণ্ড ইঞ্জিন সশব্দে চলিয়াছে ; একটি ক্ষুদ্র কীট লাইনের উপর দিয়া চলিতেছিল, গাড়ি আসিতেছে জানিতে পারিয়া সে আস্তে আস্তে রেল লাইন হইতে সরিয়া গিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইল। যদিও ঐ ক্ষুদ্র কীটটি এতই নগণ্য যে, গাড়ির চাপে যে-কোন মুহূর্তে নিষ্পেষিত হইতে পারে, তথাপি সে একটা জীব—প্রাণবান্ বস্তু ; আর এত বৃহৎ, এত প্রকাণ্ড ইঞ্জিনটি একটা যন্ত্র মাত্র। আপনারা বলিবেন, একটির জীবন আছে, আর একটি জীবনহীন জড়মাত্র—উহার শক্তি, গতি ও বেগ যতই প্রবল হউক না কেন, উহা প্রাণহীন জড় যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ঐ ক্ষুদ্র কীটটি যে রেলের উপর দিয়া চলিতেছিল এবং ইঞ্জিনের স্পর্শমাত্রেই যাহার নিশ্চিত মৃত্যু হইত, সে ঐ প্রকাণ্ড রেলগাড়িটির তুলনায় মহিমাসম্পন্ন। উহা যে সেই অনন্ত ঈশ্বরেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এবং সেইজন্য এই শক্তিশালী ইঞ্জিন অপেক্ষাও মহৎ। কেন উহার এই মহত্ত্ব হইল ? জড় ও প্রাণীর পার্থক্য আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি ? যন্ত্রকর্তা যন্ত্রটি যেরূপে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করিয়া নির্মাণ করিয়াছিল, যন্ত্র সেইটুকু কার্যই সম্পাদন করে, যন্ত্রের কার্যগুলি জীবন্ত প্রাণীর কার্যের মতো নয়। তবে জীবন্ত ও প্রাণহীনের মধ্যে প্রভেদ কিরূপে করা যাইবে ? জীবিত প্রাণীর স্বাধীনতা আছে, জ্ঞান আছে, আর মৃত জড়বস্তু কতকগুলি নিয়মের গণ্ডিতে বদ্ধ এবং তাহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহার জ্ঞান নাই। যে-স্বাধীনতা থাকায় যন্ত্র হইতে আমাদের বিশেষত্ব—সেই মুক্তিলাভের জন্যই আমরা সকলে চেষ্টা করিতেছি। অধিকতর মুক্ত হওয়াই আমাদের সকল চেষ্টার উদ্দেশ্য, কারণ শুধু পূর্ণ মুক্তিতেই পূর্ণত্ব লাভ হইতে পারে। আমরা জানি বা না জানি, মুক্তিলাভ করিবার এই চেষ্টাই সর্বপ্রকার উপাসনা-প্রণালীর ভিত্তি।

জগতে যত প্রকার উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত আছে, সেইগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, অতি অসভ্যজাতিরা ভূত, প্রেত ও পূর্বপুরুষদের আত্মার উপাসনা করিয়া থাকে। সর্পপূজা, পূর্বপুরুষদিগের আত্মার উপাসনা, উপজাতীয় দেবগণের উপাসনা—এগুলি লোকে কেন করিয়া থাকে ? কারণ

লোকে অনুভব করে যে, কোন অজ্ঞাত উপায়ে এই দেবগণ ও পূর্বপুরুষেরা তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা অনেক বড়, বেশী শক্তিশালী এবং তাহাদের স্বাধীনতা সীমিত করিতেছেন। সুতরাং অসভ্যজাতিরা এই-সকল দেবতা ও পূর্বপুরুষকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করে, যাহাতে তাঁহারা তাহাদের কোন উৎপীড়ন না করিতে পারেন অর্থাৎ যাহাতে তাহারা অধিকতর স্বাধীনতালাভ করিতে পারে। তাহারা ঐ-সকল দেবতা ও পূর্বপুরুষের পূজা করিয়া তাঁহাদের কৃপা লাভ করিতে প্রয়াসী এবং যে-সকল বস্তু মানুষের নিজের পুরুষকারের দ্বারা উপার্জন করা উচিত, সেগুলি ঈশ্বরের বরস্বরূপ পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে। মোটের উপর এই-সকল উপাসনা-প্রণালী আলোচনা করিয়া ইহাই উপলব্ধি হয় যে, সমগ্র জগৎ একটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আশা করিতেছে। এই আশা আমাদিগকে কখনই একেবারে পরিত্যাগ করে না, আর আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, আমরা সকলেই অদ্ভুত ও অসাধারণ ব্যাপারগুলির দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছি। জীবনের অর্থ ও রহস্যের অবিরাম অনুসন্ধান ছাড়া মন বলিতে আর কি বুঝায়? আমরা বলিতে পারি, অশিক্ষিত লোকেরাই এই আজগুবির অনুসন্ধানে ব্যস্ত, কিন্তু তাহারাই বা কেন উহার অনুসন্ধান করিবে—এ প্রশ্ন তো আমরা সহজে এড়াইতে পারিব না। ইহুদীরা অলৌকিক ঘটনা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। ইহুদীদের মতো সমগ্র জগৎই হাজার হাজার বর্ষ ধরিয়া এইরূপ অলৌকিক বস্তু দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছে। আবার দেখুন, জগতে সকলের ভিতরেই একটা অসন্তোষের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একটা আদর্শ গ্রহণ করি, কিন্তু উহার দিকে তাড়াহুড়া করিয়া অগ্রসর হইয়া অর্ধপথ পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই নূতন আর একটা আদর্শ ধরিয়া বসিলাম। নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে যাইবার জন্য কঠোর চেষ্টা করি, কিন্তু তারপর বুঝিলাম, উহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। বারবার আমাদের এইরূপ অসন্তোষের ভাব আসিতেছে, কিন্তু যদি শুধু অসন্তোষই আসিতে থাকে, তাহা হইলে আমাদের মনের কি অবস্থা হয়? এই সর্বজনীন অসন্তোষের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই—মুক্তিই মানুষের চিরন্তন লক্ষ্য। যতদিন না মানুষ এই মুক্তিলাভ করিতেছে, ততদিন সে মুক্তি খুঁজিবেই। তাহার সমগ্র জীবনই এই মুক্তিলাভের চেষ্টা মাত্র। শিশু জন্মিয়াই নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

শিশুর প্রথম শব্দস্ফুরণ হইতেছে ক্রন্দন—যে-বন্ধনের মধ্যে সে নিজেকে আবদ্ধ দেখে, তাহার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। মুক্তির এই আকাঙ্ক্ষা হইতেই এই ধারণা জন্মে যে, এমন একজন পুরুষ অবশ্যই আছেন, যিনি সম্পূর্ণ মুক্তস্বভাব। ঈশ্বর-ধারণাই মানুষের প্রকৃতির মূল উপাদান। বেদান্তে সচ্চিদানন্দই মানবমনের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সর্বোচ্চ ধারণা। ঈশ্বর চিদ্‌ঘন ও স্বভাবতই আনন্দঘন। আমরা অনেক দিন ধরিয়া ঐ অন্তরের বাণীকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, নিয়ম বা বিধি অনুসরণ করিয়া মনুষ্যপ্রকৃতির স্ফূর্তিতে বাধা দিবার প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার সহজাত প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে আছে। আমরা ইহার অর্থ না বুঝিতে পারি, কিন্তু অজ্ঞাতসারে আমাদের মানবীয় ভাবের সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের, নিম্নস্তরের মনের সহিত উচ্চতর মনের সংগ্রাম চলিয়াছে এবং এই সংগ্রাম নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব—যাহাকে আমরা আমাদের আমিত্ব বা 'ব্যক্তিত্ব' বলি—রক্ষা করিবার একটা চেষ্টা।

এমনকি নরকও এই অদ্ভুত সত্য প্রকাশ করে যে, আমরা জন্ম হইতেই বিদ্রোহী এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম সত্য—জীবনীশক্তির চিহ্ন এই যে, আমরা বিদ্রোহ করি এবং বলিয়া উঠি—'কোনরূপ নিয়ম মানিয়া আমরা চলিব না'। যতদিন আমরা প্রকৃতির নিয়মাবলী মানিয়া চলি, ততদিন আমরা যন্ত্রের মতো—ততদিন জগৎপ্রবাহ নিজ গতিতে চলিতে থাকে, উহার শৃঙ্খল আমরা ভাঙিতে পারি না। নিয়মই মানুষের প্রকৃতিগত হইয়া যায়। যখনই আমরা প্রকৃতির এই বন্ধন ভাঙিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করি, তখনই উচ্চস্তরের জীবনের প্রথম ইঙ্গিত বা চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 'মুক্তি, অহো মুক্তি! মুক্তি, অহো মুক্তি!'—আত্মার অন্তস্তল হইতে এই সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে। বন্ধন—হায়, প্রকৃতির শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াই জীবনের অদৃষ্ট বা পরিণাম বলিয়া মনে হয়।

অতিপ্রাকৃত শক্তিলাভের জন্য সর্প ও ভূতপ্রেতের উপাসনা এবং বিভিন্ন ধর্মমত ও সাধন-প্রণালী থাকিবে কেন? বস্তুর সত্তা আছে, জীবন আছে—এ-কথা আমরা কেন বলি? এই-সব অনুসন্ধানের জীবন বুঝিবার এবং সত্তা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে। ইহা অর্থহীন ও বৃথা হইতে পারে না। ইহা মানুষের মুক্তিলাভের নিরন্তর চেষ্টা। যে বিদ্যাকে

আমরা এখন 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করি, তাহা সহস্র সহস্র বর্ষ যাবৎ মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, এবং মানুষ এই মুক্তিই চায়। তথাপি প্রকৃতির ভিতর তো মুক্তি নাই। ইহা নিয়ম—কেবল নিয়ম। তথাপি মুক্তির চেষ্টা চলিয়াছে। শুধু তাই নয়, সূর্য হইতে আরম্ভ করিয়া পরমাণুটি পর্যন্ত সমুদয় প্রকৃতিই নিয়মাধীন—এমনকি মানুষেরও স্বাধীনতা নাই। কিন্তু আমরা এ-কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা প্রথম হইতেই প্রকৃতির নিয়মাবলী আলোচনা করিয়া আসিতেছি, তথাপি আমরা উহা বিশ্বাস করিতে পারি না; শুধু তাই নয়, বিশ্বাস করিব না যে, মানুষ নিয়মের অধীন। আমাদের আত্মার অন্তস্তল হইতে প্রতিনিয়ত 'মুক্তি! মুক্তি!'—এই ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। নিত্যমুক্ত সত্তারূপে ঈশ্বরের ধারণা করিলে মানুষ অনন্তকালের জন্য এই বন্ধনের মধ্যে শান্তি পাইতে পারে না। মানুষকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতেই হইবে, আর এ চেষ্টা যদি তাহার নিজের জন্য না হইত, তবে সে এই চেষ্টাকে এক অতি কঠোর ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। মানুষ নিজের দিকে তাকাইয়া বলিয়া থাকে, 'আমি জন্মাবধি ক্রীতদাস, আমি বদ্ধ; তাহা হইলেও এমন একজন পুরুষ আছেন, যিনি প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ নন—তিনি নিত্যমুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু।'

সুতরাং বন্ধনের ধারণা যেমন মনের অচ্ছেদ্য ও মূল অংশ, ঈশ্বরধারণাও তদ্রূপ প্রকৃতিগত ও অচ্ছেদ্য। এই মুক্তির ভাব হইতেই উভয়ের উদ্ভব। এই মুক্তির ভাব না থাকিলে উদ্ভিদের ভিতরও জীবনীশক্তি থাকিতে পারে না। উদ্ভিদ অথবা কীটের ভিতর ঐ জীবনীশক্তিকে ব্যষ্টিগত ধারণার স্তরে উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অজ্ঞাতসারে ঐ মুক্তির চেষ্টা উহাদের ভিতর কার্য করিতেছে, উদ্ভিদ্ জীবনধারণ করিতেছে—ইহার বৈচিত্র্য, নীতি ও রূপ রক্ষা করিবার জন্য, প্রকৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য নয়। প্রকৃতি উন্নতির প্রত্যেকটি সোপান নিয়মিত করিতেছে—এইরূপ ধারণা করিলে মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাবটি একেবারে উড়াইয়া দিতে হয়। জড়জগতের ভাব আগাইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির ধারণাও আগাইয়া চলিয়াছে। তথাপি ক্রমাগত সংগ্রাম চলিতেছে। আমরা বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের বিবাদের কথা শুনিতেছি, কিন্তু মত ও সম্প্রদায়গুলি ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক, উহারা থাকিবেই। শৃঙ্খল যতই দীর্ঘ হইতেছে, দ্বন্দ্বও স্বাভাবিকভাবে ততই

বাড়িতেছে, কিন্তু যদি আমরা শুধু জানি যে, আমরা সকলে সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা হইলে বিবাদের আর প্রয়োজন থাকে না।

মুক্তি বা স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ—প্রকৃতির প্রভুকে আমরা 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকি। আপনারা তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারেন না। তাহার কারণ মুক্তির ভাব ব্যতীত আপনারা এক মুহূর্তও চলাফেরা বা জীবনধারণ করিতে পারেন না। যদি আপনারা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, তবে কি কখনও এখানে আসিতেন? খুব সম্ভব, প্রাণিতত্ত্ববিৎ এই মুক্ত হইবার অবিরাম চেষ্টার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং দিবেন। এ-সবই মানিয়া লইতে পারেন, তথাপি ঐ মুক্তির ভাবটি আমাদের ভিতর থাকিয়া যাইতেছে। 'আপনারা প্রকৃতির অধীন'—এই ভাবটি যেমন আপনারা অতিক্রম করিতে পারেন না, তেমনি এই মুক্তির ভাবটিও সত্য।

বন্ধন ও মুক্তি, আলো ও ছায়া, ভাল ও মন্দ—এ দ্বন্দ্ব থাকিবেই। বুঝিতে হইবে, যেখানেই কোন প্রকার বন্ধন, তাহার পশ্চাতে মুক্তিও গুপ্তভাবে রহিয়াছে। একটি যদি সত্য হয়, তবে অপরটিও তেমনি সত্য হইবে। এই মুক্তির ধারণা অবশ্যই থাকিবে। আমরা অশিক্ষিত ব্যক্তির ভিতর বন্ধনের ধারণা দেখিতে পাই, এবং ঐ ধারণাকে মুক্তির চেষ্টা বলিয়া এখন বুঝিতে পারি না, তথাপি ঐ মুক্তির ভাব তাহার ভিতর রহিয়াছে। অশিক্ষিত বর্বর মানুষের মনে পাপ ও অপবিত্রতার বন্ধনের চেতনা অতি অল্প, কারণ তাহার প্রকৃতি পশুভাব অপেক্ষা বড় বেশী উন্নত নয়। সে দৈহিক বন্ধন, দেহ-সম্ভোগের অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্তু এই নিম্নতর চেতনা হইতে ক্রমে মানসিক বা নৈতিক বন্ধনের উচ্চতর ধারণা ও আধ্যাত্মিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং বৃদ্ধি পায়। এখানে আমরা দেখিতে পাই, সেই ঈশ্বরীয় ভাব অজ্ঞানাবরণের মধ্য দিয়া ক্ষীণভাবে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমতঃ ঐ আবরণ অতিশয় ঘন থাকে এবং সেই দিব্যজ্যোতি প্রায় আচ্ছাদিত থাকিতে পারে, কিন্তু সেই জ্যোতি—সেই মুক্তি ও পূর্ণতার উজ্জ্বল অগ্নি সদা পবিত্র ও অনির্বাণ রহিয়াছে। মানুষ এই দিব্যজ্যোতিকে বিশ্বের নিয়ন্তা, একমাত্র মুক্ত পুরুষের প্রতীক বলিয়া ধারণা করে। সে তখনও জানে না যে, সমগ্র বিশ্ব এক অখণ্ড বস্তু—প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, ধারণার তারতম্যে।

সমগ্র প্রকৃতিই ঈশ্বরের উপাসনা-স্বরূপ। যেখানেই জীবন আছে, সেখানেই এই মুক্তির অনুসন্ধান এবং সেই মুক্তিই ঈশ্বর-স্বরূপ। এই মুক্তি দ্বারা অবশ্যই সমগ্র প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ হয় এবং জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব। আমরা যতই জ্ঞানী হই, ততই প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারি। প্রকৃতিকে বশ করিতে পারিলেই আমরা শক্তিসম্পন্ন হই; এবং যদি এমন কোন পুরুষ থাকেন, যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু, তাঁহার অবশ্য প্রকৃতির পূর্ণজ্ঞান থাকিবে, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ হইবেন। মুক্তির সঙ্গে এগুলি অবশ্য থাকিবে এবং যে ব্যক্তি এইগুলি লাভ করিয়াছেন, কেবল তিনিই প্রকৃতির পারে যাইতে পারিবেন।

বেদান্তে ঈশ্বরবিষয়ক যে-সকল তত্ত্ব আছে, সেগুলির মূলে পূর্ণ মুক্তি। এই মুক্তি হইতে প্রাপ্ত আনন্দ ও নিত্য শান্তি ধর্মের উচ্চতম ধারণা। ইহা সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা—যেখানে কোন কিছুর বন্ধন থাকিতে পারে না, যেখানে প্রকৃতি নাই, পরিবর্তন নাই, এমন কিছু নাই, যাহা তাঁহাতে কোন পরিণাম উৎপন্ন করিতে পারে। এই একই মুক্তি আপনার ভিতর, আমার ভিতর রহিয়াছে এবং ইহাই একমাত্র যথার্থ মুক্তি।

ঈশ্বর সর্বদাই নিজ মহিমময় অপরিণামী স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আপনি ও আমি তাঁহার সহিত এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আবার এদিকে বন্ধনের কারণীভূত প্রকৃতি প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার, ধন, নামযশ, মানবীয় প্রেম এবং এ-সব পরিণামী প্রাকৃতিক বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যখন প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, উহার প্রকাশ কিসের উপর নির্ভর করিতেছে? ঈশ্বরের প্রকাশেই প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, সূর্য চন্দ্র তারার প্রকাশে নয়। যেখানেই কোন বস্তু প্রকাশ পায়, সূর্যের আলোকেই হউক অথবা আমাদের চেতনাতেই হউক, উহা তিনিই। তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সব কিছু প্রকাশ পাইতেছে।

আমরা দেখিলাম, এই ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ; ইনি ব্যক্তি নন, অথচ সর্বজ্ঞ, প্রকৃতির জ্ঞাতা ও কর্তা, সকলের প্রভু। সকল উপাসনার মূলেই তিনি রহিয়াছেন; আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, তাঁহারই উপাসনা হইতেছে। শুধু তাহাই নয়, আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই—যাহা দেখিয়

সকলে আশ্চর্য হয়, যাহাকে আমরা মন্দ বলি, তাহাও ঈশ্বরেরই উপাসনা। তাহাও মুক্তিরই একটা দিকমাত্র। শুধু তাহাই নয়—আপনারা হয়তো আমার কথা শুনিয়া ভয় পাইবেন, কিন্তু আমি বলি, যখন আপনি কোন মন্দ কাজ করিতেছেন, ঐ প্রবৃত্তির পিছনেও রহিয়াছে সেই মুক্তি। ঐ প্রেরণা হয়তো ভুল পথে চলিয়াছে, কিন্তু প্রেরণা সেখানে রহিয়াছে। পিছনে মুক্তির প্রেরণা না থাকিলে কোনরূপ জীবন বা কোনরূপ প্রেরণাই থাকিতে পারে না। বিশ্বের স্পন্দনের মধ্যে এই মুক্তি প্রাণবন্ত হইয়া আছে। সকলের হৃদয়ে যদি একত্ব না থাকিত, তবে আমরা বহুত্বের ধারণাই করিতে পারিতাম না, উপনিষদে ঈশ্বরের ধারণা এইরূপ। সময়ে সময়ে এই ধারণা আরও উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে—উহা আমাদের সমক্ষে এমন এক আদর্শ স্থাপন করে, যাহা দেখিয়া আমরা প্রথমে একেবারে স্তম্ভিত হই। সেই আদর্শ এই—স্বরূপতঃ আমরা ভগবানের সহিত অভিন্ন। যিনি প্রজাপতির পক্ষের বিচিত্রবর্ণ এবং ফুটন্ত গোলাপকলি, তিনিই শক্তিরূপে চারাগাছ ও প্রজাপতিতে বিরাজমান। যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, তিনিই আমাদের মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার তেজ হইতেই জীবনের আবির্ভাব, আবার ভীষণ মৃত্যুও তাঁহারই শক্তি। তাঁহার ছায়াই মৃত্যু, আবার তাঁহার ছায়াই অমৃতত্ব। আরও এক উচ্চতর ধারণার কথা বলি। যাহা কিছু ভয়াবহ, তাহা হইতেই আমরা সকলে ব্যাধ-কর্তৃক অনুসৃত শশকের মতো পলায়ন করিতেছি এবং তাহাদের মতোই মাথা লুকাইয়া নিজেদের নিরাপদ ভাবিতেছি। সমগ্র জগৎই যাহা কিছু ভয়াবহ, তাহা হইতেই পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এক-সময়ে আমি কাশীতে একটা পথ দিয়া যাইতেছিলাম, উহার এক পাশে ছিল একটা প্রকাণ্ড জলাশয় ও অপর পাশে একটা উঁচু দেয়াল। মাটিতে অনেকগুলি বানর ছিল; কাশীর বানরগুলি দীর্ঘকায় জানোয়ার এবং অনেক সময় অশিষ্ট। এখন ঐ বানরগুলির মাথায় খেয়াল উঠিল যে, তাহারা আমাকে সেই রাস্তা দিয়া যাইতে দিবে না। তাহারা ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল এবং আমার নিকট আসিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিল। তাহারা আমার আরও কাছে আসিতে থাকায় আমি দৌড়াইতে লাগিলাম; কিন্তু যতই দৌড়াই, ততই তাহারা আরও নিকটে আসিয়া আমাকে কামড়াইতে লাগিল। বানরদের হাত এড়ানো অসম্ভব বোধ

হইল—এমন সময় হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক আমাকে ডাক দিয়া বলিল, 'বানরগুলির সম্মুখীন হও।' আমি ফিরিয়া যেমন তাহাদের দিকে মুখ করয়িা দাঁড়াইলাম, অমনি তাহারা পিছু হটিয়া পলাইল। সমগ্র জীবন আমাদের এই শিক্ষা পাইতে হইবে—যাহা কিছু ভয়ানক, তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে, সাহসের সহিত উহা রুখিতে হইবে। জীবনের দুঃখকষ্টের ভয়ে না পলাইয়া সম্মুখীন হইলেই বানরদলের মতো সেগুলি হটিয়া যায়। যদি আমাদিগকে কখন মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়, তবে প্রকৃতিকে জয় করিয়াই উহা লাভ করিব, প্রকৃতি হইতে পলায়ন করিয়া নয়। কাপুরুষেরা কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। যদি আমরা চাই—ভয় কষ্ট ও অজ্ঞান আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাক, তাহা হইলে আমাদিগকে ঐগুলির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে।

মৃত্যু কি? ভয় কাহাকে বলে? এই-সকলের ভিতর কি ভগবানের মুখ দেখিতেছ না? দুঃখ ভয় ও কষ্ট হইতে দূরে পলায়ন কর, দেখিবে সেগুলি তোমাকে অনুসরণ করিবে। এগুলির সম্মুখীন হও, তবেই তাহারা পলাইবে। সমগ্র জগৎ সুখ ও আরামের উপাসক; যাহা দুঃখকর, তাহার উপাসনা করিতে খুব অল্প লোকেই সাহস করে। সুখ ও দুঃখ উভয়কে অতিক্রম করাই মুক্তির ভাব। মানুষ এই দ্বার অতিক্রম না করিলে মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের সকলকেই এগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের দেহ—প্রকৃতি, ভগবান্ ও আমাদের মধ্যে আসিয়া আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়াছে। আমাদিগকে বজ্রের মধ্যে, লজ্জা দুঃখ দুর্বিপাক ও পাপতাপের মধ্যে তাঁহাকে উপাসনা করিতে ও ভালবাসিতে শিখিতে হইবে। সমগ্র জগৎ পুণ্যের ঈশ্বরকে চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছে। আমি একাধারে পুণ্য ও পাপের ঈশ্বরকে প্রচার করি। যদি সাহস থাকে, এই ঈশ্বরকে গ্রহণ কর—এই ঈশ্বরই মুক্তির একমাত্র পথ; তবেই সেই একত্বরূপ চরম সত্যে উপনীত হইতে পারিবে। তবেই একজন অপর অপেক্ষা বড়—এই ধারণা নষ্ট হইবে। যতই আমরা এই মুক্তির নিয়মের সন্নিহিত হই, ততই আমরা ঈশ্বরে শরণাগত হই, ততই আমাদের দুঃখকষ্ট চলিয়া যায়। তখন আমরা আর নরকের দ্বার হইতে স্বর্গদ্বারকে পৃথক্‌ভাবে দেখিব না, মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি করিয়া বলিব না,

'আমি জগতের যে-কোন প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ।' যতদিন আমরা সেই প্রভু ব্যতীত জগতে আর কাহাকেও না দেখি, ততদিন এই সব দুঃখকষ্ট আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে, এবং আমরা এই-সকল ভেদ দেখিব ; কারণ সেই ভগবানেই—সেই আত্মাতেই আমরা সকলে অভিন্ন, আর যতদিন না আমরা ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতেছি, ততদিন এই একত্বানুভূতি হইবে না।

একই বৃক্ষে সুন্দরপক্ষযুক্ত নিত্যসখাস্বরূপ দুইটি পক্ষী[1] রহিয়াছে—তাহাদের মধ্যে একটি বৃক্ষের অগ্রভাগে, অপরটি নিম্নে। নীচের সুন্দর পক্ষীটি বৃক্ষের স্বাদু ও কটু ফলগুলি ভক্ষণ করিতেছে—একবার একটি স্বাদু, পরমুহূর্তে আবার কটু ফল ভক্ষণ করিতেছে। যে মুহূর্তে পক্ষীটি কটু ফল খাইল, তাহার দুঃখ হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটি ফল খাইল এবং তাহাও যখন কটু লাগিল, তখন সে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল—অপর পক্ষীটি স্বাদু বা কটু কোন ফলই খাইতেছে না, নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া স্থির ধীর ভাবে বসিয়া আছে। তারপর বেচারা নীচের পাখিটি সব ভুলিয়া আবার স্বাদু ও কটু ফলগুলি খাইতে লাগিল ; অবশেষে অতিশয় কটু একটি ফল খাইল, কিছুক্ষণ থামিয়া আবার সেই উপরের মহিমময় পক্ষীটির দিকে চাহিয়া দেখিল। অবশেষে ঐ উপরের পক্ষীটির দিকে অগ্রসর হইয়া সে যখন তাহার খুব সন্নিহিত হইল, তখন সেই উপরের পক্ষীর অঙ্গজ্যোতিঃ আসিয়া তাহার অঙ্গে লাগিল ও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে তখন দেখিল, সে নিজেই উপরের পক্ষীতে রূপায়িত হইয়া গিয়াছে ; সে শান্ত, মহিমময় ও মুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং দেখিল—বৃক্ষে বরাবর একটি পক্ষীই রহিয়াছে। নীচের পক্ষীটি উপরের পক্ষীটির ছায়ামাত্র। অতএব আমরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, কিন্তু যেমন এক সূর্য লক্ষ শিশিরবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র সূর্যরূপে প্রতীত হয়, তেমনি ঈশ্বরও বহু জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হন। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অভিন্ন হইতে চাই, তবে প্রতিবিম্ব দূর হওয়া আবশ্যক। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ কখনও আমাদের তৃপ্তির সীমা হইতে পারে না। সেজন্যই কৃপণ অর্থের উপর অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে, দস্যু অপহরণ করে, পাপী পাপাচরণ করে, তোমরা দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা কর। সকলেরই এক উদ্দেশ্য।

---

১ মুণ্ডক উপ, ৩।১।১ ; শ্বেতাশ্ব. উপ., ৪।৬

এই মুক্তি লাভ করা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই পূর্ণতালাভের চেষ্টা করিতেছি। প্রত্যেকেই এই পূর্ণতা লাভ করিবে।

যে-ব্যক্তি পাপতাপের মধ্যে অন্ধকারে হাতড়াইতেছে, যে-ব্যক্তি নরকের পথ বাছিয়া লইয়াছে, সেও এই পূর্ণতালাভ করিবে, তবে তাহার কিছু বিলম্ব হইবে। আমরা তাহাকে উদ্ধার করিতে পারি না। ঐ পথে চলিতে চলিতে সে যখন কতকগুলি শক্ত আঘাত খাইবে, তখন ভগবানের দিকে ফিরিবে; অবশেষে ধর্ম, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা ও আধ্যাত্মিকতার পথ খুঁজিয়া পাইবে। সকলে অজ্ঞাতসারে যাহা করিতেছে, তাহাই আমরা জ্ঞাতসারে করিবার চেষ্টা করিতেছি। সেণ্ট পল এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন, 'তোমরা যে-ঈশ্বরকে অজ্ঞাতসারে উপাসনা করিতেছ, তাঁহাকেই আমি তোমাদের নিকট ঘোষণা করিতেছি।' সমগ্র জগৎকে এই শিক্ষা শিখিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এই-সব মতবাদ লইয়া কি হইবে, যদি এগুলি জীবনের এই একমাত্র লক্ষ্যে পৌঁছিতে সাহায্য না করে? আমরা যেন বিভিন্ন বস্তুতে ভেদ জ্ঞান দূর করিয়া সর্বত্র সমদর্শী হই—মানুষ নিজেকে সকল বস্তুতে দেখিতে শিখুক। আমরা যেন ঈশ্বর সম্বন্ধে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধারণা লইয়া ধর্মমত বা সম্প্রদায়সমূহের উপাসক আর না হই, এবং জগতের সকলের ভিতর তাঁহাকে দর্শন করি। আপনারা যদি ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে নিজেদের হৃদয়ে যাঁহাকে উপাসনা করিতেছেন, তাঁহাকেই সর্বত্র উপাসনা করিবেন।

প্রথমতঃ এ-সকল সঙ্কীর্ণ ধারণা ত্যাগ কর এবং প্রত্যেকের মধ্যে সেই ঈশ্বরকে দর্শন কর, যিনি সকল হাত দিয়া কার্য করিতেছেন, সকল পা দিয়া চলিতেছেন, সকল মুখ দিয়া খাইতেছেন। প্রত্যেক জীবে তিনি বাস করেন, সকল মন দিয়া তিনি মনন করেন। তিনি স্বতঃপ্রমাণ—আমাদের নিকট হইতেও নিকটতর। ইহা জানাই ধর্ম—ইহা জানাই বিশ্বাস। প্রভু কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই বিশ্বাস প্রদান করুন! আমরা যখন সমগ্র জগতের এই অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিব, তখন অমৃতত্ব লাভ করিব। প্রাকৃতিক দৃষ্টিতে দেখিলেও আমরা অমর, সমগ্র জগতের সহিত এক। যতদিন এ জগতে এক-জনও বাঁচিয়া থাকে, আমি তাহার মধ্যে জীবিত আছি। আমি এই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র ব্যষ্টি জীব নই, আমি সমষ্টিস্বরূপ। অতীতে যত প্রাণী জন্মিয়াছিল,

আমি তাহাদের সকলের জীবনস্বরূপ; আমিই বুদ্ধের, যীশুর ও মহম্মদের আত্মা। আমি সকল আচার্যের আত্মা, যে-সকল দস্যু অপহরণ করিয়াছে, যে-সকল হত্যাকারীর ফাঁসি হইয়াছে, আমি তাহাদের স্বরূপ, আমি সর্বময়। অতএব উঠ—ইহাই শ্রেষ্ঠ পূজা। তুমি সমগ্র জগতের সহিত অভিন্ন। ইহাই যথার্থ বিনয়—হাঁটু গাড়িয়া করজোড়ে কেবল 'আমি পাপী, আমি পাপী' বলার নাম বিনয় নয়। যখন এই ভেদের আবরণ ছিন্ন হয়, তখনই সর্বোচ্চ ক্রমবিকাশ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সমগ্র জগতের অখণ্ডত্বই—একত্বই শ্রেষ্ঠ ধর্মমত। আমি অমুক ব্যক্তি-বিশেষ—ইহা তো অতি সঙ্কীর্ণভাব—পাকা 'আমি'র পক্ষে ইহা সত্য নয়। আমি সর্বময়—এইভাবের উপর দণ্ডায়মান হও এবং সেই পুরুষোত্তমকে সর্বোচ্চভাবে সতত উপাসনা কর, কারণ ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ এবং তাঁহাকে সত্য ও চৈতন্যরূপে উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনার নিম্নতর প্রণালী অবলম্বনে মানুষের জড়বিষয়ক চিন্তাগুলি আধ্যাত্মিক উপাসনায় উন্নীত হয়, এবং অবশেষে সেই অখণ্ড অনন্ত ঈশ্বর চৈতন্যের মধ্য দিয়া উপাসিত হন। যাহা কিছু সান্ত, তাহা জড়; চৈতন্যই কেবল অনন্ত। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অনন্ত মানুষ চৈতন্যস্বরূপ, সুতরাং অনন্ত এবং কেবল অনন্তই অনন্তের উপাসনায় সমর্থ। আমরা সেই অনন্তের উপাসনা করিব; উহাই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপাসনা। এ-সকল ভাবের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা কত কঠিন! আমি যখন কেবল কল্পনার সাহায্যে মত গঠন করি, কথা বলি, দার্শনিক বিচার করি এবং পর মুহূর্তে কোন কিছু আমার প্রতিকূল হইলে অজ্ঞাতসারে ক্রুদ্ধ হই, তখন ভুলিয়া যাই যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এই ক্ষুদ্র সসীম আমি ছাড়া আর কিছু আছে; তখন বলিতে ভুলিয়া যাই যে, আমি চৈতন্যস্বরূপ, এ অকিঞ্চিৎকর জগৎ আমার নিকট কি? আমি চৈতন্যস্বরপ। আমি তখন ভুলিয়া যাই যে, এ-সব আমারই খেলা—ভুলিয়া যাই ঈশ্বরকে, ভুলিয়া যাই মুক্তির কথা।

এই মুক্তির পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ, দুরধিগম্য ও কঠিন—ইহা অতিক্রম করা কঠিন।[১] ঋষিরা এ-কথা বারবার বলিয়াছেন। তাহা হইলেও

---

১ ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।—কঠ. উপ., ১।৩।১৪

এ-সকল দুর্বলতা ও বিফলতা যেন তোমাকে বদ্ধ না করে। উপনিষদের বাণী: 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' উঠ—জাগো, যতদিন না সেই লক্ষ্যে পৌছাইতেছ, ততদিন নিশ্চেষ্ট থাকিও না। যদিও ঐ পথ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—দুরতিক্রম্য, দীর্ঘ ও কঠিন; আমরা ইহা অতিক্রম করিবই করিব। মানুষ সাধনাবলে দেবাসুরের প্রভু হয়। আমরা ব্যতীত আমাদের দুঃখের জন্য আর কেহই দায়ী নয়। তুমি কি মনে কর, মানুষ যদি অমৃতের অনুসন্ধান করে, তৎপরিবর্তে সে বিষলাভ করিবে? অমৃত আছেই এবং যে উহা পাইবার চেষ্টা করে, সে পাইবেই। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন: সকল ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে ভবসাগরের পরপারে লইয়া যাইব, ভীত হইও না।[১]

এই বাণী জগতের সকল ধর্মশাস্ত্রেই আমরা শুনিতে পাই। সেই একই বাণী আমাদিগকে শিক্ষা দেয়, 'স্বর্গে যেমন, মর্ত্যেও তেমনি—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, কারণ সবই তোমার রাজত্ব, তোমার শক্তি, তোমার মহিমা।'[২] কঠিন—বড় কঠিন কথা। আমি নিজে নিজে বলি, 'হে প্রভু, আমি এখনই তোমার শরণ লইব—প্রেমময় তোমার চরণে সমুদয় সমর্পণ করিব, তোমার বেদীতে যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু পুণ্য—সবই স্থাপন করিব। আমার পাপতাপ, আমার ভালমন্দ—সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিব। তুমি সব গ্রহণ কর, আমি তোমাকে কখনও ভুলিব না।' এক মুহূর্তে বলি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক; পর মুহূর্তেই একটা কিছু আসিয়া উপস্থিত হয় আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তখন আমি ক্রোধে লাফাইয়া উঠি। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক, কিন্তু আচার্য বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেন। এই মিথ্যা 'আমি'-কে মারিয়া ফেলো, তাহা হইলেই পাকা 'আমি' বিরাজ করিবে। হিব্রু শাস্ত্র বলেন, 'তোমাদের প্রভু আমি ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর—আমার সম্মুখে তোমার অন্য দেবতাদের উপাসনা করিলে চলিবে না।'[৩] সেখানে একমাত্র ঈশ্বরই রাজত্ব করিবেন। আমাদের বলিতে হইবে—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।'—আমি নই, তুমি। তখন সেই প্রভুকে ব্যতীত

১ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গীতা ১৮।৬৬
২ Lord's Prayer, N. T. Matt. VI, 10.
৩ O. T. Exodus, XX, 5.

আমাদিগকে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে ; তিনি, শুধু তিনিই রাজত্ব করিবেন। হয়তো আমরা খুব কঠোর সাধনা করি, তথাপি পরমুহূর্তেই আমাদের পদস্খলন হয় এবং তখন আমরা জগজ্জননীর নিকট হাত বাড়াইতে চেষ্টা করি ; বুঝিতে পারি, জগজ্জননীর সহায়তা ব্যতীত আমরা দাঁড়াইতে পারি না। জীবন অনন্ত, উহার একটি অধ্যায় এই : 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' এবং জীবনগ্রন্থের সকল অধ্যায়ের মর্মগ্রহণ করিতে না পারিলে সমগ্র জীবন উপলব্ধি করিতে পারি না। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতক মন এই ভাবের বিরুদ্ধাচরণ করে, তথাপি কাঁচা 'আমি'-কে জয় করিতে হইলে বারবার ঐ কথা অবশ্য বলিতে হইবে। আমরা বিশ্বাস-ঘাতকের সেবা করিব অথচ পরিত্রাণ পাইব—ইহা কখনও হইতে পারে না। বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত সকলেই পরিত্রাণ পাইবে এবং যখন আমরা আমাদের 'পাকা আমি'র বাণী অমান্য করি, তখনই বিশ্বাসঘাতক—নিজেদের বিরুদ্ধে এবং জগজ্জননীর মহিমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিন্দিত হই। যাহাই ঘটুক না কেন, আমাদের দেহ ও মন সেই মহান্ ইচ্ছাময়ের নিকট সমর্পণ করিব। হিন্দু দার্শনিক ঠিক কথাই বলিয়াছেন : যদি মানুষ দুবার উচ্চারণ করে, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক', সে পাপাচরণ করে। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—ইহার বেশি আর কি প্রয়োজন ? উহা দুবার বলিবার আবশ্যক কি ? যাহা ভাল, তাহা তো ভালই। একবার যখন বলিয়াছি, তখন ঐ কথা ফিরাইয়া লওয়া চলিবে না। 'স্বর্গের ন্যায় মর্ত্যেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, কারণ তোমারই সব রাজত্ব, সব শক্তি, সব মহিমা চিরদিনের জন্য তোমারই।'

ধর্মের প্রয়োজন

লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা

মানবজাতির ভাগ্যগঠনের জন্য যতগুলি শক্তি কার্য করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, ঐ সকলের মধ্যে ধর্মরূপে অভিব্যক্ত শক্তি অপেক্ষা কোন শক্তি নিশ্চয়ই অধিকতর প্রভাবশালী নয়। সর্বপ্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে কোথাও না কোথাও সেই অপূর্ব শক্তির কার্যকারিতা বিদ্যমান এবং সকল ব্যষ্টিমানবের মধ্যে সংহতির মহত্তম প্রেরণা এই শক্তি হইতেই উদ্ভূত। ইহা আমরা সকলেই স্পষ্টভাবে জানি যে, অগণিত ক্ষেত্রে ধর্মের বন্ধন—জাতি, জলবায়ু, এমন কি বংশের বন্ধন অপেক্ষাও দৃঢ়তর। ইহা সুবিদিত সত্য যে, যাহারা একই ঈশ্বরের উপাসক, একই ধর্মে বিশ্বাসী, তাহারা একই বংশজাত লোকদের, এমন কি ভ্রাতাদের অপেক্ষাও অধিকতর দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত পরস্পরের সাহায্য করিয়াছে। ধর্মের উৎস আবিষ্কার করিবার জন্য বহু প্রকার চেষ্টা হইয়াছে। যে-সকল প্রাচীন ধর্ম বর্তমান কালাবধি টিকিয়া আছে, ঐগুলির এই একটি দাবি যে, তাহারা সকলেই অতিপ্রাকৃত; তাহাদের উৎপত্তি যেন মানুষের মস্তিষ্ক হইতে হয় নাই; বাহিরের কোন স্থান হইতে ধর্মগুলি আসিয়াছে।

আধুনিক পণ্ডিত-সমাজে এ সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে— একটি ধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, অপরটি অনন্ত ঈশ্বরের ক্রমবিকাশ। এক পক্ষ বলেন, পিতৃপুরুষদের উপাসনা হইতেই ধর্মীয় ধারণার আরম্ভ; অপর পক্ষ বলেন, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহে মানবধর্মের আরোপ হইতেই ধর্মের সূচনা। মানুষ তাহার মৃত আত্মীয়-স্বজনের স্মৃতিরক্ষা করিতে চায় এবং ভাবে যে, মৃত ব্যক্তিদের দেহনাশ হইলেও তাহারা জীবিত থাকে, এবং সেইজন্যই সে তাহাদের উদ্দেশে খাদ্যাদি উৎসর্গ করিতে এবং কতকটা তাহাদের পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এই ধারণার পরিণতিই আমাদের নিকট ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে।

মিশর, ব্যাবিলন ও চীনবাসীদের এবং আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের বহু জাতির প্রাচীন ধর্মসমূহ আলোচনা করিলে পিতৃপুরুষের পূজা হইতেই যে

ধর্মের আরম্ভ, তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই। প্রাচীন মিশরীয়দের আত্মা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম ধারণা ছিল—প্রত্যেক দেহে তদনুরূপ আর একটি 'দ্বিতীয়' চেতন-সত্তা থাকে। প্রত্যেক মানুষের দেহে প্রায় তাহারই অনুরূপ আর একটি সত্তা থাকে ; মানুষের মৃত্যু হইলে এই দ্বিতীয় সত্তা দেহ ছাড়িয়া যায়, অথচ তখনও সে বাঁচিয়া থাকে। যতদিন মৃত দেহ অটুট থাকে, শুধু ততদিনই এই দ্বিতীয় সত্তা বিদ্যমান থাকিতে পারে। সেইজন্যই এই দেহটাকে অক্ষত রাখিবার জন্য মিশরীদের এত আগ্রহ দেখিতে পাই। এইজন্যই তাহারা ঐ-সব সুবৃহৎ পিরামিড নির্মাণ করিয়া ঐগুলির মধ্যে মৃতদেহ রক্ষা করিত। কারণ তাহাদের ধারণা ছিল যে, মৃতদেহের কোন অংশ নষ্ট হইলে দ্বিতীয় সত্তারও অনুরূপ অংশটি নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা স্পষ্টতই পিতৃপুরুষের উপাসনা। প্রাচীন ব্যাবিলোন-বাসীদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এই দ্বিতীয় জীবসত্তার ধারণা প্রচলিত ছিল। তাহাদের মতে—মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবসত্তায় স্নেহবোধ নষ্ট হইয়া যায়। সে খাদ্য, পানীয় এবং নানারূপ সাহায্যের জন্য জীবিত মনুষ্যদিগকে ভয় দেখায়। এমন কি, সে নিজ সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীর প্রতিও সমস্ত স্নেহ-মমতা হারাইয়া ফেলে। প্রাচীন হিন্দুদের ভিতরেও এই প্রকার পূর্বপুরুষদের পূজার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। চীনজাতির মধ্যেও এই পিতৃগণের পূজাই তাহাদের ধর্মের মূলভিত্তি বলা যাইতে পারে এবং এখনও এই বিশ্বাস ঐ বিরাট দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচলিত। বলিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে একমাত্র পিতৃ-উপাসনাই সমগ্র চীনদেশে ধর্মাকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে যাঁহারা এই মতবাদে বিশ্বাস করেন যে, পিতৃপুরুষের উপাসনা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাদের ধারণা সুষ্ঠুভাবে সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পক্ষান্তরে এমন অনেক মনীষী আছেন, যাঁহারা প্রাচীন আর্য সাহিত্য (শাস্ত্র) হইতে দেখান যে, প্রকৃতির উপাসনা হইতেই ধর্মের সূচনা। যদিও ভারতবর্ষের সর্বত্র পূর্বপুরুষের পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়, তথাপি প্রাচীনতম শাস্ত্রে তাহার কোন চিহ্নও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর্যদের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতাতে আমরা ইহার কোন নিদর্শন পাই না। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদে প্রকৃতির উপাসনাই দেখিতে পাওয়া যায় ;

সেখানে মানবমন যেন বহির্জগতের অন্তরালে অবস্থিত বস্তুর আভাস পাওয়ার জন্য চেষ্টিত বলিয়া বোধ হয়। উষা, সন্ধ্যা, ঝঞ্ঝা—প্রকৃতির অদ্ভুত ও বিশাল শক্তি-সমূহ ও সৌন্দর্য মানবমনকে আকর্ষণ করে। সেই মানবমন প্রকৃতির পরপারে যাইয়া সেখানে যাহা আছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে। এই প্রচেষ্টায় তাহারা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আত্মা ও শরীরাদি দিয়া মানবীয় গুণরাশিতে ভূষিত করে। এগুলি তাহার ধারণায় কখন সৌন্দর্যমণ্ডিত, কখন বা ইন্দ্রিয়ের অতীত। এই-সব চেষ্টার অন্তে এই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিগুলি তাহার নিকট নিছক ভাবময় বস্তু, মানবধর্মী হউক বা না হউক। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও এই প্রকার ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের পুরাণসমূহ কেবল এই ভাবময় প্রকৃতির উপাসনায় পূর্ণ। প্রাচীন জার্মান, স্কাণ্ডিনেভীয় এবং অন্যান্য আর্যজাতিদের মধ্যেও অনুরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই পক্ষেও সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে চেতন ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই মতদ্বয় পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও তৃতীয় এক ভিত্তি অবলম্বনে উহাদের সামঞ্জস্য-বিধান করা যাইতে পারে; আমার মনে হয়, উহাই ধর্মের প্রকৃত উৎস এবং ইহাকে আমি 'ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রমণের চেষ্টা' বলিতে ইচ্ছা করি। মানুষ একদিকে তাহার পিতৃপুরুষগণের আত্মার অথবা প্রেতাত্মার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, অর্থাৎ শরীর-নাশের পর কি অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে চায়; কিংবা অপর দিকে এই বিশাল জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তরালে যে-শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে, তাহার স্বরূপ জানিতে সচেষ্ট হয়। এই উভয়ের মধ্যে মানুষ যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন, ইহা সুনিশ্চিত যে, সে তাহার ইন্দ্রিয়সমূহের সীমা অতিক্রম করিতে চায়। ইন্দ্রিয়ের গণ্ডির মধ্যেই সে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যাইতে চায়।

এই ব্যাপারের ব্যাখ্যাও রহস্যপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমার নিকট ইহা খুব স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় যে, ধর্মের প্রথম আভাস স্বপ্নের ভিতর দিয়াই আসে। অমরত্বের প্রথম ধারণা মানুষ স্বপ্নের ভিতর দিয়া অনায়াসে পাইতে পারে। এই স্বপ্ন কি একটা অত্যাশ্চর্য অবস্থা নয়? আমরা জানি

যে, শিশুগণ এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহাদের জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যে অতি অল্প পার্থক্য অনুভব করে। স্বপ্নাবস্থায় দেহ মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলেও মন যখন ঐ অবস্থায়ও তাহার সমুদয় জটিল কার্য চালাইয়া যাইতে থাকে, তখন অমরত্ব-বিষয়ে ঐ-সব ব্যক্তি যে সহজলভ্য প্রমাণ পাইয়া থাকে, উহা অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক যুক্তি আর কি থাকিতে পারে? অতএব মানুষ যদি তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসে যে, এই দেহ চিরকালের মতো নষ্ট হইয়া গেলেও পূর্ববৎ ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আমার মতে অলৌকিক তত্ত্ব-বিষয়ে এই ব্যাখ্যাটি অধিকতর স্বাভাবিক এবং এই স্বপ্নাবস্থার ধারণা অবলম্বনেই মানব-মন ক্রমশঃ উচ্চতর তত্ত্বে উপনীত হয়। অবশ্য ইহাও সত্য যে, কালে অধিকাংশ মানুষই বুঝিতে পারিয়াছিল, জাগ্রদবস্থায় তাহাদের এই স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না, এবং স্বপ্নাবস্থায় যে মানুষের কোন অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাও নয়; পরন্তু সে তখন জাগ্রৎ-কালীন অভিজ্ঞতাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র।

কিন্তু ইতিমধ্যে মানব-মনে সত্যানুসন্ধিৎসা অঙ্কুরিত হইয়া গিয়াছে এবং উহার গতি অন্তর্মুখে চলিয়াছে। মানুষ এখন তাহার মনের বিভিন্ন অবস্থাগুলি আরও গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং জাগরণ ও স্বপ্নের অবস্থা অপেক্ষাও উচ্চতর একটি অবস্থা আবিষ্কার করিল। ভাবাবেশ বা ভগবৎপ্রেরণা নামে পরিচিত এই অবস্থাটির কথা আমরা পৃথিবীর সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের মধ্যেই পাই। সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মেই ঘোষিত হয় যে, তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা—অবতারকল্প মহাপুরুষ বা ঈশদূতগণ মনের এমন সব উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, যাহা নিদ্রা ও জাগরণ হইতে ভিন্ন এবং সেখানে তাহারা অধ্যাত্ম-জগৎ নামে পরিচিত এক অবস্থাবিশেষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অভিনব সত্যসমূহ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমরা জাগ্রদবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সমূহ যেভাবে অনুভব করি, তাঁহারা পূর্বোক্ত অবস্থায় পৌঁছিয়া সেগুলি আরও স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মণদের ধর্মকে লওয়া যাক। বেদসমূহ ঋষিদের দ্বারা লিপিবদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই-সকল ঋষি কতিপয় সত্যের দ্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত 'ঋষি' শব্দের প্রকৃত অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ বৈদিক স্তুতিসমূহের বা চিন্তারাশির প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। ঋষিগণ বলেন, তাঁহারা কতকগুলি সত্য অনুভব

করিয়াছেন বা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যদি 'অতীন্দ্রিয়' বিষয় সম্পর্কে 'প্রত্যক্ষ' কথাটি ব্যবহার করা চলে। এই সত্যসমূহ তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই একই সত্য ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যেও বিঘোষিত হইতে দেখা যায়।

বৌদ্ধ-মতাবলম্বী 'হীনযান' সম্প্রদায় সম্বন্ধে কথা উঠিতে পারে। জিজ্ঞাস্য এই যে, বৌদ্ধেরা যখন কোন আত্মা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তখন তাহাদের ধর্ম কিরূপে এই অতীন্দ্রিয় অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইবে? ইহার উত্তর এই যে, বৌদ্ধেরাও এক শাশ্বত নৈতিক বিধানে বিশ্বাসী এবং সেই নীতি-বিধান আমরা যে অর্থে 'যুক্তি' বুঝি, তাহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অবস্থায় পৌঁছিয়া বুদ্ধদেব উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধদেবের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, এমন কি 'এশিয়ার আলো' (The Light of Asia) নামক অপূর্ব কাব্যগ্রন্থে নিবদ্ধ অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে, বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষ-মূলে ধ্যানস্থ হইয়া অতীন্দ্রিয় অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশসমূহ এই অবস্থা হইতেই আসিয়াছে, বুদ্ধির গবেষণা হইতে নয়।

অতএব সকল ধর্মেই এই এক আশ্চর্য বাণী ঘোষিত হয় যে, মানব-মন কোন কোন সময় শুধু ইন্দ্রিয়ের সীমাই অতিক্রম করে না, বিচারশক্তিও অতিক্রম করে। তখন এই মন এমন সব তথ্য প্রত্যক্ষ করে, যেগুলির ধারণা সে কোন কালে করিতে পারিত না এবং যুক্তির দ্বারাও পাইত না। এই তথ্য-সমূহই জগতের সকল ধর্মের মূল ভিত্তি। অবশ্য এই তথ্যগুলি সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিবার এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিবার অধিকার আমাদের আছে; তথাপি জগতের সকল প্রচলিত ধর্মমতেই দাবি করা হয় যে, মানব-মনের এমন এক অদ্ভুত শক্তি আছে, যাহার বলে সে ইন্দ্রিয় ও বিচার-শক্তির সীমা অতিক্রম করিতে পারে; অধিকন্তু তাহারা এই শক্তিকে একটি বাস্তব সত্য বলিয়াই দাবি করে।

সকল ধর্মে স্বীকৃত এই সকল তথ্য কতদূর সত্য; তাহা বিচার না করিয়াও আমরা তাহাদের একটি সাধারণ বিশেষত্ব দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ পদার্থ বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত স্থূল তথ্যগুলির তুলনায় ধর্মের আবিষ্কারগুলি অতি সূক্ষ্ম, এবং যে-সকল ধর্ম অতি উন্নত প্রণালীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি সবই এক সূক্ষ্মতম তত্ত্ব স্বীকার করে; কাহারও মতে উহা হয়তো এক

নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম সত্তা, অথবা সর্বব্যাপী পুরুষ, অথবা ঈশ্বর-নামধেয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি-বিশেষ, অথবা নৈতিক বিধি ; আবার কাহারও মতে উহা হয়তো সকল সত্তার অন্তর্নিহিত সার সত্য। এমন কি আধুনিক কালে মনের অতীন্দ্রিয় অবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া ধর্মমত প্রচারের যত প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতেও প্রাচীনদের স্বীকৃত পুরাতন সূক্ষ্মভাবগুলিই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ঐগুলিকে নীতি-বিধান (Moral Law), আদর্শগত ঐক্য (Ideal Unity) প্রভৃতি নূতন নামে অভিহিত করা হইতেছে এবং ইহা দ্বারা দেখানো হইয়াছে যে, এই-সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। আমাদের মধ্যে কেহই এ পর্যন্ত কোন আদর্শ মানুষ দেখে নাই, তথাপি আমাদিগকে এরূপ এক ব্যক্তিতে বিশ্বাসী হইতে বলা হয়। আমাদের মধ্যে কেহই এ-পর্যন্ত পূর্ণ আদর্শ মানুষ দেখে নাই, তথাপি সেই আদর্শ ব্যতীত আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারি না। বিভিন্ন ধর্ম হইতে এই একটি সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এক সূক্ষ্ম অখণ্ড সত্তা আছে, যাহাকে কখনও আমাদের নিকট ব্যক্তিবিশেষ রূপে, অথবা নীতিবাদরূপে, অথবা নিরাকার সত্তারূপে, অথবা সর্বানুস্যূত সারবস্তুরূপে উপস্থাপিত করা হয়। আমরা সর্বদাই সেই আদর্শে উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতেছি। প্রত্যেক মানুষ যেমনই হউক বা যেখানেই থাকুক, তাহার অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে একটা নিজস্ব আদর্শ আছে, প্রত্যেকেরই এক অসীম আনন্দের আদর্শ আছে। আমাদের চতুর্দিকে যে-সকল কর্ম সম্পাদিত হয়, সর্বত্র যে কর্মচাঞ্চল্য প্রকটিত হয়, এগুলি অধিকাংশই এই অনন্ত শক্তি অর্জনের, এই অসীম আনন্দ লাভের প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু অল্প-সংখ্যক লোক অচিরেই বুঝিতে পারে যে, যদিও তাহারা অনন্ত শক্তিলাভের প্রচেষ্টায় নিরত রহিয়াছে, তথাপি সেই শক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লভ্য নয়। তাহারা অবিলম্বে বুঝিতে পারে যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই অনন্ত সুখ লাভ করা যায় না। অন্যভাবে এরূপ বলা চলে যে, ইন্দ্রিয়গুলি ও দেহ এত সীমাবদ্ধ যে, সেগুলি অসীমকে প্রকাশ করিতে পারে না। অসীমকে সীমার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব ; কালে মানুষ অসীমকে সসীমের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা ত্যাগ করিতে শেখে। এই ত্যাগ, এই চেষ্টা করাই নীতি-শাস্ত্রের মূল ভিত্তি। ত্যাগের ভিত্তির উপরই নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এমন কোন নীতি কোন কালে প্রচারিত হয় নাই, যাহার মূলে ত্যাগ নাই।

'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'—ইহাই নীতিশাস্ত্রের চিরন্তন বাণী। নীতিশাস্ত্রের উপদেশ—'স্বার্থ নয়, পরার্থ।' নীতিশাস্ত্র বলে, সেই অনন্ত শক্তি বা অনন্ত সুখকে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া লাভ করিতে সচেষ্ট মানুষ নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে একটা যে মিথ্যা ধারণা আঁকড়াইয়া থাকে, তাহা ত্যাগ করিতেই হইবে। নিজেকে সর্বপশ্চাতে রাখিয়া অন্যকে প্রাধান্য দিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সমূহ বলে, 'আমারই হইবে প্রথম স্থান।' নীতিশাস্ত্র বলে, 'না, আমি থাকিব সর্বশেষে।' সুতরাং সকল নীতিশাস্ত্রই এই ত্যাগের—জড়জগতে স্বার্থবিলোপের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বার্থরক্ষার উপর নয়। এই জড়জগতে কখনও সেই অনন্তের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইবে না, ইহা অসম্ভব অথবা কল্পনারও অযোগ্য।

সুতরাং মানুষকে জড়জগৎ ত্যাগ করিয়া সেই অনন্তের গভীরতর প্রকাশের অন্বেষণে আরও উচ্চতর ভাব-ভূমিতে উঠিতে হইবে। এই ভাবেই বিভিন্ন নৈতিক বিধি রচিত হইতেছে; কিন্তু সকলেরই সেই এক মূল আদর্শ—চিরন্তন আত্মত্যাগ। অহঙ্কারের পূর্ণ বিনাশই নীতিশাস্ত্রের আদর্শ। যদি মানুষকে তাহার ব্যক্তিত্বের চিন্তা করিতে নিষেধ করা হয়, তবে সে শিহরিয়া উঠে। তাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারাইতে অত্যন্ত ভীত বলিয়া মনে হয়। অথচ সেই-সব লোকই আবার প্রচার করে যে, নীতিশাস্ত্রের উচ্চতম আদর্শগুলিই যথার্থ; তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, সকল নীতিশাস্ত্রের গণ্ডি, লক্ষ্য এবং অন্তর্নিহিত ভাবই হইল এই 'অহং'-এর নাশ, উহার বৃদ্ধি নয়।

হিতবাদের আদর্শ মানুষের নৈতিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কারণ প্রথমতঃ প্রয়োজনের বিবেচনায় কোন নৈতিক নিয়ম আবিষ্কার করা যায় না। অলৌকিক অনুমোদন অথবা আমি যাহাকে অতিচেতন অনুভূতি বলিতে পছন্দ করি, তাহা ব্যতীত কোন নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনন্তের অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই দাঁড়াইতে পারে না। যে-কোন নীতিশাস্ত্র মানুষকে তাহার নিজ সমাজের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে প্রযোজ্য নৈতিক বিধি ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। হিতবাদীরা অনন্তকে পাইবার সাধনা এবং অতীন্দ্রিয় বস্তু লাভের আশা ত্যাগ করিতে বলেন; তাঁহাদের মতে ইহা অসাধ্য ও অযৌক্তিক। আবার তাঁহারাই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে নীতি অবলম্বন এবং সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে বলেন। কেন আমরা কল্যাণ করিব? হিত

করা তো গৌণ ব্যাপার। আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক। নীতিশাস্ত্র তো লক্ষ্য নয়, উহা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। লক্ষ্যই যদি না থাকে, তবে আমরা নীতিপরায়ণ হইব কেন? কেন আমি অন্যের অনিষ্ট না করিয়া উপকার করিব? সুখই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে কেন আমি নিজেকে সুখী এবং অপরকে দুঃখী করিব না? আমাকে বাধা দেয় কিসে? দ্বিতীয়তঃ হিতবাদের ভিত্তি অতীব সঙ্কীর্ণ। যে-সকল সামাজিক রীতিনীতি ও কার্যধারা প্রচলিত আছে, সেগুলি সমাজের বর্তমান অবস্থা হইতেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হিতবাদীদের এমন কি অধিকার আছে যে, তাঁহারা সমাজকে চিরন্তন বলিয়া কল্পনা করিবেন? বহুযুগ পূর্বে সমাজের অস্তিত্ব ছিল না, খুব সম্ভব বহুযুগ পরেও থাকিবে না। খুব সম্ভব উচ্চতর ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রসর হইবার পথে এই সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের অন্যতম সোপান। শুধু সমাজ-ব্যবস্থা হইতে গৃহীত কোন বিধিই চিরন্তন হইতে পারে না এবং সমগ্র মানব-প্রকৃতির পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না। অতএব হিতবাদ-সম্ভূত মতগুলি বড়জোর বর্তমান সামাজিক অবস্থায় কার্যকর হইতে পারে। তাহার বাহিরে উহাদের কোন মূল্য নাই। কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা হইতে উদ্ভূত চরিত্রনীতি ও নৈতিক বিধির কার্যক্ষেত্র বা পরিধি সমষ্টি মানবের সমগ্র দিক। ইহা ব্যষ্টির সম্পর্কে প্রযুক্ত হইলেও ইহার সম্পর্ক সমষ্টির সহিত। সমাজও ইহার অন্তর্ভুক্ত, কারণ সমাজ তো ব্যষ্টিনিচয়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু এই নৈতিক বিধি ব্যষ্টি ও তাহার অনন্ত সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেহেতু সমাজ যে-কোন সময়ে যে-কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, ইহা সমুদয় সামাজিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এইরূপে দেখা যায় যে, মানব জাতির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন সর্বদাই আছে। জড় যতই সুখকর হউক না কেন, মানুষ সর্বদা জড়ের চিন্তা করিতে পারে না।

লোকে বলে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশী মনোযোগ দিলে আমাদের ব্যাবহারিক জগতে প্রমাদ ঘটে। সুদূর অতীতে চৈনিক ঋষি কন্‌ফ্যুসিয়াসের সময়ে বলা হইত—'আগে ইহলোকের সুব্যবস্থা করিতে হইবে; ইহলোকের ব্যবস্থা হইয়া গেলে পরলোকের কথা ভাবিব।' ইহা বেশ সুন্দর কথা যে, আমরা ইহ-জগতের কার্যে তৎপর হইব, কিন্তু ইহাও দ্রষ্টব্য যে, যদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে অত্যধিক মনোযোগের ফলে ব্যাবহারিক জীবনে কিঞ্চিৎ

ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তথাকথিত বাস্তব-জীবনের প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশের ফলে আমাদের ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই ক্ষতি হইয়া থাকে। এইভাবে চলিলে মানুষ জড়বাদী হইয়া পড়ে, কারণ প্রকৃতিই মানুষের লক্ষ্য নয়—মানুষের লক্ষ্য তদপেক্ষা উচ্চতর বস্তু।

যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণ তাহাকে যথার্থ মানুষ বলা চলে। এই প্রকৃতির দুইটি রূপ—অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি। যে নিয়মগুলি আমাদের বাহিরের ও শরীরের ভিতরের জড় কণিকাসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে, কেবল সেগুলিই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়, পরন্তু সূক্ষ্মতর অন্তঃপ্রকৃতিও উহার অন্তর্ভুক্ত; বস্তুতঃ এই সূক্ষ্মতর প্রকৃতিই বহির্জগতের নিয়ামক শক্তি। বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করা খুবই ভাল ও বড় কথা; কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করা আরও মহত্তর। যে-সকল নিয়মানুসারে গ্রহনক্ষত্রগুলি পরিচালিত হয়, সেগুলি জানা উত্তম, কিন্তু যে-সকল নিয়মানুসারে মানুষের কামনা, মনোবৃত্তি ও ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি জানা অনন্তগুণে মহত্তর ও উৎকৃষ্ট। অন্তর্মানবের এই জয়, মানব-মনের যে-সকল সূক্ষ্ম ক্রিয়াশক্তি কাজ করিতেছে, সেগুলির রহস্য জানা—সবই সম্পূর্ণরূপে ধর্মের অন্তর্গত। মানব-প্রকৃতি—আমি সাধারণ মানব-প্রকৃতির কথা বলিতেছি—বড় বড় প্রাকৃতিক ঘটনা দেখিতে চায়। সাধারণ মানুষ সূক্ষ্ম বিষয় ধারণা করিতে পারে না। ইহা বেশ বলা হয় যে, সাধারণ লোকে সহস্র মেষশাবকহত্যাকারী সিংহেরই প্রশংসা করিয়া থাকে, তাহারা একবারও ভাবে না যে, ইহাতে এক হাজার মেষের মৃত্যু ঘটিল, যদিও সিংহটার ক্ষণস্থায়ী জয় হইয়াছে; তাহারা কেবল শারীরিক শক্তির প্রকাশেই আনন্দ অনুভব করে। সাধারণ মানবের মনের ধারাই এইরূপ। তাহারা বাহিরের বিষয় বোঝে এবং তাহাতেই সুখ অনুভব করে; কিন্তু প্রত্যেক সমাজে একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের আনন্দ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে নাই, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে; তাঁহারা মাঝে মাঝে জড়বস্তু অপেক্ষা উচ্চতর কিছুর আভাস পাইয়া থাকেন এবং উহা পাইবার জন্য সচেষ্ট হন। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করিলে আমরা সর্বদা দেখিতে পাইব যে, এরূপ সূক্ষ্মদর্শী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতির উন্নতি হয় এবং অনন্তের অনুসন্ধান বন্ধ হইলে তাহার পতন আরম্ভ হয়, হিতবাদীরা এই অনুসন্ধানকে যতই বৃথা বলুক

না কেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির শক্তির মূল উৎস হইতেছে তাহার আধ্যাত্মিকতা, এবং যখনই ঐ জাতির ধর্ম ক্ষীণ হয় এবং জড়বাদ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে, তখনই সেই জাতির ধ্বংস আরম্ভ হয়।

এইরূপে ধর্ম হইতে আমরা যে-সকল তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারি, যে-সান্ত্বনা পাইতে পারি, তাহা ছাড়িয়া দিলেও ধর্ম অন্যতম বিজ্ঞান অথবা গবেষণার বস্তু হিসাবে মানব-মনের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক কল্যাণকর অনুশীলনের বিষয়। অনন্তের এই অনুসন্ধান, অনন্তকে ধারণা করিবার এই সাধনা, ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যেন জড়ের বাহিরে যাইবার এবং আধ্যাত্মিক মানবের ক্রমবিকাশ-সাধনের এই প্রচেষ্টা—অনন্তকে আমাদের সত্তার সঙ্গে একীভূত করিবার এই নিরন্তর প্রয়াস—এই সংগ্রামই মানুষের সর্বোচ্চ গৌরব ও মহত্ত্বের বিকাশ। কেহ কেহ ভোজনে সর্বাধিক আনন্দ পায়, আমাদের বলিবার কোন অধিকার নাই যে, তাহাদের উহাতে আনন্দ পাওয়া উচিত নয়। আবার কেহ কেহ সামান্য কিছু লাভ করিলেই অত্যন্ত সুখ বোধ করে; তাহাদের পক্ষে উহা অনুচিত—এরূপ বলিবার অধিকার আমাদের নাই। তেমনি আবার যে-মানুষ ধর্মচিন্তায় সর্বোচ্চ আনন্দ পাইতেছে, তাহাকে বাধা দিবারও উহাদের কোন অধিকার নাই। যে-প্রাণী যত নিম্নস্তরের হইবে, ইন্দ্রিয়-সুখে সে তত অধিক সুখ পাইবে। শৃগাল-কুকুর যতখানি আগ্রহের সহিত ভোজন করে, কম লোকই সেভাবে আহার করিতে পারে। কিন্তু শৃগাল-কুকুরের সুখানুভূতির সবটাই যেন তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখভোগ করে এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেরা চিন্তায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় সেই সুখ পাইয়া থাকে। আধ্যাত্মিকতার রাজ্য আরও উচ্চতর। উহার বিষয়টি অনন্ত হওয়ায় ঐ রাজ্যও সর্বোচ্চ এবং যাহারা উহা সম্যকরূপে ধারণা করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে ঐ স্তরের সুখও সর্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং 'মানুষকে সুখানুসন্ধান করিতে হইবে'—হিতবাদীর এই মত মানিয়া লইলেও মানুষের পক্ষে ধর্মচিন্তার অনুশীলন করা উচিত; কারণ ধর্মানুশীলনেই উচ্চতম সুখ আছে। সুতরাং আমার মতে ধর্মানুশীলন একান্ত প্রয়োজন। ইহার ফল হইতেও আমরা তাহা বুঝিতে পারি। মানব-মনকে গতিশীল করিবার জন্য, ধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ামক শক্তি। ধর্ম

আমাদের ভিতর যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করিতে পারে, অন্য কোন আদর্শ তাহা পারে না। মানব-জাতির ইতিহাস হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে অতীতে এইরূপই হইয়াছে, এবং ধর্মের শক্তি এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। কেবল হিতবাদ অবলম্বন করিলেই মানুষ খুব সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। এ জগতে এমন বহু মহাপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা হিতবাদ অনুসরণ করিয়াও সম্পূর্ণ নির্দোষ, নীতিপরায়ণ এবং সরল ছিলেন। কিন্তু যে-সকল মহামানব বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের স্রষ্টা, যাঁহারা জগতে যেন চৌম্বকশক্তিরাশি সঞ্চারিত করেন, যাঁহাদের শক্তি শত সহস্র ব্যক্তির উপর কাজ করে, যাঁহাদের জীবন অপরের জীবনে আধ্যাত্মিক অগ্নি প্রজ্বলিত করে, এরূপ মহাপুরুষদের মধ্যে আমরা সর্বদা অধ্যাত্মশক্তির প্রেরণা দেখিতে পাই। তাঁহাদের প্রেরণা-শক্তি ধর্ম হইতে আসিয়াছে। যে অনন্ত শক্তিতে মানুষের জন্মগত অধিকার, যাহা তাহার প্রকৃতিগত, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য ধর্মই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রেরণা দেয়। চরিত্র-গঠনে, সৎ ও মহৎ কার্য-সম্পাদনে, নিজের ও অপরের জীবনে শান্তিস্থাপনে ধর্মই সর্বোচ্চ প্রেরণাশক্তি; অতএব সেই দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার অনুশীলন করা উচিত। পূর্বাপেক্ষা উদার ভিত্তিতে ধর্মের অনুশীলন আবশ্যক। সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও বিবদমান ধর্মভাব দূর করিতে হইবে। সকল সাম্প্রদায়িক, স্বজাতীয় বা স্বগোত্রীয় ভাব পরিত্যাগ কারতে হইবে। প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর নিজস্ব ঈশ্বর থাকিবেন এবং অপর সকলের ঈশ্বর মিথ্যা—এই-জাতীয় ধারণা কুসংস্কার, এগুলি অতীতের গর্ভেই বিলীন হওয়া উচিত। এই ধরনের ধারণাগুলি অবশ্য বর্জনীয়।

মানবমনের যতই বিস্তার হয়, তাহার আধ্যাত্মিক সোপানগুলিও ততই প্রসার লাভ করে। এমন এক সময় আসিয়াছে, যখন মানুষের চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ হইতে না হইতে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বর্তমানে আমরা শুধু যান্ত্রিক উপায়ে সমগ্র জগতের সংস্পর্শে আসিয়াছি, সুতরাং জগতের ভাবী ধর্মসমূহকে একদিকে যেমন সর্বজনীন, অপরদিকে তেমনি উদার হইতে হইবে।

জগতে যাহা কিছু সৎ ও মহৎ, তাহার সবই ভাবী ধর্মাদর্শের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে উহাতে ভাবী উন্নতির অনন্ত সুযোগ নিহিত

থাকিবে। অতীতের যাহা কিছু ভাল, তাহার সবই সুরক্ষিত হইবে, এবং পূর্বে সঞ্চিত ধর্মভাণ্ডারে নূতন ভাবসংযোগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। অধিকন্তু প্রত্যেক ধর্মেরই অপর ধর্মগুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক; পরন্তু ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় অপরের কোন বিশেষ ধারণাকে ভিন্ন মনে করিয়া নিন্দা করা উচিত নয়। আমার জীবনে আমি এমন অনেক ধার্মিক ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দেখিয়াছি, যাঁহাদের ঈশ্বরে—অর্থাৎ আমরা যে-অর্থে ঈশ্বর মানি, সেই ঈশ্বরে আদৌ বিশ্বাস নাই, হয়তো আমাদের অপেক্ষা তাঁহারাই ঈশ্বরকে ভালরূপে বুঝিয়াছেন। ভগবানের সাকার বা নিরাকার রূপ, অসীম সত্তা, নীতিবাদ অথবা আদর্শ মনুষ্য প্রভৃতি যত কিছু মতবাদ আছে, সবই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই। সকল ধর্ম যখন এইভাবে উদারতা লাভ করিবে, তখন তাহাদের হিতকারিণী শক্তিও শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। ধর্মসমূহের মধ্যে অতি প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকিলেও ঐগুলি শুধু সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতার জন্যই মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল অধিক করিয়াছে।

বর্তমান সময়েও আমরা দেখিতে পাই, বহু সম্প্রদায় ও সমাজ প্রায় একই আদর্শ অনুসরণ করিয়াও পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছে, কারণ এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মতো নিজের আদর্শগুলি ঠিক ঠিক উপস্থাপিত করিতে চায় না। এইজন্য ধর্মগুলিকে উদার হইতে হইবে। ধর্মভাবগুলিকে সর্বজনীন, বিশাল ও অনন্ত হইতে হইবে, তবেই ধর্মের সম্পূর্ণ বিকাশ হইবে, কারণ ধর্মের শক্তি সবেমাত্র পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কখন কখন এইরূপ বলিতে শোনা যায় যে, ধর্মভাব পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইতেছে। আমার মনে হয়, ধর্মভাবগুলি সবেমাত্র বিকশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্কীর্ণতামুক্ত ও আবিলতাশূন্য হইয়া ধর্মের প্রভাব মানবজীবনের প্রতিস্তরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যতদিন ধর্ম মুষ্টিমেয় 'ঈশ্বর-নির্দিষ্ট' ব্যক্তিদের বা পুরোহিতকুলের হাতে ছিল, ততদিন উহা মন্দিরে, গির্জায়, গ্রন্থে, মতবাদে, আচার-অনুষ্ঠানে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখনই আমরা ধর্মের যথার্থ আধ্যাত্মিক ও সর্বজনীন ধারণায় উপনীত হইব, তখন এবং কেবল তখনই উহা প্রকৃত ও জীবন্ত হইবে—ইহা আমাদের স্বভাবে পরিণত হইবে, আমাদের প্রতি গতিবিধিতে প্রাণবন্ত হইয়া থাকিবে, সমাজের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিবে এবং পূর্বাপেক্ষা অনন্তগুণ কল্যাণকারিণী শক্তি হইবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের উত্থান বা পতনের প্রশ্ন যখন একসঙ্গে গ্রথিত, তখন প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদা হইতে উদ্ভূত সৌভ্রাত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে প্রচলিত অনেক ধর্মের প্রতি বিনীত, সানুগ্রহ ও কৃপণোচিত সদিচ্ছা প্রকাশ নয়। সর্বোপরি দুই প্রকার বিশেষ মতবাদের মধ্যে এই ভ্রাতৃভাব স্থাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; ইহার মধ্যে প্রথম দলের ধর্মের বিবিধ বিকাশ মনস্তত্ত্বের আলোচনা হইতে উদ্ভূত হয়—দুরদৃষ্টবশতঃ তাঁহারা এখনও দাবি করেন যে, তাঁহাদের ধর্মই একমাত্র 'ধর্ম' নামের যোগ্য। দ্বিতীয় আর একদল আছেন, যাঁহাদের মস্তিষ্ক স্বর্গের আরও রহস্য উদ্ঘাটন করিতে ব্যস্ত, কিন্তু তাঁহাদের পদতল মাটি আঁকড়াইয়া থাকে—এখানে আমি তথাকথিত জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদের কথাই বলিতেছি।

এই সমন্বয় আনিতে হইলে উভয়কে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে; কখন এই ত্যাগ একটু বেশী রকমের দরকার, এমন কি কখন যন্ত্রণাদায়কও হইতে পারে, কিন্তু এই ত্যাগের ফলে প্রত্যেক দল নিজেকে এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত ও সত্যে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবেন। এবং পরিণামে যে-জ্ঞানকে দেশ ও কালের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন রাখা হইয়াছে, তাহা পরস্পর মিলিত হইয়া দেশকালাতীত এমন এক সত্তার সহিত একীভূত হইবে, যেখানে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ যাইতে অক্ষম, যাহা সর্বাতীত, অনন্ত ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

যুক্তি ও ধর্ম

ইংলণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা

নারদ নামে এক ঋষি সত্যলাভের জন্য সনৎকুমার নামক আর একজন ঋষির কাছে গিয়াছিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ কোন্ বিষয় ইতিমধ্যে অধ্যয়ন করিয়াছ?' নারদ বলিলেন, 'বেদ, জ্যোতিষ এবং আরও বহু বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তৃপ্ত হইতে পারি নাই।' আলাপ চলিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে সনৎকুমার বলিলেন: বেদ জ্যোতিষ ও দর্শন-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা গৌণ; বিজ্ঞানগুলিও গৌণ। যাহা দ্বারা আমাদের ব্রহ্মোপলব্ধি হয়, তাহাই চরম জ্ঞান—সর্বোচ্চ জ্ঞান। এই ধারণাটি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই দেখা যায়, এবং এইজন্যই সর্বোচ্চ জ্ঞান বলিয়া ধর্মের দাবি চিরন্তন। বিজ্ঞানগুলির জ্ঞান যেন আমাদের জীবনের একটু অংশ জুড়িয়া আছে। কিন্তু ধর্ম আমাদের কাছে যে জ্ঞান লইয়া আসে, তাহা চিরন্তন; ধর্ম যে সত্যের কথা প্রচার করে, সেই সত্যের মতো এ জ্ঞানও সীমাহীন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি লইয়া ধর্ম বারবার সর্ববিধ জাগতিক জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়াছে, শুধু তাই নয়, জাগতিক জ্ঞানের দ্বারা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সমর্থিত হইতেও বহুবার অস্বীকার করিয়াছে। ফলে জগতের সর্বত্র ধর্মজ্ঞান ও জাগতিক জ্ঞানের মধ্যে একটা বিরোধ লাগিয়াই আছে। একপক্ষ আচার্য, শাস্ত্র প্রভৃতির অভ্রান্ত প্রমাণকে পথ-নির্দেশক বলিয়া দাবি করিয়াছে এবং এ-বিষয়ে জাগতিক জ্ঞানের যাহা বলিবার আছে, তাহার কিছুতেই কান দিতে চায় নাই। অপর পক্ষ যুক্তিরূপ শাণিত অস্ত্র দ্বারা ধর্ম যাহা কিছু বলিতে চায়, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। প্রত্যেক দেশেই এই সংগ্রাম চলিয়াছে, এবং এখনও চলিতেছে। ধর্ম বারবার পরাজিত ও প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। মানুষের ইতিহাসে 'যুক্তি-দেবতার উপাসনা' ফরাসী-বিপ্লবের সময়েই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে নাই; এইজাতীয় ঘটনা পূর্বেও ঘটিয়াছিল, ফরাসী-বিপ্লবের সময় উহার পুনরভিনয় মাত্র হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে উহা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। জড়-

বিজ্ঞানগুলি এখন পূর্বাপেক্ষা আরও ভালভাবে প্রস্তুত হইয়াছে; আর ধর্মের প্রস্তুতি সে-তুলনায় কমিয়া গিয়াছে, ভিত্তিগুলি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আর আধুনিক মানুষ প্রকাশ্যে যাহাই বলুক না কেন, তাহার অন্তরের গোপন প্রদেশে এ-বোধ জাগ্রত যে, সে আর 'বিশ্বাস' করিতে পারে না। আধুনিক যুগের মানুষ জানে যে, পুরোহিত-সম্প্রদায় তাহাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছে বলিয়াই, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়াই, কিংবা তাহার স্বজনেরা চাহিতেছে বলিয়াই কিছু বিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য এমন কিছু লোক আছে, যাহাদিগকে তথাকথিত জনপ্রিয় বিশ্বাসে সম্মত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-কথাও আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করে না। তাহাদের বিশ্বাসের ভাবটিকে 'চিন্তাহীন অনবধানতা' আখ্যা দেওয়া চলে। এই সংগ্রাম এভাবে আর বেশীদিন চলিতে পারে না; চলিলে ধর্মের সব সৌধই ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন হইল—ইহা হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় আছে কি? আরও স্পষ্টভাবে বলিলে বলিতে হয়: অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিই যুক্তির যে-সকল আবিষ্কারের সহায়তায় নিজেদের সমর্থন করিতেছে, ধর্মকেও কি আত্ম-সমর্থনের জন্য সেগুলির সাহায্য লইতে হইবে? বহির্জগতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধানের যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি সেই একই পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে? আমার মতে তাহাই হওয়া উচিত। আমি ইহাও মনে করি, যত শীঘ্র তাহা হয়, ততই মঙ্গল। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে কোন ধর্ম যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সেই ধর্ম বরাবরই অনাবশ্যক কুসংস্কার-মাত্র ছিল; যতশীঘ্র উহা লোপ পায়, ততই মঙ্গল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উহার বিনাশেই সর্বাধিক কল্যাণ। এই অনুসন্ধানের ফলে ধর্মের ভিতর যা-কিছু খাদ আছে, সে-সবই দূরীভূত হইবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু ধর্মের যাহা সারভাগ, তাহা এই অনুসন্ধানের ফলে বিজয়-গৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের সিদ্ধান্তগুলি যতখানি বিজ্ঞানসম্মত, ধর্ম যে অন্ততঃ ততখানি বিজ্ঞানসম্মত হইবে শুধু তাই নয়, বরং আরও বেশী জোরালো হইবে; কারণ জড়বিজ্ঞানের সত্যগুলির পক্ষে সাক্ষ্য দিবার মতো আভ্যন্তরীণ আদেশ বা নির্দেশ কিছু নাই, কিন্তু ধর্মের তাহা আছে।

যে-সব ব্যক্তি ধর্মের মধ্যে কোন যুক্তিসঙ্গত তত্ত্বানুসন্ধানের উপযোগিতা অস্বীকার করেন, আমার মনে হয়, তাঁহারা যেন কতকটা স্ববিরোধী কাজ করিয়া থাকেন। যেমন খ্রীষ্টানরা দাবি করেন যে, তাঁহাদের ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম; কারণ অমুক-অমুক ব্যক্তির কাছে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। মুসলমানরাও নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে একই দাবি জানান যে, একমাত্র তাঁহাদের ধর্মই সত্য, কারণ এই এই ব্যক্তির কাছে তাহা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের বলেন, 'তোমাদের নীতি-শাস্ত্রের কয়েকটি বিষয় ঠিক বলিয়া মনে হয় না। একটা উদাহরণ দিই। দেখ, ভাই মুসলমান, তোমার শাস্ত্র বলে যে, কাফেরকে জোর করিয়া মুসলমান করা চলে; আর সে যদি মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইতে না চায়, তবে তাহাকে হত্যা করাও চলে। আর এরূপ কাফেরকে যে-মুসলমান হত্যা করে, সে যত পাপ, যত গর্হিত কর্মই করুক না কেন, তাহার স্বর্গলাভ হইবেই।' মুসলমানরা ঐ-কথার উত্তরে বিদ্রূপ করিয়া বলিবে, 'ইহা যখন শাস্ত্রের আদেশ, তখন আমার পক্ষে এরূপ করাই সঙ্গত। এরূপ না করাটাই আমার পক্ষে অন্যায়।' খ্রীষ্টানরা বলিবে, 'কিন্তু আমাদের শাস্ত্র এ-কথা বলে না।' মুসলমানরা তাহার উত্তরে বলিবে, 'তা আমি জানি না। তোমার শাস্ত্র-প্রমাণ মানিতে আমি বাধ্য নই। আমার শাস্ত্র বলে, সব কাফেরকে হত্যা কর। কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল, তাহা তুমি জানিলে কিরূপে? আমার শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, নিশ্চয়ই তাহা সত্য। আর তোমার শাস্ত্রে যে আছে, হত্যা করিও না, তাহা ভুল। ভাই খ্রীষ্টান, তুমিও তো এই কথাই বলো; তুমি বলো যে, জিহোবা ইহুদীদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ কর্তব্য; আর তিনি তাহাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা করা অন্যায়। আমিও তাহাই বলি; কতকগুলি বিষয়কে কর্তব্য বলিয়া এবং কতকগুলি বিষয়কে অকর্তব্য বলিয়া আল্লা আমার শাস্ত্রে অনুজ্ঞা দিয়াছেন; ন্যায়-অন্যায় নির্ণয়ের তাহাই চূড়ান্ত প্রমাণ।' খ্রীষ্টানরা কিন্তু ইহাতেও খুশী নয়। তাহারা 'শৈলোপদেশের' (Sermon on the Mount) নীতির সহিত কোরানের নীতি তুলনা করিয়া দেখাইবার জন্য জিদ করিতে থাকে। ইহার মীমাংসা হইবে কিরূপে? গ্রন্থের দ্বারা নিশ্চয়ই নয়, কারণ পরস্পর-বিবদমান গ্রন্থগুলি বিচারক হইতে পারে না। কাজেই এ-কথা আমাদের

স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই-সব গ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বজনীন কিছু একটা আছে ; একটা কিছু আছে, যাহা জগতে যত নীতিশাস্ত্র আছে, সেগুলি অপেক্ষা উচ্চতর ; একটা কিছু আছে, যাহা বিভিন্ন জাতির অনুপ্রেরণা-শক্তিগুলিকে পরস্পর তুলনা করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে পারে। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করি আর নাই করি, পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, বিচারের জন্য আবেদন লইয়া আমরা যুক্তির দ্বারস্থ হই।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে : এই যুক্তির আলোক অনুপ্রেরণাগুলিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিতে সমর্থ কিনা ; যেখানে আচার্যের সহিত আচার্যের বিরোধ, সেখানেও যুক্তি নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে কি না এবং ধর্ম-সংক্রান্ত সব বিষয়ই বুঝিবার সামর্থ্য তাহার আছে কি না ? যদি না থাকে, তবে আচার্যে আচার্যে, শাস্ত্রে শাস্ত্রে যে জঘন্য বিরোধ যুগযুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, কোন কিছু দ্বারাই তাহার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয় ; কারণ তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সব ধর্মই শুধু মিথ্যা ও অতিমাত্রায় পরস্পর-বিরোধী এবং সেগুলির মধ্যে নীতির কোন স্থায়ী মান নাই। ধর্মের প্রমাণ মানুষের প্রকৃতিগত সত্যের উপর নির্ভর করে, কোন গ্রন্থের উপর নয়। গ্রন্থগুলি তো মানুষের প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ, তাহার পরিণাম। মানুষই এই গ্রন্থগুলির স্রষ্টা। মানুষকে গড়িয়াছে, এমন কোন গ্রন্থ এখনও আমাদের নজরে পড়ে নাই। যুক্তিও সমভাবে সেই সাধারণ কারণ—মনুষ্য-প্রকৃতির একপ্রকার বিকাশ। এই মনুষ্য-প্রকৃতির কাছেই আমাদের আবেদন জানাইতে হইবে। তবু একমাত্র যুক্তিই এই মানব-প্রকৃতির সহিত সরাসরি সংযুক্ত ; সেজন্য যতক্ষণ তাহা মানব-প্রকৃতির অনুগামী হয়, ততক্ষণ যুক্তিরই আশ্রয় লওয়া উচিত। যুক্তি বলিতে আমি কি বুঝাইতে চাহিতেছি ? আধুনিক কালের প্রত্যেক নরনারী যাহা করিতে চায়, আমি তাহাই বলিতে চাহিতেছি—জাগতিক জ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে ধর্মের উপর প্রয়োগ করিতে বলিতেছি। যুক্তির প্রথম নিয়ম এই যে, বিশেষ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, সাধারণ জ্ঞান ব্যাখ্যাত হয় আরও ব্যাপক সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা ; যতক্ষণ না আমরা বিশ্বজনীনতায় গিয়া পৌঁছাই, ততক্ষণ এইভাবেই চলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ নিয়ম বলিতে কি বুঝায়, সে ধারণা আমাদের আছে। একটা কিছু ঘটিলে আমাদের যদি বিশ্বাস হয় যে, কোন একটি

নিয়মের ফলেই তাহা ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমরা তৃপ্ত হই; আমাদের কাছে উহাই কার্যটির ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা-অর্থে আমরা ইহাই বুঝাইতে চাই: যে কার্যটি দেখিয়া আমরা অতৃপ্ত ছিলাম, এখন প্রমাণ পাইলাম যে, এই ধরনের হাজার হাজার কার্য ঘটিয়া থাকে; এটি সেই সাধারণ কার্যের অন্তর্গত একটি বিশেষ কার্য মাত্র। ইহাকেই আমরা 'নিয়ম' বলি। একটি আপেল পড়িতে দেখিয়া নিউটনের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, সব আপেলই পড়ে, মাধ্যাকর্ষণের জন্য ইহা ঘটে, তখন তিনি তৃপ্ত হইলেন। মানুষের জ্ঞানের ইহা একটি নিয়ম। আমি কোন বিশেষ জিনিসকে—একটি মানুষকে রাস্তায় দেখিলাম; মানুষ সম্বন্ধে বৃহত্তর ধারণার সহিত তাহার তুলনা করিলাম এবং তৃপ্ত হইলাম; বৃহত্তর সাধারণের সহিত তুলনা করিয়া আমি তাহাকে মানুষ বলিয়া জানিলাম। কাজেই বিশেষকে বুঝিতে হইলে সাধারণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে, সাধারণকে বৃহত্তর সাধারণের সঙ্গে এবং সবশেষে সব-কিছুকে বিশ্বজনীনতার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে। অস্তিত্বের ধারণাই আমাদের সর্বশেষ ধারণা, সর্বাধিক বিশ্বজনীন ধারণা। অস্তিত্বই হইল বিশ্বজনীন বোধের চূড়ান্ত।

আমরা সবাই মানুষ; ইহার অর্থ—মনুষ্যজাতি-রূপ যে সাধারণ ধারণা, আমরা যেন তাহার অংশ-বিশেষ। মানুষ, বিড়াল, কুকুর—এ-সবই প্রাণী। মানুষ, কুকুর, বিড়াল—এই-সব বিশেষ উদাহরণগুলি প্রাণিরূপ বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সাধারণ জ্ঞানের অংশ। মানুষ, বিড়াল, কুকুর, লতা, বৃক্ষ—এ-সবই আবার জীবন-রূপ আরও ব্যাপক ধারণার অন্তর্ভুক্ত। এগুলিকে এবং সব জীব, সব পদার্থকেই আবার অস্তিত্ব রূপ একটি ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা যায়; কারণ আমরা সবাই সেই ধারণার মধ্যে পড়ি। এই ব্যাখ্যা বলিতে শুধু বিশেষজ্ঞানকে সাধারণজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা এবং আরও কিছু সমধর্মী বিষয়ের সন্ধান করা বোঝায়। মন যেন তাহার ভাণ্ডারে এই ধরনের অসংখ্য সাধারণজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। মনের মধ্যে যেন অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে, সেগুলির মধ্যে এই-সব ধারণা ভাগে-ভাগে সাজানো থাকে; আর যখনই আমরা কোন নূতন জিনিস দেখি, মন তৎক্ষণাৎ এই প্রকোষ্ঠগুলির কোন একটি হইতে তাহার অনুরূপ জিনিস বাহির করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। যদি কোন খোপে আমার অনুরূপ জিনিস খুঁজিয়া পাই, তবে নূতন জিনিসটিকে

সেই খোপে রাখিয়া দিই। আমরা তখন তৃপ্ত হই ও ভাবি, জিনিসটি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিলাম। জ্ঞান বলিতে ইহাই বুঝায়, ইহার বেশী কিছু নয়। মনের কোন খোপে অনুরূপ জিনিস দেখিতে না পাইলে আমরা অতৃপ্ত হই। ইহার জন্য মনের মধ্যে পূর্ব হইতেই বর্তমান এমন একটি শ্রেণীবিভাগ খুঁজিয়া বাহির না করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হয়। কাজেই জ্ঞান বলিতে শ্রেণীবিভাগ বুঝায়; এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাছাড়া আরও আছে। জ্ঞানের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, কোন বস্তুর ব্যাখ্যা অবশ্যই উহার ভিতর হইতে আসা চাই, বাহির হইতে নয়। একখণ্ড পাথর উপরে ছুঁড়িয়া দিলে উহা আবার নীচে পড়িয়া যায় কেন? লোকে এরূপ বিশ্বাস করিত যে, কোন দৈত্য সেটিকে টানিয়া নামাইয়া আনে। বহু ঘটনা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ছিল যে, সেগুলি কেহ অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে ঘটায়; আসলে কিন্তু সেগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। শূন্যে উৎক্ষিপ্ত পাথরকে একজন দৈত্য টানিয়া নামায়, এই ব্যাখ্যাটি পাথর-বস্তুটির ভিতর হইতে আসিত না, আসিত বাহির হইতে। মাধ্যাকর্ষণের জন্য পাথরটি পড়িয়া যায়, এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু পাথরের স্বভাবগত গুণবিশেষ; এই ব্যাখ্যাটি বস্তুর অভ্যন্তর হইতে আসিতেছে। দেখা যায়, এভাবে ব্যাখ্যা করার ঝোঁক আধুনিক চিন্তার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এক কথায় বলা যায়, বিজ্ঞান বলিতে বোঝায় যে, বস্তুর ব্যাখ্যা তাহার প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে; বিশ্বের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্য বাহিরের কোন ব্যক্তি বা অস্তিত্বকে টানিয়া আনার প্রয়োজন হয় না। রাসায়নিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য রসায়নবিদের কোন দানব বা ভূত-প্রেত বা এই ধরনের কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। কোন পদার্থবিদের বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিকের কাছেও তাঁহাদের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যার জন্য এই-সব দৈত্য-দানবাদির কোন প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানের এটি একটি ধারা; এই ধারাটি আমি ধর্মের উপর প্রয়োগ করিতে চাই। দেখা যায়, ধর্মগুলির মধ্যে ইহার অভাব রহিয়াছে এবং সেইজন্য ধর্মগুলি ভাঙিয়া শতধা হইতেছে। প্রত্যেক বিজ্ঞান অভ্যন্তর হইতেই—বস্তুর প্রকৃতি হইতেই ব্যাখ্যা চায়; ধর্মগুলি কিন্তু তাহা দিতে পারিতেছে না। একটি মত আছে যে, ঈশ্বর ব্যক্তি-বিশেষ এবং তিনি বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক সত্তা; এই ধারণা অতি প্রাচীন-কাল হইতে বিদ্যমান। ইহার সপক্ষে বারবার এই যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে যে,

বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, অতিপ্রাকৃতিক একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন রহিয়াছে; এই ঈশ্বর ইচ্ছামাত্র বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ধর্ম বিশ্বাস করে, তিনিই বিশ্বের নিয়ন্তা। এ-সব যুক্তি তো আছেই, তাছাড়া দেখা যায়—সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সকলের প্রতি করুণাময় বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন; এদিকে আবার সেইসঙ্গে জগতে বৈষম্যও রহিয়াছে। দার্শনিক এ-সব লইয়া মোটেই মাথা ঘামান না; তিনি বলেন, ইহার গোড়ায় গলদ রহিয়াছে—এই ব্যাখ্যা বাহির হইতে আসিতেছে, ভিতর হইতে নয়। বিশ্বের কারণ কি? বাহিরের কোন কিছু—কোন ব্যক্তি এই বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন! শূন্যে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের নিম্নে পতনরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন এরূপ ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, ধর্মের ব্যাখ্যাতেও ঠিক তাই। ধর্মগুলি ভাঙিয়া খণ্ডখণ্ড হইয়া যাইতেছে, কারণ ইহা অপেক্ষা ভাল ব্যাখ্যা তাহারা দিতে পারে না।

প্রত্যেক বস্তুর ব্যাখ্যা উহার ভিতর হইতেই আসে, এই ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি ধারণা হইল আধুনিক বিবর্তনবাদ; দুটি ধারণাই একই মূল তত্ত্বের অভিব্যক্তি। সমগ্র বিবর্তনবাদের সরল অর্থ—বস্তুর স্বভাব পুনঃপ্রকাশিত হয়; কারণের অবস্থান্তর ছাড়া কার্য আর কিছুই নয়, কার্যের সম্ভাবনা কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে; সমগ্র বিশ্বই তাহার মূল সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র, শূন্য হইতে সৃষ্ট নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক কার্যই তাহার পূর্ববর্তী কোন কারণের পুনরভিব্যক্তি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শুধু তাহার অবস্থান্তর ঘটে। সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া ইহাই ঘটিতেছে, কাজেই এই-সব পরিবর্তনের কারণ খুঁজিতে আমাদের বিশ্বের বাহিরে হাতড়াইবার প্রয়োজন নাই; বিশ্বের ভিতরেই সেই কারণ বর্তমান। বাহিরে কারণ খোঁজা নিষ্প্রয়োজন। এই ধারণাটিও ধর্মকে ভূমিসাৎ করিতেছে। যে-সব ধর্ম বিশ্বাতিরিক্ত একজন ঈশ্বরকে আঁকড়াইয়া ছিল, তিনি খুব বড় একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নন; এই ধারণা এখন আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যেন জোর করিয়া টানিয়া সে ধারণাকে ভূপাতিত করা হইতেছে; ধর্মকে ভূমিসাৎ করা হইতেছে বলিয়া আমি ইহাই বলিতেছি।

এই দুইটি মূলতত্ত্বকে তৃপ্ত করিতে পারে, এমন কোন ধর্ম থাকিতে পারে কি? আমার মনে হয়, পারে। আমরা দেখিয়াছি, সর্বপ্রথমে সামান্যীকরণের মূলতত্ত্বগুলিকে তৃপ্ত করিতে হইবে। সামান্যীকরণের তত্ত্বগুলির সঙ্গে সঙ্গে

বিবর্তনবাদের তত্ত্বগুলিকেও তৃপ্ত করিতে হইবে। আমাদিগকে এমন একটি চরম সামান্যীকরণে আসিতে হইবে, যাহা শুধু সামান্যীকরণগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিশ্বব্যাপকই হইবে না, বিশ্বের সব কিছুর উদ্ভবও তাহা হইতে হওয়া চাই। উহাকে নিম্নতম কার্যের সহিত সমপ্রকৃতির হইতে হইবে; যাহা কারণ, যাহা সর্বোচ্চ, যাহা চরম—যাহা আদি কারণ, তাহাকে পরম্পরাগত কতকগুলি অভিব্যক্তির ফলে সঞ্জাত দূরতম, নিম্নতম কার্যের সহিতও অভেদ হইতে হইবে। বেদান্তের ব্রহ্মই এই শর্ত পূরণ করেন; কারণ সামান্যীকরণ করিতে করিতে সর্বশেষে আমরা গিয়া যেখানে পৌঁছিতে পারি, এই ব্রহ্ম তাহাই। এই ব্রহ্ম নির্গুণ,—অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দের চরম অবস্থা (সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ)। আমরা দেখিয়াছি, মনুষ্য-মন যে চরম সামান্যীকরণে পৌঁছিতে পারে, তাহাই 'অস্তিত্ব' (সৎ)। জ্ঞান (চিৎ) বলিতে আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহা বুঝায় না; ইহা সেই জ্ঞানের নির্যাস বা সূক্ষ্মতম অবস্থা; ইহাই ক্রম-অভিব্যক্ত হইয়া মানুষ বা অপর প্রাণীর মধ্যে জ্ঞানরূপে ফুটিয়া উঠে। বিশ্বের পিছনে যে চরম সত্তা রহিয়াছে—কাহারও আপত্তি না থাকিলে বলিতে পারি—এমন কি চেতনারও পিছনে যাহা রহিয়াছে, জ্ঞানের সূক্ষ্মসত্তা বলিতে তাহাই বুঝায়। 'চিৎ' বলিতে এবং বিশ্বের বস্তুসমূহের সত্তাগত একত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, উহা তাহাই। আমার মনে হয়, আধুনিক বিজ্ঞান বারবার যাহা প্রমাণ করিয়া চলিয়াছে, তাহা এই : আমরা এক ; মানসিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক—সব দিক দিয়াই আমরা এক। শরীরের দিক হইতে আমরা পৃথক্, এ-কথাও বলা ভুল। তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইতেছি, আমরা জড়বাদী; সে ক্ষেত্রেও আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, সমগ্র বিশ্ব একটা জড়-সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নয়, আর সেই জড়-সমুদ্রে তুমি আমি যেন ছোট ছোট ঘূর্ণি। খানিকটা জড়পদার্থ প্রত্যেক ঘূর্ণির স্থানে আসিয়া ঘূর্ণির আকার লইতেছে, আবার জড়পদার্থরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে, আমার শরীরে যে জড়পদার্থ আছে, কয়েক বছর পূর্বে তাহা হয়তো তোমার শরীরে ছিল বা সূর্যে ছিল বা হয়তো অন্য কোন গ্রহে বা অন্য কোথাও ছিল—অবিরাম গতিশীল অবস্থায় ছিল। তোমার দেহ, আমার দেহ—এ-কথার অর্থ কি ? দেহ সবই এক। চিন্তার বেলাও তাই। চিন্তার একটি অসীম-প্রসারী সমুদ্র রহিয়াছে;

তোমার মন, আমার মন সেই সমুদ্রেরই ভিতর দুটি ঘূর্ণিবিশেষ। উহার ফল কি এখনই প্রত্যক্ষ করিতেছ না? তোমার চিন্তা আমার মনে এবং আমার চিন্তা তোমার মনে প্রবেশ করিতেছে কি করিয়া? আমাদের সমস্ত জীবনই এক; আমরা এক, এমন কি চিন্তার দিক দিয়াও এক। সামান্যীকরণের দিকে আরও অগ্রসর হইলে পাওয়া যায় জড়বস্তু ও চিন্তার সূক্ষ্মসত্তা আত্মাকে, যাহা হইতে উহারা অভিব্যক্ত হইতেছে; এই একত্ব হইতেই সব কিছু আসিয়াছে; সত্তার দিক হইতে সেগুলিকে এক হইতেই হইবে। আমরা সর্বতোভাবে এক; শরীর ও মনের দিক দিয়া এক; আর আত্মায় যদি আমাদের আদৌ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আত্মার দিক হইতেও যে আমরা এক, এ-কথা বলাই বাহুল্য। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রতিদিনই এই একত্বের কথা প্রমাণিত হইয়া চলিয়াছে। গর্বিত লোককে বলা হয়: তুমিও যা, ঐ ক্ষুদ্র পোকাটিও তাই; তোমার ও উহার মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে, এ-কথা ভাবিও না। উহার সঙ্গে তুমি এক। পূর্বজন্মে তুমিও একদিন ঐরকম পোকা ছিলে; পোকাই ক্রমোন্নত হইতে হইতে কালে এই মানুষ হইয়াছে, যে-মনুষ্যত্বের গর্বে তুমি এত গর্বিত! বস্তুর একত্বরূপ এই অপূর্ব তথ্যটি—যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহারই সহিত আমাদের এক করিয়া দেয়। এ তথ্যটি একটি মহান্ শিক্ষার বিষয়; কারণ আমাদের ভিতর অধিকাংশ লোকই উচ্চতর জীবনের সঙ্গে নিজেকে এক করিতে পারিলে খুশী হয়। কিন্তু কেহই নিম্নতর জীবনের সঙ্গে নিজেকে এক বলিয়া ভাবিতে চায় না। কাহারও পূর্বপুরুষ পশুতুল্য, দস্যু বা দস্যু-জমিদার হওয়া সত্ত্বেও যদি সমাজকর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, তবে আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে তাঁহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার সহিত একটা সম্পর্ক খুঁজিতে তৎপর হই; মানুষের এমনই নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি সৎ এবং ভদ্র হইলেও আমরা কেহই তাঁহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে চাই না। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে, সত্য ক্রমেই অধিকতর প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। আর তাহাতে ধর্মের লাভ যথেষ্ট। আমি যে বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছি, সেই অদ্বৈততত্ত্ব ঠিক এই কথাই বলে। বিশ্বের মূল সত্তা ব্রহ্মই সব জীবাত্মার স্বরূপ। তিনিই তোমার জীবনের পরম ধন; তাই বা বলি কেন, তুমিই তিনি—'তত্ত্বমসি'। বিশ্বের সঙ্গে তুমি এক। যে বলে অপরের সহিত

তাহার এতটুকু পার্থক্য রহিয়াছে, সে তখনই দুঃখী হয়। এই একত্বের বোধ সম্বন্ধে যে সচেতন, যে নিজেকে বিশ্বের সঙ্গে এক বলিয়া জানে, সে-ই সুখের অধিকারী।

কাজেই দেখা যাইতেছে, উচ্চতম সামান্যীকরণ এবং বিবর্তনবাদের কথা বেদান্তে আছে বলিয়া বেদান্তের ধর্ম বৈজ্ঞানিক জগতের দাবি মিটাইতে পারে। কোন বস্তুর ব্যাখ্যা যে তাহার ভিতর হইতেই আসে, বেদান্ত সে-কথা আরও সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেয়। বেদান্তের ভগবান্—ব্রহ্মের বাহিরে তদতিরিক্ত কোন সত্তা নাই, একেবারেই নাই। আসলে সবই তিনি, বিশ্বের মধ্যে তিনিই রহিয়াছেন; তিনিই বিশ্ব। 'তুমিই নর, তুমিই নারী; যৌবন-মদ-দৃপ্ত হইয়া বিচরণকারী যুবক তুমিই, স্খলিত-পদ বৃদ্ধও তুমি।'[১] এই এখানেই তিনি আছেন। আমরা তাঁহাকেই দেখি, তাঁহাকেই অনুভব করি। তাঁহাতেই আমরা বাঁচিয়া থাকি ও বিচরণ করি; তাঁহার অস্তিত্বেই আমাদের অস্তিত্ব। 'নিউ টেস্টামেণ্ট'[২]-এর ভিতর আমরা এই ভাব দেখিতে পাই। সেই একই ভাব—ভগবান্ বিশ্বে ওতপ্রোত। তিনিই বস্তুর মূল সত্তা, বস্তুর হৃদয়-স্বরূপ, প্রাণ-স্বরূপ। বিশ্বে তিনি যেন নিজেকেই অভিব্যক্ত করেন। সেই অসীম সচ্চিদানন্দ-সাগরের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি; তুমি আমি যেন সেই সাগরেরই ক্ষুদ্র অংশ, ক্ষুদ্র বিন্দু, ক্ষুদ্র প্রণালী, ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি। বস্তুর দিক দিয়া মানুষে-মানুষে, দেবতায়-মানুষে, মানুষে-প্রাণীতে, প্রাণীতে-উদ্ভিদে, উদ্ভিদে-পাথরে কোন পার্থক্য নাই। কারণ সর্বোচ্চ দেবদূত হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বনিম্ন ধূলিকণা পর্যন্ত—সবই সেই এক সীমাহীন সাগরের অভিব্যক্তি। তফাত শুধু প্রকাশের তারতম্যে। আমার মধ্যে প্রকাশ খুব কম, তোমার মধ্যে হয়তো তার চেয়ে বেশী; কিন্তু উভয়ের মধ্যে বস্তু সেই একই। তুমি আমি সেই একই অনন্ত সাগর—ঈশ্বরের দুটি নির্গম-পথ; কাজেই ঈশ্বরই তোমার স্বরূপ, আমারও স্বরূপ। জন্ম হইতেই তুমি স্বরূপতঃ ঈশ্বর, আমিও তাহাই। তুমি হয়তো পবিত্রতার-মূর্তি দেবদূত, আর আমি হয়তো মহাদুষ্কৃতিকারী দানব। তা

১ ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি···শ্বে. উপ., ৪।৩

২ বাইবেলের শেষাংশ, নূতন নিয়ম, যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও বাণী।

সত্ত্বেও সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে আমার জন্মগত অধিকার আছে, তোমারও আছে। তুমি আজ নিজেকে অনেক বেশী মাত্রায় অভিব্যক্ত করিয়াছ। অপেক্ষা কর, আমি নিজেকে আরও বেশী অভিব্যক্ত করিব; কারণ সবই তো আমার ভিতরে রহিয়াছে। কোন স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; কাহারও কাছে কিছু চাহিতেও হইবে না। সমগ্র বিশ্বের সমষ্টি হইলেন ঈশ্বর স্বয়ং। ঈশ্বর কি তাহা হইলে জড়পদার্থ? না, নিশ্চয়ই নয়। কারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা ভগবান্‌কে যেভাবে অনুভব করি, তাহাই তো জড়পদার্থ। বুদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে যেভাবে অনুভব করি, তাহাই মন। আবার আত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বর আত্মারূপেই দৃষ্ট হন। তিনি জড়পদার্থ নন, জড়পদার্থের মধ্যে সত্যবস্তু বলিতে যাহা আছে, তাহাই তিনি। চেয়ারের মধ্যে যাহা সত্যবস্তু, তাহা ভগবান্‌ই। কারণ চেয়ারটিকে চেয়াররূপে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন। বাহিরে কিছু একটা ছিল, যাহাকে আমার ইন্দ্রিয়গুলি আমার নিকট আনিয়াছে; আমার মন তাহার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করিয়াছে; আর সেই দুয়ের সমবায়ে যাহা হইয়াছে, তাহাই হইল চেয়ার। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি-নিরপেক্ষ যে সত্তা চিরবিদ্যমান, তাহাই ভগবান্ স্বয়ং। তাঁহারই উপর ইন্দ্রিয়গুলি চেয়ার, টেবিল, ঘর, বাড়ি, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি সব কিছুই চিত্রিত করিতেছে। তাই যদি হয়, তবে আমরা সকলে একই প্রকার চেয়ার দেখিতেছি কেন? ভগবানের উপর—সচ্চিদানন্দের উপর একইভাবে এই-সব বিভিন্ন বস্তু আঁকিয়া চলিতেছি কেন? সকলেই যে একইভাবে অঙ্কিত করে, এমন কথা নয়; তবে যাহারা একই ভাবে আঁকিতেছে, তাহারা সকলেই সত্তার একই স্তরে রহিয়াছে বলিয়া পরস্পরের চিত্রণগুলিকে এবং পরস্পরকে দেখিতে পায়। তোমার আমার মাঝখানে এমন লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে, যাহারা এইভাবে ভগবান্‌কে চিত্রিত করে না। সেই-সব প্রাণী এবং তাহাদের চিত্রিত জগৎ আমরা দেখিতে পাই না। এদিকে আবার আধুনিক পদার্থবিদ্যার গবেষণাগুলি হইতে এ-কথার প্রমাণ ক্রমশঃ বেশী করিয়া পাওয়া যাইতেছে। বস্তুর সূক্ষ্মতর সত্তাই সত্য; যাহা স্থূল, তাহা দৃশ্যমাত্র। সে যাহাই হউক, আমরা দেখিয়াছি, আধুনিক যুক্তির সম্মুখে যদি কোন ধর্মীয় মতবাদ দাঁড়াইতে পারে, তবে তাহা হইল একমাত্র অদ্বৈতবাদ; কারণ এখানে আধুনিক যুক্তির দুটি দাবি পূর্ণ হয়,

ইহাই সর্বোচ্চ সামান্যীকরণ; এই সামান্যীকরণ ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে, ইহা প্রত্যেক জীবের পক্ষেই সাধারণ। যে সামান্যীকরণ সাকার ঈশ্বরে শেষ হয়, তাহা বিশ্বজনীন হইতে পারে না; কারণ সাকার ঈশ্বরের ধারণা করিতে গেলে প্রথমেই তাঁহাকে সর্বতোভাবে দয়াময়—মঙ্গলময় বলিতে হইবে। কিন্তু এই জগৎ ভাল মন্দ উভয়েরই মিশ্রণে গঠিত—ইহার কিছুটা ভাল, কিছুটা মন্দ। আমরা ইহা হইতে কিছুটা বাদ দিয়া বাকী অংশকে সাকার ঈশ্বররূপে সামান্যীকরণ করি। সাকার ঈশ্বর এই-এই রূপ বলিলে এ-কথাও বলিতে হইবে যে, তিনি এই-এই রূপ নন। আর দেখিবে, সাকার ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বদা একটি সাকার শয়তানও আসিয়া পড়িবে। ইহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সাকার ঈশ্বরের ধারণায় যথার্থ সামান্যীকরণ হয় না; আমাদের আরও আগাইয়া যাইতে হইবে—নিরাকার ব্রহ্মে পৌঁছাইতে হইবে। নিরাকার ব্রহ্মের মধ্যে সুখ-দুঃখ সব লইয়াই বিশ্ব রহিয়াছে, কারণ বিশ্বে যাহা কিছু বর্তমান, সে-সবই ঈশ্বরের সেই নিরাকার স্বরূপ হইতে আসিয়াছে। অমঙ্গল প্রভৃতি সব কিছুই যাঁহার উপর আরোপ করিতেছি, তিনি আবার কি ধরনের ঈশ্বর? কথা হইল, ভাল-মন্দ—দুই-ই একই জিনিসের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন প্রকাশ। ভাল ও মন্দ যে দুটি পৃথক্ সত্তা—এই ভুল ধারণা আদিকাল হইতে রহিয়াছে। ন্যায় ও অন্যায় দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিস, উহারা পরস্পরের সহিত সম্পর্করহিত—এই ধারণা, এবং ভাল ও মন্দ দুটি চির-বিচ্ছেদ্য, চির-বিচ্ছিন্ন পদার্থ—এই ধারণা আমাদের এই জগতে বহু দুর্ভোগের কারণ হইয়াছে। সর্বদাই ভাল বা সর্বদাই খারাপ, এমন কোন জিনিস দেখাইয়া দিতে পারে, এরূপ লোকের সাক্ষাৎ পাইলে আমি খুশী হইতাম। যেন কোন ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া খুব ভালভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিবে যে, আমাদের জীবনের কতকগুলি ঘটনা শুধু মঙ্গল আনে, আর কতকগুলি আনে কেবল অমঙ্গল। আজ যাহা মঙ্গলকর, কাল তাহা অমঙ্গলজনক হইতে পারে। আজ যাহা মন্দ, কাল তাহা ভাল হইতে পারে। আমার পক্ষে যাহা কল্যাণকর, তোমার পক্ষে তাহা অকল্যাণকর হইতে পারে। সিদ্ধান্ত হইল এই যে, অন্যান্য প্রত্যেক জিনিসের মতোই ভালমন্দের মধ্যেও বিবর্তন আছে। একটা কিছু আছে, যাহাকে ক্রমবিবর্তনের পথে এক অবস্থায় আমরা ভাল বলি, আবার অন্য অবস্থায় মন্দ বলি। ঝড়ে আমার

এক বন্ধু মারা গেল, ঝড়কে আমি অকল্যাণকর বলিলাম; কিন্তু সেই ঝড়ই হয়তো বায়ুর দূষিত বীজাণু নষ্ট করিয়া হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাইল। লোকে ঝড়কে ভাল বলিল, আমি খারাপ বলিলাম। কাজেই ভালমন্দ আপেক্ষিক জগতের অন্তর্গত—ঘটনার অন্তর্গত। যে নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলা হইতেছে, তিনি আপেক্ষিক ঈশ্বর নন। কাজেই তাঁহাকে ভাল বা মন্দ কোন আখ্যাই দেওয়া যায় না; ভাল বা মন্দ কোনটিই নন বলিয়া তিনি এ-সবের অতীত। অবশ্য তাঁহার অভিব্যক্তি হিসাবে 'মন্দ' অপেক্ষা 'ভাল' তাঁহার স্বরূপের অধিকতর নিকটবর্তী।

এরূপ নিরাকার সত্তা—নির্গুণ ঈশ্বর মানিলে ফল কি হইবে? আমাদের কি লাভ হইবে তাহাতে? আমাদের সান্ত্বনার স্থলরূপে, আমাদের সহায়ক-রূপে ধর্ম কি আর মানবজীবনের অঙ্গরূপে থাকিতে পারিবে? মানুষের কাহারও সাকার ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিবার যে আকূতি রহিয়াছে, তাহার কি হইবে? এ-সবই থাকিবে। সাকার ঈশ্বর থাকিবেন, দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। নিরাকার ব্রহ্মের দ্বারা তিনি আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবেন। আমরা দেখিয়াছি, নিরাকার ঈশ্বরকে বাদ দিয়া সাকার ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। আমরা যদি বলিতে চাই যে, সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একজন ঈশ্বর আছেন, যিনি ইচ্ছামাত্র শূন্য হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে সে-কথা প্রমাণ করিতে পারা যায় না। ইহা অচল। কিন্তু নিরাকারের ভাব ধারণা করিতে পারিলে সেখানে সাকারের ভাবও থাকিতে পারে। সেই একই নিরাকার সত্তাকে বিভিন্নভাবে দেখিলে যাহা মনে হয়, বহু বিচিত্র এই বিশ্ব তাহাই। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যখন তাঁহাকে দেখি, তখন তাঁহাকে জড়জগৎ বলি। এমন কোন প্রাণী যদি থাকিত, যাহার ইন্দ্রিয় পাঁচটিরও বেশী, তবে এই জগৎকেই সে অন্যরূপ দেখিত। আমাদের মধ্যে কাহারও যদি এমন একটি ইন্দ্রিয় হয়, যাহা দ্বারা সে বিদ্যুৎ-শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তবে এই বিশ্বকেই সে আবার অন্যরূপে দেখিবে। সেই একই অদ্বয় ব্রহ্মের বহু রূপ, তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দেখার ফলেই বিভিন্ন জগতের ধারণাগুলি উদ্ভূত হয়; মনুষ্য-বুদ্ধিতে সেই নিরাকার সত্তা সম্বন্ধে সর্বোচ্চ যে ধারণা আসা সম্ভব, তাহাই হইল সাকার ঈশ্বর। কাজেই এই চেয়ারটি—এই জগৎ যতখানি সত্য, সাকার ঈশ্বরও ততখানি

সত্য ; কিন্তু তাহার বেশী নয়। ইহা চরম সত্য নয়। নিরাকার ব্রহ্মই সাকার ঈশ্বর ; এইজন্য সাকার ঈশ্বর সত্য। যেমন মানুষ হিসাবে আমি একসঙ্গে সত্য এবং অসত্য দুই-ই। তুমি আমাকে যেভাবে দেখিতেছ, আমি যে তাহাই, এ-কথা সত্য নয়—এ-কথা তুমি নিজেই যাচাই করিয়া দেখিয়া লইতে পারো। তুমি আমাকে যাহা বলিয়া মনে কর, আমি তাহা নই ; বিচার করিয়া দেখিলে এ-বিষয়ে তুমি তৃপ্ত হইতে পারিবে, কারণ আলো, বিভিন্ন স্পন্দন, বায়ুমণ্ডলের অবস্থা, আমার ভিতরে যাবতীয় গতি—এই সব-গুলির একত্র মিলনের ফলে আমাকে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তুমি আমাকে সেইরূপই দেখিতেছ। এই অবস্থাগুলির ভিতর যে-কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলেই আমি আবার অন্যরূপ দেখাইব। আলোকের বিভিন্ন অবস্থায় একই মানুষের আলোকচিত্র লইয়া তুমি এ-কথার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারো। কাজেই তোমার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাকে যেমন দেখাইতেছে, 'আমি' বলিতে তাহাই বুঝাইতেছে। এ-সব সত্ত্বেও আমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহার পরিবর্তন নাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থাগুলি প্রকাশ পাইতেছে। সেইটিই নৈর্ব্যক্তিক 'আমি', তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হাজার হাজার বিভিন্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 'আমি' ফুটিয়া উঠিতেছে ; আমি শিশু ছিলাম, আমি যুবা হইয়াছিলাম, আমি আরও বয়স্ক হইয়া চলিয়াছি। আমার জীবনের প্রতিটি দিনেই আমার দেহের ও চিন্তার পরিবর্তন ঘটিতেছে। এ-সব পরিবর্তন সত্ত্বেও সেগুলির সমষ্টির পরিমাণ কিন্তু চিরস্থির। সেইটিই নৈর্ব্যক্তিক 'আমি' ; এই-সব অভিব্যক্তি যেন তাহারই অংশস্বরূপ।

একই ভাবে এই বিশ্বের সমষ্টিফল অপরিবর্তনীয়, ইহা আমরা জানি। কিন্তু এই বিশ্ব-সংশ্লিষ্ট সব কিছুরই গতি আছে, সব কিছুই অবিরাম স্পন্দনশীল অবস্থায় রহিয়াছে ; সব কিছুই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। আবার সেই সঙ্গেই দেখি যে, এই বিশ্ব অনড় ; কারণ গতিশব্দটি আপেক্ষিক। চেয়ারটি স্থির, আমি নড়িতেছি ; আমার এই গতি ঐ স্থির চেয়ারটির সঙ্গে আপেক্ষিক। গতি-সৃষ্টির জন্য অন্ততঃ দুটি জিনিসের প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বকে যদি এক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সেখানে গতির স্থান নাই। সে যে গতিশীল হইবে, তাহার গতি নির্ধারিত হইবে কিসের সহিত তুলনা করিয়া? কাজেই চরম সত্য অপরিবর্তনীয়, অবিচল। যা কিছু গতি ও পরিবর্তন, তাহা সবই ঘটে

শুধু এই আপেক্ষিক ও সীমাবদ্ধ জগতে। সমষ্টি-সত্তা নৈর্ব্যক্তিক। যাঁহার নিকট আমরা নতজানু হই, প্রার্থনা করি, সেই ভগবান্—সাকার ঈশ্বর, স্রষ্টা বা বিশ্ব-নিয়ন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম অণু পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ এই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে। যথেষ্ট যুক্তি দেখাইয়া এরূপ সাকার ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করা যায়। এরূপ সাকার ঈশ্বরকে নিরাকার ব্রহ্মেরই সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। তুমি আমি অতি নিম্নস্তরের প্রকাশ; আমরা যতদূর ধারণা করিতে পারি, তাহার সর্বোচ্চ প্রকাশ এই সাকার ঈশ্বর। আবার তুমি বা আমি সেই সাকার ঈশ্বর হইতে পারি না। বেদান্ত যখন বলেন, 'তুমি আমি ব্রহ্ম', তখন সেই ব্রহ্ম বলিতে সাকার ঈশ্বর বুঝায় না। একটি উদাহরণ দিতেছি। একতাল কাদা লইয়া একটি প্রকাণ্ড মাটির হাতি গড়া হইল; আবার সেই কাদার সামান্য অংশ লইয়া ছোট একটি মাটির ইঁদুরও গড়া হইল। ঐ মাটির ইঁদুরটি কি কখনও মাটির হাতি হইতে পারিবে? কিন্তু দুটিকে জলের মধ্যে রাখিয়া দিলে দুইটিই কাদা হইয়া যায়। কাদা বা মাটি হিসাবে দুইটিই এক; কিন্তু ইঁদুর ও হাতি হিসাবে তাহাদের মধ্যে চিরদিন পার্থক্য থাকিবে। অসীম নিরাকার ব্রহ্ম যেন পূর্বোক্ত উদাহরণের মাটির মতো। স্বরূপের দিক দিয়া আমরা ও বিশ্বনিয়ন্তা এক, কিন্তু তাঁহার অভিব্যক্তিরূপে, মানুষরূপে আমরা তাঁহার চিরদাস, তাঁহার পূজক। কাজেই দেখা যাইতেছে, সাকার ঈশ্বর থাকিয়া যাইতেছেন। এই আপেক্ষিক জগতের আর সব কিছুও রহিয়া গেল; ধর্মকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইল। কাজেই সাকার ঈশ্বরকে জানিতে গেলে আগে নিরাকার সত্তাকে জানা প্রয়োজন।

আমরা দেখিয়াছি, তর্কযুক্তির নিয়মানুসারে 'সামান্যে'র মধ্য দিয়াই শুধু 'বিশেষ'কে জানা যায়। কাজেই যিনি সামান্যীকরণের চরম, সেই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার, নিরাকার ব্রহ্মের মাধ্যমেই শুধু মানুষ হইতে ঈশ্বর পর্যন্ত সব বিশেষকেই জানা যায়। প্রার্থনা থাকিয়া যাইবে, তাহার অর্থ আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে মাত্র। প্রার্থনার নিম্নস্তরে আমাদের মনের কামনা পূরণের জন্য শুধু 'দাও দাও' ভাব, প্রার্থনা সম্বন্ধে অর্থহীন ধারণাগুলিকে বোধ হয় সরিয়া পড়িতে হইবে। যুক্তিমূলক ধর্মে ঈশ্বরের নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে বলা হয় না; প্রার্থনা করিতে বলা হয় দেবতাদের কাছে। এরূপ হওয়াই খুব

স্বাভাবিক। রোমান ক্যাথলিকরা সাধু-সন্তদের কাছে প্রার্থনা করেন; এটি খুব ভাল। কিন্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করার কোন অর্থ হয় না। শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য, একপশলা বৃষ্টি হওয়ার জন্য বা বাগানে সবজি ফলাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা খুবই অস্বাভাবিক। ঈশ্বরের তুলনায় যাঁহারা আমাদেরই মতো ক্ষুদ্র জীব, সেই সাধু-সন্তেরা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার নিকট আমাদের ছোটখাট সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার কথা বলা—শিশুকাল হইতেই বলা, 'হে ঈশ্বর, আমার মাথা-ব্যথা সারাইয়া দাও'—এগুলি নিতান্তই হাস্যকর। জগতে এমন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাদের আত্মা এখনও রহিয়াছে; তাঁহারা দেবতা ও দেবদূত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সাহায্য করুন না! কিন্তু এজন্য ভগবান্‌কে বলা? নিশ্চয়ই নয়। তাঁহার নিকট চাহিতে হইলে নিশ্চয়ই আরও উচ্চতর জিনিস চাহিতে হইবে। গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য যে কূপ খনন করে, সে তো মূর্খ, হীরকের খনির কাছে বাস করিয়া যে কাঁচখণ্ডের জন্য মাটি খোঁড়ে, সে মূর্খ ছাড়া আর কি?

করুণাময়, প্রেমময় ঈশ্বরের নিকট আমরা যদি জাগতিক বস্তু চাহিতে যাই, তবে আমরা নির্বোধ ছাড়া আর কি? কাজেই তাঁহার নিকট জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি প্রার্থনা করিব। কিন্তু যতদিন আমাদের দুর্বলতা আছে, যতদিন 'তুমি প্রভু, আমি দাস' এই ভাব লইয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের আছে, ততদিন এ-সব নিম্নস্তরের প্রার্থনাও থাকিবে এবং সাকার ঈশ্বরের উপাসনার ভাবও থাকিবে। কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিকতায় অনেক উন্নত হইয়াছেন, তাঁহারা এ-সব ছোট-খাট প্রার্থনার ধার ধারেন না; তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছু চাওয়ার কথা, নিজেদের কোন প্রয়োজনের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। 'আমি নই, সখা, তুমি!'—তাঁহাদের মধ্যে এই ভাবেরই প্রাধান্য। ইঁহারাই নিরাকার উপাসনার যোগ্য ব্যক্তি। নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার অর্থ কি? তাহার অর্থ এরূপ দাসভাব নয়—'হে প্রভু, আমি অতি অকিঞ্চন, আমায় কৃপা কর!' ইংরেজী ভাষায় অনূদিত সেই প্রাচীন পারসী কবিতাটি তো আপনারা জানেন: আমি আমার প্রিয়তমকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। আসিয়া দেখি দ্বার রুদ্ধ। দ্বারে করাঘাত করিতেই ভিতর হইতে কেহ বলিল, 'তুমি কে?' বলিলাম, 'আমি

অমুক।' দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার আসিয়া করাঘাত করিলাম, একই প্রশ্ন হইল, একই উত্তর দিলাম। সেবারেও দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার আসিলাম, একই প্রশ্ন হইল। আমি বলিলাম, 'প্রিয়তম, আমি তুমিই!' তখন দ্বার খুলিয়া গেল। সত্যের মাধ্যমে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়। সত্য কি? আমিই তিনি। আমি 'তুমি' নই—এ-কথা বলিলে অসত্য বলা হয়। তোমা হইতে আমি পৃথক্, এ-কথার মতো মিথ্যা, ভয়ঙ্কর মিথ্যা আর নাই। এই বিশ্বের সঙ্গে আমি এক, জন্ম হইতেই এক। বিশ্বের সঙ্গে আমি যে এক, তাহা আমার ইন্দ্রিয়ের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। আমার চারিদিকে যে বায়ু রহিয়াছে, তাহার সহিত আমি এক, তাপের সঙ্গে এক, আলোর সঙ্গে এক; যাঁহাকে বিশ্ব বলা হয়, যাঁহাকে অজ্ঞানবশতঃ বিশ্ব বলিয়া মনে হয়, সেই সর্বব্যাপী বিশ্বদেবতার সঙ্গে আমি অনন্তকাল এক, কারণ হৃদয়ে যিনি চিরন্তন কর্তা, প্রত্যেকের হৃদয়াভ্যন্তরে যিনি বলেন, 'আমি আছি', যিনি মৃত্যুহীন চিরজাগ্রত অমর, যাঁহার মহিমার নাশ নাই, যাঁহার শক্তি চির-অব্যর্থ, তিনিই এই বিশ্বদেবতা, অপর কেহই নন। তাঁহার সহিত আমি এক।

ইহাই নিরাকার উপাসনার সার। এই উপাসনায় কি ফল হয়? ইহাতে মানুষের গোটা জীবনটাই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। আমাদের জীবনে যে শক্তির একান্ত প্রয়োজন, ইহাই সেই শক্তি। কারণ যাহাকে আমরা পাপ বলি, দুঃখ বলি, তাহার একটিমাত্র কারণ আছে—আমাদের দুর্বলতাই সেই কারণ। দুর্বলতার সঙ্গে অজ্ঞান আসে, অজ্ঞানের সঙ্গে আসে দুঃখ। নিরাকারের উপাসনা আমাদিগকে শক্তিমান্ করিয়া তুলিবে। আমরা তখন দুঃখকে, হীনতার উগ্রতাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিব; হিংস্র ব্যাঘ্র তখন তাহার ব্যাঘ্র-স্বরূপের পিছনে আমার নিজেরই আত্মাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবে। নিরাকার উপাসনার ফল এই হইবে। ভগবানের সহিত যাঁহার আত্মা এক হইয়া গিয়াছে, তিনিই শক্তিমান্; তাছাড়া আর কেহই শক্তিমান্ নয়। নাজারাথের যীশুর যে-শক্তির কথা তোমাদের বাইবেলে আছে, যে প্রচণ্ড শক্তিবলে বিশ্বাসঘাতককে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে যাহারা হত্যা করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদেরও তিনি আশীর্বাদ করিয়াছেন, সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল—তোমরা মনে কর? এই শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল এই বোধ হইতে—'আমি ও আমার পিতা এক'; এই শক্তির কারণ এই প্রার্থনা—'পিতা,

আমি যেমন তোমার সঙ্গে এক, সেইরূপ ইহাদের সকলকেই আমার সহিত এক করিয়া দাও।' ইহাই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা। বিশ্বের সহিত এক হইয়া যাও, তাঁহার সহিত এক হইয়া যাও। আর এই নিরাকার ব্রহ্মের কোন বাহ্য প্রকাশের—কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা, নিজ নিজ চিন্তা অপেক্ষা তিনি আমাদের আরও নিকটে। তিনি আছেন বলিয়াই তাঁহার মাধ্যমে আমরা দেখি ও চিন্তা করি। কোন কিছু দেখিবার পূর্বে তাঁহাকেই দেখিতে হইবে। এই দেয়ালটি দেখিতে হইলে পূর্বে তাঁহাকে দেখি, তারপর দেখি দেয়ালটিকে; কারণ চিরকাল সব ক্রিয়ারই কর্তা তিনি। কে কাহাকে দেখিতেছে? তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে রহিয়াছেন। দেহ ও মনের পরিবর্তন হয়; সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ আসে আবার চলিয়া যায়; দিন ও বৎসর আবর্তন করিয়া চলিয়াছে; জীবন আসে, আবার চলিয়া যায়, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু নাই। 'আমি আছি, আমি আছি'—এই একই সুর চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। তাঁহারই মধ্যে, তাঁহারই মাধ্যমে আমরা সব জানি। তাঁহারই মধ্যে, তাঁহারই মাধ্যমে আমরা সব কিছু দেখি। তাঁহারই মধ্যে, তাঁহারই মাধ্যমে আমরা সব কিছু অনুভব করি, চিন্তা করি, বাঁচিয়া থাকি; তাঁহারই মধ্যে ও তাঁহারই মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্ব। আর যে-'আমি'কে ভুল করিয়া আমরা ছোট 'আমি', সীমায়িত 'আমি' বলিয়া ভাবি, তাহা শুধু আমার 'আমি' নয়, তাহা তোমাদেরও 'আমি', প্রাণিগণের—দেবদূতগণেরও 'আমি', হীনতম জীবেরও 'আমি'। সেই 'আমি আছি'-বোধ ঘাতকের মধ্যেও যেমন, সাধুর মধ্যেও ঠিক তেমনি; ধনীর মধ্যেও যা, দরিদ্রের মধ্যেও তাই; নর ও নারী, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী—সকলেরই মধ্যে এই বোধ এক। সর্বনিম্ন জীবকোষ হইতে সর্বোচ্চ দেবদূত পর্যন্ত প্রত্যেকের অন্তরেই তিনি বাস করিতেছেন এবং চিরদিন ঘোষণা করিতেছেন, 'আমিই তিনি—সোঽহম্, সোঽহম্।' অন্তরে চিরবিদ্যমান এই বাণী যখন আমাদের বোধগম্য হইবে, উহার শিক্ষা গ্রহণ করিব, তখন দেখিব—সমগ্র বিশ্বের রহস্য প্রকট হইয়া পড়িয়াছে, দেখিব—প্রকৃতি আমাদের নিকট রহস্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। আমরা দেখিব, সমস্ত ধর্ম যে-সত্যের সন্ধানে রত, যে-সত্যের তুলনায় জড়বিজ্ঞানের সব জ্ঞানই গৌণ মাত্র, আমরা সেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছি; ইহাই একমাত্র সত্যজ্ঞান, যাহা আমাদিগকে বিশ্বের এই বিশ্বজনীন ঈশ্বরের সঙ্গে এক করিয়া দেয়।

বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ

(কিভাবে ইহা বিভিন্ন প্রকার মানুষকে আকর্ষণ করিবে)

ইংলণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা

আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যে-কোন বস্তুকেই গ্রহণ করুক না কেন, অথবা আমাদের মন যে-কোন বিষয় কল্পনা করুক না কেন, সর্বত্রই আমরা দুইটি শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই; একটি অপরটির বিরুদ্ধে কার্য করিতেছে এবং আমাদের চতুর্দিকে জটিল ঘটনারাজি ও আমাদের অনুভূত মানসিক ভাবপরম্পরার অবিশ্রান্ত লীলাবিলাস সংঘটন করিতেছে। বহির্জগতে এই বিপরীত শক্তিদ্বয় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-রূপে অথবা কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি-রূপে, এবং অন্তর্জগতে রাগদ্বেষ ও শুভাশুভ-রূপে প্রকাশিত হইতেছে। কতকগুলি জিনিসের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ এবং কতকগুলির প্রতি আকর্ষণ আছে। আমরা কোনটির প্রতি আকৃষ্ট হই, আবার কোনটি হইতে দূরে থাকিতে চাই। আমাদের জীবনে অনেকবার এমন হইয়া থাকে যে, কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না অথচ কোন কোন লোকের প্রতি যেন আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, আবার অন্য অনেক সময় যেন কোন কোন লোক দেখিলেই বিনা কারণে মন বিদ্বেষে পূর্ণ হয়। এই বিষয়টি সকলেরই কাছে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আর এই শক্তির কার্যক্ষেত্র যতই উচ্চতর হইবে, এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের প্রভাব ততই তীব্র ও স্পষ্ট হইতে থাকিবে। ধর্মই মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্বোচ্চ স্তর; এবং আমরা দেখিতে পাই, ধর্মজগতেই এই শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে। মানুষ যত প্রকার প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে, তন্মধ্যে তীব্রতম প্রেমলাভ হইয়াছে ধর্ম হইতে, এবং মানুষ যত প্রকার পৈশাচিক ঘৃণার পরিচয় পাইয়াছে, তাহারও উদ্ভব হইয়াছে ধর্ম হইতে। জগৎ কোন কালে যে মহত্তম শান্তিবাণী শ্রবণ করিয়াছে, তাহা ধর্মরাজ্যের লোকদেরই মুখনিঃসৃত, এবং জগৎ কোনকালে যে তীব্রতম নিন্দা ও অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছে, তাহাও ধর্মরাজ্যের লোকদের মুখেই উচ্চারিত হইয়াছে। কোন ধর্মের উদ্দেশ্য যত উচ্চতর এবং উহার কার্য-

প্রণালী যত সুবিন্যস্ত, তাহার ক্রিয়াশীলতা ততই আশ্চর্য। ধর্মপ্রেরণায় মানুষ জগতে যে রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে, মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন প্রেরণায় তাহা ঘটে নাই; আবার ধর্মপ্রেরণায় যত চিকিৎসালয় ও আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অন্য কিছুতেই তত হয় নাই। ধর্মপ্রেরণার ন্যায় মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন বৃত্তি তাহাকে শুধু মানবজাতির জন্য নয়, নিম্নতম প্রাণিগণের জন্য পর্যন্ত এতটা যত্ন লইতে প্রবৃত্ত করে নাই। ধর্ম-প্রভাবে মানুষ যত নিষ্ঠুর হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না, আবার ধর্মপ্রভাবে মানুষ যত কোমল হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অতীতে এইরূপই হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও খুব সম্ভবতঃ এইরূপই হইবে। তথাপি বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির সংঘর্ষ হইতে উত্থিত এই দ্বন্দ্ব-কোলাহল, এই বিবাদ-বিসম্বাদ, এই হিংসাদ্বেষের মধ্য হইতেই সময়ে সময়ে এমন সব শক্তিশালী গম্ভীর কণ্ঠ উত্থিত হইয়াছে, যাহা এই সমুদয় কোলাহলকে ছাপাইয়া, যেন সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত সকলকে আপন বার্তা শুনিতে বাধ্য করিয়া সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও মিলনের বাণী ঘোষণা করিয়াছে। জগতে কি কখনও এই শান্তি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইবে?

ধর্মরাজ্যের এই প্রবল বিবাদ-বিসংবাদের স্তরে একটি অবিচ্ছিন্ন সমন্বয় বিরাজিত থাকা কি কখনও সম্ভব? বর্তমান শতাব্দীর শেষভাগে এই মিলনের প্রশ্ন লইয়া জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমাজে এই সমস্যাপূরণের নানারূপ প্রস্তাব উঠিতেছে এবং সেগুলি কার্যে পরিণত করিবার নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু ইহা যে কতদূর কঠিন, তাহা আমরা সকলেই জানি। জীবন-সংগ্রামের ভীষণতা লাঘব করা—মানুষের মধ্যে যে প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা রহিয়াছে, তাহা মন্দীভূত করা—মানুষ এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে করে। জীবনের যাহা বাহ্য স্থূল এবং বহিরংশমাত্র, সেই বহির্জগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করাই যদি এত কঠিন হয়, তবে মানুষের অন্তর্জগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করা তদপেক্ষা সহস্রগুণ কঠিন। আমি আপনাদিগকে বাক্যজালের ভিতর হইতে কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে আসিতে অনুরোধ করি। আমরা সকলেই বাল্যকাল হইতে প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি অনেক কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সেগুলি আমাদের কাছে কতকগুলি নিরর্থক শব্দমাত্রে পরিণত হইয়াছে। আমরা

সেগুলি তোতাপাখির মতো আওড়াইয়া থাকি এবং উহাই আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ঐরূপ না করিয়া পারি না। যে-সকল মহাপুরুষ প্রথমে তাঁহাদের হৃদয়ে এই মহান্ তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই শব্দগুলি সৃষ্টি করেন। তখন অনেকেই এগুলির অর্থ বুঝিত। পরে অজ্ঞ লোকেরা এই শব্দগুলি লইয়া ছেলেখেলা করিতে থাকে, অবশেষে ধর্ম জিনিসটাকে কেবলমাত্র কথার মারপ্যাঁচে দাঁড় করানো হইয়াছে—উহা যে জীবনে পরিণত করিবার জিনিস, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা এখন 'পৈত্রিক ধর্ম', 'জাতীয় ধর্ম', 'দেশীয় ধর্ম' ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে। শেষে কোন ধর্মাবলম্বী হওয়াটা স্বদেশহিতৈষিতার একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর স্বদেশহিতৈষিতা সর্বদাই একদেশী। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা বাস্তবিক কঠিন ব্যাপার। তথাপি আমরা এই ধর্ম-সমন্বয়-সমস্যার আলোচনা করিব।

আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক ধর্মের তিনটি বিভাগ আছে—আমি অবশ্য প্রসিদ্ধ ও সর্বজনপরিচিত ধর্মগুলির কথাই বলিতেছি। প্রথমতঃ দার্শনিক ভাগ—যাহাতে সেই ধর্মের সমগ্র বিষয়বস্তু অর্থাৎ উহার মূলতত্ত্ব, উদ্দেশ্য ও তাহা লাভের উপায় নিহিত। দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক ভাগ অর্থাৎ দর্শনকে স্থূল রূপপ্রদান। উহাতে সাধারণ বা অপ্রাকৃত পুরুষদের জীবনের উপাখ্যানাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাতে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বগুলি সাধারণ বা অপ্রাকৃত পুরুষদের অল্প-বিস্তর কাল্পনিক জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থূলভাবে বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ আনুষ্ঠানিক ভাগ—উহা ধর্মের আরও স্থূলভাগ—উহাতে পূজাপদ্ধতি, আচারানুষ্ঠান, বিবিধ অঙ্গন্যাস, পুষ্প, ধূপধুনা প্রভৃতি নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রয়োগ আছে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম এই সকল লইয়া গঠিত। আপনারা দেখিতে পাইবেন, সমুদয় বিখ্যাত ধর্মের এই তিনটি ভাগ আছে। কোন ধর্ম হয়তো দার্শনিক ভাগের উপর বেশী জোর দেয়, কোন ধর্ম অপর কোনটির উপর। এক্ষণে প্রথম অর্থাৎ দার্শনিক ভাগের কথা ধরা যাক।

সর্বজনীন দর্শন বলিয়া কিছু আছে কি? এখন পর্যন্ত তো কিছু হয় নাই। প্রত্যেক ধর্মই তাহার নিজ নিজ মতবাদ উপস্থিত করিয়া সেইগুলিকে একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে জেদ করে। কেবলমাত্র ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। পরন্তু সেই-ধর্মাবলম্বী মনে করে, যে ঐ মতে বিশ্বাস না করে, পরলোকে

তাহার গতি ভয়াবহ হইবে। কেহ কেহ আবার অপরকে স্বমতে আনিতে বাধ্য করিবার জন্য তরবারি পর্যন্ত গ্রহণ করে। ইহা যে তাহারা দুর্মতিবশতঃ করিয়া থাকে, তাহা নয়—গোঁড়ামি নামক মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত ব্যাধি-বিশেষের তাড়নায় করিয়া থাকে। এই গোঁড়ারা খুব অকপট—মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী অকপট, কিন্তু তাহারা জগতের অন্যান্য পাগলদেরই মতো সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিরই মতো এই গোঁড়ামিও একটি ভয়ানক ব্যাধি। মানুষের যত রকম কুপ্রবৃত্তি আছে, এই গোঁড়ামি তাহাদের সবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহা দ্বারা ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়, স্নায়ুমণ্ডলী অতিশয় চঞ্চল হয় এবং মানুষ ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠে।

বিভিন্ন ধর্মের পুরাণগুলির ভিতরে কি কোন সাদৃশ্য আছে?—পৌরাণিক দৃষ্টিতে এমন কোন ঐক্য, এমন কোন ঐতিহ্যগত সার্বভৌমিকতা আছে কি, যাহা সকল ধর্মই গ্রহণ করিতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। সকল ধর্মেরই নিজ নিজ পুরাণ আছে—যদিও প্রত্যেকেই বলে, 'আমার পুরাণোক্ত গল্পগুলি কেবল উপকথা মাত্র নয়।' এই বিষয়টি উদাহরণ-সহায়ে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। আমি শুধু দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি বুঝাইতে চাহিতেছি। কোন ধর্মকে সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। খ্রীষ্টান বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর ঘুঘুর আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ইহা ঐতিহাসিক সত্য—পৌরাণিক গল্পমাত্র নয়। হিন্দু আবার গাভীর মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব বিশ্বাস করেন। খ্রীষ্টান বলেন, এরূপ বিশ্বাসের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই—উহা পৌরাণিক গল্পমাত্র, কুসংস্কার মাত্র। ইহুদীগণ মনে করেন, যদি একটি বাক্সে বা সিন্দুকের দুই পার্শ্বে দুইটি দেবদূতের মূর্তি স্থাপন করা যায়, তবে উহাকে মন্দিরের অভ্যন্তরে পবিত্রতম স্থানে স্থাপন করা যাইতে পারে—উহা জিহোবার দৃষ্টিতে পরম পবিত্র। কিন্তু মূর্তিটি যদি কোন সুন্দর নর বা নারীর আকারে গঠিত হয়, তাহা হইলে তাহারা বলে, 'উহা একটা বীভৎস পুতুল মাত্র, উহা ভাঙিয়া ফেলো!' পৌরাণিক দিক হইতে এই তো আমাদের মিল! যদি একজন লোক দাঁড়াইয়া বলে, 'আমাদের ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষেরা এই এই অত্যাশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন!' অপর সকলে বলিবে, 'ইহা কেবল কুসংস্কার মাত্র', আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইহাও বলিবে, তাহাদের নিজেদের ঈশদূতগণ ইহা অপেক্ষাও অধিক

আশ্চর্যজনক কাজ করিয়াছিলেন এবং তাহারা সেগুলিকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া দাবি করে। আমি যতদূর দেখিয়াছি, এই পৃথিবীতে এমন কেহই নাই, যিনি এই-সকল লোকের মাথার ভিতরে ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে এই যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটি রহিয়াছে, তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এই প্রকার গল্পগুলি যে-ধর্মেরই হউক না কেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে পুরাণ-পর্যায়ভুক্ত, যদিও কখন কখন হয়তো ঐগুলির মধ্যে একটু আধটু ঐতিহাসিক সত্য থাকিতে পারে।

তারপর অনুষ্ঠানগুলির কথা। সম্প্রদায়বিশেষের হয়তো কোন বিশেষ প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি আছে এবং তাঁহারা উহাকেই পবিত্র এবং অপর সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানগুলিকে ঘোর কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন। যদি এক সম্প্রদায় কোন বিশেষ প্রকার প্রতীকের উপাসনা করেন, তবে অপর সম্প্রদায় বলিয়া বসেন, 'ওঃ, কি জঘন্য!' একটি সাধারণ প্রতীকের কথা ধরা যাক। লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক নিশ্চয়ই পুংচিহ্ন বটে, কিন্তু ক্রমশঃ উহার ঐ দিকটা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং এখন উহা ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বের প্রতীকরূপে গৃহীত হইতেছে। যে-সকল জাতি উহাকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা কখনও উহাকে পুংচিহ্নরূপে চিন্তা করে না, উহাও অন্যান্য প্রতীকের ন্যায় একটি প্রতীক—এই পর্যন্ত। কিন্তু অপর জাতি বা সম্প্রদায়ের একজন লোক উহাতে পুংচিহ্ন ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পায় না, সুতরাং সে উহার নিন্দাবাদ আরম্ভ করে। আবার সে হয়তো তখন এমন কিছু করিতেছে, যাহা তথাকথিত লিঙ্গোপাসকদের চক্ষে অতি বীভৎস ঠেকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দুটিকে ধরা যাক—লিঙ্গোপাসনা ও স্যাক্রামেণ্ট (Sacrament) নামক খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠান। খ্রীষ্টানগণের নিকট লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক অতি কুৎসিত এবং হিন্দুগণের নিকট খ্রীষ্টানদের স্যাক্রামেণ্ট বীভৎস বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন যে, কোন মানুষের সদ্‌গুণাবলী পাইবার আশায় তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করা ও রক্তপান করা তো নরখাদকের বৃত্তি মাত্র। কোন কোন বর্বর জাতি এইরূপই করিয়া থাকে। যদি কোন লোক খুব বীর হয়, তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করে; কারণ তাহারা মনে করে, ইহা দ্বারা তাহারা সেই ব্যক্তির সাহস ও বীরত্ব প্রভৃতি গুণাবলী লাভ করিবে। স্যার জন লাবকের ন্যায় ভক্তিমান্

খ্রীষ্টানও এ-কথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, বর্বরজাতিদের এই ধারণা হইতেই খ্রীষ্টান অনুষ্ঠানটির উদ্ভব। খ্রীষ্টানেরা অবশ্য উহার উদ্ভব সম্বন্ধে এই মত স্বীকার করেন না এবং ঐরূপ অনুষ্ঠান হইতে কিসের আভাস পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও তাঁহাদের মাথায় আসে না। উহা একটি পবিত্র ঘটনার প্রতীক—এইটুকু মাত্র জানিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ভাগেও এমন কোন সাধারণ প্রতীক নাই, যাহা সকল ধর্মমতেই সকলের পক্ষে স্বীকার্য ও গ্রহণীয় হইতে পারে। তাহা হইলে কিঞ্চিন্মাত্র সার্বভৌমিকত্ব আছে কোথায়?—তাহা হইলে ধর্মের কোন প্রকার সার্বভৌম রূপ গড়িয়া তোলা কিরূপে সম্ভব হইবে? বাস্তবিক কিন্তু তাহা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। এখন দেখা যাক—তাহা কি।

আমরা সকলেই সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা শুনিতে পাই এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় উহার বিশেষ প্রচারে কিরূপ উৎসাহী, তাহাও দেখিয়া থাকি। আমার একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে। ভারতবর্ষে মদ্যপান অতি মন্দকার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দুই ভাই ছিল, তাহারা এক রাত্রে লুকাইয়া মদ খাইবার ইচ্ছা করিল। পাশের ঘরেই তাহাদের খুল্লতাত নিদ্রা যাইতেছিলেন—তিনি একজন খুব নিষ্ঠাবান্ লোক ছিলেন। এই কারণে মদ্যপানের পূর্বে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—'আমাদের খুব চুপিচুপি কাজ সারিতে হইবে, নতুবা খুল্লতাত জাগিয়া উঠিবেন।' তাহারা মদ খাইতে খাইতে পরস্পরকে চুপ করাইবার জন্য একের উপর স্বর চড়াইয়া অপরে চীৎকার করিতে লাগিল, 'চুপ চুপ, খুড়ো জাগবে।' গোলমাল বাড়ার ফলে খুল্লতাতের ঘুম ভাঙিয়া গেল—তিনি ঘরে ঢুকিয়া সমস্তই দেখিতে পাইলেন। আমরা ঠিক এই মাতালদের মতো চীৎকার করি—'সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব! আমরা সকলেই সমান; অতএব এস, আমরা একটা দল করি।' কিন্তু যখনই তুমি দল গঠন করিলে, তখনই তুমি ফলতঃ সাম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে এবং তখনই আর সাম্য বলিয়া কোন কিছু রহিল না। মুসলমানগণ 'সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব ভ্রাতৃভাব' করে, কিন্তু বাস্তবিক কাজে কতদূর দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই, যে মুসলমান নয়, তাহাকে আর এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের ভিতর লওয়া হইবে না—তাহার গলা কাটা যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। খ্রীষ্টানগণ সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা বলে, কিন্তু যে খ্রীষ্টান নয়, তাহাকে

এমন জায়গায় যাইতে হইবে, যেখানে তাহার ভাগ্যে চির নরক-যন্ত্রণার ব্যবস্থা আছে।

এইরূপে আমরা 'সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব' ও সাম্যের অনুসন্ধানে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যখন তুমি কোথাও এই-ভাবের কথা শুনিবে, তখনই আমার অনুরোধ, তুমি একটু ধীর ও সতর্ক হইবে, কারণ এই-সকল কথা-বার্তার অন্তরালে প্রায়ই ঘোর স্বার্থপরতা লুকাইয়া থাকে। কথায় বলে, শরৎকালে কখন কখন আকাশে বজ্রনির্ঘোষকারী মেঘ দেখা যাইলেও গর্জন মাত্র শোনা যায়, কিন্তু একবিন্দুও বারিপাত হয় না, অপরপক্ষে বর্ষাকালে মেঘগুলি নীরব থাকিয়াই পৃথিবীকে প্লাবিত করে। সেইরূপ যাহারা প্রকৃত কর্মী এবং অন্তরে বাস্তবিক সকলের প্রতি প্রেম অনুভব করে, তাহারা মুখে লম্বা-চওড়া কথা বলে না, ভ্রাতৃভাব-প্রচারের জন্য দলগঠন করে না, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়াকলাপ, তাহাদের গতিবিধি তাহাদের সারাটা জীবন লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের অন্তর সত্যসত্যই মানবজাতির প্রতি প্রেমে পূর্ণ, তাহারা সকলকে ভালবাসে এবং সকলের ব্যথার ব্যথী, তাহারা কথা না কহিয়া কার্যে দেখায়—আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন করে। সারা দুনিয়ায় লম্বা-চওড়া কথার মাত্রা বড়ই বেশী। আমরা চাই কথা কম এবং যথার্থ কাজ কিছু বেশী হউক।

এতক্ষণ আমরা দেখিলাম যে, ধর্মের সার্বভৌমিকতার বাস্তব রূপ বলিয়া কিছু খুঁজিয়া বাহির করা খুব কঠিন; তথাপি আমরা জানি, উহা আছে ঠিক। আমরা সকলেই মানুষ, কিন্তু আমরা সকলে কি সমান? কখনই নয়। কে বলে আমরা সমান? কেবল বাতুলেই এ-কথা বলিতে পারে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের শক্তি, আমাদের শরীর কি সব সমান? এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা বলশালী, একজনের বুদ্ধিবৃত্তি অপরের চেয়ে বেশী। যদি আমরা সকলেই সমান হই, তবে এই অসামঞ্জস্য কেন? কে ইহা করিল? আমরা নিজেরা। আমাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য, বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্য এবং শারীরিক বলের তারতম্য আছে বলিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য হইতে বাধ্য। তথাপি আমরা জানি, এই সাম্যবাদ আমাদের সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। আমরা সকলেই মানুষ বটে—কিন্তু আমাদের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ, কতকগুলি নারী; কেহ কৃষ্ণকায়, কেহ শ্বেতকায়; কিন্তু সকলেই

মানুষ—সকলেই এক মনুষ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মুখের চেহারা নানা রকমের। আমি দুইটি ঠিক এক রকমের মুখ দেখি নাই; তথাপি আমরা সকলে এক মানবজাতীয়। এই সাধারণ মনুষ্যত্বের স্বরূপটি কি? আমি কোন গৌরাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ নর বা নারীকে দেখিলাম; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিলাম যে, তাহাদের সকলের মুখে একটা ভাবময় সাধারণ মনুষ্যত্বের ছাপ আছে। যখন আমি উহাকে ধরিবার চেষ্টা করি, উহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে যাই, যখন বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে যাই, তখন ইহা দেখিতে না পাইতে পারি, কিন্তু যদি কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তবে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বরূপ এই সাধারণভাবই সেই বস্তু। নিজ মনোমধ্যে এই মানবত্বরূপ সাধারণ ভাবটি আছে বলিয়াই তদবলম্বনে আমি তোমাকে নর বা নারীরূপে জানিতে পারি। সর্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধেও এই কথা। ইহা ঈশ্বরের ধারণা অবলম্বনে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসমূহে অনুস্যূত রহিয়াছে। ইহা অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান আছে এবং নিশ্চিতই থাকিবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।' আমি মণিগণের ভিতর সূত্ররূপে বর্তমান রহিয়াছি—এই এক-একটি মণিকে এক-একটি ধর্মমত বা তদন্তর্গত সম্প্রদায় বিশেষ বলা যাইতে পারে। পৃথক্ পৃথক্ মণিগুলি এইরূপ এক-একটি ধর্মমত এবং প্রভুই সূত্ররূপে সেই-সকলের মধ্যে বর্তমান। তবে অধিকাংশ লোকই এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম। আমরা সকলেই মানুষ অথচ আমরা সকলেই পরস্পর পৃথক্। মনুষ্যজাতির অংশ হিসাবে আমি ও তুমি এক, কিন্তু যখন আমি অমুক, তখন আমি তোমা হইতে পৃথক্। পুরুষ হিসাবে তুমি নারী হইতে ভিন্ন, কিন্তু মানুষ হিসাবে নর ও নারী এক। মানুষ হিসাবে তুমি জীবজন্তু হইতে পৃথক্, কিন্তু প্রাণী হিসাবে স্ত্রী, পুরুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ্ সকলেই সমান; এবং সত্তা হিসাবে তুমি বিরাট বিশ্বের সহিত এক। সেই বিরাট সত্তাই ভগবান্—তিনিই এই বৈচিত্র্যময় জগৎপ্রপঞ্চের চরম একত্ব। তাঁহাতে আমরা সকলেই এক হইলেও ব্যক্তপ্রপঞ্চের মধ্যে এই ভেদগুলি অবশ্য চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। বহির্দেশে আমাদের কার্যকলাপ ও বলবীর্য যেমন যেমন প্রকাশ পাইবে, সেই সঙ্গে এই ভেদ সর্বদাই বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সর্বজনীন ধর্মের অর্থ যদি এই হয় যে, কতকগুলি বিশেষ

মত জগতের সমস্ত লোকে বিশ্বাস করিবে, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা কখনও হইতে পারে না—এমন সময় কখন হইবে না, যখন সমস্ত লোকের মুখ এক রকম হইবে। আবার যদি আমরা আশা করি যে, সমস্ত জগৎ একই পৌরাণিক তত্ত্বে বিশ্বাসী হইবে, তাহা অসম্ভব; তাহাও কখন হইতে পারে না। সমস্ত জগতে কখনও এক প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে না। এরূপ ব্যাপার কোন কালে কখনও হইতে পারে না; যদি কখনও হয়, তবে সৃষ্টি লোপ পাইবে, কারণ বৈচিত্র্যই জীবনের মূলভিত্তি। আকৃতিবিশিষ্ট জীবরূপে আমরা সৃষ্ট হইলাম কিরূপে? বৈচিত্র্য হইতে। সম্পূর্ণ সাম্যভাব হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সমভাবে ও সম্পূর্ণরূপে তাপ বিকিরণ করাই উত্তাপের ধর্ম; এখন মনে করুন, এই ঘরের উত্তাপ-রাশি সেইভাবে বিকীর্ণ হইয়া গেল; তাহা হইলে কার্যতঃ সেখানে উত্তাপ বলিয়া পরে কিছু থাকিবে না। এই জগতে গতি সম্ভব হইতেছে কিসের জন্য? সমতাচ্যুতি ইহার কারণ। যখন এই জগৎ ধ্বংস হইবে, তখনই কেবল সাম্যরূপ ঐক্য আসিতে পারে; অন্যথা এরূপ হওয়া অসম্ভব। কেবল তাহাই নয়, এরূপ হওয়া বিপজ্জনক। আমরা সকলেই এক প্রকার চিন্তা করিব, এরূপ ইচ্ছা করা উচিত নয়। তাহা হইলে চিন্তা করিবার কিছুই থাকিবে না। তখন যাদুঘরে অবস্থিত মিশরীয় মামিগুলির (mummies) মতো আমরা সকলেই এক রকমের হইয়া যাইব, এবং পরস্পরের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিব—আমাদের মনে ভাবিবার মতো কথাই উঠিবে না। এই পার্থক্য, এই বৈষম্য, আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সাম্যের অভাবই আমাদের উন্নতির প্রকৃত উৎস, উহাই আমাদের যাবতীয় চিন্তার প্রসূতি। চিরকাল এইরূপই চলিবে।

সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ বলিতে তবে আমি কি বুঝি? আমি এমন কোন সার্বভৌম দার্শনিক তত্ত্ব, কোন সার্বভৌম পৌরাণিক তত্ত্ব, অথবা কোন সার্বভৌম আচার-পদ্ধতির কথা বলিতেছি না, যাহা সকলেই মানিয়া চলে। কারণ আমি জানি যে, নানা পাকে-চক্রে গঠিত, অতি জটিল ও অতি বিস্ময়াবহ এই জগৎ-রূপ দুর্বোধ্য ও বিশাল যন্ত্রটি বরাবর এইভাবেই চলিতে থাকিবে। আমরা তবে কি করিতে পারি?—আমরা ইহাকে সুচারুরূপে চলিতে সাহায্য করিতে পারি, ইহার ঘর্ষণ কমাইতে পারি, ইহার চক্রগুলি তৈলসিক্ত ও মসৃণ রাখিতে পারি। কিরূপে?—বৈষম্যের

স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া। আমাদিগকে আমাদের স্বভাব বশতই যেমন একত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ বৈষম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, একই সত্য লক্ষ ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক ভাবটিই তাহাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথার্থ। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে, কোন বিষয়কে শত প্রকার বিভিন্ন দিক হইতে দেখা চলে, অথচ বস্তুটি একই থাকে। সূর্যের কথা ধরা যাক। মনে করুন, এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠ হইতে সূর্যোদয় দেখিতেছে; সে প্রথমে একটি বৃহৎ গোলাকৃতি বস্তু দেখিতে পাইবে। তারপর মনে করুন, সে একটি ক্যামেরা লইয়া সূর্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়া যে পর্যন্ত না সূর্যে পৌছায়, সেই পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ সূর্যের প্রতিচ্ছবি লইতে লাগিল। এক স্থল হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি স্থানান্তর হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি হইতে ভিন্ন হইবে। যখন সে ফিরিয়া আসিবে, তখন মনে হইবে, বাস্তবিক সে যেন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সূর্যের প্রতিকৃতি লইয়া আসিয়াছে। আমরা কিন্তু জানি যে, সেই ব্যক্তি তাহার গন্তব্য পথের বিভিন্ন স্থল হইতে একই সূর্যের বহু প্রতিকৃতি লইয়া আসিয়াছে। ভগবান্ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট দর্শনের মধ্য দিয়াই হউক, সূক্ষ্মতম অথবা স্থূলতম পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভিতর দিয়াই হউক, সুসংস্কৃত ক্রিয়া-কাণ্ড অথবা জঘন্য ভূতোপাসনাদির মধ্য দিয়াই হউক, প্রত্যেক সম্প্রদায়—প্রত্যেক ব্যক্তি—প্রত্যেক জাতি—প্রত্যেক ধর্ম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঊর্ধ্বগামী হইয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবারই চেষ্টা করিতেছে। মানুষ সত্যের যত প্রকার অনুভূতি লাভ করুক না কেন, তাহার প্রত্যেকটি ভগবানেরই দর্শন ছাড়া অপর কিছুই নয়। মনে করুন, আমরা সকলেই পাত্র লইয়া একটি জলাশয় হইতে জল আনিতে গেলাম। কাহারও হাতে বাটি, কাহারও কলসী, কাহারও বা বালতি ইত্যাদি, এবং আমরা নিজ নিজ পাত্রগুলি ভরিয়া লইলাম। তখন বিভিন্ন পাত্রের জল স্বভাবতই আমাদের নিজ নিজ পাত্রের আকার ধারণ করিবে। যে বাটি আনিয়াছে, তাহার জল বাটির মতো; যে কলসী আনিয়াছে তাহার জল কলসীর মতো আকার ধারণ করিয়াছে; এমনি সকলের পক্ষে। কিন্তু প্রত্যেক পাত্রেই জল ব্যতীত অন্য কিছু নাই। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। আমাদের মনগুলি এই

পাত্রের মতো। আমরা প্রত্যেকেই ভগবান্ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। যে জলদ্বারা পাত্রগুলি পূর্ণ রহিয়াছে, ভগবান সেই জলস্বরূপ এবং প্রত্যেক পাত্রের পক্ষে ভগবদ্দর্শন সেই সেই আকারে হইয়া থাকে। তথাপি তিনি সর্বত্রই এক। একই ভগবান্ ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। আমরা সার্বভৌম ভাবের এই একমাত্র বাস্তব পরিচয় পাইতে পারি।

এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল, মতবাদ হিসাবে তাহা বেশ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বাস্তব সামঞ্জস্য স্থাপনের কি কোন উপায় আছে? আমরা দেখিতে পাই, 'সকল ধর্মমতই সত্য'—এ-কথা বহু প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে, আলেকজান্দ্রিয়ায় ইওরোপে, চীনে, জাপানে, তিব্বতে এবং সর্বশেষে আমেরিকায় একটি সর্ববাদি-সম্মত ধর্মমত গঠন করিয়া সকল ধর্মকে এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবার শত শত চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সবগুলিই ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ তাহারা কোন কার্যকর প্রণালী অবলম্বন করে নাই। পৃথিবীর সকল ধর্মই সত্য, এ-কথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের একীকরণের এমন কোন কার্যকর উপায় তাঁহারা দেখাইয়া দেন নাই, যাহা দ্বারা এই সমন্বয়ের মধ্যেও সকল ধর্ম নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে। সেই উপায়ই যথার্থ কার্যকর, যাহা ব্যক্তিগত ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপর সকলের সহিত মিলিত হইবার পথ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু এ যাবৎ যে-সকল উপায়ে ধর্মজগতে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন ধর্মমত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত হইলেও কার্যক্ষেত্রে কয়েকটি মতবিশেষের মধ্যে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেইহেতু অপর কতকগুলি পরস্পর-বিবদমান ঈর্ষাপরায়ণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় রত নূতন দলেরই সৃষ্টি হইয়াছে।

আমারও নিজের একটি ক্ষুদ্র কার্য-প্রণালী আছে। জানি না—ইহা কার্যকর হইবে কিনা, কিন্তু আমি উহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। আমার কার্য-প্রণালী কি? মানবজাতিকে আমি প্রথমেই এই নীতিটি মানিয়া লইতে অনুরোধ করি—'কিছু নষ্ট করিও না', ধ্বংসবাদী সংস্কারকগণ জগতের কোন উপকারই করিতে পারে না। কোন কিছু একেবারে ভাঙিও না, একেবারে ধূলিসাৎ করিও না,

বরং গঠন কর। যদি পারো সাহায্য কর; যদি না পারো, হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকো, এবং যেমন চলিতেছে চলিতে দাও। যদি সাহায্য করিতে না পারো, অনিষ্ট করিও না। যতক্ষণ মানুষ অকপট থাকে, ততক্ষণ তাহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিও না। দ্বিতীয়তঃ যে যেখানে রহিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে উপরে তুলিবার চেষ্টা কর। যদি ইহাই সত্য হয় যে, ভগবানই সকল ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ, এবং আমরা প্রত্যেকেই যেন একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধ দিয়া সেই কেন্দ্রেরই দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইলে আমরা সকলে নিশ্চয়ই কেন্দ্রে পৌঁছিব এবং যে-কেন্দ্রে সকল ব্যাসার্ধ মিলিত হয়, সেই কেন্দ্রে পৌঁছিয়া আমাদের সকল বৈষম্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু যে পর্যন্ত না সেখানে পৌঁছাই, সে পর্যন্ত বৈষম্য অবশ্যই থাকিবে। এই-সকল ব্যাসার্ধই কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়। একজন তাহার স্বভাব অনুযায়ী একটি ব্যাসার্ধ দিয়া যাইতেছে, আর একজন অপর একটি ব্যাসার্ধ দিয়া যাইতেছে এবং আমরা সকলেই যদি নিজ নিজ ব্যাসার্ধ ধরিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলে অবশ্য একই কেন্দ্রে পৌঁছিব; এইরূপ প্রবাদ আছে যে, 'সকল রাস্তাই রোমে পৌঁছায়।' প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। প্রত্যেকেই কালে চরম সত্য উপলব্ধি করিবে; কারণ শেষে দেখা যায়, মানুষ নিজেই নিজের শিক্ষা বিধান করে। তুমি আমি কি করিতে পারি? তুমি কি মনে কর, তুমি একটি শিশুকেও কিছু শিখাইতে পারো?—পার না। শিশু নিজেই শিক্ষালাভ করে। তোমার কর্তব্য, সুযোগ বিধান করা—বাধা দূর করা। একটি গাছ বাড়িতেছে। তুমি কি গাছটিকে বাড়াও? তোমার কর্তব্য গাছটির চারিদিকে বেড়া দেওয়া, যেন গরু-ছাগলে উহাকে না খাইয়া ফেলে; ব্যস্, ঐখানেই তোমার কর্তব্য শেষ। গাছ নিজেই বাড়ে। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। কেহই তোমাকে শিক্ষা দিতে পারে না—কেহই তোমাকে আধ্যাত্মিক মানুষ করিয়া দিতে পারে না; তোমাকে নিজে নিজেই শিক্ষা-লাভ করিতে হইবে; তোমার উন্নতি তোমার নিজের ভিতর হইতেই হইবে।

বাহিরের শিক্ষাদাতা কি করিতে পারেন? তিনি অন্তরায়গুলি কিঞ্চিৎ অপসারিত করিতে পারেন মাত্র। ঐখানেই তাঁহার কর্তব্য শেষ। অতএব যদি পারো সহায়তা কর, কিন্তু বিনষ্ট করিও না। তুমি কাহাকেও

আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন করিতে পারো—এ ধারণা একেবারে পরিত্যাগ কর। ইহা অসম্ভব। তোমার নিজের আত্মা ব্যতীত তোমার অপর কোন শিক্ষাদাতা নাই, ইহা স্বীকার কর। তাহাতে কি ফল হয়? সমাজে আমরা নানাবিধ স্বভাবের লোক দেখি। সংসারে সহস্র সহস্র প্রকার মন- ও সংস্কারবিশিষ্ট লোক রহিয়াছে, তাহাদিগের সম্পূর্ণ সামান্যীকরণ অসম্ভব; কিন্তু আপাততঃ আমাদের সুবিধামত তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ উদ্যমশীল কর্মঠ ব্যক্তি; তিনি কর্ম করিতে চান; তাঁহার পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীতে বিপুল শক্তি রহিয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য কাজ করা—হাসপাতাল নির্মাণ করা, সৎকার্য করা, রাস্তা প্রস্তুত করা, কার্যপ্রণালী স্থির করা ও প্রতিষ্ঠান গঠন করা। দ্বিতীয়তঃ ভাবুক লোক—যিনি শিব ও সুন্দরকে অত্যধিক ভালবাসেন। তিনি সৌন্দর্যের চিন্তা করিতে, প্রকৃতির মনোরম দিকটি উপভোগ করিতে এবং প্রেম ও প্রেমময় ভগবান্‌কে পূজা করিতে ভালবাসেন। তিনি পৃথিবীর সকল সময়ের যাবতীয় মহাপুরুষ, ধর্মাচার্য ও ভগবানের অবতারগণকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসেন; খ্রীষ্ট অথবা বুদ্ধ বাস্তবিকই ছিলেন, এ-কথা যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হয় কি হয় না, তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন না; খ্রীষ্টের প্রদত্ত 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount) কবে প্রচারিত হইয়াছিল অথবা শ্রীকৃষ্ণ ঠিক কোন্ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা তিনি বিশেষ আবশ্যক মনে করেন না; তাঁহার নিকট তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব, তাঁহাদের মনোহর মূর্তিগুলি সমধিক আদরণীয়। ইহাই তাঁহার আদর্শ প্রেমিকের প্রকৃতি, ভাবুকের স্বভাবই এই প্রকার। তৃতীয়তঃ অতীন্দ্রিয়বাদী যোগী—তিনি নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে, মানবমনের ক্রিয়াসমূহ জানিতে, অন্তরে কি কি শক্তি কার্য করিতেছে এবং কিরূপে তাহাদিগকে জানা যায়, পরিচালিত করা যায় ও বশীভূত করা যায়—এই-সকল বিষয় তিনি জানিতে চান। ইহাই ঐ যোগীর (mystic) মনের স্বভাব। চতুর্থতঃ দার্শনিক—যিনি প্রত্যেকটি বিষয় মাপিয়া দেখিতে চান এবং মানবীয় দর্শনের পক্ষে যতদূর যাওয়া সম্ভব, তাহারও ঊর্ধ্বে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে লইয়া যাইতে চান।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যদি কোন ধর্মকে সর্বাপেক্ষা বেশী লোকের উপযোগী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার বিভিন্ন লোকের মনের উপযোগী

খাদ্য যোগানোর ক্ষমতা থাকা চাই ; এবং যে-ধর্মে এই ক্ষমতার অভাব, সেই ধর্মের অন্তর্গত সম্প্রদায়গুলি সবই একদেশী হইয়া পড়ে। মনে করুন, আপনি এমন কোন সম্প্রদায়ের নিকট গেলেন, যাহারা ভক্তি ও ভাবুকতা প্রচার করে, গান করে, কাঁদে এবং প্রেম প্রচার করে ; কিন্তু যখনই আপনি বলিলেন, 'বন্ধু, আপনি যাহা বলিতেছেন, সবই ঠিক, কিন্তু আমি চাই ইহা অপেক্ষাও শক্তিপ্রদ কিছু—আমি চাই একটু বুদ্ধিপ্রয়োগ, একটু দার্শনিকতা। আমি আরও বিচারপূর্বক বিষয়গুলি ধাপে ধাপে বুঝিতে চাই।' তাহারা তৎক্ষণাৎ বলিবে, 'দূর হও' এবং শুধু যে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিবে তাহা নয়, পারে তো আপনাকে একেবারে ভবপারে পাঠাইয়া দিবে। ফলে এই হয় যে, সেই সম্প্রদায় কেবল ভাবপ্রবণ লোকদিগকেই সাহায্য করিতে পারে। তাহারা অপরকে সাহায্য তো করেই না, পরন্তু তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে ; এবং এই ব্যাপারের সর্বাপেক্ষা নীতিবিগর্হিত দিকটা এই যে, সাহায্যের কথা দূরে থাকুক, অপরে যে অকপট হইতে পারে, ইহাও তাহারা বিশ্বাস করে না। এদিকে আবার দার্শনিকদের সম্প্রদায় আছে। তাঁহারা ভারত ও প্রাচ্যের জ্ঞানের বড়াই করেন এবং মনস্তত্ত্ববিষয়ক খুব লম্বা-চওড়া গালভরা শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু যদি আমার মতো একজন সাধারণ লোক তাঁহাদের নিকট গিয়া বলে, 'আমাকে ধার্মিক হওয়ার মতো কিছু কিছু উপদেশ দিতে পারেন কি?' তাহা হইলে তাঁহারা প্রথমেই একটু মুচকি হাসিয়া বলিবেন, 'ওহে, তুমি বুদ্ধিবৃত্তিতে এখনও আমাদের বহু নীচে। তুমি আধ্যাত্মিকতার কি বুঝিবে?' ইহারা বড় উঁচুদরের দার্শনিক। তাঁহারা তোমাকে শুধু বাহিরে যাইবার দরজা দেখাইয়া দিতে পারেন। আর এক দল আছেন, তাঁহারা যোগমার্গী (mystic)। তাঁহারা জীবের বিভিন্ন অবস্থা, মনের বিভিন্ন স্তর, মানসিক সিদ্ধির ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা তোমাকে বলিবেন এবং তুমি যদি সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহাকে বলো, 'আমাকে এমন কোন সদুপদেশ দিন, যাহা কার্যে পরিণত করিতে পারি। আমি অত কল্পনাপ্রিয় নই। আমার উপযোগী কিছু দিতে পারেন কি?' তাঁহারা হাসিয়া বলিবেন, 'নির্বোধটা কি বলে শোন ; কিছুই জানে না—আহাম্মকের জীবনই বৃথা।' পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ চলিতেছে। আমি এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের একটা

ঘরে একত্র পুরিয়া তাহাদের সুন্দর বিদ্রূপব্যঞ্জক হাস্যের আলোকচিত্র তুলিতে চাই।

ইহাই ধর্মের সমসাময়িক অবস্থা, ইহাই বর্তমান পরিস্থিতি। আমি এমন একটি ধর্ম প্রচার করিতে চাই, যাহা সকল প্রকার মনের উপযোগী হইবে—ইহা সমভাবে দর্শনমূলক, তুল্যরূপে ভক্তিপ্রবণ, সমভাবে 'মরমী' এবং কর্মপ্রেরণাময় হইবে। যদি কলেজ হইতে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ আসেন, তাঁহারা যুক্তিবিচার পছন্দ করিবেন। তাঁহারা যত পারেন বিচার করুন। শেষে তাঁহারা এমন এক স্থানে পৌঁছিবেন, যেখানে তাঁহাদের মনে হইবে যে, যুক্তিবিচারের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারেন না। তাঁহারা বলিয়া বসিবেন, 'ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি ভাবগুলি কুসংস্কার মাত্র—উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।' আমি বলি, 'হে দার্শনিকপ্রবর, তোমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ যে আরও বড় কুসংস্কার, এটিকে পরিত্যাগ কর। আহার করিবার জন্য আর গৃহে বা অধ্যাপনার জন্য তোমার দর্শনবিজ্ঞানের ক্লাসে যাইও না। শরীর ছাড়িয়া দাও এবং যদি না পারো, জীবনভিক্ষা চাহিয়া চুপ করিয়া ব'স।' কারণ যে দর্শন আমাদিগকে জগতের একত্ব ও বিশ্বময় একই সত্তার অস্তিত্ব শিক্ষা দেয়, সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার উপায় দেখাইবার সামর্থ্য ধর্মের থাকা আবশ্যক। সেইরূপ যদি 'মরমী' যোগী কেহ আসেন, আমরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈজ্ঞানিক ভাবে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দিতে ও হাতে-কলমে তাহা করিয়া দেখাইতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিব। যদি ভক্ত লোক আসেন, আমরা তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া ভগবানের নামে হাসিব ও কাঁদিব; আমরা 'প্রেমের পেয়ালা পান করিয়া মত্ত হইয়া যাইব।' যদি একজন উদ্যমশীল কর্মী আসেন, আমরা তাঁহার সহিত যথাসাধ্য কর্ম করিব। এই প্রকার সমন্বয়ই সার্বভৌম ধর্মের নিকটতম আদর্শ হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় যদি সকল লোকের মনেই এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের প্রত্যেকটি ভাবই পূর্ণমাত্রায় অথচ সমভাবে বিদ্যমান থাকিত, তবে কি সুন্দরই না হইত! ইহাই আদর্শ, ইহাই আমার পূর্ণ মানবের আদর্শ। যাহাদের চরিত্রে এই ভাবগুলির একটি বা দুইটি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে একদেশী বলি এবং সমস্ত জগৎই সেইরূপ একদেশদর্শী মানুষে পরিপূর্ণ এবং তাহারা কেবল সেই রাস্তাটিই

জানে, যাহাতে নিজেরা চলাফেরা করে; এতদ্ব্যতীত অপর যাহা কিছু সমস্তই তাহাদের নিকট বিপজ্জনক ও জঘন্য। এই চারিটি দিকে সামঞ্জস্যের সহিত বিকাশলাভ করাই আমার প্রস্তাবিত ধর্মের আদর্শ এবং ভারতবর্ষে আমরা যাহাকে 'যোগ' বলি, তাহা দ্বারাই এই আদর্শ ধর্ম লাভ করা যায়। কর্মীর দৃষ্টিতে ইহার অর্থ ব্যক্তির সহিত সমগ্র মানবজাতির অভেদ ভাব; 'মরমী'র দৃষ্টিতে ইহার অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সাধন; ভক্তের নিকট ইহার অর্থ নিজের সহিত প্রেমময় ভগবানের মিলন এবং জ্ঞানীর নিকট ইহার অর্থ নিখিল সত্তার ঐক্য বোধ। 'যোগ' শব্দে ইহাই বুঝায়। ইহা একটি সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কৃতে এই চারিপ্রকার যোগের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যিনি এই প্রকার যোগসাধন করিতে চান, তিনিই 'যোগী'। যিনি কর্মের মধ্য দিয়া এই যোগসাধন করেন, তাঁহাকে 'কর্মযোগী' বলে। যিনি প্রেমের মধ্য দিয়া এই যোগসাধন করেন, তাঁহাকে 'ভক্তিযোগী' বলে। ধ্যানধারণার মধ্য দিয়া সাধন করেন, তাঁহাকে 'রাজযোগী' বলে। যিনি জ্ঞানবিচারের মধ্য দিয়া এই যোগসাধন করেন, তাঁহাকে 'জ্ঞানযোগী' বলে। অতএব 'যোগী' বলিতে ইঁহাদের সকলকেই বুঝায়।

এখন প্রথমে 'রাজযোগের' কথা ধরি। এই রাজযোগ—এই মনঃসংযোগের ব্যাপারটা কি? ইংলণ্ডে আপনারা 'যোগ' কথাটির সহিত ভূত প্রেত প্রভৃতি নানারকমের কিম্ভূতকিমাকার ধারণা জড়াইয়া রাখিয়াছেন। অতএব প্রথমেই আপনাদিগকে ইহা বলিয়া রাখা আমার কর্তব্য বোধ হইতেছে যে, যোগের সহিত ইহাদের কোনই সংস্রব নাই। এইগুলির মধ্যে কোন যোগেই তোমাকে যুক্তিবিচার পরিত্যাগ করিতে, অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইতে অথবা পুরোহিতকুল যে-কোন পর্যায়েরই হউন না কেন, তাঁহাদের হাতে তোমার বিচারশক্তি সমর্পণ করিতে বলে না। কোন যোগই বলে না যে, তোমাকে কোন অতিমানুষ ঈশদূতের নিকট সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যেকেই বলে, তুমি তোমার বিচারশক্তিকে দৃঢ়ভাবে ধর, তাহাতেই লাগিয়া থাকো। আমরা সকল প্রাণীর মধ্যেই জ্ঞানলাভের তিন প্রকার উপায় দেখিতে পাই। প্রথম সহজাত জ্ঞান, যাহা জীবজন্তুর মধ্যেই বিশেষ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা জ্ঞানলাভের সর্বনিম্ন উপায়। দ্বিতীয় উপায় কি? বিচারশক্তি। মানুষের মধ্যেই ইহার সমধিক বিকাশ দেখিতে

পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সহজাত জ্ঞান একটি অসম্পূর্ণ উপায়। জীবজন্তু সকলের কার্যক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ এবং এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই সহজাত জ্ঞান কার্য করে। মানুষের বেলায় দেখা যায়, এই সহজাত জ্ঞান বহুলভাবে বিচার-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কার্যক্ষেত্রও বাড়িয়া গিয়াছে। তথাপি এই বিচারশক্তিরও যথেষ্ট অপ্রাচুর্য রহিয়াছে। বিচারশক্তি কিছুদূর পর্যন্তই মাত্র অগ্রসর হইতে পারে, তারপর সে থামিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে পারে না; এবং যদি তুমি ইহাকে বেশী দূর চালাইতে চেষ্টা কর, তবে তাহার ফলে এক দুরপনেয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, যুক্তি নিজেই অযুক্তিতে পরিণত হয়। যুক্তি তখন চক্রাকারে চলিতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের প্রত্যক্ষের মূলীভূত কারণ জড় ও শক্তির কথাই ধরুন। জড় কি? যাহার উপর শক্তি ক্রিয়া করে। শক্তি কি? যাহা জড়ের উপর ক্রিয়া করে। এই-সব কথায় গোলমালটা কোথায়, তাহা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন। ন্যায়শাস্ত্রবিদ্‌গণ ইহাকে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ বলেন—একটির (অর্থাৎ জড়ের) ধারণার জন্য অপরটির (অর্থাৎ শক্তির) উপর নির্ভর করিতে হইতেছে; আবার অপরটির (শক্তির) ধারণার জন্য প্রথমটির (জড়ের) উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। সুতরাং আপনারা যুক্তির সম্মুখে এক প্রবল বাধা দেখিতে পাইতেছেন, যাহাকে অতিক্রম করিয়া যুক্তি আর অগ্রসর হইতে পারে না। তথাপি এই বাধার অপর প্রান্তে যে অনন্তের রাজ্য রহিয়াছে, সেখানে পৌঁছাইতে যুক্তি সর্বদা ব্যস্ত। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মনের বিষয়ীভূত এই জগৎ, এই নিখিল বিশ্ব আমাদের বুদ্ধিভূমির উপর প্রতিফলিত, সেই অনন্তের এক কণিকামাত্র এবং বুদ্ধিরূপ জাল দ্বারা বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে আমাদের বিচারশক্তি কার্য করে—তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। সুতরাং ইহার বাহিরে যাইবার জন্য আমাদের অপর কোন উপায়ের প্রয়োজন —প্রজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় বোধ। অতএব সহজাত জ্ঞান, বিচারশক্তি ও অতীন্দ্রিয় বোধ—এই তিনটিই জ্ঞানলাভের উপায়। পশুতে সহজাত জ্ঞান, মানুষে বিচার-শক্তি ও দেবমানবে অতীন্দ্রিয় বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল মানুষের ভিতরেই এই তিনটি শক্তির বীজ অল্পবিস্তর পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। এই-সকল মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে হইলে উহাদের বীজগুলিও অবশ্যই মানবমনে থাকা চাই, এবং ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, একটি শক্তি

অপরটির বিকশিত অবস্থা মাত্র; সুতরাং তাহারা পরস্পর-বিরোধী নয়। বিচারশক্তিই পরিস্ফুট হইয়া অতীন্দ্রিয় বোধে পরিণত হয়; সুতরাং অতীন্দ্রিয় বোধ বিচারশক্তির পরিপন্থী নয়, পরন্তু তাহার পরিপূরক। যে-সকল স্থলে বিচারশক্তি পৌঁছিতে পারে না, অতীন্দ্রিয় বোধ তাহাদিগকেও উদ্ভাসিত করে, এবং তাহারা বুদ্ধির বিরোধী হয় না। বার্ধক্য বালকত্বের বিরোধী নয়, পরন্তু তাহার পরিণতি। অতএব তোমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, নিম্নশ্রেণীর জ্ঞানোপায়কে উচ্চশ্রেণীর উপায় বলিয়া ভুলকরা-রূপ ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অনেক সময়ে সহজাত জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বোধ বলিয়া জগতে চালাইয়া দেওয়া হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যদ্বক্তা সাজিবার সকল প্রকার মিথ্যা দাবি আসিয়া পড়ে। একজন নির্বোধ অথবা অর্ধোন্মাদ ব্যক্তি মনে করে যে, তাহার মস্তিষ্কে যে-সকল পাগলামি চলিতেছে, সেগুলিও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং সে চায় লোকে তাহার অনুসরণ করুক। জগতে সর্বাপেক্ষা পরস্পর-বিরোধী যত প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বিকৃতমস্তিষ্ক কতগুলি উন্মাদের সহজাত জ্ঞানানুযায়ী প্রলাপবাক্যকে অতীন্দ্রিয়-বোধের ভাষা বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃত শিক্ষার প্রথম লক্ষণ এই হওয়া চাই যে, ইহা কখনও যুক্তিবিরোধী হইবে না; এবং আপনারা দেখিতে পাইবেন, উল্লিখিত সকল যোগ এই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে রাজযোগের কথা ধরা যাক। রাজযোগ মনস্তত্ত্ববিষয়ক যোগ, মনোবৃত্তির সহায় অবলম্বনে পরমাত্মযোগে পৌঁছিবার উপায়। বিষয়টি খুব বড়; তাই আমি এক্ষণে এই 'যোগে'র মূল ভাবটিই আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। জ্ঞানলাভ করিবার আমাদের একটি মাত্র উপায় আছে। নিম্নতম মনুষ্য হইতে সর্বোচ্চ 'যোগী' পর্যন্ত সকলকেই সেই এক উপায় অবলম্বন করিতে হয়—একাগ্রতাই এই উপায়। রসায়নবিদ্ যখন তাঁহার পরীক্ষাগারে (Laboratory) কাজ করেন, তখন তিনি তাঁহার মনের সমস্ত শক্তি সংহত করেন, উহাকে এককেন্দ্রিক করেন, এবং সেই শক্তিকে পদার্থবিশেষের উপর প্রয়োগ করেন। তখন ঐ পদার্থের সংগঠক ভূতবর্গ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং এইরূপে তিনি তাহাদের জ্ঞানলাভ করেন। জ্যোতির্বিদ্‌ও তাঁহার সমুদয় মনঃশক্তিকে সংহত করিয়া তাহাকে এককেন্দ্রিক করেন; তারপর তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া ঐ শক্তিকে বস্তুর উপর

প্রয়োগ করেন ; তখন নক্ষত্রনিচয় ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল ঘুরিয়া তাঁহার দিকে আসে এবং নিজ নিজ রহস্য তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত করে। অধ্যাপনারত আচার্যই বলো, অথবা পাঠনিরত ছাত্রই বলো, যেখানে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সকলের পক্ষে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন, উহা যদি আপনাদের ভাল লাগে, তবে আপনাদের মন উহার প্রতি একাগ্র হইবে ; তখন যদি একটা ঘড়ি বাজে, আপনারা তাহা শুনিতে পাইবেন না, কারণ আপনাদের মন তখন অন্য বিষয়ে একাগ্র হইয়াছে। আপনাদের মনকে যতই একাগ্র করিতে সক্ষম হইবেন, ততই আপনারা আমার কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন, এবং আমিও আমার প্রেম ও শক্তিসমূহকে যতই একাগ্র করিব, ততই আমার বক্তব্য বিষয়টি আপনাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইতে সক্ষম হইব। এই একাগ্রতা যত অধিক হইবে, মানুষ তত অধিক জ্ঞানলাভ করিবে, কারণ ইহাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। এমন কি, অতি নীচ মুচিও যদি একটু বেশী মনঃসংযোগ করে, তাহা হইলে সে তাহার জুতাগুলি আরও ভাল করিয়া বুরুশ করিবে ; পাচক একাগ্র হইলে তাহার খাদ্য আরও ভাল করিয়া রন্ধন করিবে। অর্থোপার্জনই হউক অথবা ভগবদারাধনাই হউক—যে কাজে মনের একাগ্রতা যত অধিক হইবে, কাজটি ততই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। কেবল এইভাবে ডাকিলে বা এইভাবে করাঘাত করিলেই প্রকৃতির ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় এবং জগৎ আলোক-বন্যায় প্লাবিত হয়। ইহাই—এই একাগ্রতা-শক্তিই জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের একমাত্র উপায়। রাজযোগে প্রায় এই বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের বর্তমান শারীরিক অবস্থায় আমরা এতই বিক্ষুব্ধ রহিয়াছি যে, আমাদের মন শত বিষয়ে তাহার শক্তি বৃথা ক্ষয় করিতেছে। যখনই আমি বাজে চিন্তা বন্ধ করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য কোন বিষয়ে মনঃস্থির করিতে চেষ্টা করি, তখনই শতসহস্র অবাঞ্ছিত আলোড়ন মস্তিষ্কে দ্রুত উত্থিত হইয়া, শতসহস্র চিন্তা যুগপৎ মনে উদিত হইয়া উহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। কিরূপে ঐ-গুলি নিবারণ করিয়া মন বশে আনিতে পারা যায়, তাহাই রাজযোগের একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

এক্ষণে কর্মযোগের অর্থাৎ কর্মের মধ্য দিয়া ভগবান্-লাভের কথা ধরা যাক। সংসারে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কোন

না কোন প্রকার কাজ করিতেই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের মন শুধু চিন্তার রাজ্যেই একাগ্র হইয়া থাকিতে পারে না—তাহারা বোঝে কেবল কাজ—যা চোখে দেখা যায় এবং হাতে করা যায়। এই প্রকার লোকের জন্যও একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন কর্ম করিতেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই অধিকাংশ শক্তির অপব্যবহার করিয়া থাকে; কারণ আমরা কর্মের রহস্য জানি না। কর্মযোগ এই রহস্যটি বুঝাইয়া দেয় এবং কোথায় কিভাবে কার্য করিতে হইবে, উপস্থিত কর্মে কিভাবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক ফললাভ হইবে, তাহা শিক্ষা দেয়। কিন্তু এই রহস্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কর্মের বিরুদ্ধে—'উহা দুঃখজনক' এই বলিয়া যে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করা হয়, আমাদিগকে তাহারও বিচার করিতে হইবে। সমুদয় দুঃখ-কষ্ট আসক্তি হইতে আসে। আমি কাজ করিতে চাই—আমি কোন লোকের উপকার করিতে চাই; এবং শতকরা নব্বইটি স্থলেই দেখা যায় যে, আমি যাহাকে সাহায্য করিয়াছি, সেই ব্যক্তি সমস্ত উপকার ভুলিয়া আমার শত্রুতা করে; ফলে আমাকে কষ্ট পাইতে হয়। এবংবিধ ঘটনার ফলেই মানুষ কর্ম হইতে বিরত হয় এবং এই দুঃখকষ্টের ভয়ই মানবের কর্ম ও উদ্যমের অনেকটা নষ্ট করিয়া দেয়। কাহাকে সাহায্য করা হইতেছে, এবং কোন্ প্রয়োজনে সাহায্য করা হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া অনাসক্তভাবে শুধু কর্তব্যবোধে কর্ম করিতে হয়, কর্মযোগ তাহাই শিক্ষা দেয়। কর্মযোগী কর্ম করেন, কারণ উহা তাঁহার স্বভাব, তিনি প্রাণে প্রাণে বোধ করেন, এরূপ করা তাঁহার পক্ষে কল্যাণজনক—ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তিনি জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করেন, কখনও কিছু প্রত্যাশা করেন না। তিনি জ্ঞাতসারে দান করিয়াই যান, কিন্তু প্রতিদান-স্বরূপ কিছুই চান না। সুতরাং তিনি দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পান। যখনই দুঃখ আমাদিগকে গ্রাস করে, তখনই বুঝিতে হইবে, উহা 'আসক্তির' প্রতিক্রিয়া মাত্র।

অতঃপর ভাবপ্রবণ বা প্রেমিক লোকদিগের জন্য ভক্তিযোগ। ভক্ত ভগবান্‌কে ভালবাসিতে চান, তিনি ধর্মের অঙ্গরূপে ক্রিয়া-কলাপের এবং পুষ্প, গন্ধ, সুরম্য মন্দির, মূর্তি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের উপর নির্ভর করেন

এবং সাধনায় তাহাদের প্রয়োগ করেন। আপনারা কি বলিতে চান, তাঁহারা ভুল করেন? আমি আপনাদিগকে একটি সত্য কথা বলিতে চাই, তাহা আপনাদের—বিশেষতঃ এই দেশে—মনে রাখা ভাল। যে-সকল ধর্ম-সম্প্রদায় অনুষ্ঠান ও পৌরাণিক তত্ত্বসম্পদে সমৃদ্ধ, তাহাদের মধ্য হইতেই জগতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর যে-সকল সম্প্রদায় কোন প্রতীক বা অনুষ্ঠানবিশেষের সহায়তা ব্যতীত ভগবান-লাভের চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা ধর্মের যাহা কিছু সুন্দর ও মহান্ সমস্ত নির্মম-ভাবে পদদলিত করিয়াছে। খুব ভাল চক্ষে দেখিলেও তাহাদের ধর্ম গোঁড়ামি মাত্র, এবং শুষ্ক। জগতের ইতিহাস ইহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং এই-সকল অনুষ্ঠান ও পুরাণাদিকে গালি দিও না। যে-সকল লোক ঐগুলি লইয়া থাকিতে চায়, তাহারা ঐগুলি লইয়া থাকুক। তোমরা অযথা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিও না, 'তাহারা মূর্খ, উহা লইয়াই থাকুক।' তাহা কখনই নয়; আমি জীবনে যে-সকল আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই এই-সকল অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন। আমি নিজেকে তাঁহাদের পদতলে বসিবার যোগ্য মনে করি না, আবার আমি কিনা তাঁহাদের সমালোচনা করিতে যাইব! এই সমুদয় ভাব মানবমনে কিরূপ কার্য করে, এবং তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি আমার গ্রাহ্য, কোন্‌টি ত্যাজ্য, তাহা আমি কিরূপে জানিব? আমরা উচিত অনুচিত বিচার না করিয়াই পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের সমালোচনা করিয়া থাকি। লোকে এই-সকল সুন্দর সুন্দর উদ্দীপনাপূর্ণ পুরাণাদি যত ইচ্ছা গ্রহণ করুক; কারণ আপনাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, ভাবপ্রবণ লোকেরা সত্যের কতকগুলি নীরস সংজ্ঞা মাত্র লইয়া থাকিতে মোটেই পছন্দ করেন না। ভগবান্ তাঁহাদের নিকট 'ধরা-ছোঁয়ার' বস্তু, তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু। তাঁহারা ভগবান্‌কে অনুভব করেন, তাঁহার কথা শোনেন, তাঁহাকে দেখেন ভালবাসেন। তাঁহারা তাঁহাদের ভগবান্ লাভ করুন। তোমরা যুক্তি-বাদীরা, ভক্তের চক্ষে সেইরূপ নির্বোধ—যেমন কোন ব্যক্তি একটি সুন্দর মূর্তি দেখিলে তাহাকে চূর্ণ করিয়া বুঝিতে চায় উহা কি পদার্থে নির্মিত। 'ভক্তিযোগ' তাহাদিগকে কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছাড়িয়া ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়; লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা কিংবা অন্য কোন কামনার জন্য নয়,

কিন্তু মঙ্গলময়কে মঙ্গলময়রূপে, এবং ভগবান্‌কে ভগবান্‌রূপে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়। প্রেমই প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান এবং ভগবান্‌ই প্রেমস্বরূপ—ইহাই ভক্তিযোগের শিক্ষা। ভক্তিযোগ তাঁহাদিগকে ভগবান্ সৃষ্টিকর্তা, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, শাস্তা এবং পিতা ও মাতা বলিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয়ের সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতে শিক্ষা দেয়। মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে অথবা মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে যে সর্বোচ্চ ধারণা করিতে পারে, তাহা এই যে, তিনি প্রেমের ঈশ্বর। 'যেখানেই কোন প্রকার ভালবাসা রহিয়াছে, তাহাই তিনি।' যেখানে এতটুকু প্রেম, তাহা তিনিই, ঈশ্বর সেখানে বিরাজমান, স্বামী যখন স্ত্রীকে চুম্বন করেন, সে চুম্বনে তিনিই বিদ্যমান; মাতা যখন শিশুকে চুম্বন করেন, সেখানেও তিনি বিদ্যমান; বন্ধুগণের করমর্দনে সেই প্রভুই প্রেমময় ভগবান্‌রূপে বিদ্যমান।' যখন কোন মহাপুরুষ মানবজাতিকে ভালবাসিয়া তাহাদের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রভুই তাঁহার প্রেমভাণ্ডার হইতে মুক্তহস্তে ভালবাসা বিতরণ করিতেছেন। যেখানেই হৃদয়ের বিকাশ হয়, সেখানেই তাঁহার প্রকাশ। 'ভক্তিযোগ' এই-সকল কথাই শিক্ষা দেয়।

সর্বশেষে আমরা 'জ্ঞানযোগীর' কথা আলোচনা করিব; তিনি দার্শনিক ও চিন্তাশীল, তিনি এই দৃশ্য-জগতের পারে যাইতে চান। তিনি এই সংসারের তুচ্ছ জিনিস লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নন। তিনি আমাদের পানাহারাদি প্রাত্যহিক কার্যাবলীর পারে যাইতে চান; সহস্র সহস্র পুস্তকও তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে না; এমন কি সমুদয় জড়বিজ্ঞানও তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, কারণ বড় জোর এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটি তাঁহার জ্ঞানগোচর করিতে পারে। এমন আর কি আছে, যাহা তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে পারে? কোটি কোটি সৌরজগৎ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; তাঁহার চক্ষে তাহারা অস্তিত্বের সমুদ্রে বিন্দুমাত্র। তাঁহার আত্মা এই-সকলের পারে যাইয়া সকল অস্তিত্বের যাহা সার, সেই সত্যকে স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া, সেই বিরাট সত্তার সহিত অভিন্ন হইয়া তাঁহাতেই ডুবিয়া যাইতে চায়। ইহাই হইল জ্ঞানীর ভাব। তাঁহার মতে ভগবান্‌কে জগতের পিতা, মাতা, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পথপ্রদর্শক ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করা মোটেই

সম্ভব নয়। তিনি ভাবেন, ভগবান্ তাঁহার প্রাণের প্রাণ, তাঁহার আত্মার আত্মা। ভগবান্ তাঁহার নিজেরই আত্মা। ভগবান্ ছাড়া আর কোন বস্তুই নাই। তাঁহার যাবতীয় নশ্বর অংশ বিচারের প্রবল আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া যায়, অবশেষে যাহা সত্যসত্যই থাকে, তাহাই পরমাত্মা স্বয়ং।

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥'[১]

একই গাছে দুইটি পাখি রহিয়াছে—একটি উপরে, একটি নীচে। উপরের পাখিটি স্থির, নির্বাক, মহান্, নিজের মহিমায় নিজে বিভোর; নীচের ডালের পাখিটি কখনও সুমিষ্ট, কখনও তিক্ত ফল খাইতেছে, এক ডাল হইতে আর এক ডালে লাফাইয়া উঠিতেছে এবং পর্যায়ক্রমে নিজেকে সুখী ও দুঃখী বোধ করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে নীচের পাখিটি একটি অতি মাত্রায় তিক্ত ফল খাইল এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়া উপরের দিকে তাকাইল এবং অপর পাখিটিকে দেখিতে পাইল—সেই অপূর্ব সোনালি রঙের পাখাওয়ালা পাখিটি—সে মিষ্ট বা তিক্ত কোন ফলই খায় না এবং নিজেকে সুখী বা দুঃখীও মনে করে না, পরন্তু প্রশান্তভাবে আপনাতে আপনি থাকে—নিজের আত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না। নীচের পাখিটি ঐরূপ অবস্থা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কিন্তু শীঘ্রই ইহা ভুলিয়া গিয়া আবার ফল খাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল পরে সে আবার একটা অতি তিক্ত ফল খাইল। তাহাতে তাহার মনে অতিশয় দুঃখ হইল এবং সে পুনরায় উপরের দিকে তাকাইল এবং উপরের পাখিটির কাছে যাইবার চেষ্টা করিল। আবার সে এ-কথা ভুলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় উপরের দিকে তাকাইল। বারবার এইরূপ করিতে করিতে সে অবশেষে সুন্দর পাখিটির

১ মুণ্ডক উপ., ৩।১।১-৩; শ্বেঃ উপ., ৪।৬-৭

খুব নিকটে আসিয়া পৌঁছিল এবং দেখিল অপর পক্ষীর পক্ষ হইতে জ্যোতির ছটা আসিয়া তাহার নিজ দেহের চতুর্দিকে পড়িয়াছে। সে এক পরিবর্তন অনুভব করিল—যেন সে মিলাইয়া যাইতেছে; সে আরও নিকটে আসিল, দেখিল তাহার চারিদিকে যাহা কিছু ছিল সমস্তই অদৃশ্য—অন্তর্হিত হইতেছে। অবশেষে সে এই অদ্ভুত পরিবর্তনের অর্থ বুঝিল। নীচের পাখিটি যেন উপরের পাখিটির স্থূলরূপে প্রতীয়মান ছায়া মাত্র—প্রতিবিম্ব মাত্র ছিল। সে নিজে বরাবর স্বরূপতঃ সেই উপরের পাখিই ছিল। নীচের ছোট পাখিটির এই মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাওয়া এবং পর পর সুখদুঃখ বোধ করা—এই সবই মিথ্যা—স্বপ্ন মাত্র; সেই প্রশান্ত, নির্বাক্, মহিমময়, শোকদুঃখাতীত উপরের পাখিটিই সর্বক্ষণ বিদ্যমান ছিল। উপরের পাখিটি ঈশ্বর, পরমাত্মা—জগতের প্রভু; এবং নীচের পাখিটি জীবাত্মা—এই জগতের সুখদুঃখরূপ বিষ ও তিক্ত ফলসমূহের ভোক্তা। মধ্যে মধ্যে জীবাত্মার উপর প্রবল আঘাত আসে; সে কিছুক্ষণের জন্য ফলভোগ বন্ধ করিয়া সেই অজ্ঞাত ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাহার হৃদয়ে সহসা জ্ঞানজ্যোতির প্রকাশ হয়। সে তখন মনে করে, এই জগৎ মিথ্যা দৃশ্যজাল মাত্র। কিন্তু পুনরায় ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে বহির্জগতে টানিয়া নামাইয়া আনে এবং সেও পূর্বের ন্যায় এই জগতের ভালমন্দ ফল ভোগ করিতে থাকে। আবার সে এক অতি কঠোর আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং আবার তাহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হইয়া দিব্য জ্ঞানালোক প্রবেশ করে। এইরূপে ধীরে ধীরে সে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় এবং যতই সে নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই দেখিতে পায়, তাহার 'কাঁচা আমি' স্বতই লীন হইয়া যাইতেছে। যখন সে খুব নিকটে আসিয়া পড়ে, তখন দেখিতে পায়, সে নিজেই পরমাত্মা এবং বলিয়া উঠে, 'যাঁহাকে আমি তোমাদিগের নিকট জগতের জীবন এবং অণুপরমাণুতে ও চন্দ্র-সূর্যে বিদ্যমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তিনি আমাদের এই জীবনের অবলম্বন—আমাদের আত্মার আত্মা। শুধু তাই নয়, তুমিই সেই—তত্ত্বমসি।' 'জ্ঞানযোগ' আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয়। ইহা মানুষকে বলে, তুমি স্বরূপতঃ পরমাত্মা। ইহা মানুষকে প্রাণিজগতের মধ্যে যথার্থ একত্ব দেখাইয়া দেয়—আমাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়া স্বয়ং প্রভুই এই জগতে প্রকাশ পাইতেছেন। অতি সামান্য পদদলিত কীট হইতে যাঁহাদিগকে আমরা সবিস্ময়ে হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা

অর্পণ করি, সেই-সব শ্রেষ্ঠ জীব পর্যন্ত সকলেই সেই এক পরমাত্মার প্রকাশ মাত্র।

শেষ কথা এই যে, এই-সকল বিভিন্ন যোগ আমাদিগকে কার্যে পরিণত করিতেই হইবে; কেবল তাহাদের সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিলে চলিবে না। 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—প্রথমে এগুলি সম্বন্ধে শুনিতে হইবে, পরে শ্রুত বিষয়গুলি চিন্তা করিতে হইবে। আমাদিগকে সেগুলি বেশ বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে—যেন আমাদের মনে তাহাদের একটা ছাপ পড়ে। অতঃপর তাহাদিগকে ধ্যান এবং উপলব্ধি করিতে হইবে—যে পর্যন্ত না আমাদের সমস্ত জীবনটাই তদ্ভাবভাবিত হইয়া উঠে। তখন ধর্ম জিনিসটা আর শুধু কতকগুলি ধারণা বা মতবাদের সমষ্টি অথবা বুদ্ধির সায় মাত্র হইয়া থাকিবে না। তখন ইহা আমাদের জীবনের সহিত এক হইয়া যাইবে। বুদ্ধির সায় দিয়া আজ আমরা অনেক মূর্খতাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া কালই হয়তো আবার সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন করিতে পারি। কিন্তু যথার্থ ধর্ম কখনই পরিবর্তিত হয় না। ধর্ম অনুভূতির বস্তু—উহা মুখের কথা বা মতবাদ বা যুক্তিমূলক কল্পনা মাত্র নয়—তাহা যতই সুন্দর হউক না কেন। ধর্ম—জীবনে পরিণত করিবার বস্তু, শুনিবার বা মানিয়া লইবার জিনিস নয়; সমস্ত মনপ্রাণ বিশ্বাসের বস্তুর সহিত এক হইয়া যাইবে। ইহাই ধর্ম।

বিশ্বজনীন ধর্মলাভের উপায়

১৯০০ খৃঃ ২৮শে জানুআরি ক্যালিফর্নিয়ার প্যাসাডেনাস্থিত ইউনিভার্সালিস্ট চার্চে প্রদত্ত।

যে-অনুসন্ধানের ফলে আমরা ভগবানের নিকট হইতে আলো পাই, মনুষ্য-হৃদয়ের নিকট তদপেক্ষা প্রিয়তর অনুসন্ধান আর নাই। কি অতীত কালে, কি বর্তমান কালে 'আত্মা' 'ঈশ্বর' ও 'অদৃষ্ট' সম্বন্ধে আলোচনায় মানুষ যত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে, অন্য কোন আলোচনায় তত করে নাই। আমরা আমাদের দৈনিক কাজ-কর্ম, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমাদের কর্তব্য প্রভৃতি লইয়া যতই ডুবিয়া থাকি না কেন, আমাদের সর্বাপেক্ষা কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যেও কখন কখন এমন একটি বিরাম-মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন মন সহসা থামিয়া যায় এবং এই জগৎপ্রপঞ্চের পারে কি আছে, তাহা জানিতে চায়। কখন কখন সে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কিছু কিছু আভাস পায় এবং ফলে তাহা পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকে। সর্বকালে সর্বদেশে এইরূপ ঘটিয়াছে। মানুষ অতীন্দ্রিয় বস্তুর দর্শন লাভ করিতে চাহিয়াছে, নিজেকে বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, এবং যাহা কিছু আমাদের নিকট উন্নতি বা ক্রমাভিব্যক্তি নামে পরিচিত, তাহা সর্বকালে মানবজীবনের চরম গতি—ঈশ্বরানুসন্ধানের তুলাদণ্ডে পরিমিত হইয়াছে।

আমাদের সামাজিক জীবনসংগ্রাম যেমন বিভিন্ন জাতির বিবিধ প্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি মানবের আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রামও বিভিন্ন ধর্ম-অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেরূপ সর্বদাই পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ এই ধর্মসম্প্রদায়গুলিও সর্বদা পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রামে রত। কোন এক বিশেষ সমাজসংস্থার অন্তর্ভুক্ত লোকেরা দাবি করে যে, একমাত্র তাহাদেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এবং তাহারা যতক্ষণ পারে দুর্বলের উপর অত্যাচার করিয়া সেই অধিকার বজায় রাখিতে চায়। আমরা জানি, এইরূপ একটি ভীষণ সংগ্রাম বর্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিতেছে। সেইরূপ প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ও এইপ্রকার দাবি করিয়া আসিয়াছে যে, শুধু তাহারই বাঁচিয়া থাকিবার

অধিকার আছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, যদিও ধর্ম মানবজীবনে যতটা মঙ্গলবিধান করিয়াছে, অপর কিছুই তাহা পারে নাই, তথাপি ধর্ম আবার যেরূপ বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে, আর কিছুই এমন করে নাই। ধর্মই সর্বাপেক্ষা অধিক শান্তি ও প্রেম বিস্তার করিয়াছে, আবার ধর্মই সর্বাপেক্ষা ভীষণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্মই মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক স্পষ্টরূপে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আবার ধর্মই মানুষে মানুষে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক শত্রুতা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্মই মানুষের—এমন কি পশুর জন্য পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে, আবার ধর্মই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে। আবার আমরা ইহাও জানি যে, সব সময়েই ফল্গুধারার ন্যায় আর একটা চিন্তাস্রোতও চলিয়াছে; সব সময়েই বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় রত এমন অনেক তত্ত্বান্বেষী বা দার্শনিক রহিয়াছেন, যাঁহারা এই সকল পরস্পর-বিবদমান ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর শান্তি স্থাপন করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। কোন কোন দেশে এই চেষ্টা সফল হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর দিক হইতে দেখিতে গেলে উহা ব্যর্থ হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে কতকগুলি ধর্ম প্রচলিত আছে, যেগুলির মধ্যে এই ভাবটি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান যে, সকল সম্প্রদায়ই বাঁচিয়া থাকুক; কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কোন একটি নিজস্ব তাৎপর্য, কোন একটি মহান্ ভাব আছে, কাজেই উহা জগতের কল্যাণের জন্য আবশ্যক এবং উহাকে পোষণ করা উচিত। বর্তমান কালেও এই ধারণাটি আধিপত্য লাভ করিতেছে এবং ইহাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টাও চলিতেছে। এই-সকল চেষ্টা সকল সময়ে আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় না, বা যোগ্যতা দেখাইতে পারে না। শুধু তাই নয়, বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, আমরা আরও ঝগড়া বাড়াইয়া তুলিতেছি।

এক্ষণে ধর্মান্ধ মতবাদ অবলম্বনে আলোচনা ছাড়িয়া বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণ বিচারবুদ্ধি অবলম্বন করিলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান ধর্মে একটা প্রবল জীবনীশক্তি রহিয়াছে। কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে, তাঁহারা এ-বিষয়ে কিছু জানেন না, কিন্তু অজ্ঞতার কথা তুলিয়া

নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যদি কোন লোক বলে, 'বহির্জগতে কি হইতেছে না হইতেছে, আমি কিছুই জানি না, অতএব বহির্জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলই মিথ্যা', তাহা হইলে তাহাকে মার্জনা করা চলে না। তখন আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সমগ্র জগতে অধ্যাত্মচিন্তার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ অবগত আছেন যে, পৃথিবীর একটিও মুখ্য ধর্ম মরে নাই ; শুধু তাই নয়, এগুলির প্রত্যেকটিই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, হিন্দুরা বিস্তার লাভ করিতেছে এবং ইহুদীগণও সংখ্যায় অধিক হইতেছে, এবং সংখ্যায় তাহারা দ্রুত বর্ধিত হইয়া সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ায় ইহুদীধর্মের গণ্ডি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

একটিমাত্র ধর্ম—একটি প্রধান প্রাচীন ধর্ম ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়াছে। তাহা প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম—জরথুষ্ট্র-ধর্ম। মুসলমানদের পারস্যবিজয়কালে প্রায় এক লক্ষ পারস্যবাসী ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের কেহ কেহ প্রাচীন পারস্যদেশেই থাকিয়া গিয়াছিল। যাহারা পারস্যে ছিল, তাহারা ক্রমাগত মুসলমানদিগের নির্যাতনের ফলে ক্ষয় পাইতে পাইতে এখন বড়জোর দশ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। ভারতে তাহাদের সংখ্যা প্রায় আশি হাজার ; কিন্তু তাহারা আর বাড়িতেছে না। অবশ্য গোড়াতেই তাহাদিগের একটি অসুবিধা রহিয়াছে—তাহারা অপর কাহাকেও নিজেদের ধর্মভুক্ত করে না। আবার ভারতে এই মুষ্টিমেয় সমাজেও স্বগোত্রীয় নিকট-সম্পর্কীয়দের মধ্যে বিবাহরূপ ঘোরতর অনিষ্টকর প্রথা প্রচলিত থাকায় তাহারা বৃদ্ধি পাইতেছে না। এই একটিমাত্র ধর্ম ব্যতীত অপর সকল প্রধান প্রধান ধর্মই জীবিত রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টি-লাভ করিতেছে। আর আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্মই অতি পুরাতন, তাহাদের একটিও বর্তমান কালে গঠিত হয় নাই এবং পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই গঙ্গা ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, একটিও প্রধান ধর্ম ইওরোপ বা আমেরিকায় উদ্ভূত হয় নাই—একটিও নয় ; প্রত্যেক ধর্মই এশিয়াসম্ভূত এবং তাহাও আবার পৃথিবীর ঐ অংশটুকুর মধ্যে। 'যোগ্যতম ব্যক্তি বা বস্তুই বাঁচিয়া থাকিবে'—আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের এই মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই-সকল ধর্ম যে এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে,

ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এখনও তাহারা কতকগুলি লোকের পক্ষে উপযোগী ; তাহারা যে কেন বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার কারণ আছে—তাহারা বহু লোকের উপকার করিতেছে। মুসলমানদিগকে দেখ, তাহারা দক্ষিণ-এশিয়ার কতকগুলি স্থানে কেমন বিস্তার লাভ করিতেছে, এবং আফ্রিকায় আগুনের মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে। বৌদ্ধগণ মধ্য-এশিয়ায় বরাবর বিস্তার লাভ করিতেছে। ইহুদীদের মতো হিন্দুগণও অপরকে নিজধর্মে গ্রহণ করে না, তথাপি ধীরে ধীরে অন্যান্য জাতি হিন্দুধর্মের ভিতর আসিয়া পড়িতেছে এবং হিন্দুদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টধর্মও যে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন ; তবে আমার যেন মনে হয়, চেষ্টার অনুরূপ ফল হইতেছে না। খ্রীষ্টানদের প্রচারকার্যে একটি ভয়ানক দোষ আছে এবং পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান মাত্রেই এই দোষ বিদ্যমান। শতকরা নব্বই ভাগ শক্তি প্রতিষ্ঠান-যন্ত্রের পরিচালনাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়, কারণ প্রতিষ্ঠানসুলভ বিধিব্যবস্থা বড় বেশি। প্রচারকার্যটা প্রাচ্য লোকেরাই বরাবর করিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্য লোকেরা সংঘবদ্ধভাবে কার্য, সামাজিক অনুষ্ঠান, যুদ্ধসজ্জা, রাজ্য-শাসন প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে করিবে, কিন্তু ধর্মপ্রচার-ক্ষেত্রে তাহারা প্রাচ্যদিগের কাছে ঘেঁষিতেও পারে না, কারণ ইহা বরাবর তাহাদেরই কাজ ছিল বলিয়া তাহারা ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং তাহারা অতিরিক্ত বিধি-ব্যবস্থার পক্ষপাতী নয়।

অতএব মনুষ্যজাতির বর্তমান ইতিহাসে ইহা একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, পূর্বোক্ত সকল প্রধান প্রধান ধর্মই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টি-লাভ করিতেছে। এই ঘটনার নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে, এবং সর্বজ্ঞ পরম-কারুণিক সৃষ্টিকর্তার যদি ইহাই ইচ্ছা হইত যে, ইহাদের একটিমাত্র ধর্ম থাকুক এবং অবশিষ্ট সবগুলিই বিনষ্ট হউক, তাহা হইলে উহা বহু পূর্বেই সংসাধিত হইত। আর যদি এই-সকল ধর্মের মধ্যে একটিমাত্র ধর্মই সত্য এবং অপরগুলি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে ঐ সত্য ধর্মই এতদিনে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই ; উহাদের কোনটিই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করে নাই। সকল ধর্মই এক সময়ে উন্নতির দিকে, আবার অন্য সময়ে অবনতির দিকে যায়। আর ইহাও ভাবিয়া দেখ, তোমাদের দেশে

ছয় কোটি লোক আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র দুই কোটি দশ লক্ষ কোন না কোন প্রকার ধর্মভুক্ত। সুতরাং সব সময়েই ধর্মের উন্নতি হয় না। সম্ভবতঃ সকল দেশেই—গণনা করিলে দেখিতে পাইবে, ধর্মগুলির কখনও উন্নতি আবার কখনও অবনতি হইতেছে। সম্প্রদায়ের সংখ্যাও সর্বদা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের এই দাবি যদি সত্য হইত যে, সমুদয় সত্য উহাতেই নিহিত এবং ঈশ্বর সেই নিখিল সত্য কোন গ্রন্থবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকেই দিয়াছেন—তবে জগতে এত সম্প্রদায় হইল কিরূপে? পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতে একই পুস্তককে ভিত্তি করিয়া কুড়িটি নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ঈশ্বর যদি কয়েকখানি পুস্তকেই সমগ্র সত্য নিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঝগড়া করিবার জন্য তিনি কখনই আমাদিগকে সেগুলি দেন নাই, কিন্তু বস্তুতঃ দাঁড়াইতেছে তাই। কেন এরূপ হয়? যদি ঈশ্বর বাস্তবিকই ধর্মবিষয়ক সমস্ত সত্য একখানি পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে দিতেন, তাহা হইলেও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না, কারণ কেহই সে গ্রন্থ বুঝিতে পারিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাইবেল ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত যাবতীয় সম্প্রদায়ের কথা ধরুন; প্রত্যেক সম্প্রদায় ঐ একই গ্রন্থ তাহার নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছে যে, কেবল সেই উহা ঠিক ঠিক বুঝিয়াছে, আর অপর সকলে ভ্রান্ত। প্রত্যেক ধর্মসম্বন্ধেই এই কথা। মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, হিন্দুদের মধ্যে তো শত শত। এখন আমি যে-সকল ঘটনা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি, এগুলির উদ্দেশ্য—আমি দেখাইতে চাই যে, ধর্ম-বিষয়ে যতবারই সমুদয় মনুষ্যজাতিকে একপ্রকার চিন্তার মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, ততবারই উহা বিফল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। এমন কি, বর্তমান কালেও নূতন মতপ্রবর্তক মাত্রেই দেখিতে পান যে, তিনি তাঁহার অনুবর্তিগণের নিকট হইতে কুড়ি মাইল দূরে সরিয়া যাইতে না যাইতে তাহারা কুড়িটি দল গঠন করিয়া বসিয়াছে। আপনারা সব সময়েই এইরূপ ঘটিতে দেখিতে পান। ইহা ধ্রুব সত্য যে, সকল লোককে একই প্রকার ভাব গ্রহণ করানো চলে না এবং আমি ইহার জন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি কোন সম্প্রদায়ের বিরোধী নই, বরং নানা সম্প্রদায় রহিয়াছে বলিয়া আমি খুশী এবং আমার বিশেষ ইচ্ছা—তাহাদের সংখ্যা

দিন দিন বাড়িয়া যাক। ইহার কারণ কি? কারণ শুধু এই যে, যদি আপনি আমি এবং এখানে উপস্থিত অন্যান্য সকলে ঠিক একই প্রকার ভাবরাশি চিন্তা করি, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা করিবার বিষয়ই থাকিবে না। দুই বা ততোধিক শক্তির সঙ্ঘর্ষ হইলেই গতি সম্ভব, ইহা সকলেই জানেন। সেইরূপ চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাত হইতেই—চিন্তার বৈচিত্র্য হইতেই নূতন চিন্তার উদ্ভব হয়। এখন আমরা সকলেই যদি একই প্রকার চিন্তা করিতাম, তাহা হইলে আমরা যাদুঘরের মিশরদেশীয় 'মামিতে' (mummies) পরিণত হইয়া শুধু তাহাদেরই মতো পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম —তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই হইত না। বেগবতী জীবন্ত নদীতেই ঘূর্ণাবর্ত থাকে, বদ্ধ ও স্রোতহীন জলে আবর্ত হয় না। যখন ধর্মগুলি বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন আর সম্প্রদায়ও থাকিবে না; তখন শ্মশানের পূর্ণ শান্তি ও সাম্য বিরাজ করিবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মানুষ চিন্তা করিবে, ততদিন সম্প্রদায়ও থাকিবে। বৈষম্যই জীবনের চিহ্ন এবং বৈষম্য থাকিবেই। আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে জগতে যত মানুষ আছে, ততগুলি সম্প্রদায় গঠিত হউক, যেন ধর্মরাজ্যে প্রত্যেকে তাহার নিজের পথে—তাহার ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রণালী অনুসারে চলিতে পারে।

কিন্তু এই ধারা চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে চিন্তা করে; কিন্তু এই স্বাভাবিক ধারা বরাবরই বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এইজন্য সাক্ষাৎভাবে তরবারি ব্যবহৃত না হইলেও অন্য উপায় গ্রহণ করা হইয়া থাকে। নিউ ইয়র্কের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক কি বলিতেছেন, শুনুন—তিনি প্রচার করিতেছেন যে, ফিলিপাইনবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে হইবে, কারণ তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দিবার উহাই একমাত্র উপায়! তাহারা ইতিপূর্বেই ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রেস্‌বিটেরিয়ান করিতে চান এবং ইহার জন্য তিনি এই রক্তপাতজনিত ঘোর পাপরাশি স্বজাতির স্কন্ধে চাপাইতে উদ্যত। কি ভয়ানক! আবার এই ব্যক্তিই তাঁহার দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক এবং বিদ্যায় শীর্ষস্থানীয়। যখন এইরূপ একজন লোক সর্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রকার কদর্য প্রলাপবাক্য বলিয়া যাইতে

লজ্জাবোধ করে না, তখন জগতের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখুন, বিশেষতঃ যখন আবার তাহার শ্রোতৃবৃন্দ তাহাকে উৎসাহ দিতে থাকে, তখন ভাবিয়া দেখুন জগতের স্বরূপটা কি! ইহাই কি সভ্যতা? ইহা ব্যাঘ্র, নরখাদক ও অসভ্য বন্যজাতির সেই চিরাভ্যস্ত রক্তপিপাসা বই আর কিছুই নয়, শুধু আবার নূতন নামে ও নূতন অবস্থার মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে মাত্র। এতদ্ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? বর্তমান কালেই যদি ঘটনা এইরূপ হয়, তবে ভাবিয়া দেখুন, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়গুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত, সেই প্রাচীনকালে জগৎকে কি ভয়ানক নরক-যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাইতে হইত! ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমাদের শার্দূলসদৃশ মনোবৃত্তি সুপ্ত রহিয়াছে মাত্র,—ঐ মনোবৃত্তি একেবারে মরে নাই। সুযোগ উপস্থিত হইলেই উহা লাফাইয়া উঠে এবং পূর্বের মতো নিজ নখর ও বিষদন্ত ব্যবহার করে। তরবারি অপেক্ষাও—জড়পদার্থ-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষাও ভীষণতর অস্ত্রশস্ত্র আছে; যাহারা ঠিক আমাদের মতাবলম্বী নয়, তাহাদের প্রতি এখন অবজ্ঞা, সামাজিক ঘৃণা ও সমাজ হইতে বহিষ্করণরূপ ভীষণ মর্মভেদী অস্ত্রসকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কেন সকলে ঠিক আমার মতো চিন্তা করিবে?—আমি তো ইহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আমি যদি বিচারশীল মানুষ হই, তাহা হইলে সকলে যে ঠিক আমার ভাবে ভাবিত নয়, ইহাতে আমার আনন্দিতই হওয়া উচিত। আমি শ্মশানতুল্য দেশে বাস করিতে চাই না; আমি মানুষেরই মতো থাকিতে চাই—মানুষেরই মধ্যে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মতভেদ থাকিবে; কারণ পার্থক্যই চিন্তার প্রথম লক্ষণ। আমি যদি চিন্তাশীল হই, তাহা হইলে আমার অবশ্যই এমন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বাস করিবার ইচ্ছা হওয়া উচিত, যেখানে মতের পার্থক্য থাকিবে।

তারপর প্রশ্ন উঠিবে, এই-সকল বৈচিত্র্য কি করিয়া সত্য হইতে পারে? কোন বস্তু সত্য হইলে তাহার বিপরীত বস্তুটা মিথ্যা হইবে। একই সময়ে দুইটি বিরুদ্ধ মত কি করিয়া সত্য হইতে পারে? আমি এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চাই। কিন্তু আমি প্রথমে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর ধর্মগুলি কি বাস্তবিকই একান্ত বিরোধী? যে-সকল বাহ্য আচারে

বড় বড় চিন্তাগুলি আবৃত থাকে, আমি সে-সকলের কথা বলিতেছি না। নানা ধর্মে যে-সকল বিবিধ মন্দির, ভাষা, ক্রিয়াকাণ্ড, শাস্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার হইয়া থাকে, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি না; আমি প্রত্যেক ধর্মের ভিতরকার প্রাণবস্তুর কথাই বলিতেছি। প্রত্যেক ধর্মের পশ্চাতে একটি করিয়া সারবস্তু বা 'আত্মা' আছে; এবং এক ধর্মের আত্মা অন্য ধর্মের আত্মা হইতে পৃথক হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কি একান্ত বিরোধী? তাহারা পরস্পরকে খণ্ডন করে, না একে অপরের পূর্ণতা সম্পাদন করে?—ইহাই প্রশ্ন। আমি যখন নিতান্ত বালক ছিলাম, তখন হইতে এই প্রশ্নটির আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি এবং সারা জীবন ধরিয়া উহারই আলোচনা করিতেছি। আমার সিদ্ধান্ত হয়তো আপনাদের কোন উপকারে আসিতে পারে, এই মনে করিয়া উহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। আমার বিশ্বাস, তাহারা পরস্পরের বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক। প্রত্যেক ধর্ম যেন মহান্ সার্বভৌম সত্যের এক একটি অংশ লইয়া তাহাকে বাস্তব রূপ প্রদান করিতে এবং আদর্শে পরিণত করিতে উহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতেছে। সুতরাং ইহা মিলনের ব্যাপার—বর্জনের নয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। এক-একটি বড় ভাব লইয়া সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে, এবং আদর্শগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপেই মানবজাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। মানুষ কখনও ভ্রম হইতে সত্যে উপনীত হয় না, পরন্তু সত্য হইতেই সত্যে গমন করিয়া থাকে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরূঢ় হইয়া থাকে—কিন্তু কখনও ভ্রম হইতে সত্যে নয়। পুত্র হয়তো পিতা অপেক্ষা সমধিক গুণশালী হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া পিতা যে কিছু নন, তা তো নয়। পুত্রের মধ্যে পিতা তো আছেনই, অধিকন্তু আরও কিছু আছে। আপনার বর্তমান জ্ঞান যদি আপনার বাল্যাবস্থার জ্ঞান হইতে অনেক বেশী হয়, তাহা হইলে কি আপনি এখন সেই বাল্যাবস্থাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন? আপনি কি সেই অতীত অবস্থার দিকে তাকাইয়া উহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দিবেন? বুঝিতেছেন না, আপনার সেই বাল্যকালের জ্ঞানই আরও কিছু অভিজ্ঞতা দ্বারা পুষ্ট হইয়া বর্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

আবার ইহা তো সকলেই জানেন যে, একই জিনিসকে বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিয়া প্রায় বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সকল সিদ্ধান্ত একই বস্তুর আভাস দিয়া থাকে। মনে করুন, এক ব্যক্তি সূর্যের দিকে গমন করিতেছে এবং সে যেমন অগ্রসর হইতেছে, অমনি বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্যের এক-একটি ফটোগ্রাফ লইতেছে। যখন সে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে, তখন সূর্যের অনেকগুলি ফটো আনিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিবে। আমরা দেখিতে পাইব তাহাদের কোন দুইখানি ঠিক এক রকমের নয়, কিন্তু এ-কথা কে অস্বীকার করিবে যে, এগুলি একই সূর্যের ফটো—শুধু ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে গৃহীত? বিভিন্ন কোণ হইতে এই গির্জাটির চারখানি ফটো লইয়া দেখুন, তাহারা কত পৃথক দেখাইবে; অথচ তাহারা একই গির্জার প্রতিকৃতি। এইরূপে আমরা একই সত্যকে এমন সব দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতেছি, যাহা আমাদের জন্ম, শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আমরা সত্যকেই দেখিতেছি, তবে এই-সমুদয় অবস্থার মধ্য দিয়া সেই সত্যের যতটা দর্শন পাওয়া সম্ভব, ততটাই পাইতেছি—তাহাকে আমাদের নিজ নিজ হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত করিতেছি, আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতেছি এবং নিজ নিজ মন দ্বারা ধারণা করিতেছি। আমরা সত্যের শুধু সেইটুকুই বুঝিতে পারি, যেটুকুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে বা যতটুকু গ্রহণের ক্ষমতা আমাদের আছে। এই হেতুই মানুষে মানুষে প্রভেদ হয়; এমন কি, কখন কখন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে; অথচ আমরা সকলেই সেই এক সর্বজনীন সত্যের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব আমার ধারণা এই যে, ভগবানের বিধানে এই সকল ধর্ম বিবিধ শক্তিরূপে বিকশিত হইয়া মানবের কল্যাণ-সাধনে নিরত রহিয়াছে; তাহাদের একটিও মরিতে পারে না—একটিকেও বিনষ্ট করিতে পারা যায় না। যেমন কোন প্রাকৃতিক শক্তিকে বিনষ্ট করা যায় না, সেইরূপ এই আধ্যাত্মিক শক্তিনিচয়ের কোন একটিরও বিনাশ সাধন করিতে পারা যায় না। আপনারা দেখিয়াছেন, প্রত্যেক ধর্মই জীবিত রহিয়াছে। সময়ে সময়ে ইহা হয়তো উন্নতি বা অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। কোন সময়ে হয়তো ইহার সাজসজ্জার অনেকটা হ্রাস পাইতে পারে, কখনও উহা রাশীকৃত সাজসজ্জায় মণ্ডিত হইতে পারে; কিন্তু তথাপি উহার প্রাণবস্তু সর্বদাই

অব্যাহত রহিয়াছে ; উহা কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মের সেটি অন্তর্নিহিত আদর্শ, তাহা কখনই নষ্ট হয় না ; সুতরাং প্রত্যেক ধর্মই সজ্ঞানে অগ্রগতির পথে চলিয়াছে।

আর সেই সার্বভৌম ধর্ম, যাহার সম্বন্ধে সকল দেশের দার্শনিকগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি কত কল্পনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা এখানেই রহিয়াছে। সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব যেমন পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, সেইরূপ সার্বভৌম ধর্মও রহিয়াছে। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা নানা দেশ পর্যটন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই নিজেদের ভাই-বোনের পরিচয় পান নাই ? আমি তো পৃথিবীর সর্বত্রই তাঁহাদিগকে পাইয়াছি। ভ্রাতৃভাব পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা ইহা দেখিতে না পাইয়া নূতনভাবে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চীৎকার করিয়া বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। সার্বভৌম ধর্মও বর্তমান রহিয়াছে। পুরোহিতকুল এবং অন্যান্য যে-সব লোক বিভিন্ন ধর্ম প্রচার করিবার ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঘাড়ে লইয়াছেন, তাঁহারা যদি দয়া করিয়া একবার কিছুক্ষণের জন্য প্রচারকার্য বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, ঐ সার্বভৌম ধর্ম পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। তাঁহারা বরাবরই উহাকে প্রতিহত করিতেছেন, কারণ উহাতেই তাঁহাদের লাভ। আপনারা দেখিতে পান, সকল দেশের পুরোহিতরাই অতিশয় গোঁড়া। ইহার কারণ কি? খুব কম পুরোহিতই আছেন, যাঁহারা জনসাধারণকে পরিচালিত করেন ; তাঁহাদের অধিকাংশই জনসাধারণ-দ্বারা চালিত হন এবং তাহাদের ভৃত্য ও ক্রীতদাস হইয়া পড়েন। যদি কেহ বলে, 'ইহা শুষ্ক', তাঁহারাও বলিবেন, 'হাঁ শুষ্ক' ; যদি কেহ বলে, 'ইহা কালো', তাঁহারাও বলিবেন, 'হাঁ, ইহা কালো'। যদি জনসাধারণ উন্নত হয়, তাহা হইলে পুরোহিতরাও উন্নত হইতে বাধ্য। তাঁহারা পিছাইয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং পুরোহিতদিগকে গালি দিবার পূর্বে—পুরোহিতগণকে গালি দেওয়া আজকাল একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আপনাদের নিজেদেরই গালি দেওয়া উচিত। আপনারা শুধু তেমন জিনিসই পাইতে পারেন, যাহার জন্য আপনারা যোগ্য। যদি কোন পুরোহিত নূতন নূতন উন্নত ভাব শিখাইয়া আপনাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহার দশা কি হইবে ? হয়তো তাঁহার

পুত্রকন্যা অনাহারে মারা যাইবে এবং তাঁহাকে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতে হইবে। আপনাদিগকে যে-সকল জাগতিক বিধি মানিতে হয়, তাঁহাকেও তাই করিতে হয়। তিনি বলেন, 'আপনারা যদি চলিতে থাকেন তো চলুন, আমরা সকলে আগাইয়া যাই।' অবশ্য এমন বিরল দুই চারি জন উচ্চ ভাবের মানুষ আছেন, যাঁহারা লোকমতকে ভয় করেন না। তাঁহারা সত্য অনুভব করেন এবং একমাত্র সত্যকেই সার জ্ঞান করেন। সত্য তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে—যেন তাঁহাদিগকে অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং তাঁহাদের অগ্রসর.হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। তাঁহারা কখনও পিছনে ফিরিয়া চাহেন না এবং লোকমত গ্রাহ্যও করেন না। তাঁহাদের নিকট একমাত্র ভগবানই সত্য; তিনিই তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক জ্যোতি এবং তাঁহারা সেই জ্যোতিরই অনুসরণ করেন।

এদেশে (আমেরিকায়) আমার জনৈক মর্মন (Mormon) ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি আমাকে তাঁহার মতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, 'আপনার মতের উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে আমরা একমত নই। আমি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আপনি বহুবিবাহের পক্ষপাতী। ভাল কথা, আপনি ভারতে আপনার মত প্রচার করিতে যান না কেন?' ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'কি রকম, আপনি ।ববাহের আদৌ পক্ষপাতী নন, আর আমি বহুবিবাহের পক্ষপাতী; তথাপি আপনি আমাকে আপনার দেশে যাইতে বলিতেছেন!' আমি বলিলাম, 'হাঁ, আমার দেশ-বাসীরা সকল প্রকার ধর্মমতই শুনিয়া থাকেন—তাহা যে-দেশ হইতেই আসুক না কেন। আমার ইচ্ছা আপনি ভারতে যান; কারণ প্রথমতঃ আমি সম্প্রদায়সমূহের উপকারিতায় বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়তঃ সেখানে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বর্তমান সম্প্রদায়গুলির উপর আদৌ সন্তুষ্ট নন, এবং এই হেতু তাঁহারা ধর্মের কোন ধারই ধারেন না; হয়তো তাঁহাদের কেহ কেহ আপনার মত গ্রহণ করিতে পারেন।' সম্প্রদায়ের সংখ্যা যতই অধিক হইবে, লোকের ধর্মলাভ করিবার সম্ভাবনা ততই বেশী হইবে। যে হোটেলে সব রকম খাবার পাওয়া যায়, সেখানে সকলেরই ক্ষুধাতৃপ্তির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আমার ইচ্ছা, সকল দেশে সম্প্রদায়ের সংখ্যা

বাড়িয়া যাক, যাহাতে আরও বেশী লোক ধর্মজীবনলাভের সুবিধা পাইতে পারে। এইরূপ মনে করিবেন না যে, লোকে ধর্ম চায় না। আমি তাহা বিশ্বাস করি না। তাহাদের যাহা প্রয়োজন, প্রচারকেরা ঠিক তাহা দিতে পারে না। যে লোক নাস্তিক, জড়বাদী বা ঐ রকম একটা কিছু বলিয়া ছাপমারা হইয়া গিয়াছে, তাহারও যদি এমন কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি তাহাকে ঠিক তাহার মনের মতো আদর্শটি দেখাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সে হয়তো সমাজের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতি-সম্পন্ন লোক হইয়া উঠিবে। আমরা বরাবর যেভাবে খাইতে অভ্যস্ত, সেভাবেই খাইতে পারি। দেখুন না, আমরা হিন্দুরা—হাত দিয়া খাইয়া থাকি, আপনাদের অপেক্ষা আমাদের আঙুল বেশী তৎপর, আপনারা ঠিক ঐভাবে আঙল নাড়িতে পারেন না। শুধু খাবার দিলেই হইল না, আপনাকে উহা নিজের ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। আপনাকে শুধু কতকগুলি আধ্যাত্মিক ভাব দিলেই চলিবে না, আপনার পরিচিত ধারায় সেগুলি আপনার নিকট আসা চাই। সেগুলি যদি আপনার নিজের ভাষায় আপনার প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত করা হয়, তবেই আপনার সন্তোষ হইবে। এমন কেহ যখন আসেন, যিনি আমার ভাষায় কথা বলেন এবং আমার ভাষায় উপদেশ দেন, আমি তখনই উহা বুঝিতে পারি এবং চিরকালের মতো স্বীকার করিয়া লই। ইহা একটা মস্ত বড় বাস্তব সত্য।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কত বিভিন্ন স্তর এবং প্রকৃতির মানব-মন রহিয়াছে এবং ধর্মগুলির উপরেও কি গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। কেহ হয়তো দুই তিনটি মতবাদ বাহির করিয়া বলিয়া বসিবেন যে, তাঁহার ধর্ম সকল লোকের উপযোগী হওয়া উচিত। তিনি একটি ছোট খাঁচা হাতে লইয়া ভগবানের এই জগদ্রূপ চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিয়া বলেন, 'ঈশ্বর, হস্তী এবং অপর সকলকেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে হস্তীটিকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়াও ইহার মধ্যে ঢুকাইতে হইবে।' আবার, হয়তো এমন কোন সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভাল ভাল ভাব আছে। তাঁহারা বলেন, 'সকলকেই আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইবে!' 'কিন্তু সকলের তো স্থান নাই!' 'কুছ পরোয়া নেই! তাহাদিগকে কাটিয়া ছাঁটিয়া যেমন করিয়া পারো ঢোকাও। কারণ তাহারা

যদি না আসে, তাহারা নিশ্চয়ই উৎসন্ন যাইবে।' আমি এমন কোন প্রচারকদল বা সম্প্রদায় কোথাও দেখিলাম না, যাঁহারা স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখেন, 'আচ্ছা, লোকে যে আমাদের কথা শোনে না, ইহার কারণ কি?' এরূপ না করিয়া তাঁহারা কেবল লোকদের অভিশাপ দেন আর বলেন, লোকগুলো ভারি পাজী।' তাঁহারা একবার জিজ্ঞাসাও করেন না, 'কেন লোকে আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না? কেন আমি তাহাদিগকে সত্য দেখাইতে পারিতেছি না? কেন আমি তাহাদের বুঝিবার মতো ভাষায় কথা বলিতে পারি না? কেন আমি তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে পারি না?' প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আরও সুবিবেচক হওয়া আবশ্যক। এবং যখন তাঁহারা দেখেন যে, লোকে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করে না, তখন যদি কাহাকেও গালাগালি দিতে হয় তো তাঁহাদের নিজেদের গালগালি দেওয়া উচিত। কিন্তু সব সময়ে লোকেরই যত দোষ! তাঁহারা কখনও নিজেদের সম্প্রদায়কে বড় করিয়া সকল লোকের উপযোগী করিবার চেষ্টা করেন না। অতএব অংশ নিজেকে পূর্ণ বলিয়া সর্বদা দাবি করা, ক্ষুদ্র সসীম বস্তু নিজেকে অসীম বলিয়া সর্বদা জাহির করা-রূপ এত সঙ্কীর্ণতা জগতে কেন চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ আমরা অতি সহজেই দেখিতে পাই। একবার সেই-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির কথা ভাবিয়া দেখুন, যেগুলি মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে ভ্রান্ত মানব-মস্তিষ্ক হইতে জাত হইয়াছে, অথচ ভগবানের অনন্ত সত্যের সমস্ত জানিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া উদ্ধত স্পর্ধা করে। কতদূর প্রগল্‌ভতা একবার দেখুন! ইহা হইতে আর কিছু না হউক, এইটুকু বোঝা যায় যে, মানুষ কত আত্মম্ভরী! আর এই প্রকার দাবি যে বরাবরই ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা কিছুই আশ্চর্য নয় এবং প্রভুর কৃপায় উহা চিরকালই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই বিষয়ে মুসলমানেরা সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাহারা তরবারির সাহায্যে প্রত্যেক পদ অগ্রসর হইয়াছিল—তাহাদের এক হস্তে ছিল কোরান, অপর হস্তে তরবারি; 'হয় কোরান গ্রহণ কর, নতুবা মৃত্যু আলিঙ্গন কর। আর অন্য উপায় নাই!' ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন, তাহাদের অভূতপূর্ব সাফল্য হইয়াছিল। ছয়শত বৎসর ধরিয়া কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারে নাই; কিন্তু পরে এমন এক সময় আসিল, যখন তাহাদিগকে অভিযান থামাইতে

হইল। অপর কোনও ধর্ম যদি ঐরূপ পন্থা অনুসরণ করে, তবে তাহারও একই দশা হইবে। আমরা এই প্রকার শিশুই বটে! আমরা মানবপ্রকৃতির কথা সর্বদাই ভুলিয়া যাই। আমাদের জীবন-প্রভাতে আমরা মনে করি যে, আমাদের অদৃষ্ট একটা কিছু অসাধারণ রকমের হইবে এবং কিছুতেই এ-বিষয়ে আমাদের অবিশ্বাস আসে না। কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় আমাদের চিন্তা অন্যরূপ দাঁড়ায়। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। প্রথমাবস্থায় যখন ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি একটু বিস্তৃতি লাভ করে, তখন ঐগুলি মনে করে, কয়েক বৎসরেই সমগ্র মানবজাতির মন বদলাইয়া দিবে এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিবার জন্য শত সহস্র লোকের প্রাণ বধ করিতে থাকে। পরে যখন অকৃতকার্য হয়, তখন ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের চক্ষু খুলিতে থাকে। দেখা যায়, ঐগুলি যে উদ্দেশ্য লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, আর ইহাই জগতের পক্ষে অশেষ কল্যাণজনক। একবার ভাবিয়া দেখুন, যদি এই গোঁড়া সম্প্রদায়সমূহের কোন একটি সমগ্র পৃথিবী ছড়াইয়া পড়িত, তাহা হইলে আজ মানুষের কি দশা হইত! ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তাহারা কৃতকার্য হয় নাই। তথাপি প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক-একটি মহান্ সত্যের প্রতিনিধি; প্রত্যেক ধর্মই কোন একটি বিশেষ উচ্চাদর্শের প্রতিভূ—উহাই তাহার প্রাণবস্তু। একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে: কতকগুলি রাক্ষসী ছিল; তাহারা মানুষ মারিত এবং নানাপ্রকার অনিষ্টসাধন করিত। কিন্তু তাহাদিগকে কেহই মারিতে পারিত না। অবশেষে একজন খুঁজিয়া বাহির করিল যে, তাহাদের প্রাণ কতকগুলি পাখির মধ্যে রহিয়াছে এবং যতক্ষণ ঐ পাখিগুলি বাঁচিয়া থাকিবে, ততক্ষণ কেহই রাক্ষসীদের মারিতে পারিবে না। আমাদের প্রত্যেকেরও যেন এইরূপ এক-একটি প্রাণ-পক্ষী আছে, উহার মধ্যেই আমাদের প্রাণবস্তুটি রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের একটি আদর্শ—একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে, যেটি জীবনে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষই এইরূপ এক-একটি আদর্শ, এইরূপ এক-একটি উদ্দেশ্যের প্রতিমূর্তি। আর যাহাই নষ্ট হউক না কেন, যতক্ষণ সেই আদর্শটি ঠিক আছে, যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য অটুট রহিয়াছে, ততক্ষণ কিছুতেই আপনার বিনাশ নাই। সম্পদ আসিতে বা যাইতে পারে, বিপদ পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু আপনি যদি সেই লক্ষ্য অটুট রাখিয়া থাকেন, কিছুই

আপনার বিনাশসাধন করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধ হইতে পারেন, এমনকি শতায়ু হইতে পারেন, কিন্তু যদি সেই উদ্দেশ্য আপনার মনে উজ্জ্বল এবং সতেজ থাকে, তাহা হইলে কে আপনাকে বধ করিতে সমর্থ? কিন্তু যখন সেই আদর্শ হারাইয়া যাইবে এবং সেই উদ্দেশ্য বিকৃত হইবে, তখন আর কিছুতেই আপনার রক্ষা নাই, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, সমস্ত শক্তি মিলিয়াও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। এবং জাতি আর কি—ব্যষ্টির সমষ্টি বই তো নয়? সুতরাং প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, যেটি বিভিন্ন জাতি-সমূহের সুশৃঙ্খল অবস্থিতির পক্ষে বিশেষ দরকার, এবং যতদিন উক্ত জাতি সেই আদর্শকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন কিছুতেই তাহার বিনাশ নাই। কিন্তু যদি ঐ জাতি উক্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন ক্ষীণ হইয়া আসে এবং ইহা অচিরেই অন্তর্হিত হয়।

ধর্মের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। এই-সকল পুরাতন ধর্ম যে আজিও বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, এগুলি নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্য অটুট রাখিয়াছে। ধর্মগুলির সমুদয় ভুলভ্রান্তি, বাধাবিঘ্ন, বিবাদ-বিসংবাদ সত্ত্বেও সেগুলির উপর নানাবিধ অনুষ্ঠান ও নির্দিষ্ট প্রণালীর আবর্জনাস্তূপ সঞ্চিত হইলেও প্রত্যেকের প্রাণকেন্দ্র ঠিক আছে, উহা জীবন্ত হৃৎপিণ্ডের ন্যায় স্পন্দিত হইতেছে—ধুক্ ধুক্ করিতেছে। ঐ ধর্মগুলির মধ্যে কোন ধর্মই, যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে, তাহা হারাইয়া ফেলে নাই। আর সেই উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করা চমকপ্রদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুসলমানধর্মের কথাই ধরুন। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণ মুসলমান ধর্মকে যত বেশী ঘৃণা করে, এরূপ আর কোন ধর্মকেই করে না। তাঁহারা মনে করেন, এরূপ নিকৃষ্ট ধর্ম আর কখনও হয় নাই। কিন্তু দেখুন, যখনই একজন লোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, অমনি সমগ্র ইসলামী সমাজ তাহাকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে ভ্রাতা বলিয়া বক্ষে ধারণ করিল। এরূপ আর কোন ধর্ম করে না। এদেশীয় একজন রেড ইণ্ডিয়ান যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে তুরস্কের সুলতানও তাহার সহিত একত্র ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না এবং সে বুদ্ধিমান হইলে যে-কোন উচ্চপদ-লাভে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু এদেশে আমি এ পর্যন্ত এমন একটিও গির্জা দেখি নাই, যেখানে শ্বেতকায় ব্যক্তি ও

নিগ্রো পাশাপাশি নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে পারে। এই কথাটি একবার ভাবিয়া দেখুন! ইসলাম ধর্ম তদন্তর্গত সকলব্যক্তিকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকে। সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন এইখানেই মুসলমান ধর্মের নিজস্ব বিশেষ মহত্ত্ব। কোরানের অনেকস্থলে মানবজীবন সম্বন্ধে নিছক ইহলৌকিক কথা দেখিতে পাইবেন; তাহাতে ক্ষতি নাই। মুসলমান ধর্ম জগতে যে বার্তা প্রচার করিতে আসিয়াছে, তাহা সকল মুসলমান-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কার্যে পরিণত এই ভ্রাতৃভাব, ইহাই মুসলমান ধর্মের অত্যাবশ্যক সারাংশ, এবং স্বর্গ, জীবন প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে যে-সমস্ত ধারণা, সেগুলি মুসলমানধর্মের সারাংশ নয়, অন্য ধর্ম হইতে উহাতে ঢুকিয়াছে।

হিন্দুদিগের মধ্যে একটি জাতীয় ভাব দেখিতে পাইবেন—তাহা আধ্যাত্মিকতা। অন্য কোন ধর্মে—পৃথিবীর অপর কোন ধর্মপুস্তকে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে এত অধিক শক্তিক্ষয় করিয়াছে, দেখিতে পাইবেন না। তাঁহারা এভাবে আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে কোন পার্থিব সংস্পর্শই ইহাকে কলুষিত করিতে না পারে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ভগবৎসত্তারই সমতুল; এবং আত্মাকে আত্মারূপে বুঝিতে হইলে উহাকে কখনও মানবত্বে পরিণত করা চলে না।

সেই একত্বের ধারণা এবং সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধিই সর্বদা সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। তিনি স্বর্গে বাস করেন ইত্যাদি কথা হিন্দুদের নিকট অসার উক্তি বই আর কিছুই নহে—উহা মনুষ্য কর্তৃক ভগবানে মনুষ্যোচিত গুণাবলীর আরোপ মাত্র। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা এখনই এবং এইখানে বর্তমান। অনন্তকালের মধ্যবর্তী যে-কোন মুহূর্ত অপর যে-কোন মুহূর্তেরই মতো ভাল। যিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী, তিনি এখনই তাঁহার দর্শন-লাভ করিতে পারেন। আমাদের মতে একটা কিছু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেই ধর্মের আরম্ভ হয়; কতকগুলি মতে বিশ্বাসী হওয়া কিংবা বুদ্ধিদ্বারা উহা স্বীকার করা, অথবা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করাকে ধর্ম বলে না। ভগবান্ যদি থাকেন, তবে আপনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন কি? যদি বলেন, 'না', তবে আপনার তাঁহাতে বিশ্বাস করিবার কি অধিকার আছে? আর যদি আপনার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তবে তাঁহাকে

দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন না কেন? কেন আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া এই এক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন না? ত্যাগ এবং আধ্যাত্মিকতা—এই দুইটিই ভারতের মহান্ আদর্শ এবং এ দুইটি ধরিয়া আছে বলিয়াই ভারতের এত ভুলভ্রান্তিতেও বিশেষ কিছু যায় আসে না।

খ্রীষ্টানদিগের প্রচারিত মূল ভাবটিও এই: অবহিত হইয়া প্রার্থনা কর, কারণ ভগবানের রাজ্য অতি নিকটে।—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি করিয়া প্রস্তুত হও। আর এই ভাব কখনও নষ্ট হইতে পারে না। আপনাদের বোধ হয় মনে আছে যে, খ্রীষ্টানগণ ঘোর অন্ধকারযুগেও-অতি কুসংস্কারগ্রস্ত খ্রীষ্টান দেশসমূহেও অপরকে সাহায্য করা, হাসপাতাল নির্মাণ করা প্রভৃতি সৎকার্যের দ্বারা সর্বদা নিজেদের পবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা এই লক্ষ্যে স্থির থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের ধর্ম সজীব থাকিবে।

সম্প্রতি আমার মনে একটা আদর্শের ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে। হয়তো ইহা স্বপ্নমাত্র। জানি না ইহা কখনও জগতে কার্যে পরিণত হইবে কি না। কিন্তু কঠোর বাস্তবে থাকিয়া মরা অপেক্ষা কখন কখন স্বপ্ন দেখাও ভাল। স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশিত হইলেও মহান সত্যগুলি অতি উত্তম, নিকৃষ্ট বাস্তব অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ঠ। অতএব একটা স্বপ্নই দেখা যাক না কেন!

আপনারা জানেন যে, মনের নানা স্তর আছে। আপনি হয়তো সহজজ্ঞানে আস্থাবান্ একজন বস্তুতান্ত্রিক যুক্তিবাদী; আপনি আচার-অনুষ্ঠানের ধার ধারেন না। আপনি চান এমন সব প্রত্যক্ষ ও অকাট্য সত্য, যাহা যুক্তিদ্বারা সমর্থিত এবং কেবল উহাতেই আপনি সন্তোষলাভ করিতে পারেন। আবার পিউরিটান ও মুসলমানগণ আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের উপাসনাস্থলে কোন প্রকার ছবি বা মূর্তি রাখিতে দিবেন না। বেশ কথা! কিন্তু আর এক প্রকার লোক আছেন, যিনি একটু বেশী শিল্পকলাপ্রিয়; ঈশ্বরলাভের সহায়রূপে তাঁহার অনেকটা শিল্পকলার প্রয়োজন হয়; তিনি চান সুন্দর ও সুঠাম নানা সরল ও বক্ররেখা এবং বর্ণ ও রূপ, আর চান ধূপ, দীপ, অন্যান্য প্রতীক ও বাহ্যোপকরণ। আপনি যেমন ঈশ্বরকে যুক্তি-বিচারের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিও তেমনি

তাঁহাকে ঐ সকল প্রতীকের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারেন। আর একপ্রকার ভক্তিপ্রবণ লোক আছেন, যাঁহাদের প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। ভগবানের পূজা এবং স্তবস্তুতি করা ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোন চিন্তা নাই। তাহার পর আছেন দার্শনিক, যিনি এই-সকলের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে বিদ্রূপ করেন; তিনি মনে করেন, কি সব ব্যর্থ প্রয়াস! ঈশ্বর সম্বন্ধে কি সব অদ্ভুত ধারণা।'

তাঁহারা পরস্পরকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু এই জগতে প্রত্যেকেরই একটা স্থান আছে। এই-সকল বিভিন্ন মন, এই-সকল বিচিত্র ভাবাদর্শের প্রয়োজন আছে, যদি কখনও কোন আদর্শ ধর্ম প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহাকে এরূপ উদার এবং প্রশস্তহৃদয় হইতে হইবে, যাহাতে উহা এই-সকল বিভিন্ন মনের উপযোগী খাদ্য যোগাইতে পারে। ঐ ধর্ম জ্ঞানীর হৃদয়ে দর্শন-সুলভ দৃঢ়তা আনিয়া দিবে, এবং ভক্তের হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত করিবে। আনুষ্ঠানিককে ঐ ধর্ম উচ্চতম প্রতীকোপাসনালভ্য সমুদয় ভাবরাশিদ্বারা চরিতার্থ করিবে, এবং কবি যতখানি হৃদয়োচ্ছ্বাস ধারণ করিতে পারে, কিংবা আর যাহা কিছু গুণরাশি আছে, তাহার দ্বারা সে কবিকে পূর্ণ করিবে। এইরূপ উদার ধর্মের সৃষ্টি করিতে হইলে আমাদিগকে ধর্মসমূহের অভ্যুদয়কালে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং ঐগুলি সবই গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব গ্রহণই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত—বর্জন নয়। কেবল পরমতসহিষ্ণুতা নয়—উহা অনেক সময়ে ঈশ্বর-নিন্দারই নামান্তর মাত্র; সুতরাং আমি উহাতে বিশ্বাস করি না। আমি 'গ্রহণে' বিশ্বাসী। আমি কেন পরধর্মসহিষ্ণু হইতে যাইব? পরধর্মসহিষ্ণুতার মানে এই যে, আমার মতে আপনি অন্যায় করিতেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে বাঁচিয়া থাকিতে বাধা দিতেছি না। তোমার আমার মতো লোক কাহাকেও দয়া করিয়া বাঁচিতে দিতেছে, এইরূপ মনে করা কি ভগবদ্বিধানে দোষারোপ করা নয়? অতীতে যত ধর্মসম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলিই সত্য বলিয়া মানি এবং তাহাদের সকলের সহিতই উপাসনায় যোগদান করি। প্রত্যেক সম্প্রদায় যে ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে, আমি তাহাদের প্রত্যেকের সহিত ঠিক সেই ভাবে তাঁহার আরাধনা করি। আমি মুসলমানদিগের

মসজিদে যাইব, খ্রীষ্টানদিগের গির্জায় প্রবেশ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের বিহারে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের ও তাঁহার ধর্মের শরণ লইব, এবং অরণ্যে গমন করিয়া সেই-সব হিন্দুর পার্শ্বে ধ্যানে মগ্ন হইব, যাঁহারা সকলের হৃদয়-কন্দর-উদ্ভাসনকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট।

শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতে যে-সকল ধর্ম আসিতে পারে তাহাদের জন্যও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব। ঈশ্বরের বিধিশাস্ত্র কি শেষ হইয়া গিয়াছে, অথবা উহা চিরকালব্যাপী অভিব্যক্তিরূপে আজও আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে? জগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিসমূহের এই যে লিপি, ইহা এক অদ্ভুত পুস্তক। বাইবেল, বেদ ও কোরান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ যেন ঐ পুস্তকের এক একখানি পত্র, এবং উহার অসংখ্য পত্র এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সেই সব অভিব্যক্তির জন্য আমি এ-পুস্তক খুলিয়াই রাখিব। আমরা বর্তমানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের অনন্ত ভাবরাশি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিব। অতীতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সে-সবই আমরা গ্রহণ করিব, বর্তমানের জ্ঞানালোক উপভোগ করিব এবং ভবিষ্যতেও যাহা উপস্থিত হইবে, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য হৃদয়ের সকল বাতায়ন উন্মুক্ত রাখিব। অতীতের ঋষিকুলকে প্রণাম, বর্তমানের মহাপুরুষদিগকে প্রণাম এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে আসিবেন, তাঁহাদের সকলকে প্রণাম।

আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম

অতীতের সুদীর্ঘ ধারার মধ্য দিয়া শত শত যুগের একটি বাণী আমাদের নিকট ভাসিয়া আসিতেছে—সেই বাণী হিমালয় ও অরণ্যের মুনি-ঋষিদের বাণী ; সেই বাণী সেমিটিক জাতিদের নিকটও আবির্ভূত হইয়াছিল, বুদ্ধদেব ও অন্যান্য ধর্মবীরগণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল ; সেই বাণী সেই-সব মানবের নিকট হইতে আসিতেছে, যাঁহারা এমন এক জ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিলেন, যাহা এই পৃথিবীর আরম্ভ হইতেই মানুষের সহচররূপে বিদ্যমান ছিল ; মানুষ যেখানেই যাক, সেখানেই উহা প্রকাশ পায় এবং সর্বদা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ; সেই বাণী এখনও আমাদের নিকট আসিতেছে। এই বাণী সেই-সব পর্বতনিঃসৃত ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনীর মতো, যেগুলি এখন অদৃশ্য, হয়তো আবার খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে একটি বিশাল শক্তিশালী বন্যায় পরিণত হয়। জগতের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের ঈশ্বরাদিষ্ট ও পবিত্রাত্মা নরনারীর মুখ হইতে যে বাণীসমূহ আমরা পাইতেছি, সেগুলি নিজ নিজ শক্তি সম্মিলিত করিয়া আমাদিগকে ভেরীনিনাদে অতীতের বাণীই শুনাইতেছে। আমাদের লব্ধ প্রথম বাণী : তোমাদের এবং সকল ধর্মের শান্তি হউক। ইহা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাণী নয়, পরন্তু ঐক্যবদ্ধ ধর্মের কথা। আসুন আমরা প্রথমেই এই বাণীর তাৎপর্য আলোচনা করি।

বর্তমান যুগের প্রারম্ভে এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ধর্মের ধ্বংস এবার অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক গবেষণার তীব্র আঘাতে পুরাতন কুসংস্কারগুলি চীনামাটির বাসনের মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। যাহারা ধর্মকে কেবল মতবাদ ও অর্থশূন্য অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিত, তাহারা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গেল ; ধরিয়া রাখার মতো কিছুই তাহারা খুঁজিয়া পাইল না। এক সময়ে ইহা অনিবার্য বলিয়া বোধ হইল যে, জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের উত্তাল তরঙ্গ সম্মুখের সকল বস্তুকে দ্রুতবেগে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। অনেকেই এ বিষয়ে নিরাশ হইল এবং ভাবিল যে, ধর্ম এবার চিরদিনের

মতো লোপ পাইল। কিন্তু স্রোত আবার ফিরিয়াছে এবং উহার উদ্ধারের উপায় আসিয়াছে।—সেটি কি? সে উপায়টি ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা। বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনে আমরা দেখিতে পাই যে, সেগুলি মূলতঃ এক। বাল্যকালে এই নাস্তিকতার প্রভাব আমার উপরও পড়িয়াছিল এবং এক সময়ে এমন বোধ হইয়াছিল যে, আমাকেও ধর্মের সকল আশা ভরসা ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম অধ্যয়ন করিলাম এবং আশ্চর্য হইলাম, আমাদের ধর্ম যে-সকল মূলতত্ত্ব শিক্ষা দেয়, অন্যান্য ধর্মও অবিকল সেইগুলিই শিক্ষা দেয়। ইহাতে আমার মনে এই প্রকার চিন্তার উদয় হইল: সত্য কী? এই জগৎ কি সত্য? উত্তর পাইলাম—হাঁ, সত্য। কেন সত্য?—কারণ আমি ইহা দেখিতেছি। যে-সব মনোহর স্বললিত কণ্ঠস্বর ও যন্ত্রসঙ্গীত আমরা এইমাত্র শুনিলাম, সে-সব কি সত্য?—হাঁ, সত্য; কারণ আমরা তাহা শুনিয়াছি। আমরা জানি যে, মানুষের একটি শরীর আছে, দুটি চক্ষু ও দুটি কর্ণ আছে এবং তাহার একটি আধ্যাত্মিক প্রকৃতিও আছে, যাহা আমরা দেখিতে পাই না। এই আধ্যাত্মিক বৃত্তির সাহায্যেই সে বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনের ফলে বুঝিতে পারে যে, ভারতের অরণ্যে ও খ্রীষ্টানদের দেশে যত ধর্মমত প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি মূলতঃ এক। ইহার ফলে আমরা এই সত্যেই উপনীত হই যে, ধর্ম মানব-মনের একটি স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন। কোন এক ধর্মকে সত্য বলিতে হইলে অপর ধর্মগুলিকেও সত্য বলিয়া মানিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, আমার ছয়টি আঙুল আছে, কিন্তু অন্য কাহারও ঐরূপ নাই; তাহা হইলে আপনারা বেশ বুঝিতে পারেন যে, ইহা অস্বাভাবিক। কেবল একটি ধর্ম সত্য আর অন্য ধর্মগুলি মিথ্যা—এই বিতণ্ডার সমাধানেও ঐ একই যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। জগতে মাত্র একটি ধর্ম সত্য বলিলে উহা ছয় আঙুল-বিশিষ্ট হাতের মতো অস্বাভাবিকই হইবে। সুতরাং দেখা গেল যে, একটি ধর্ম সত্য হইলে অপরগুলিও অবশ্য সত্য হইবে। গৌণ অংশগুলি সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ সেগুলি সব এক। যদি আমার পাঁচ আঙল সত্য হয়, তবে তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয়—তোমার পাঁচ আঙুলও সত্য।

মানুষ যেখানেই থাকুক, তাহার একটি ধর্মবিশ্বাস থাকিবেই, সে তাহার ধর্মভাবের পরিপুষ্টি করিবেই। জগতের বিভিন্ন ধর্ম আলোচনা করিয়া আর

একটি সত্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার তিনটি বিভিন্ন স্তর আছে। প্রথমতঃ সকল ধর্মই স্বীকার করে, এই নশ্বর শরীর ছাড়া (মানুষের) আর একটি অংশ বা অন্য কিছু আছে, যাহা শরীরের মতো পরিবর্তিত হয় না ; তাহা নির্বিকার, শাশ্বত ও অমৃত। কিন্তু পরবর্তী কয়েকটি ধর্মের মতে—যদিও ইহা সত্য যে, আমাদের একটা অংশ অমর, তথাপি কোন না কোন সময়ে ইহার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যাহার আরম্ভ আছে, তাহার নাশ অবশ্য আছে। আমাদের অর্থাৎ আমাদের মূল সত্তার কখনও আরম্ভ হয় নাই, কখন অন্তও হইবে না। আমাদের সকলের উপরে—এই অনন্ত সত্তারও উপরে 'ঈশ্বর'-পদবাচ্য আর একজন অনাদি পুরুষ আছেন, যাঁহার অন্ত নাই। লোকে জগতের সৃষ্টি ও মানবের আরম্ভের কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু জগতের 'আরম্ভ' কথাটির অর্থ শুধু একটি কল্পের আরম্ভ। ইহা দ্বারা কোথাও সমগ্র বিশ্বজগতের আরম্ভ বুঝায় না। সৃষ্টির যে আরম্ভ থাকিতে পারে—ইহা অসম্ভব। আদিকাল বলিয়া কোন কিছুর ধারণা আপনাদের মধ্যে কেহই করিতে পারেন না। যাহার আরম্ভ আছে, তাহার শেষ আছেই। ভগবদ্গীতা বলেন :

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥[১]

—অর্থাৎ পূর্বে যে আমি ছিলাম না, এমন নয় ; তুমি যে ছিলে না, এমন নয় ; এই নৃপতিগণ যে ছিলেন না, তাহাও নয় এবং আমরা সকলে যে পরে থাকিব না, তাহাও নয়। যেখানেই সৃষ্টির প্রারম্ভের কথার উল্লেখ আছে, সেখানে কল্পারম্ভই বুঝিতে হইবে। দেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা চির অমর।

আত্মার এই ধারণার সহিত ইহার পূর্ণতা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি ধারণা আমরা দেখিতে পাই। আত্মা স্বয়ং পূর্ণ। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ এ-কথা স্বীকার করে যে, মানুষ প্রথমে পবিত্র ছিল। মানুষ নিজের কর্মের দ্বারা নিজেকে অশুদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে তাহার সেই পুরাতন প্রকৃতি অর্থাৎ পবিত্র স্বভাবকে আবার পাইতে হইবে। কেহ কেহ এই সকল কথা রূপকাকারে,

১ গীতা, ২।১২

গল্পচ্ছলে ও প্রতীক অবলম্বনে বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এই কথা-গুলিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, উহাদের সকলেরই এই এক উপদেশ—আত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ এবং মানুষকে তাহার সেই মৌলিক শুদ্ধ স্বভাব পুনরায় লাভ করিতেই হইবে। কি উপায়ে?—ঈশ্বরানুভূতির দ্বারা; ঠিক যেমন ইহুদীদের বাইবেল বলে, 'ঈশ্বরের পুত্রের মধ্য দিয়া না হইলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না।' ইহা হইতে কি বুঝা যায়? ঈশ্বরদর্শনই সকল মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। পিতার সহিত এক হইবার পূর্বে পুত্রত্ব অবশ্য আসিবে। মনে রাখিতে হইবে, মানুষ তাহার নিজ কর্মদোষে তাহার শুদ্ধ ভাব হারাইয়াছে। আমরা যে কষ্ট পাই, তাহা আমাদের নিজেদের কর্মফলে। ইহার জন্য ভগবান্ দোষী নন। এই-সব ধারণার সহিত পুনর্জন্মবাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। পাশ্চাত্যগণের হস্তে অঙ্গহানি হওয়ার পূর্বে এই মতবাদটি সর্বজনীন ছিল।

আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে শুনিয়াছেন, কিন্তু ইহাকে স্বীকার করেন নাই। 'মানবাত্মা অনাদি অনন্ত'—এই অপর মতবাদটির সহিত জন্মান্তরবাদের ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে চলিয়া আসিতেছে। যাহা কোনখানে আসিয়া শেষ হয়, তাহা অনাদি হইতে পারে না এবং যাহা কোনস্থান হইতে আরম্ভ হয়, তাহাও অনন্ত হইতে পারে না। মানবাত্মার উৎপত্তিরূপ ভয়াবহ অসম্ভব ব্যাপার আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। জন্মান্তরবাদে আত্মার স্বাধীনতার কথা বিঘোষিত হয়। মনে করুন, ইহা সুনিশ্চিতরূপে স্বীকৃত হইল যে, আদি বলিয়া একটা জিনিস আছে। তাহা হইলে মানুষের মধ্যে যত অপবিত্রতা আছে, তাহার দায়িত্ব ভগবানের উপর আসিয়া পড়ে। অসীম করুণাময় জগৎ-পিতা তাহা হইলে সংসারের সমুদয় পাপের জন্য দায়ী! পাপ যদি এইভাবেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে একজন অন্যের অপেক্ষা অধিক পাপ ভোগ করিবে কেন? যদি অসীম করুণাময় ঈশ্বরের নিকট হইতেই যাহা কিছু সব আসিয়া থাকে, তবে এত পক্ষপাত কেন? কেনই বা লক্ষ লক্ষ লোক পদদলিত হয়? দুর্ভিক্ষ-সৃষ্টির জন্য যাহারা দায়ী নয়, তাহারা কেন অনাহারে মরে? ইহার জন্য দায়ী কে? ইহাতে মানুষের কোন হাত না থাকিলে ভগবান্‌কেই নিশ্চিতরূপে দায়ী করিতে হয়। সুতরাং ইহার উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা এই যে, কাহারও ভাগ্যে যে-

সকল দুঃখভোগ হয়, তাহার জন্য সে-ই দায়ী। কোন চক্রকে যদি আমি গতিশীল করি, তাহার ফলের জন্য আমিই দায়ী এবং আমি যখন আমার দুঃখ উৎপন্ন করিতে পারি, তখন তাহার নিবৃত্তিও আমিই করিতে পারি। অতএব এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আমরা স্বাধীন। অদৃষ্ট বলিয়া কোন কিছু নাই। আমাদিগকে বাধ্য করিবার কিছুই নাই। আমরা নিজেরা যাহা করিয়াছি, আমরা তাহার নিবৃত্তিও করিতে পারি।

এই মতবাদের সম্পর্কে একটি যুক্তি আমি দিতেছি; ইহা কিছু জটিল বলিয়া আপনাদিগকে একটু ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক শুনিতে অনুরোধ করি। অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা সর্ব প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি—ইহাই একমাত্র উপায়। যাহাকে আমরা অভিজ্ঞতা বলি, তাহা আমাদের চিত্তের জ্ঞানভূমিতে ঘটিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন—একটি লোক পিয়ানো বাজাইতেছে, সে জ্ঞাতসারে প্রত্যেক সুরের চাবির উপর তাহার প্রতিটি আঙুল রাখিতেছে। এই প্রক্রিয়াটি সে বার বার করিতে থাকে, যতক্ষণ না ঐ অঙ্গুলি-সঞ্চালন-ব্যাপারটি অভ্যাসে পরিণত হয়। পরে সে প্রত্যেক চাবির দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়াও একটি সুর বাজাইতে পারে। সেইরূপে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধেও আমরা দেখিতে পাই যে, অতীতে আমরা সজ্ঞানে যে-সব কাজ করিয়াছি, তাহারই ফলে আমাদের বর্তমান সংস্কারসমূহ রচিত হইয়াছে। প্রত্যেক শিশু কতকগুলি সংস্কার লইয়া জন্মায়। সেগুলি কোথা হইতে আসিল? জন্ম হইতে কোন শিশু একেবারে সংস্কারশূন্য মন লইয়া আসে না, অর্থাৎ তাহার মন লেখাজোখাহীন সাদা কাগজের মতো থাকে না। পূর্ব হইতেই সে কাগজের উপর লেখা হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীস ও মিশরের দার্শনিকগণ বলেন, কোন শিশু শূন্য মন লইয়া জন্মায় না। শিশুমাত্রই অতীতে সজ্ঞানকৃত শত শত কর্মের সংস্কার লইয়া জগতে আসে। এগুলি সে এ-জন্মে অর্জন করে নাই এবং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সেগুলি সে পূর্ব পূর্ব জন্মে অর্জন করিয়াছিল। ঘোরতর জড়বাদীকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, এই সংস্কারসমূহ পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মসমূহের ফলে উৎপন্ন হয়। তাঁহারা কেবল এইটুকু বেশী বলেন, উহা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে; আমাদের পিতা-মাতা, পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহ, প্রপিতামহীগণ বংশানুক্রমিক নিয়মানুসারে আমাদের মধ্যে বাস

করিতেছেন। কেবল বংশপরম্পরা স্বীকার করিলেই যদি এ-সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা হইয়া যায়, তাহা হইলে আর আত্মায় বিশ্বাস করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ শরীর-অবলম্বনেই আজকাল সব ব্যাখ্যা হইতে পারে। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন বিচার ও আলোচনার খুঁটিনাটির মধ্যে যাইবার এখন আমাদের প্রয়োজন নাই।—যাঁহারা ব্যষ্টি-আত্মায় বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জন্য এতদূর পর্যন্ত অর্থ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি যে, কোন যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের পূর্বজন্ম ছিল। পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত দার্শনিক ও সাধুমহাপুরুষদের ইহাই বিশ্বাস। ইহুদীরাও এরূপ মত বিশ্বাস করিত। ভগবান্ যীশুও ইহাতে বিশ্বাসী ছিলেন। বাইবেলে তিনি বলিতেছেন, 'আব্রাহামের পূর্বেও আমি বর্তমান ছিলাম।' এবং অন্যত্র পাওয়া যায়—'ইনিই সেই ইলিয়াস, যাঁহার আগমনের কথা ছিল।'

যে বিভিন্ন ধর্মসমূহ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থা ও আবেষ্টনীর মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেগুলির আদি উৎপত্তিস্থল এশিয়া মহাদেশ এবং এশিয়াবাসীরাই সেগুলি বেশ ভালোরূপে বুঝিতে পারে। ঐ ধর্মসমূহ যখন উৎপত্তি-স্থলের বাহিরে প্রচারিত হইল, তখন সেগুলি অনেক ভ্রান্ত মতের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িল। খ্রীষ্টান ধর্মের অতি গভীর ও উদারভাব ইওরোপ কখনও ধরিতে পারে নাই। কারণ বাইবেল-প্রণেতাগণের ব্যবহৃত ভাব, চিন্তাধারা ও রূপকসমূহের সহিত তাহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ম্যাডোনার প্রতিকৃতিটিকে উদাহরণস্বরূপ ধরুন। প্রত্যেক শিল্পী ম্যাডোনাকে স্বীয় হৃদয়গত পূর্বধারণানুযায়ী চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যীশুখ্রীষ্টের শেষ নৈশভোজনের শত শত ছবি দেখিয়াছি; প্রত্যেকটিতে তাঁহাকে একটি টেবিলে খাইতে বসানো হইয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও টেবিলে খাইতে বসিতেন না। তিনি সকলের সঙ্গে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিতেন, আর একটি বাটিতে রুটি ডুবাইয়া উহা খাইতেন। আপনারা যে রুটি এখন খান, উহা তাহার মতো নয়। এক জাতির পক্ষে অপর জাতির বহু শতাব্দী যাবৎ অপরিচিত প্রথাসকল বুঝিতে পারা বড় কঠিন। গ্রীক, রোমান ও অন্যান্য জাতির দ্বারা সংসাধিত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর ইহুদী প্রথাসমূহ বুঝিতে পারা ইওরোপবাসীদের

নিকট কতই না শক্ত ব্যাপার! যে-সকল অলৌকিক ব্যাপার ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা দ্বারা যীশুর ধর্ম পরিবৃত রহিয়াছে, সেগুলির মধ্য হইতে লোকে যে ঐ সুন্দর ধর্মের অতি সামান্যমাত্র মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে এবং উহাকে কালে একটি দোকানদারের ধর্মে পরিণত করিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

এখন আসল কথায় আসা যাক্। আমরা দেখিলাম—সকল ধর্মই আত্মার অমরত্বের কথা বলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শিক্ষা দেয় যে, আত্মার পূর্ব জ্যোতি হ্রাস পাইয়াছে এবং ঈশ্বরানুভূতি দ্বারা উহার সেই আদি বিশুদ্ধ স্বভাবের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। এখন এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা কিরূপ? সর্বপ্রথমে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা অতি অস্পষ্টই ছিল। অতি প্রাচীন জাতিরা বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করিত—সূর্য, পৃথিবী, অগ্নি, জল (বরুণ) ইত্যাদি। প্রাচীন ইহুদী ধর্মে আমরা দেখিতে পাই, এইরূপ অসংখ্য দেবতা নৃশংসভাবে পরস্পর যুদ্ধ করিতেছেন। তারপর পাই ইলোহিম দেবতাকে, যাঁহাকে ইহুদী ও ব্যাবিলনবাসী উভয়েই পূজা করিত। পরে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন ভগবান্‌কে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা হইতেছে, কিন্তু বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধারণানুযায়ী ঈশ্বরের ধারণাও বিভিন্ন ছিল। প্রত্যেকেই তাহাদের দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবি করিত এবং যুদ্ধ করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত। তাহাদের মধ্যে যে জাতি যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ হইত, সে ঐ ভাবেই নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিত। সেই-সব জাতি প্রায়শঃ অসভ্য ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ উচ্চতর ধারণাসমূহ প্রাচীন ধারণার স্থান অধিকার করিল। এখন সেই-সব পুরাতন ধারণা আর নাই, যেটুকু বা আছে, তাহা অসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। পূর্বোক্ত সকল ধর্মই শত শত বর্ষের ক্রমবিকাশের ফল, কোনটিই আকাশ হইতে পড়ে নাই। প্রত্যেককে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তারপর একেশ্বরবাদের ধারণা আসিল, ঐ মতে ঈশ্বর এক এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্, তিনি বিশ্বের বাহিরে স্বর্গে বাস করেন। তিনি প্রাচীন উদ্ভাবকগণের স্থূলবুদ্ধি অনুযায়ী এইরূপেই বর্ণিত হইলেন, যথা: 'তাঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বদ্বয় আছে, তাঁহার হস্তে একটি পাখি আছে'—ইত্যাদি।

কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, গোষ্ঠী-দেবতারা চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের স্থানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি সর্বদেবেশ্বর। এই স্তরেও তিনি বিশ্বাতীত, তিনি দুরধিগম্য, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ধারণাটিও পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং ঠিক তার পরের স্তরে আমরা দেখিতে পাই এমন এক ঈশ্বর, যিনি সর্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছেন।

নিউ টেস্টামেণ্টে আছে, 'হে আমাদের স্বর্গবাসী পিতা'; এখানেও এক ভগবানের কথা, যিনি মনুষ্য হইতে দূরে স্বর্গে বাস করেন। আমরা পৃথিবীতে বাস করিতেছি এবং তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন। আরও অগ্রসর হইয়া আমরা এরূপ শিক্ষা দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর চরাচর প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে আছেন। তিনি যে কেবল স্বর্গের ঈশ্বর তাহা নয়, তিনি পৃথিবীরও ঈশ্বর। তিনি আমাদের অন্তর্যামী ভগবান্। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রেরও একটি স্তরে ভগবান্‌কে ঠিক এইভাবেই আমাদের অতি নিকটবর্তী বলা হইয়াছে। হিন্দু দর্শন এই পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়া যায় নাই; ইহার পরেও অদ্বৈতের একটি স্তর আছে। এই অবস্থায় মানব উপলব্ধি করিতে পারে, যে ঈশ্বরকে—যে ভগবান্‌কে সে এতদিন উপাসনা করিয়া আসিতেছে, তিনি কেবলমাত্র স্বর্গ ও পৃথিবাস্থ পিতা নন, পরন্তু 'আমি ও আমার পিতা এক'—আত্মস্থ হইয়া যে ইহা উপলব্ধি করে, সে স্বয়ং ঈশ্বর, কেবল প্রভেদ এই যে, সে তাঁহার একটি নিম্নতর প্রকাশ। আমার মধ্যে যাহা কিছু যথার্থ বস্তু, তাহাই তিনি এবং তাঁহার মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই আমি। এইরূপেই ঈশ্বর ও মানবের মধ্যবর্তী পার্থক্য দূরীভূত হয়। এই প্রকারে আমরা বুঝিতে পারিলাম, কিরূপে ঈশ্বরকে জানিলে স্বর্গরাজ্য আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হয়।

প্রথম অর্থাৎ দ্বৈতাবস্থায় মানুষ বোধ করে, সে জন্, জেমস্ বা টম ইত্যাদি নামধেয় একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মা এবং সে বলে, সে অনন্তকাল ধরিয়া ঐ জন্, জেমস্ ও টমই থাকিয়া যাইবে, কখনই অন্য কিছু হইবে না। কোন খুনী আসামী যদি বলে, 'আমি চিরকাল খুনীই থাকিয়া যাইব', ইহাও যেন ঠিক সেইরূপ বলা হইল। কিন্তু কালের পরিবর্তনে টম অদৃশ্য হইয়া সেই খাঁটি আদি মানব-আদমেই ফিরিয়া যায়।

পবিত্রাত্মারাই ধন্য, কারণ তাঁহারাই ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন। আমরা কি ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারি? অবশ্যই পারি না। আমরা কি ঈশ্বরকে জানিতে পারি? নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বর যদি জ্ঞাতই হন, তাহা হইলে তিনি আর ঈশ্বরই থাকিবেন না। জানা মানেই সীমাবদ্ধ করা। কিন্তু 'আমি ও আমার পিতা এক'। আত্মাতেই আমি আমার বাস্তব পরিচয় পাই। কোন কোন ধর্মে এই-সকল ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন ধর্মে ইহার ইঙ্গিত-মাত্র আছে। আবার কোনটিতে ইহা একেবারে বর্জিত হইয়াছে। খ্রীষ্টের ধর্ম এখন এদেশে খুব কম লোকের বোধগম্য; আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি বলিতে চাই, তাঁহার উপদেশ এদেশে কোনকালেই উত্তমরূপে বোধগম্য হয় নাই।

পবিত্রতা ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য ক্রমোন্নতির বিভিন্ন সোপানের সবগুলিই অত্যাবশ্যক। ধর্মের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি মূলে একই রূপ ধারণা বা ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। যীশু বলিতেছেন: 'স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান', আবার বলিতেছেন, 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা।' আপনারা কিরূপে এই উপদেশ দুইটির সামঞ্জস্য করিবেন? কেবল নিম্নোক্তরূপে ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারেন। তিনি অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট অর্থাৎ ধর্মবিষয়ে অজ্ঞ লোকদের শেষোক্ত উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদিগকে তাহাদের ভাষাতেই উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সাধারণ লোক চায় কতগুলি সহজবোধ্য ধারণা—এমন কিছু, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায়। কেহ হয়তো জগতে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি ধর্ম-বিষয়ে তিনি হয়তো শিশুমাত্র। মানব যখন উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করে, তখন বুঝিতে পারে যে, স্বর্গরাজ্য তাঁহার অন্তরেই রহিয়াছে। তাহাই যথার্থ মনোরাজ্য—স্বর্গরাজ্য। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক ধর্মে যে-সকল আপাতবিরোধ ও জটিলতা প্রতীত হয়, তাহা শুধু তাহার ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তরের সূচনা করে। সেইহেতু ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কাহাকেও নিন্দা করিবার অধিকার আমাদের নাই। ধর্মের ক্রমবিকাশের পথে এমন সব স্তর আছে, যাহাতে মূর্তি ও প্রতীক আবশ্যক হইয়া থাকে। জীব ঐ অবস্থায় ঐরূপ ভাষা বুঝিতেই সমর্থ।

আর একটি কথা আপনাদিগকে জানাইতে চাই—ধর্ম-অর্থে কোন মন-গড়া মত বা সিদ্ধান্ত নয়। আপনারা কি অধ্যয়ন করেন অথবা কি

মতবাদ বিশ্বাস করেন, তাহাই প্রধান বিচার্য বিষয় নয়, বরং আপনি কি উপলব্ধি করেন, তাহাই জ্ঞাতব্য। 'পবিত্রাত্মারাই ধন্য, কারণ তাহাদের ঈশ্বর-দর্শন হইবে।'—ঠিক কথা, এই জীবনেই দর্শন হইবে; আর ইহাই তো মুক্তি। এমন সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে শাস্ত্রবাক্য জপ করিলেই মুক্তি পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন মহাপুরুষ এরূপ শিক্ষা দেন নাই যে, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলি মুক্তিলাভের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মুক্ত হওয়ার শক্তি আমাদের মধ্যেই আছে। আমরা ব্রহ্মেই অবস্থিত এবং ব্রহ্মেরই মধ্যে আমাদের সব ক্রিয়াদি চলিতেছে।[১]

মতবাদ ও সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে-সব শিশুদের জন্য। উহাদের প্রয়োজন সাময়িক। শাস্ত্র কখনও আধ্যাত্মিকতার জন্ম দেয় নাই, বরং আধ্যাত্মিকতাই শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে—এ-কথা যেন আমরা না ভুলি। এ-পর্যন্ত কোন ধর্মপুস্তক ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিতে পারে নাই, কিন্তু ঈশ্বরই সকল উচ্চতম শাস্ত্রের উদ্দীপক। আর এ-পর্যন্ত কোন ধর্মপুস্তক আত্মাকে সৃষ্টি করে নাই—এ-কথাও যেন ভুলিয়া না যাই। সকল ধর্মের শেষ লক্ষ্য—আত্মাতেই ঈশ্বর দর্শন করা। ইহাই একমাত্র সর্বজনীন ধর্ম। ধর্মমতসমূহের মধ্যে সর্বজনীন বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে এই ঈশ্বরানুভূতিকে আমি এখানে উহার স্থলাভিষিক্ত করিতে চাই। আদর্শ ও রীতিনীতি ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই ঈশ্বরানুভূতিই কেন্দ্র-বিন্দুস্বরূপ। সহস্র ব্যাসার্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু উহারা এক কেন্দ্রে মিলিত হয় এবং উহাই ঈশ্বরদর্শন; ইহা এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের অতীত বস্তু—ইহা চিরকাল পান, ভোজন, বৃথা বাক্যব্যয় এবং এই ছায়াবৎ মিথ্যা ও স্বার্থপূর্ণ জগতের বাহিরে। এই সমুদয় গ্রন্থ, ধর্মবিশ্বাস ও জগতের সকল প্রকারের অসার আড়ম্বরের উর্ধ্বে ঐ এক বস্তু রহিয়াছে, আর উহাই হইল তোমার অন্তরে ঈশ্বরানুভূতি। একজন লোক পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদে বিশ্বাসী হইতে পারে, এ-পর্যন্ত যতপ্রকার ধর্মপুস্তক প্রণীত হইয়াছে, তাহা সব স্মরণ রাখিতে পারে, এবং পৃথিবীতে সকল নদীর পূতবারিতে নিজেকে অভিষিক্ত করিতে পারে,

১ তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।—গীতা, ৯।৬

কিন্তু যদি তাহার ঈশ্বরানুভূতি না হয়, তবে তাহাকে আমি ঘোর নাস্তিক বলিয়াই গণ্য করিব। অপর একজন যদি কখনও কোন গির্জা বা মসজিদে প্রবেশ না করিয়া থাকেন, কোনও ধর্মানুষ্ঠান না করিয়া থাকেন, অথচ অন্তরে ঈশ্বরকে অনুভব করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা এই জগতের অসার আড়ম্বরের ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া থাকেন, তবে তিনিই মহাত্মা, তিনিই সাধু—বা যে কোন নামে ইচ্ছা তাঁহাকে অভিহিত করিতে পারেন। যখন দেখিবে—কেহ বলিতেছে, 'কেবলমাত্র আমিই ঠিক, আমার সম্প্রদায়ই যথার্থ পথ ধরিয়াছে এবং অপর সকলে ভুল করিতেছে', তখন জানিবে তাহারই সব ভুল। সে জানে না যে, অপর মতসমূহের প্রামাণ্যের উপর তাহার মতের সত্যতা নির্ভর করিতেছে। সমুদয় মানবজাতির প্রতি প্রেম ও সেবাই ঠিক ঠিক ধার্মিকতার প্রমাণ। লোকে ভাবের উচ্ছ্বাসে যে বলিয়া থাকে, 'সকল মানুষই আমার ভাই', আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলিতেছি না; কিন্তু ইহাই বলিতে চাই যে, সমস্ত মানবজীবনের একত্বানুভূতি হওয়া আবশ্যক। সকল সম্প্রদায় ও ধর্মবিশ্বাসই ততক্ষণ অতি সুন্দর, এবং আমি সেগুলিকে আমার বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী আছি, যতক্ষণ তাহারা অপরকে অস্বীকার না করে, যতক্ষণ তাহারা সকল মানবসমাজকে যথার্থ ধর্মের দিকেই পরিচালিত করিতেছে। আমি আরও বলিতে চাই যে, কোন সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্তু উহারই গণ্ডির মধ্যে মরা ভাল নয়। শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করা ভাল বটে, কিন্তু আমরণ শিশু থাকিয়া যাওয়া ভাল নয়। ধর্মসম্প্রদায়, আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীকাদি শিশুদের জন্য ভাল, কিন্তু শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তখনই তাহাকে হয় ঐ গণ্ডিসমূহের বা নিজের শিশুত্বের সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতে হইবে। চিরকাল শিশু থাকা আমাদের কোনক্রমেই ভাল নয়। ইহা যেন বিভিন্ন বয়সের ও আকারের শরীরে একটি মাপের জামা পরাইবার চেষ্টার মতো। আমি জগতে সম্প্রদায় থাকার নিন্দা করিতেছি না। ঈশ্বর করুন—আরও দুই-কোটি সম্প্রদায় হউক, তাহা হইলে পছন্দমত আপন আপন উপযোগী ধর্মমত নির্বাচনের অধিক সুবিধা থাকিবে। কিন্তু একটি-মাত্র ধর্মকে যখন কেহ সকলের পক্ষে খাটাইতে চায়, তখনই আমার আপত্তি। যদিও সকল ধর্ম পরমার্থতঃ এক, তথাপি বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন অবস্থায় সঞ্জাত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান থাকিবেই। আমাদের প্রত্যেকেরই

একটি ব্যক্তিগত ধর্ম, অর্থাৎ বাহ্য প্রকাশের দৃষ্টিতে একটা নিজস্ব ধর্ম থাকা আবশ্যক।

বহু বৎসর পূর্বে আমি আমার জন্মভূমিতে অতীব শুদ্ধস্বভাব এক সাধু মহাত্মাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমরা আমাদের স্বয়ম্ভূ বেদ, আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, কোরান এবং সকল প্রকার স্বপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। আমাদের আলোচনার শেষে সেই সাধুটি আমাকে টেবিল হইতে একখানি পুস্তক আনিতে আজ্ঞা করিলেন। এই পুস্তকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেই বৎসরের বর্ষণ-ফলাফলের উল্লেখ ছিল। সাধুটি আমাকে উহা পাঠ করিতে বলিলেন এবং আমি উহা হইতে বৃষ্টি-পাতের পরিমাণটি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তখন তিনি বলিলেন—'এখন তুমি পুস্তকটি একবার নিঙড়াইয়া দেখ তো?' তাঁহার কথামত আমি ঐরূপ করিলাম। তিনি বলিলেন—'কই বৎস! একফোঁটা জলও যে পড়িতেছে না! যতক্ষণ পর্যন্ত না জল বাহির হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা পুস্তকমাত্র; সেইরূপ যতদিন পর্যন্ত তোমার ধর্ম তোমাকে ঈশ্বর উপলব্ধি না করায়, ততদিন উহা বৃথা। যিনি ধর্মের জন্য কেবল গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহার অবস্থা ঠিক যেন একটি গর্দভের মতো, যাহার পিঠে চিনির বোঝা আছে, কিন্তু সে উহার মিষ্টত্বের কোনও খবর রাখে না।'

মানুষকে কি এই উপদেশ দেওয়া উচিত যে, সে হাঁটু গাড়িয়া কাঁদিতে বসুক আর বলুক, 'আমি অতি হতভাগ্য ও পাপী'? না, তাহা না করিয়া বরং তাহার দেবত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। আমি একটি গল্প বলিতেছি। শিকার-অন্বেষণে আসিয়া এক সিংহী একপাল মেষ আক্রমণ করিল। শিকার ধরিবার জন্য লাফ দিতে গিয়া সে একটি শাবক প্রসব করিয়া সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সিংহশাবকটি মেষপালের সহিত বর্ধিত হইতে লাগিল। সে ঘাস খাইত এবং মেষের মতো ডাকিত। সে মোটেই জানিত না যে, সে সিংহ। একদিন এক সিংহ সবিস্ময়ে দেখিল যে, মেষপালের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড সিংহ ঘাস খাইতেছে এবং মেষের মতো ডাকিতেছে। ঐ সিংহকে দেখিয়া মেষের পাল এবং সেই সঙ্গে ঐ সিংহটিও পলায়ন করিল। কিন্তু সিংহটি সুযোগ খুঁজিতে লাগিল, এবং একদিন মেষ-সিংহটিকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহাকে জাগাইয়া

বলিল—'তুমি সিংহ'। সে বলিল 'না', এই বলিয়া মেষের মতো ডাকিতে লাগিল। কিন্তু আগন্তুক সিংহটি তাহাকে একটি হ্রদের ধারে লইয়া গিয়া জলের মধ্যে তাহাদের নিজ প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বলিল, 'দেখ তো, তোমার আকৃতি আমার মতো কিনা ?' সে তাহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া স্বীকার করিল যে, তাহার আকৃতি সিংহের মতো। তারপর সিংহটি গর্জন করিয়া দেখাইল এবং তাহাকে সেইরূপ করিতে বলিল। মেষ-সিংহটিও সেইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং শীঘ্রই তাহার মতো গম্ভীর গর্জন করিতে পারিল। এখন সে আর মেষ নয়, সিংহ। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সকলকে বলিতে চাই যে, আপনারা সকলে সিংহের মতো পরাক্রমশালী। যদি আপনাদের গৃহ অন্ধকারাবৃত থাকে, তাহা হইলে কি আপনারা বুক চাপড়াইয়া 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া কাঁদিতে থাকিবেন ? তাহা নয়। আলো পাইবার একমাত্র উপায় আলো জ্বালা, তবেই অন্ধকার চলিয়া যাইবে। ঊর্ধ্বের আলো পাইবার একমাত্র উপায় অন্তরের মধ্যে আধ্যাত্মিক আলো জ্বালা। তবেই পাপ ও অপবিত্রতারূপ অন্ধকার দূরীভূত হইবে। তোমার উচ্চ প্রকৃতির বিষয় চিন্তা কর ; হীনতার কথা ভাবিও না।

বৈদিক ধর্মাদর্শ

আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ধর্মবিষয়ক চিন্তা—আত্মা, ঈশ্বর এবং ধর্ম-সম্পর্কীয় যা কিছু কথা। আমরা বেদের সংহিতার কথা বলিব। সংহিতা-অর্থে স্তোত্র-সংগ্রহ—এগুলিই প্রাচীনতম আর্য-সাহিত্য; যথাযথ-ভাবে বলিতে গেলে এগুলিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বলিতে হইবে। এগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর সাহিত্যের নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে ঠিকঠিক গ্রন্থ বা সাহিত্য আখ্যা দেওয়া চলে না। সংগৃহীত গ্রন্থ-হিসাবে পৃথিবীতে এগুলি প্রাচীনতম এবং এগুলিতেই আর্য-জাতির সর্বপ্রথম মনোভাব, আকাঙ্ক্ষা, রীতি-নীতি সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন উঠিয়াছে, সে-সব চিত্রিত আছে। একেবারে প্রথমেই আমরা একটি অদ্ভুত ধারণা দেখিতে পাই। এই স্তোত্রসমূহ বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে রচিত স্তুতিগান। দ্যুতিসম্পন্ন, তাই 'দেবতা'। তাঁহারা সংখ্যায় অনেক—ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, পর্জন্য ইত্যাদি। আমরা একটির পর একটি বহুবিধ পৌরাণিক ও রূপক মূর্তি দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বজ্রধর ইন্দ্র—মানুষের নিকট বারিবর্ষণে বিঘ্ন-উৎপাদনকারী সর্পকে আঘাত করিতেছেন। তারপর তিনি বজ্রনিক্ষেপ করিলে সর্প নিহত হইল, অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মানুষেরা ইন্দ্রকে যজ্ঞাহুতি দ্বারা আরাধনা করিতেছে। তাহারা যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিয়া সেখানে পশু বধ করিতেছে, শলাকার উপরে উহা পক্ব করিয়া ইন্দ্রকে নিবেদন করিতেছে। তাহাদের একটি সর্বজনপ্রিয় 'সোমলতা' নামক ওষধি ছিল; উহা যে ঠিক কি, তাহা এখন আর কেহই জানে না, উহা একেবারে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি, উহা নিষ্পেষণ করিলে দুগ্ধবৎ একপ্রকার রস বাহির হইত, রস গাঁজিয়া উঠিত; আরও জানা যায়, এই সোমরস মাদক দ্রব্য। ইহাও সেই আর্যেরা ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণের উদ্দেশে নিবেদন করিত এবং নিজেরাও পান করিত। কখন কখন তাহারা এবং দেবগণ একটু বেশী মাত্রাতেই পান করিতেন। ইন্দ্র কখন কখন সোমরস পান করিয়া মত্ত হইয়া পড়িতেন। ঐ গ্রন্থে এরূপও লেখা আছে: এক সময়ে ইন্দ্র এত অধিক সোমরস পান

করিয়াছিলেন যে, তিনি অসংলগ্ন কথা বলিতে লাগিলেন। বরুণদেবতারও একই গতি। তিনি আর এক অতিশয় শক্তিশালী দেবতা এবং ইন্দ্রের মতো তাঁহার উপাসকগণকে রক্ষা করেন ; উপাসকগণও সোম আহুতি দিয়া তাঁহার স্তুতি করেন। রণদেবতা (মরুৎ) ও অপর দেবগণের ব্যাপারও এইরূপ। কিন্তু অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই-সব দেবতার প্রত্যেকের চরিত্রে অনন্তের (অনন্ত শক্তির) ভাব রহিয়াছে। এই অনন্ত কখন কখন ভাবরূপে চিত্রিত, কখন আদিত্যরূপে বর্ণিত, কখন বা অন্যান্য দেবতাদের চরিত্রে আরোপিত। ইন্দ্রেরই কথা ধরুন। বেদের কোন কোন অংশে দেখিতে পাইবেন, ইন্দ্র মানুষের মতো শরীরধারী, অতীব শক্তিশালী, কখন স্বর্ণ-নির্মিত-বর্মপরিহিত, কখন বা উপাসকগণের নিকট অবতরণ করিয়া তাহাদের সহিত আহার ও বসবাস করিতেছেন, অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, সর্পকুলের ধ্বংস করিতেছেন ইত্যাদি। আবার একটি স্তোত্রে দেখিতে পাই, ইন্দ্রকে উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে ; তিনি সর্বশক্তিমান্, সর্বত্র বিদ্যমান এবং সর্বজীবের অন্তর্দ্রষ্টা। বরুণদেবতার সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে —ইনিও ইন্দ্রের মতো অন্তরীক্ষের দেবতা ও বৃষ্টির অধিপতি। তারপর সহসা দেখিতে পাই, তিনি উচ্চাসনে উন্নীত ; তাঁহাকে সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্ প্রভৃতি বলা হইতেছে। আমি তোমাদের নিকট বরুণদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে একটি স্তোত্র পাঠ করিব, তাহাতে তোমরা বুঝিতে পারিবে, আমি কি বলিতেছি। ইংরেজীতেও কবিতাকারে ইহা অনূদিত হইয়াছে।

আমাদের কার্যচয় উচ্চ হ'তে দেখিবারে পান,
যেন অতি নিকটেই প্রভুদেব সর্বশক্তিমান্।
যদিও মানুষ রাখে কর্মচয় অতীব গোপন,
স্বর্গ হ'তে দেবগণ হেরিছেন সব অনুক্ষণ।
যে-কেহ দাঁড়ায়, নড়ে, গোপনেতে যায় স্থানান্তর,
সুনিভৃত কক্ষে পশে, দেবতার দৃষ্টি তার'পর।
উভয়ে মিলিয়া যেথা ষড়যন্ত্র করে ভাবি মনে,
কেহ না হেরিছে দোঁহে, মিলিয়াছে অতি সঙ্গোপনে।
তৃতীয় বরুণদেব সেই স্থানে করি অবস্থান,
দুরভিসন্ধির কথা জ্ঞাত হন সর্বশক্তিমান্।

এই যে রয়েছে বিশ্ব—অধিপতি তিনি গো ইহার,
ওই যে হেরিছ নভঃ সুবিশাল সীমাহীন তাঁর।
রাজিছে তাঁহারই মাঝে অন্তহীন দুটি পারাবার,
তবু ক্ষুদ্র জলাশয় রচেছেন আগার তাঁহার।
বাঞ্ছা যার আছে মনে উঠিবারে উচ্চ গগনেতে,
বরুণের হস্তে তার অব্যাহতি নাই কোনমতে।
নভঃ হ'তে অবতরি চরগণ তাঁর নিরন্তর,
করিছে ভ্রমণ অতিক্রুত সারা পৃথিবীর 'পর।
দূর দূরতম স্থানে লক্ষ্য তারা করিছে সতত,
পরীক্ষাকুশল নেত্র বিস্ফারিত করি শত শত।[১]

অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। তাঁহারা একের পর এক সেই একই অবস্থা লাভ করেন। প্রথমে তাঁহারা অন্যতম দেবতারূপে আরাধিত হন, কিন্তু তারপর সেই পরমসত্তারূপে গৃহীত হন, যাঁহাতে সমগ্র জগৎ অবস্থিত, যিনি প্রত্যেকের অন্তর্যামী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তা। বরুণদেব সম্বন্ধে কিন্তু আর একটি ধারণা আছে। উহার অঙ্কুর মাত্র দেখা গিয়াছিল, কিন্তু আর্যগণ শীঘ্রই উহা দমন করিয়াছিলেন—উহা 'ভীতির ধারণা'। অন্য একস্থলে দেখা যায়—তাঁহারা ভীত, তাঁহারা পাপ করিয়া বরুণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। সেই ধারণাগুলি ভারতভূমিতে বাড়িতে দেওয়া হয় নাই, ইহার কারণ পরে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু উহার বীজগুলি নষ্ট হয় নাই, অঙ্কুরিত হইবার চেষ্টা করিতেছিল—'উহা ভয় ও পাপের ধারণা'। আপনারা সকলেই জানেন যে, এই ধারণাকে 'একেশ্বর-বাদ' বলা হয়। এই একেশ্বরবাদ একেবারে প্রথম দিকে ভারতে দেখা দিয়াছিল, দেখিতে পাই সংহিতার সর্বত্রই—উহার প্রথম ও সর্বপ্রাচীন অংশে এই একেশ্বরবাদের প্রভাব। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব, আর্যগণের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত হয় নাই, তাঁহারা উহাকে অতি প্রাথমিক ধারণাবোধে একপাশে ফেলিয়া দেন এবং আরও অগ্রসর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যেমন হিন্দুগণ এখনও করিয়া থাকে। অবশ্য বেদ সম্বন্ধে ইওরোপীয়দের এরূপ

---

১ অথর্ববেদ, কাণ্ড ৪, সূঃ ১৬; এখানে ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

সমালোচনা পাঠ করিয়া হিন্দুগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। যাঁহারা (পাশ্চাত্য জাতিরা) মাতৃদুগ্ধপানের মতো সগুণ-ঈশ্বরবাদকেই ঈশ্বরের সর্বোচ্চ ধারণা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যখন দেখিতে পান, যে-একেশ্বরবাদের ভাবে বেদের সংহিতাভাগ পূর্ণ, সেই একেশ্বরবাদকে আর্যগণ অপ্রয়োজনীয় এবং দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে এবং অধিকতর দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ ও অতীন্দ্রিয় ভাব আয়ত্ত করিতে কঠোর আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তখন স্বভাবতই তাঁহারা ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকগণের ভাব অনুযায়ী চিন্তা করিতে সাহস করেন না।

যদিও ঈশ্বরের বর্ণনাকালে আর্যগণ বলিয়াছেন, 'সমুদয় জগৎ তাঁহাতেই অনুবর্তিত' এবং 'তুমি সকল হৃদয়ের পালনকর্তা', তথাপি একেশ্বরবাদ তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত মানবভাবাপন্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল। হিন্দুরা সর্ববিধ চিন্তা-ধারায় সাহসী—এত সাহসী যে, তাঁহাদের চিন্তার এক একটি স্ফুলিঙ্গ পাশ্চাত্যের তথাকথিত সাহসী মনীষীদের ভীতি উৎপাদন করে। হিন্দুদের পক্ষে ইহা একটি গৌরব ও কৃতিত্বের কথা। এই হিন্দু মনীষিগণের সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যথার্থই বলিয়াছেন, 'তাঁহারা এত উচ্চে উঠিয়াছেন যে, সেখানে তাঁহাদেরই ফুসফুস শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু অপর দার্শনিকগণের ফুসফুস ফাটিয়া যাইত।' এই সাহসী জাতি বরাবর যুক্তি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে; যুক্তি তাঁহাদের কোথায় লইয়া যাইবে, ইহার জন্য কি মূল্য দিতে হইবে, সে-কথা আর্য দার্শনিকগণ ভাবেন নাই; ইহার ফলে তাঁহাদের অতি প্রিয় কুসংস্কারগুলি চূর্ণ হইয়া যাক, অথবা সমাজ তাঁহাদের সম্বন্ধে কি ভাবিবে বা বলিবে, সে-বিষয়ে তাঁহারা দৃক্‌পাত করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা যাহা সত্য ও যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন।

প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা প্রথমতঃ দু-একটি অতি আশ্চর্য বৈদিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। এই-সকল দেবতা একের পর এক গৃহীত হইয়া সর্বোচ্চভাবে উন্নীত হইয়াছেন, অবশেষে তাঁহারা প্রত্যেকে অনাদি অখণ্ড সগুণ ঈশ্বররূপ ধারণ করিয়াছেন; এই অভিনব ব্যাপারটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এইরূপ উপাসনাতে হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব দেখিয়া উহাকে Henotheism বা 'একদেববাদ' আখ্যা দিয়াছেন। উহার ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগকে বহুদূরে

যাইতে হইবে না, উহা ঋগ্বেদের মধ্যেই আছে। ঐ গ্রন্থের যে-স্থলে প্রত্যেক দেবতাকে ঐরূপ সর্বোচ্চ মহিমায় মণ্ডিত করিয়া উপাসনা করিবার কথা আছে, সে-স্থল হইতে আর একটু অগ্রসর হইলে আমরা তাহার অর্থও জানিতে পারি। এখন প্রশ্ন আসে—হিন্দুপুরাণসমূহ অন্যান্য ধর্মের পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি হইতে এত পৃথক্, এত বিশিষ্ট কিরূপে হইল? ব্যাবিলনীয় বা গ্রীক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, একজন দেবতাকে উন্নীত করিবার প্রয়াস করা হইতেছে—পরে তিনি এক উচ্চপদ লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যান্য দেবতারা হতশ্রী হইলেন। সকল মোলোকের (Molochs) মধ্যে জিহোবা (Jehovah) শ্রেষ্ঠ হইলেন, অন্যান্য মোলোকগণ চিরতরে বিস্মৃত ও বিলীন হইলেন। তিনিই সর্বদেবতা 'ঈশ্বর' হইলেন। গ্রীক দেবতাদের সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে—জিউস (Zeus) অগ্রবর্তী হইলেন, উচ্চ উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইলেন, সমগ্র জগতের প্রভু হইলেন এবং অন্যান্য দেবগণ অতি ক্ষুদ্র দেবদূতরূপে পরিণত হইলেন। পরবর্তী কালেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। বৌদ্ধ ও জৈনগণ তাঁহাদের একজন ধর্মপ্রচারককে ঈশ্বররূপে আরাধনা করিলেন এবং অন্যান্য দেবগণকে তাঁহার অধীন করিয়া দিলেন। ইহাই সর্বত্র অনুসৃত পদ্ধতি, কিন্তু এ-বিষয়ে হিন্দুধর্মে বিশেষত্ব ও ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। প্রথম একজন দেবতা বন্দিত হইতেছেন, কিছুক্ষণের জন্য অন্যান্য দেবতারা তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী বলা হইয়াছে।

যিনি বরুণদেব কর্তৃক পূজিত ও সম্মানিত হইলেন, তিনিই পরবর্তী গ্রন্থে সর্বোচ্চ গৌরব লাভ করিলেন। এই দেবগণ যথাক্রমে প্রত্যেকেই সগুণ ঈশ্বররূপে বর্ণিত। ইহার ব্যাখ্যা ঐ পুস্তকেই আছে এবং ইহাই চমৎকার ব্যাখ্যা। যে মন্ত্রপ্রভাবে অতীত ভারতে একটি চিন্তাপ্রবাহ উঠিয়াছিল এবং যাহা ভবিষ্যতে সমগ্র ধর্মজগতের চিন্তার কেন্দ্রস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইবে, সেই মন্ত্রটি এই: 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—যাহা সত্য তাহা এক, জ্ঞানিগণ তাহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই দেবতাদের বিষয়ে যে-সকল স্তোত্র রচিত হইয়াছে, সর্বত্রই অনুভূত সত্তা এক—অনুভবকর্তার জন্যই যা কিছু বিভিন্নতা। স্তোত্র-রচয়িতা, ঋষি ও কবিগণ বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন বাক্যে সেই একই সত্তার (ব্রহ্মের) স্তুতিগান করিয়াছেন—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। এই একটি মাত্র শ্রুতিবাক্য হইতে প্রভূত ফল

ফলিয়াছে। সম্ভবতঃ তোমাদের কেহ কেহ ভাবিয়া বিস্মিত হইবে যে, ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যেখানে ধর্মের জন্য কখন কাহারও উপর নির্যাতন হয় নাই, যেখানে কোন ব্যক্তি কখনও তাহার ধর্মবিশ্বাসের জন্য উত্যক্ত হয় নাই; সেখানে ঈশ্বরবিশ্বাসী, নাস্তিক, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী এবং একেশ্বরবাদী সকলেই আছেন এবং কখনও নির্যাতিত না হইয়া বসবাস করিতেছেন। সেখানে জড়বাদীদিগকেও ব্রাহ্মণ-পরিচালিত মন্দিরের সোপান হইতে দেবতাদের বিরুদ্ধে এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে দেওয়া হইয়াছে। জড়বাদী চার্বাকগণ দেশময় প্রচার করিয়াছে: ঈশ্বর-বিশ্বাস কুসংস্কার; এবং দেবতা, বেদ ও ধর্ম—পুরোহিতগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উদ্ভাবিত কুসংস্কার মাত্র। তাহারা বিনা উৎপীড়নে এই-সব প্রচার করিয়াছে। এইরূপে বুদ্ধদেব হিন্দুগণের প্রত্যেক প্রাচীন ও পবিত্র বিষয় ধূলিসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াও অতি বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। জৈনগণও এইরূপ করিয়াছেন—তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব শুনিয়া বিদ্রূপ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন: ঈশ্বর আছেন—ইহা কিরূপে সম্ভব? ইহা শুধু একটি কুসংস্কার। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মুসলমান আক্রমণ-তরঙ্গ ভারতে আসিবার পূর্বে এদেশে ধর্মের জন্য নির্যাতন কী, তাহা কেহ কখনও জানিত না। যখন বিদেশীরা এই নির্যাতন হিন্দুদের উপর আরম্ভ করিল, তখনই হিন্দুদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা হইল; এবং এখনও ইহা একটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের গির্জা-নির্মাণে কত অধিক পরিমাণে এবং তৎপরতার সহিত সাহায্য করিয়াছে—কোথাও রক্তপাত হয় নাই। এমন কি ভারতবর্ষ হইতে যে-সকল হিন্দুধর্মবিরোধী ধর্ম উত্থিত হইয়াছিল, সেগুলিও কখন নির্যাতিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের কথা ধরুন—বৌদ্ধধর্ম কোন কোন বিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম; কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে বেদান্ত বলিয়া মনে করা অর্থহীন। খ্রীষ্টধর্ম ও 'স্যালভেশন আর্মি'র প্রভেদ সকলেই অনুভব করিতে পারেন। বৌদ্ধধর্মে মহান্ ও সুন্দর ভাব আছে, কিন্তু উহা এমন একপ্রকার মণ্ডলীর হস্তে পতিত হইয়াছিল, যাহারা ঐ ভাবসমূহ রক্ষা করিতে পারে নাই। দার্শনিকগণের হস্তের রত্নসমূহ জনসাধারণের হস্তে পড়িল এবং তাহারা দার্শনিক ভাবগুলি দখল করিয়া বসিল। তাহাদের ছিল অত্যধিক উৎসাহ, আর কয়েকটি আশ্চর্য আদর্শ, মহৎ জনহিতকর ভাবও

ছিল, কিন্তু সর্বোপরি সর্ববিষয় নিরাপদ রাখিবার পক্ষে আরও কিছু প্রয়োজন—চিন্তা ও মনীষা। যেখানেই দেখিবেন, উচ্চতম লোকহিতকর ভাবসমূহ শিক্ষাদীক্ষাহীন সাধারণ লোকের হাতে পড়িয়াছে, তাহার প্রথম ফল—অবনতি। কেবলমাত্র বিদ্যানুশীলন ও বিচারশক্তি সকল বস্তুকে সুরক্ষিত করে। তারপর এই বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রচারশীল ধর্ম, তৎকালীন সমুদয় সভ্য জগতের সর্বত্র প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য একটি বিন্দু রক্তপাত হয় নাই। আমরা পড়িয়াছি, কিরূপে চীনদেশে বৌদ্ধ প্রচারকগণ নির্যাতিত হন, এবং সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ক্রমান্বয়ে দুই তিন জন সম্রাট্ কর্তৃক নিহত হয়, কিন্তু তারপর যখন বৌদ্ধদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল এবং একজন সম্রাট্ উৎপীড়নকারীদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন, তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। আমাদের এই সমুদয় তিতিক্ষার জন্য ঐ এক মন্ত্রের নিকটেই আমরা ঋণী। সেইজন্যই আমি উহা আপনাদিগকে স্মরণ করিতে বলিতেছি। যাঁহাকে সকলে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ বলে—সেই সত্তা একই ; ঋষিরা তাঁহাকে বহু নামে ডাকে—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'।[১]

এই স্তুতি কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা কেহই জানেন না ; আট হাজার বৎসর পূর্বেও হইতে পারে এবং আধুনিক সকল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইহার প্রণয়নকাল ৯০০০ বৎসর প্রাচীনও হইতে পারে।

ধর্মবিষয়ক এই অনুধ্যানগুলির একটিও আধুনিক কালের নয়, তথাপি রচনাকালে এগুলি যেমন জীবন্ত ছিল, এখনও সেইরূপ ; এখন বরং অধিকতর সজীব হইয়া উঠিয়াছে, কারণ প্রাচীনতম কালে মানবজাতি আধুনিক কালের মতো এত 'সভ্য' ছিল না ; এতটুকু মতের পার্থক্যের জন্য সে তখনও তাহার ভ্রাতার গলা কাটিতে শিখে নাই বা রক্তস্রোতে ধরাতল প্লাবিত করে নাই অথবা নিজ প্রতিবেশীর প্রতি পিশাচের মতো ব্যবহার করে নাই। তখন মানুষ মনুষ্যত্বের নামে সমুদয় মানবজাতির ধ্বংস সাধন করিতে শিখে নাই।

১ ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।—ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬

সেইজন্যই 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এই মহাবাণী আজও আমাদের নিকট অতিশয় সজীব, ততোধিক মহান্, শক্তি- ও জীবন-প্রদ এবং যেকালে এগুলি লিখিত হইয়াছিল, সে-সময় অপেক্ষা অধিকতর নবীনরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এখনও আমাদের শিখিতে হইবে যে, সকল প্রকার ধর্ম—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান—যে কোন নামেই অভিহিত হউক না, সকলে একই ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং যে এগুলির একটিকে ঘৃণা করে, সে তাহার নিজের ভগবান্‌কেই ঘৃণা করে।

তাঁহারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলেন। কিন্তু পূর্বে যেমন বলিয়াছি—এই প্রাচীন একেশ্বরবাদ হিন্দু চিত্তকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই; কারণ আধ্যাত্মিক রাজ্যে ইহা অধিক দূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ; ইহার দ্বারা দৃশ্য জগতের ব্যাখ্যা হয় না—পৃথিবীর একচ্ছত্র শাসনকর্তা দ্বারা পৃথিবীর ব্যাখ্যা হয় না।

বিশ্বের একজন নিয়ন্তা দ্বারা কখনই বিশ্বের ব্যাখ্যা হয় না, বিশেষতঃ বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত নিয়ন্তার দ্বারা ইহার সম্ভাবনা তো আরও কম। তিনি আমাদের নৈতিক গুরু হইতে পারেন—জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-শক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন, কিন্তু তাহা তো বিশ্বের ব্যাখ্যা নয়।

তাই প্রথম প্রশ্ন উঠিতেছে—বিরাট প্রশ্ন উঠিতেছে!

'এই বিশ্ব কোথা হইতে আসিল কেমন করিয়া আসিল এবং কিরূপেই বা অবস্থান করিতেছে?' [১] এই প্রশ্ন সমাধানের একটি বিশিষ্ট রূপ গঠনের জন্য বহু স্তোত্র লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই স্তোত্রে যেরূপ অপূর্ব কাব্যের সহিত উহা প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথায়ও দেখা যায় না:

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥[২]

—যখন অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না, যখন অন্তরীক্ষ ছিল না, যখন কিছুই ছিল না, কোন্ বস্তু সকলকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, কিসে সব বিশ্রাম

১ কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ।—ঋগ্‌বেদ, ১০।৮১।২

২ ঋগ্‌বেদ, ১০।১২৯।১-২—নাসদীয় সূক্ত।

করিতেছিল? তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না। অনুবাদে মূলের কাব্যমাধুরী বহুলাংশে নষ্ট হইয়া যায়—'তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না'! সংস্কৃত ভাষার প্রত্যেক ধ্বনিটি যেন সুরময়! তখন সেই 'এক' (ঈশ্বর) অবরুদ্ধ-প্রাণে নিজেতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না'—এই ভাবটি উত্তমরূপে ধারণা করা উচিত যে, ঈশ্বর অবরুদ্ধ-প্রাণ (গতিহীন)-রূপে অবস্থান করিতেছিলেন; কারণ অতঃপর আমরা দেখিব, কিভাবে পরবর্তীকালে এই ভাব হইতেই সৃষ্টিতত্ত্ব অঙ্কুরিত হইয়াছে। হিন্দু দার্শনিকগণ সমগ্র বিশ্বকে একটি স্পন্দনসমষ্টি—একপ্রকার গতি মনে করিতেন, সর্বত্রই শক্তি-প্রবাহ। এই গতি-সমষ্টি একটা সময়ে স্থির হইতে থাকে এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন করে এবং কিছুকালের জন্য সেই অবস্থায় স্থিতি করে। এই স্তোত্রে ঐ অবস্থার কথাই বর্ণিত হইয়াছে—এই জগৎ স্পন্দন-হীন হইয়া নিশ্চল অবস্থায় ছিল। যখন এই সৃষ্টির সূচনা হইল, তখন উহা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিল এবং উহা হইতে জগৎ বাহির হইয়া আসিল। সেই পুরুষের নিঃশ্বাস—শান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ—ইহার বাহিরে আর কিছু নাই।

প্রথম একমাত্র অন্ধকারই ছিল। তোমাদের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষে অথবা অন্য কোন গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশে গিয়া মৌসুমী-বায়ু-চালিত মেঘ-বিস্তার দেখিয়াছ, তাহারাই এই বাক্যের গাম্ভীর্য বুঝিতে পারিবে। আমাদের মনে আছে, তিনজন কবি এই দৃশ্য বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মিল্টন বলিয়াছেন, 'সেখানে আলোক নাই, বরং অন্ধকার দৃশ্যমান।' কালিদাস বলেন, 'সূচিভেদ্য অন্ধকার।' কিন্তু কেহই এই বৈদিক বর্ণনার নিকটবর্তী হইতে পারেন নাই—'অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার লুকানো ছিল।' সর্ববস্তু দহ্যমান, মর্মরিত—শুষ্ক, সমগ্র সৃষ্টি যেন ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে, এবং এইভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর একদিন সায়াহ্নে দিক্‌চক্রবালের এক প্রান্তে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল, এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই মেঘে পৃথিবী ছাইয়া গেল, মেঘের উপর মেঘ, থরে থরে মেঘ—তারপর প্রবল ধারায় উহা যেন ফাটিয়া পড়িল, প্লাবন শুরু হইল।

এখানে সৃষ্টির কারণরূপে ইচ্ছাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে যাহা ছিল, তাহা যেন ইচ্ছারূপে পরিণত হইল এবং ক্রমে তাহা হইতেই বাসনার

প্রকাশ। এইটি আমাদের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত, কারণ এই বাসনাই আমাদের যাহা কিছু প্রত্যক্ষের কারণরূপে কথিত হইয়াছে। এই ইচ্ছার ধারণাই বৌদ্ধ ও বেদান্ত চিন্তাপদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ এবং পরবর্তী কালে জার্মান দর্শনে প্রবিষ্ট হইয়া শোপেনহাওয়ারের দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে। এইখানেই আমরা প্রথম পাই :

ব্যক্ত মনেতে উপ্ত সে বীজ—সে কোন্ প্রভাতে দূর
জাগিয়া উঠিল ইচ্ছা প্রথম—বাসনার অঙ্কুর !
কবি-কল্পনা জ্ঞানের সহায়ে খুঁজিল হৃদয়-মাঝে,
দেখিল সেথায় সৎ ও অসৎ—বাঁধনে জড়ায়ে রাজে।[১]

ইহা এক নূতন প্রকারের অভিব্যক্তি ; কবি এই বলিয়া শেষ করিলেন, 'তিনিও বোধ হয় জানেন না, সেই অধ্যক্ষও সৃষ্টির কারণ জানেন না।'[২] আমরা এই সূক্তে দেখিতে পাই—ইহার কাব্যমাধুরী ছাড়া বিশ্বরচনা সম্বন্ধে প্রশ্নটি এক নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। এবং এই-সব ঋষিদের মন এমন একটি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, তাঁহারা আর সাধারণ উত্তরে সন্তুষ্ট নন। আমরা এখানে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা 'পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত এই জগতের অধ্যক্ষে একজন শাসনকর্তায়' সন্তুষ্ট নন। এই বিশ্ব কিরূপে আবির্ভূত হইল—এ সম্বন্ধে পূর্বে আমরা যেরূপ দেখিয়াছি, সেই একই ধারণা নানা সূক্তে দেখিতে পাই।

তাঁহারা একজন ব্যক্তিবিশেষকে এই বিশ্বের অধ্যক্ষরূপে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং ইহার নিমিত্ত এক একটি দেবতাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সেই ঈশ্বরের আসনে বসাইতেছিলেন। সেইজন্য বিভিন্ন স্তোত্রে আমরা দেখিতে পাই, এক একটি বিভিন্ন আদর্শকে গ্রহণপূর্বক অনন্তরূপে বর্ধিত করিয়া বিশ্বের সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিতেছেন।

---

১ কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিংদন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা। ঐ, ৪র্থ মন্ত্র

২ ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ। ঐ, ৭ম মন্ত্র

কোন একটি বিশিষ্ট আদর্শ এই জগতের আধার-রূপে গৃহীত হইতেছে—যাহাতে এই বিশ্বের স্থিতি এবং যে আধার এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপে নানা আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা বিশ্বরহস্য সমাধানে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রাণই জীবনীশক্তি, তাঁহারা এই প্রাণতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া এমন ভাবে বর্ধিত করিতে লাগিলেন যে, ঐ প্রাণশক্তি এক অনন্ত তত্ত্বে পরিণত হইল। এই প্রাণশক্তি সকলকে ধারণ করিতেছে—কেবল মনুষ্য-শরীরকে নয়, এই প্রাণশক্তি সূর্য ও চন্দ্রেরও আলো—ইহাই সব কিছুকে স্পন্দিত করিতেছে। ইহাই বিশ্বের প্রেরণাশক্তি।

সমস্যার সমাধানে এই-সকল চেষ্টা অতীব সুন্দর—অতিশয় কাব্যমধুর। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি, যেমন 'তিনিই সুন্দরী ঊষার আগমনবার্তা ঘোষণা করেন' প্রভৃতি তাঁহারা যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব গীতিময়।

এই যে 'ইচ্ছা', যাহা আমরা এই মাত্র পড়িলাম, যাহা সৃষ্টির আদি-বীজরূপে উত্থিত হইয়াছিল, উহাকে তাঁহারা এমন ভাবে বিস্তৃত করিতে লাগিলেন যে, উহাই শেষ পর্যন্ত এক বিশ্বজনীন ঈশ্বরভাবে পরিণত হইল। কিন্তু এই ভাবগুলির কোনটিই তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতে পারিল না।

এই আদর্শ ক্রমে মহিমান্বিত হইয়া শেষে এক বিরাট ব্যক্তিত্বে ঘনীভূত হইল। 'তিনি সৃষ্টির অগ্রে ছিলেন, তিনি সব কিছুর অধীশ্বর, তিনি বিশ্বকে ধরিয়া আছেন, তিনি জীবের স্রষ্টা, তিনি বলবিধাতা, সকল দেবতা যাঁহাকে উপাসনা করেন, জীবন ও মৃত্যু যাঁহার ছায়া—তাঁহাকে ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে আমরা উপাসনা করিব? তুষারমৌলি হিমালয় যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, সমুদ্র তাহার সমগ্র জলরাশির সহিত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে'—এইভাবে তাঁহার বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু এই মাত্র আমি বলিয়াছি যে, এই সমস্ত ধারণাও তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই।[১]

অবশেষে (বেদে) আমরা এক অদ্ভুত ধারণা দেখিতে পাই। (ঐ যুগে) আর্যমানবের মন বহিঃপ্রকৃতি হইতে এতদিন ঐ প্রশ্নের (কে সেই সর্বজ্ঞ

---

১ ঋগ্বেদ, ১০।১২১।১-৪ মন্ত্র—হিরণ্যগর্ভসূক্তম্।

একমাত্র স্রষ্টা ?) উত্তর অনুসন্ধান করিতেছিল। তাঁহারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাশি প্রভৃতি সর্ববস্তুর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া এবং সাধ্যানুযায়ী তাহার সমাধানও করিয়াছিলেন। সমগ্র বিশ্ব তাঁহাদের শুধু এইটুকু শিখাইল—বিশ্বের নিয়ন্তা এক সগুণ ঈশ্বর আছেন। বহিঃপ্রকৃতি ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক শিখাইতে পারে না। সংক্ষেপে বহিঃপ্রকৃতি হইতে আমরা মাত্র একজন বিশ্ব-স্থপতির অস্তিত্ব ধারণা করিতে পারি। এই ধারণা রচনাকৌশলবাদ (Design Theory) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আমরা সকলেই জানি, এইরূপ মীমাংসা খুব বেশী যুক্তিসঙ্গত নয়; এই মতবাদ কতকটা ছেলেমানুষী, তথাপি বহির্জগতের কারণানুসন্ধান দ্বারা এইটুকু মাত্র আমরা জানিতে পারি যে, এই জগতের একজন নির্মাতা প্রয়োজন। কিন্তু ইহা দ্বারা আদৌ জগতের ব্যাখ্যা হইল না। এই জগতের উপাদান তো ঈশ্বরের আগেও ছিল এবং তাঁহার এই-সব উপাদানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইহাতে এক ভীষণ আপত্তি উঠিবে যে, তিনি তাহা হইলে এই উপাদানের দ্বারা সীমাবদ্ধ। গৃহনির্মাতা উপাদান ব্যতিরেকে গৃহ নির্মাণ করিতে পারেন না। অতএব তিনি উপাদান দ্বারা সীমাবদ্ধ হইলেন; উপাদানের দ্বারা যতটুকু সম্ভব, ততটুকু মাত্রই তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন। সেইজন্য রচনা-কৌশলবাদের ঈশ্বর একজন স্থপতি মাত্র এবং সেই বিশ্বস্থপতি সসীম; উপাদানের দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ—একেবারেই স্বাধীন নন। এই পর্যন্ত তাঁহারা ইতিপূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বহু মানবচিত্ত এইখানেই বিশ্রাম করিতে পারে। অন্যান্য দেশের চিন্তাক্ষেত্রে এইরূপই ঘটিয়াছিল, কিন্তু মনুষ্যমন উহাতে তৃপ্ত হইতে পারে নাই; চিন্তাশীল, অবধারণশীল চিত্ত আরও অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহিল, কিন্তু যাহারা পশ্চাদ্‌বর্তী তাহারা উহাই ধরিয়া রহিল এবং অগ্রবর্তীদের আর অগ্রসর হইতে দিল না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই হিন্দু ঋষিরা আঘাত খাইয়া দমিবার পাত্র ছিলেন না; তাঁহারা ইহার সমাধান চাহিলেন এবং এখন আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহারা বাহ্যকে ত্যাগ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছেন।

প্রথমেই তাঁহাদের মনে এই সত্য ধরা পড়িয়াছিল যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করি না বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু জানিতে পারি না; তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা সেইজন্য আমাদের শারীরিক

এবং মানসিক অক্ষমতা নির্দেশ করা, ইহা আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। একজন ঋষি বলিলেন, 'তুমি এই বিশ্বের কারণ জান না; তোমার ও আমার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে—কেন? তুমি ইন্দ্রিয়পর বিষয় সম্বন্ধে কথা বলিতেছ, এবং বিষয় ও ধর্মের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে সন্তুষ্ট রহিয়াছ, পক্ষান্তরে আমি ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষকে জানিয়াছি।'

আমি যে আধ্যাত্মিক প্রগতির অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অপর দিক—যাহার সহিত আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যেজন্য আমি উহা বিশদরূপে উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক নই—সেই আনুষ্ঠানিক ধর্মের বৃদ্ধির সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব। যদি আধ্যাত্মিক ধারণার প্রগতি সমান্তরে (Arithmetical Progression) বর্ধিত হয়, তাহা হইলে আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রগতি সমগুণিতান্তর (Geometrical Progression) বেগে বর্ধিত হইয়াছে—প্রাচীন কুসংস্কার এক বিরাট আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে; ইহা ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ করিয়া হিন্দুর জীবনীশক্তি ইহার চাপে প্রায় ধ্বংস করিয়া দিয়াছে; ইহা এখনও সেখানে বর্তমান; ইহা আমাদিগকে কঠোরভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং আমাদের জীবনীশক্তির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া জন্ম হইতে আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে। তথাপি সেই প্রাচীনকাল হইতেই আমরা দেখিতে পাই, অনুষ্ঠানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধও চলিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে যে একটি আপত্তি উঠিয়াছিল, তাহা এই—ক্রিয়াকাণ্ডে প্রীতি, নির্দিষ্ট সময়ে পরিচ্ছদ-ধারণ, নির্দিষ্ট উপায়ে খাওয়া-দাওয়া—ধর্মের এই-সব বাহ্য ঘটা ও মূক নাট্যাভিনয়, বহিরঙ্গ ধর্ম; ইহা কেবল মানুষের ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করে, ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে যাইতে দেয় না—আমাদের এবং প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হওয়ার এক প্রচণ্ড বাধা।

পারতপক্ষে আমরা যদি বা আধ্যাত্মিক বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাও ইন্দ্রিয়ের উপযোগী হওয়া চাই; একজন মানুষ কয়েকদিন ধরিয়া দর্শন, ঈশ্বর, অতীন্দ্রিয় বস্তু সম্বন্ধে শ্রবণ করার পর জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা বেশ, এতে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে? ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগ এতে কতটুকু হয়?' সম্ভোগ বলিতে ইহারা মাত্র ইন্দ্রিয়সুখই বুঝে—ইহা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু

আমাদের ঋষিরা বলিতেছেন, 'ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই আমাদের ও সত্যের মধ্যে এক আবরণ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।' ক্রিয়াকাণ্ডে আনন্দ, ইন্দ্রিয়ে তৃপ্তি এবং বিভিন্ন মতবাদ আমাদের ও সত্যের মধ্যে এক আবরণ টানিয়া দিয়াছে। এই বিষয়টি আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর এক বিরাট সীমা-নির্দেশ। আমরা শেষ পর্যন্ত এই আদর্শেরই অনুসরণ করিব এবং দেখিতে পাইব, ইহা কিরূপে বর্ধিত হইয়া বেদান্তের সেই অদ্ভুত মায়াবাদে পরিসমাপ্ত হইয়াছে—এই মায়ার অবগুণ্ঠনই বেদান্তের যথার্থ ব্যাখ্যা—সত্য চিরকালই সমভাবে বিদ্যমান, কেবল মায়া তাহার অবগুণ্ঠনের দ্বারা তাহাকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচীন চিন্তাশীল আর্যেরা এক নূতন প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন, বহির্জগতের অনুসন্ধানের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে না। অনন্তকাল ধরিয়া বহির্জগতে অনুসন্ধান করিলেও সেখান হইতে এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যাইবে না। এইজন্য তাঁহারা অপর পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন এবং তদনুসারে জানিলেন যে, এই ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা, ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি আসক্তি, বাহ্য বিষয়ই ব্যক্তির সহিত সত্যের মিলনের মধ্যে এক ব্যবধান টানিয়া দিয়াছে, যাহা কোন ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা অপসারিত হইবার নয়। তাঁহারা তাঁহাদের মনোজগতে আশ্রয় লইলেন এবং নিজেদেরই মধ্যে সেই সত্যকে আবিষ্কার করিবার জন্য মনকে বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বহির্জগতে ব্যর্থ হইয়া যখন অন্তর্জগতে প্রবেশ করিলেন, তখনই ইহা প্রকৃত বেদান্তদর্শনে পরিণত হইল; এখান হইতেই বেদান্তদর্শনের আরম্ভ এবং ইহাই বেদান্তের ভিত্তি-প্রস্তর। আমরা যতই অগ্রসর হইব, ততই বুঝিতে পারিব, এই দর্শনের সকল অনুসন্ধান অন্তর্দেশে। দেখা যায়—একেবারে প্রথম হইতেই তাঁহারা ঘোষণা করিতেছেন, 'কোনও ধর্মবিশেষে সত্যের অনুসন্ধান করিও না; সকল রহস্যের রহস্য, সকল জ্ঞানের কেন্দ্র, সকল অস্তিত্বের খনি—এই মানবাত্মায় অনুসন্ধান কর। যাহা এখানে নাই, তাহা সেখানেও নাই।' ক্রমে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, যাহা বাহ্য তাহা অন্তরের বড়জোর একটা মলিন প্রতিবিম্ব মাত্র। আমরা দেখিতে পাইব, তাঁহারা কেমন করিয়া জগৎ হইতে পৃথক্ এবং শাসক ঈশ্বরের প্রাচীন ধারণাকে প্রথম বাহ্য হইতে অন্তরে স্থাপন করিয়াছেন। এই ভগবান্

জগতের বাহিরে নন, অন্তরে; এবং পরে সেখান হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়া তাঁহারা নিজেদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি এখানে—এই মানব-হৃদয়ে আছেন—তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের অন্তর্যামী সত্যস্বরূপ।

বেদান্ত-দর্শনের কর্মপ্রণালী যথাযথভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে কতকগুলি মহৎ ধারণা পূর্বে বুঝিতে হইবে। ক্যাণ্ট ও হেগেলের দর্শন আমরা যেভাবে বুঝি, বেদান্ত সেইভাবের কোন দর্শনশাস্ত্র নয়। ইহা কোন গ্রন্থ-বিশেষ বা কোন একজন ব্যক্তিবিশেষের লেখা নয়। বেদান্ত হইতেছে—বিভিন্ন কালে রচিত গ্রন্থসমষ্টি। কখন কখন দেখা যায়, ইহার একখানিতেই পঞ্চাশটি বিষয়ের সন্নিবেশ। অপর বিষয়গুলি যথাযথভাবে সজ্জিতও নয়; মাত্র চিন্তাগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই, নানা বিজাতীয় বিষয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট। কিন্তু একটা বিষয় খুব প্রণিধানযোগ্য যে, উপনিষদের এই আদর্শগুলি চির-প্রগতিশীল। ঋষিগণের মনের কার্যাবলী যেমন যেমন চলিয়াছে, তাঁহারাও সেই প্রাচীন অসম্পূর্ণ ভাষায় উহা তেমনি তেমনি আঁকিয়াছেন। প্রথম ধারণাগুলি অতি স্থূল, ক্রমে সেগুলি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ধারণায় পরিণত হইয়া বেদান্তের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে এবং পরে এই শেষ সিদ্ধান্ত এক দার্শনিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন প্রথম আমরা দেখিতে পাই—দ্যোতন-স্বভাব দেবতার অনুসন্ধান, তারপর আদি জগৎ-কারণের অন্বেষণ এবং সেই সত্য একই অনুসন্ধানের ফলে আর একটি অধিকতর স্পষ্ট দার্শনিক আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে, সকল পদার্থের একত্ব—'যাহাকে জানিলে সকলই জানা হয়'।

হিন্দুধর্ম

[প্রাচীন বৈদিক ঋষিদেরই প্রেম ও পরধর্মসহিষ্ণুতাপূর্ণ মধুর কণ্ঠস্বর সেদিন হিন্দু সন্ন্যাসী 'পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল; এবং ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটির নিমন্ত্রণক্রমে যাঁহারা ক্লিন্টন এভেন্যুতে অবস্থিত পাউচ্ গ্যালারির প্রকাণ্ড বক্তৃতাগৃহ এবং তৎসংযুক্ত গৃহগুলিতে যত লোক ধরে, তদপেক্ষাও অধিক সংখ্যায় সমবেত হইয়াছিলেন, সেই বহু শত শ্রোতৃবৃন্দের প্রত্যেককে সেই কণ্ঠস্বরই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।—৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪ খৃঃ।

এই প্রাচ্য সন্ন্যাসী 'হিন্দুধর্ম'-নামক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও দর্শনসম্মত ধর্মোপাসনার দূত ও প্রতিভূরূপে প্রতীচ্যে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহার যশ পূর্ব হইতেই বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহার ফলস্বরূপ চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী, বিচারক, শিক্ষক প্রভৃতি সকল বিভাগের লোক বহু ভদ্র-মহিলার সহিত শহরের নানাস্থান হইতে ভারতীয় ধর্মের এই অপূর্ব, সুন্দর ও বাগ্মিতাপূর্ণ সমর্থন শুনিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্বেই তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, তিনি চিকাগো বিশ্বমেলার অন্তর্গত ধর্মমহাসভায় কৃষ্ণ, ব্রহ্ম এবং বুদ্ধের উপাসকদের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন এবং সেখানে অখ্রীষ্টান প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্বেই পড়িয়াছিলেন যে, এই দার্শনিক ধর্মের নিমিত্ত তিনি তাঁহার উজ্জ্বল সাংসারিক জীবন ত্যাগ করেন এবং বহু বর্ষের আগ্রহপূর্ণ এবং ধীর অধ্যয়নের ফলে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কৃষ্টিকে আয়ত্ত করিয়া ঐতিহ্যপূর্ণ হিন্দুসভ্যতার অধ্যাত্ম-রহস্যপূর্ণ ভূমিতে উহা রোপণ করেন; তাঁহারা ইতিপূর্বে তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বাগ্মিতা, পবিত্রতা সারল্য ও সাধুতা সম্বন্ধে শুনিয়াছেন, তাই তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন।

এ-বিষয়ে তাঁহারা হতাশও হন নাই। স্বামী (রাব্বি বা আচার্য) বিবেকানন্দ তাঁহার যশ অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি যখন উজ্জ্বল লালরঙের আলখাল্লা পরিধান করিয়া সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন একগুচ্ছ

কৃষ্ণ চূর্ণকুন্তল তাঁহার কমলারঙের বহুভাঁজযুক্ত পাগড়ির পাশ দিয়া দেখা যাইতেছিল, মুখমণ্ডলের শ্যামশ্রীতে চিন্তার ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, আয়ত ভাবদ্যোতক চক্ষু ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের উদ্দীপনায় ভাস্বর এবং তাঁহার সাবলীল মুখ হইতে গভীর সুমধুর স্বরে প্রায়-নিখুঁত শুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় শুধু প্রেম, সহানুভূতি ও পরমতসহিষ্ণুতার বাণী উচ্চারিত হইতেছিল। তিনি ছিলেন হিমালয়ের প্রসিদ্ধ ঋষিদের এক অত্যাশ্চর্য প্রতিরূপ, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিকতার সহিত খ্রীষ্টধর্মের নৈতিকতার সমন্বয়কারী এক নবীন ধর্মের প্রবর্তক। তাঁহার শ্রোতারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেন ১৮৯৪ খৃঃ ৫ই সেপ্টেম্বর হিন্দুধর্মের সমর্থনকল্পে তিনি যে মহৎ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, শুধু সেইজন্য তাঁহার প্রতি স্বদেশবাসীদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রকাশ্যভাবে লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা নগরীতে এক মহতী জনসভা আহূত হইয়াছিল। স্বামীজী লিখিত বক্তৃতা না দিয়া মৌখিক ভাষণ দিয়াছিলেন ; বক্তৃতা সম্বন্ধে যে যাহাই সমালোচনা করুক না কেন, বাস্তবিকই উহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এথিক্যাল এসোসিয়েশন-এর সভাপতি ডঃ লুইস্ জি. জেন্স্. স্বামীজীর পরিচয় দিবার পর শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহাকে যে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইরূপ :]

শিক্ষালাভ করাই আমার ধর্ম। আমি আমার ধর্মগ্রন্থ তোমাদের বাইবেলের আলোকে অধিকতর স্পষ্টরূপে পড়ি ; তোমাদের ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদের বাণীর সহিত তুলনা করিলে আমার ধর্মের অস্পষ্ট সত্যসকল অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। সত্য চিরকালই সর্বজনীন। যদি তোমাদের সকলের হাতে মাত্র পাঁচটি আঙুল থাকে এবং আমার হাতে থাকে ছয়টি, তাহা হইলে তোমরা কেহই মনে করিবে না যে, আমার হাতখানা প্রকৃতির যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে ; বরং ইহা অস্বাভাবিক এবং রোগগ্রস্ত। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা।

যদি একটিমাত্র সম্প্রদায় সত্য হয় এবং অপরগুলি অসত্য হয়, তবে তোমার বলিবার অধিকার আছে, ঐ পূর্বের ধর্মটি ভুল। যদি একটি ধর্ম সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—অপরগুলিও নিশ্চয়ই সত্য। এই দৃষ্টিতে

হিন্দুধর্মের উপর তোমাদের ঠিক ততখানি দাবি আছে, যতখানি আছে আমার। ঊনত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ খ্রীষ্টান, ৬ কোটি মুসলমান এবং বাকী সব হিন্দু।

প্রাচীন বেদের উপর হিন্দুরা তাহাদের ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; 'বেদ' শব্দটি জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। বেদ কতকগুলি পুস্তকের সমষ্টি; আমাদের মতে ইহাতেই সর্বধর্মের সার নিহিত; তবে এ-কথা আমরা বলি না যে, সত্য কেবল ইহাতেই নিহিত আছে। বেদ আমাদিগকে আত্মার অমরত্ব শিক্ষা দেয়। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা এক স্থায়ী সাম্য অবস্থার সন্ধান করা, যাহা কখনও পরিবর্তিত হয় না। প্রকৃতিতে আমরা ইহার সাক্ষাৎ পাই না, কারণ সমগ্র বিশ্ব এক অসীম পরিবর্তনের সমষ্টি ব্যতীত কিছুই নয়।

কিন্তু ইহা হইতে যদি এইরূপ অনুমান করা হয় যে, এই জগতে অপরিবর্তনীয় কিছুই নাই, তবে আমরা হীনযান বৌদ্ধ এবং চার্বাকদের ভ্রমেই পতিত হইব। চার্বাকেরা বিশ্বাস করে, সব কিছুই জড়। মন বলিয়া কিছুই নাই, ধর্মমাত্রই প্রবঞ্চনা এবং নৈতিকতা ও সততা অপ্রয়োজনীয় কুসংস্কার। বেদান্ত-দর্শন শিক্ষা দেয়, মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয়বর্গ বর্তমানই জানিতে পারে, ভবিষ্যৎ বা অতীত পারে না; কিন্তু এই বর্তমান যেহেতু অতীত ও ভবিষ্যতের সাক্ষ্য দেয় এবং ঐ তিনটিই যেহেতু কালের বিভিন্ন নির্দেশ মাত্র, অতএব যদি ইন্দ্রিয়াতীত, কাল-নিরপেক্ষ এবং অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের ঐক্যবিধানকারী—কোন সত্তা না থাকে, তাহা হইলে বর্তমানও অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে।

কিন্তু স্বাধীন কে? দেহ স্বাধীন নয়; কারণ ইহা বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে, মনও স্বাধীন নয়, কারণ যে চিন্তারাশি দ্বারা ইহা গঠিত, তাহাও অপর এক কারণের কার্য। আমাদের আত্মাই স্বাধীন। বেদ বলেন, সমগ্র বিশ্ব, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা—মুক্তি ও দাসত্বের মিশ্রণে প্রস্তুত। কিন্তু এই-সকল দ্বন্দ্বের মধ্যেও সেই মুক্ত, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও পবিত্র আত্মা প্রকাশিত আছেন। যদি ইহা স্বাধীন হয়, তাহা হইলে ইহার ধ্বংস সম্ভব নয়; কারণ মৃত্যু একটা পরিবর্তন এবং একটা বিশেষ অবস্থা-সাপেক্ষ। আত্মা যদি স্বাধীন হয়, ইহাকে পূর্ণ হইতেই হইবে। কারণ—অসম্পূর্ণতাও একটা অবস্থা-সাপেক্ষ,

সেইজন্য উহা পরাধীন। আবার এই অমর পূর্ণ আত্মা নিশ্চয়ই সর্বোত্তম, ভগবান্ হইতে নিকৃষ্ট মানবে পর্যন্ত—সকলের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত, উভয়ের প্রভেদ মাত্র আত্মার বিকাশের তারতম্যে। কিন্তু আত্মা শরীর ধারণ করে কেন? যে কারণে আমি আয়না ব্যবহার করি, নিজের মুখ দেখিবার জন্য,—এইভাবেই দেহে আত্মা প্রতিবিম্বিত হন। আত্মাই ঈশ্বর; প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই পূর্ণ দেবত্ব রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বকে শীঘ্র বা বিলম্বে প্রকাশ করিতেই হইবে। যদি আমি কোন অন্ধকার গৃহে থাকি, সহস্র অনুযোগেও ঘর আলোকিত হইবে না; আমাকে দীপ জ্বালিতেই হইবে। ঠিক তেমনি, শুধু অনুযোগ ও আর্তনাদের দ্বারা আমাদের অপূর্ণ দেহ কখনও পূর্ণতা লাভ করিবে না; কিন্তু বেদান্ত শিক্ষা দেয়, তোমার আত্মার শক্তিকে উদ্বোধিত কর—নিজ দেবত্ব প্রকাশিত কর। তোমার বালক-বালিকাদের শিক্ষা দাও যে, তাহারা দেবতা; ধর্ম অস্তিমূলক, নাস্তিমূলক বাতুলতা নয়; পীড়নের ফলে ক্রন্দনের আশ্রয় লওয়াকে ধর্ম বলে না,—ধর্ম বিস্তার ও প্রকাশ।

প্রত্যেক ধর্মই বলে, অতীতের দ্বারাই মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপায়িত হয়; বর্তমান অতীতের ফলস্বরূপ। তাই যদি হইল, তবে প্রত্যেক শিশু যখন এমন কতকগুলি সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যাহার ব্যাখ্যা বংশানুক্রমিক ভাব-সংক্রমণের সাহায্যে দেওয়া চলে না, তাহার কি মীমাংসা হইবে? কেহ যখন ভাল পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সৎ শিক্ষার দ্বারা সৎ লোক হয় এবং অপর কেহ নীতিজ্ঞানশূন্য পিতামাতা হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে জীবনলীলা শেষ করে, তাহারই বা কি ব্যাখ্যা হইবে? ঈশ্বরকে দায়ী না করিয়া এই বৈষম্যের সমাধান কি করিয়া সম্ভব? করুণাময় পিতা তাঁহার সন্তানকে কেন এমন অবস্থায় নিক্ষেপ করিলেন, যাহার ফল নিশ্চিত দুঃখ? 'ভগবান্ ভবিষ্যতে সংশোধন করিবেন—প্রথমে হত্যা করিয়া পরে ক্ষতিপূরণ করিবেন'—ইহা কোন ব্যাখ্যাই নয়; আবার ইহাই যদি আমার প্রথম জন্ম হয়, তবে আমার মুক্তির কি হইবে? পূর্বজন্মের সংস্কার-বর্জিত হইয়া সংসারে আগমন করিলে স্বাধীনতা বলিয়া আর কিছুই থাকে না, কারণ আমার পথ তখন অপরের অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্দেশিত হইবে। আমি যদি আমার ভাগ্যের বিধাতা না হই, তাহা হইলে

আমি আর স্বাধীন কোথায়? বর্তমান জীবনের দুঃখের দায়িত্ব আমি নিজেই স্বীকার করি, এবং পূর্বজন্মে যে অন্যায় বা অশুভ কর্ম করিয়াছি, এই জন্মে আমি নিজেই তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলিব। আমাদের জন্মান্তর-বাদের দার্শনিক ভিত্তি এইরূপ। আমরা পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা লইয়া বর্তমান জীবনে প্রবেশ করিয়াছি এবং আমাদের বর্তমান জন্মের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য সেই পূর্বজন্মের কর্মের ফল; তবে উত্তরোত্তর আমাদের উন্নতিই হইতেছে এবং অবশেষে একদিন আমরা পূর্ণত্ব লাভ করিব।

বিশ্বজগতের পিতা, অনন্ত সর্বশক্তিমান্ এক ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের আত্মা যদি অবশেষে পূর্ণতা লাভ করে, তবে তখন তাহাকে অনন্তও হইতে হইবে। কিন্তু একই কালে দুইটি নিরপেক্ষ অনন্ত সত্তা থাকিতে পারে না; অতএব আমরা বলি যে, তিনি ও আমরা এক। প্রত্যেক ধর্মই এই তিনটি স্তর স্বীকার করে। প্রথমে আমরা ঈশ্বরকে কোন দূরদেশে অবস্থান করিতে দেখি, ক্রমে আমরা তাঁহার নিকটবর্তী হই এবং তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করি, অর্থাৎ আমরা তাঁহাতেই আশ্রিত আছি, মনে করি; সর্বশেষে জানি যে, আমরা ও তিনি অভিন্ন। ভেদদৃষ্টিতে যে ভগবানের দর্শন, তাহাও মিথ্যা নয়; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে যত ধারণা আছে, সবই সত্য, এবং তাই প্রত্যেক ধর্মও সত্য; কারণ উহারা আমাদের জীবন-যাত্রার বিভিন্ন স্তর; সকলেরই উদ্দেশ্য বেদের সম্পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করা। কাজেই আমরা হিন্দুরা কেবল পরমতসহিষ্ণু নই, আমরা প্রত্যেক ধর্মকে সত্য বলিয়া মানি এবং তাই মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, জরথুষ্ট্রীয়দের অগ্নির সমক্ষে উপাসনা করি, খ্রীষ্টানদের ক্রুশের সমক্ষে মাথা নত করি, কারণ আমরা জানি, বৃক্ষ-প্রস্তরের উপাসনা হইতে সর্বোচ্চ নির্গুণ ব্রহ্মবাদ পর্যন্ত প্রত্যেক মতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানবাত্মা নিজ জন্ম ও আবেষ্টনীর পরি-প্রেক্ষিতে অনন্তকে ধরিবার ও বুঝিবার জন্য ঐরূপ বিবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত আছে; প্রত্যেক অবস্থাই আত্মার প্রগতির এক একটি স্তর মাত্র। আমরা এই বিভিন্ন পুষ্পগুলি চয়ন করি এবং প্রেমসূত্রে বন্ধন করিয়া এক অপূর্ব উপাসনা-স্তবকে পরিণত করি।

আমি যদি ব্রহ্মই হই, তাহা হইলে আমার অন্তরাত্মাই সেই পরমাত্মার মন্দির এবং আমার প্রত্যেক কর্মই তাঁহার উপাসনা হওয়া উচিত। আমাকে

ধর্মের উদ্ভব

প্রথমবার আমেরিকায় অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে স্বামীজী কর্তৃক লিখিত।

অরণ্যের বিচিত্র দল-মণ্ডিত সুন্দর কুসুমরাজি মৃদু পবনে নাচিতেছিল, ক্রীড়াচ্ছলে মাথা দোলাইতেছিল; অপরূপ পালকে শোভিত মনোরম পক্ষী-গুলি বনভূমির প্রতিটি কন্দর মধুর কলগুঞ্জনে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল—গতকাল পর্যন্ত সেগুলি আমার সাথী ও সান্ত্বনা ছিল; আজ আর সেগুলি নাই, কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। কোথায় গেল তাহারা, যাহারা আমার খেলার সাথী, আমার সুখদুঃখের অংশীদার, আমার আনন্দ ও খেলার সহচর, তাহারাও চলিয়া গেল। কোথায় গেল? যাঁহারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করিয়াছিলেন, যাঁহারা জীবনভোর শুধু আমার কথাই ভাবিতেন, যাঁহারা আমার জন্য সব কিছু করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারাও আজ আর নাই। প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি বস্তু চলিয়া গিয়াছে, চলিয়া যাইতেছে এবং চলিয়া যাইবে। কোথায় যায় সব? আদিম মানুষের মনে এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য চাহিদা আসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিতে পারো, কেন এই প্রশ্ন জাগে? আদিম মানুষ কি লক্ষ্য করে নাই, তাহার চোখের সামনে সব কিছু বস্তু পচিয়া গলিয়া শুকাইয়া ধূলায় মিশিয়া যায়? এ-সব কোথায় গিয়াছে—সে সম্বন্ধে আদিম মানব আদৌ মাথা ঘামাইবে কেন?

আদিম মানুষের নিকট প্রথমতঃ সব কিছুই জীবন্ত, এবং মৃত্যু যে বিনাশ—ইহা তাহার কাছে একেবারেই অর্থহীন। তাহার দৃষ্টিতে মানুষ আসে, চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে। কখন কখন তাহারা চলিয়া যায়, কিন্তু ফিরিয়া আসে না। সুতরাং পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষায় মৃত্যুকে বলা হয়, একপ্রকার চলিয়া যাওয়া। ইহাই ধর্মের প্রারম্ভ। এইভাবে আদিম মানুষ তাহার এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল—তাহারা সব যায় কোথায়?

সুপ্তিমগ্ন পৃথিবীতে আলোক, উত্তাপ এবং আনন্দ ছড়াইয়া স্বমহিমাদীপ্ত প্রভাত-সূর্য উদিত হয়। ধীরে ধীরে সূর্য আকাশ অতিক্রম করে। হায়! সূর্যও শেষে অতি নীচে অতলে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু পরদিন আবার গৌরব- ও লাবণ্য-মণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হয়।

সভ্যতার জন্মভূমি নীল, সিন্ধু ও টাইগ্রিস্ নদীর উপত্যকায় অপূর্ব পদ্মফুল-গুলির মুদিত পাপড়িতে প্রাতঃকালীন সূর্যকিরণের স্পর্শ লাগিবামাত্র ফুলগুলি প্রস্ফুটিত হয়, এবং অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে পুনরায় নিমীলিত হয়। আদিম মানুষ ভাবিত, তাহা হইলে সেখানে কেহ না কেহ ছিল, যে আসিয়াছিল, চলিয়া গিয়াছিল এবং সমাধিস্থান হইতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া আবার উঠিয়া আসিয়াছে। ইহাই হইল প্রাচীন মানুষের প্রথম সমাধান। সেইজন্য সূর্য এবং পদ্ম অতি প্রাচীন ধর্মগুলির প্রধান প্রতীক ছিল। এ-সব প্রতীক আবার কেন? কারণ বিমূর্ত চিন্তা—সে-চিন্তা যাহাই হউক না কেন—যখন প্রকাশিত হয়, তখন উহা দৃশ্য, গ্রাহ্য ও স্থূল অবলম্বনের ভিতর দিয়া মূর্ত হইতে বাধ্য হয়। ইহাই নিয়ম। তিরোধানের অর্থ যে অস্তিত্বের বাহিরে যাওয়া নয়, অস্তিত্বের ভিতরেই থাকা—এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইবে; ইহাকে পরিবর্তন, বিকল্প বা সাময়িক রূপায়ণের অর্থেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। স্বয়ং কর্তারূপে যে-বস্তুটি ইন্দ্রিয়গুলিকে আঘাত করিয়া মনের উপর স্পন্দন সৃষ্টি করে এবং একটি নূতন চিন্তা জাগাইয়া তোলে, সেই বস্তুটিকে অবলম্বন ও কেন্দ্র-রূপে গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহাকেই অবলম্বন করিয়া নূতন চিন্তা অভিব্যক্তির জন্য সম্প্রসারিত হয় এবং এইজন্য সূর্য ও পদ্ম ধর্মজগতে প্রথম প্রতীক।

সর্বত্রই গভীর গহ্বর রহিয়াছে—এগুলি অতি অন্ধকার ও নিরানন্দ; তলদেশ সম্পূর্ণ তমিস্র ও ভয়াবহ। চক্ষু খুলিয়া রাখিলেও জলের নীচে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। উপরে আলো, সবই আলো—রাত্রিকালেও মনোরম নক্ষত্রপুঞ্জ আলো বিকিরণ করে। তাহা হইলে যাহাদের আমি ভালবাসি, তাহারা কোথায় যায়? নিশ্চয়ই তাহারা সেই তমসাবৃত স্থানে যায় না; তাহারা যায় ঊর্ধ্বলোকে, নিত্যজ্যোতির্ময় ধামে। এই চিন্তার জন্য একটি নূতন প্রতীকের প্রয়োজন হইল। এইবার আসিল অগ্নি—প্রজ্বলিত অদ্ভুত অগ্নির লেলিহান শিখা, যে-অগ্নি নিমেষে একটি বন গ্রাস করে, যে-অগ্নি খাদ্য প্রস্তুত করে, উত্তাপ দেয়, বন্যজন্তুদের বিতাড়িত করে। এই অগ্নি প্রাণদ, জীবনরক্ষক। আর অগ্নিশিখার গতি ঊর্ধ্বে, কখনও ইহা নিম্নমুখী হয় না। অগ্নি আরও একটি প্রতীকের কাজ করে; যে-অগ্নি মৃত্যুর পর মানুষকে ঊর্ধ্বে আলোকের দেশে লইয়া যায়, সেই অগ্নি পরলোকবাসী ও আমাদের মধ্যে যোগসূত্র। প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ বলেন, 'হে অগ্নি,

জ্যোতির্ময় দেবগণের নিকট তুমিই আমাদের দূত।' এইজন্ত তাহারা খাদ্য, পানীয় এবং এই জ্যোতির্ময় দেহধারীদের সন্তুষ্টিবিধায়ক বলিয়া বিবেচিত সব কিছুই অগ্নিতে আহুতি দিত। ইহাই যজ্ঞের সূচনা।

এ-পর্যন্ত প্রথম প্রশ্নের সমাধান হইল, অন্ততঃ আদিম মানুষের চাহিদা মিটাইতে যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু হইল। ইহার পর আর একটি প্রশ্ন আসিল। এই-সব আসিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নটি প্রথমেই কেন জাগিল না?—কারণ আমরা একটি আকস্মিক পরিবর্তনকে বেশী মনে রাখি। সুখ, আনন্দ, সংযোগ, সম্ভোগ প্রভৃতি আমাদের মনে যতটা না দাগ রাখে, তাহা অপেক্ষা অধিক রেখাপাত করে অসুখ, দুঃখ এবং বিয়োগ। আমাদের প্রকৃতিই হইতেছে আনন্দ, সম্ভোগ ও সুখ। যাহা কিছু আমাদের এই প্রকৃতিকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়, সে-সব স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা গভীরতর ছাপ রাখে। মৃত্যু ভীষণভাবে সব কিছু তছনছ করিয়া দেয় বলিয়া মৃত্যুর সমস্যা সমাধান করাই হইল প্রথম কর্তব্য। পরে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উঠিল অপর প্রশ্নটি : তাহারা আসে কোথা হইতে? যাহা প্রাণবান্, তাহাই গতিশীল হয়। আমরা চলি, আমাদের ইচ্ছাশক্তি আমাদের অঙ্গগুলিকে চালনা করে, আমাদের ইচ্ছাবশে অঙ্গগুলি নানা আকার ধারণ করে। বর্তমান কালের শিশু-মানবের নিকট যেমন প্রতিভাত হয়, তেমনি প্রাচীনকালের মানব-শিশুর নিকটও প্রতিভাত হইয়াছিল যে, যাহা কিছু চলে, তাহারই পিছনে একটি ইচ্ছা আছে। বায়ুর ইচ্ছা আছে; মেঘ—এমন কি সমস্ত প্রকৃতি—স্বতন্ত্র ইচ্ছা, মন এবং আত্মায় পূর্ণ। আমরা যেমন বহু বস্তু নির্মাণ করি, তাহারাও তেমনি এই-সব সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা অর্থাৎ দেবতারা—'ইলোহিমরা' এই-সবের স্রষ্টা।

ইতিমধ্যে সমাজেরও উন্নতি হইতে লাগিল। সমাজে রাজা থাকিতেন; কাজেই দেবতাদের ভিতর, ইলোহিমদের ভিতরেও একজন রাজা থাকিবেন না কেন? সুতরাং একজন দেবাদিদেব, একজন ইলোহিম-যিহোভা, পরমেশ্বর হইলেন, যিনি স্বীয় ইচ্ছামাত্রেই ঐসব—এমন কি দেবতাদেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যেমন বিভিন্ন গ্রহ ও নক্ষত্র নিযুক্ত করিয়াছেন, তেমনি প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যসাধনের অধিনায়করূপে বিভিন্ন দেবতা বা দেবদূতকে নিয়োজিত করিলেন। কেহ হইলেন মৃত্যুর, কেহ বা জন্মের, কেহ বা অন্যকিছুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ধর্মের দুইটি বিরাট উৎস—আর্য ও

সেমিটিক জাতির ধর্মের ভিতরে একটি সাধারণ ধারণা আছে যে, একজন পরমপুরুষ আছেন, এবং তিনি অন্যান্য সকলের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী বলিয়াই পরমপুরুষ হইয়াছেন। কিন্তু ইহার পরই আর্যেরা একটি নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন; উহা পুরাতন ধারার এক মহান্ ব্যতিক্রম। তাহাদের দেবতা শুধু পরমপুরুষই নন, তিনি 'দ্যৌঃ পিতরঃ' অর্থাৎ স্বর্গস্থ পিতা। ইহাই প্রেমের সূচনা। সেমিটিক ভগবান্ কেবল সমুদ্যতবজ্র রুদ্র, দলের পরাক্রমশালী প্রভু। এই-সব ভাবের সহিত আর্যেরা একটি নূতন ভাব—পিতৃভাব সংযোজন করিল। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভেদ আরও সুস্পষ্ট হইতে লাগিল; মানবজাতির সেমিটিক শাখার ভিতর প্রগতি বস্তুতঃ এইস্থানে আসিয়াই থামিয়া গেল। সেমিটিকদিগের ঈশ্বরকে দেখা যায় না; শুধু তাই নয়, তাঁহাকে দেখাই মৃত্যু। আর্যদের ঈশ্বরকে শুধু যে দেখা যায়, তা নয়, তিনি সকল জীবের লক্ষ্য। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—তাঁহাকে দর্শন করা। শাস্তির ভয়ে সেমিটিক তাহার রাজাধিরাজকে মানে, তাঁহার আজ্ঞা ও অনুশাসন মানিয়া চলে। আর্যেরা পিতাকে ভালবাসে; মাতা এবং সখাকেও ভালবাসে। তাহারা বলে, 'আমাকে ভালবাসিলে আমার কুকুরকেও ভালবাসিতে হইবে।' সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রত্যেক জীবকে ভালবাসিতে হইবে, কারণ তাহারা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। সেমিটিকের নিকট এই জীবনটা যেন একটি সৈন্য-শিবির; এখানে আমাদিগকে আমাদের আনুগত্য পরীক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর্যের কাছে এই জীবন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ। সেমিটিক বলে, যদি আমরা আমাদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করি, তাহা হইলে স্বর্গে আমরা একটি নিত্য আনন্দ-নিকেতন পাইব। আর্যের নিকট স্বয়ং ভগবান্ই সেই আনন্দ-নিকেতন। সেমিটিকের মতে ঈশ্বর-সেবা উদ্দেশ্যলাভের একটি উপায়মাত্র এবং সেই উদ্দেশ্য হইল আনন্দ ও সুখ। আর্যদের কাছে ভোগসুখ দুঃখকষ্ট—সবই উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য হইল ঈশ্বরলাভ। স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য সেমিটিক ভগবানের ভজনা করে। আর্য ভগবান্‌কে পাইবার জন্য স্বর্গ প্রত্যাখ্যান করে। সংক্ষেপে ইহাই হইল প্রধান প্রভেদ। আর্যজীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ঈশ্বরদর্শন, প্রেমময়ের সাক্ষাৎকার, কারণ ঈশ্বরকে ছাড়া বাঁচা যায় না। 'তুমি না থাকিলে সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের জ্যোতি থাকে না।'

লণ্ডনে বক্তৃতায় স্বামীজী, ১৮৯৬

ধর্মের মূলতত্ত্ব

আমেরিকায় প্রদত্ত একটি ভাষণের সারাংশ

ফরাসীদেশে দীর্ঘকাল ধরে জাতির মূলমন্ত্র ছিল 'মানুষের অধিকার' আমেরিকায় এখনও 'নারীর অধিকার' জনসাধারণের কানে আবেদন জানায়; ভারতবর্ষে কিন্তু আমাদের মাথাব্যথা ঈশ্বরের বিভিন্নভাবে প্রকাশের অধিকার নিয়ে।

সর্বপ্রকার ধর্মমতই বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষে আমাদের একটা স্বতন্ত্র ভাব আছে। আমার যদি একটি সন্তান থাকত, তাকে মনঃসংযমের অভ্যাস এবং সেই সঙ্গে একপঙ্‌ক্তি প্রার্থনার মন্ত্রপাঠ ছাড়া আর কোন প্রকার ধর্মের কথা আমি শিক্ষা দিতাম না। তোমরা যে অর্থে প্রার্থনা বলো, ঠিক তা নয়, সেটি হচ্ছে এই: 'বিশ্বের স্রষ্টা যিনি, আমি তাঁকে ধ্যান করি; তিনি আমার ধীশক্তি উদ্বুদ্ধ করুন।' তারপর সে বড় হয়ে নানা মত এবং উপদেশ শুনতে শুনতে এমন কিছু একটা পাবে, যা তার কাছে সত্য ব'লে মনে হবে। তখন সেই সত্যের যিনি উপদেষ্টা, সে তাঁরই শিষ্য হবে। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদ—যাঁকে ইচ্ছা সে উপাসনা করতে পারে; এঁদের প্রত্যেকের অধিকার আমরা মানি, আর সকলের নিজ নিজ ইষ্ট বা মনোনীত পন্থা অনুসরণ করবার অধিকারও আমরা স্বীকার করি। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রীষ্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হ'তে পারি।

আমরা জানি যে, সব ধর্মপথ দিয়েই ঈশ্বরের কাছে পৌছানো যায়—কেবল আমাদের চোখ দিয়ে ভগবান্‌কে না দেখলে যে পৃথিবীর উন্নতি হবে না, তা নয়, আর পৃথিবী-সুদ্ধ লোক আমার বা আমাদের চোখে ঈশ্বরকে দেখলেই সব ভাল হয়ে যাবে, তাও নয়। আমাদের মূল ভাব হচ্ছে এই যে, তোমার ধর্মবিশ্বাস আমার হ'তে পারে না, আবার আমার মতবাদও তোমার হ'তে পারে না। আমি আমার নিজেরই একটি সম্প্রদায়। এটা ঠিক যে, ভারতবর্ষে আমরা এমন এক ধর্মমত সৃষ্টি

করেছি, যাকে আমরা একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ধর্মপদ্ধতি ব'লে বিশ্বাস করি, কিন্তু এর যুক্তিবত্তায় আমাদের বিশ্বাস নির্ভর করছে সকল ঈশ্বরান্বেষীকে এর অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়ার ওপর; সর্বপ্রকার উপাসনাপদ্ধতির প্রতি সম্পূর্ণ উদারতা দেখানো এবং জগতে ভগবদভিমুখী চিন্তাপ্রণালীগুলি গ্রহণ করবার ক্ষমতার ওপর। আমাদের নিয়মপদ্ধতির মধ্যেও অপূর্ণতা আছে, তা আমরা স্বীকার করি, কেন না তত্ত্ববস্তু হচ্ছে সকল নিয়মপদ্ধতির ঊর্ধ্বে; আর এই স্বীকৃতির মধ্যেই আছে অনন্ত বিকাশের ইঙ্গিত ও প্রতিশ্রুতি। মত, উপাসনা এবং শাস্ত্র মানুষের স্বরূপোপলব্ধির উপায় হিসাবে ঠিকই, কিন্তু উপলব্ধির পরে সে সবই পরিহার করে। বেদান্তদর্শনের শেষ কথা, 'আমি বেদ অতিক্রম করেছি'—আচার-উপাসনা, যাগযজ্ঞ এবং শাস্ত্রগ্রন্থ, যার সাহায্যে এই মুক্তির পথে মানুষ পরিভ্রমণ করেছে, তা সবই তার কাছে বিলীন হয়ে যায়। 'সোঽহং, সোঽহম্'—আমিই তিনি—এই ধ্বনি তখন তার কণ্ঠে উদ্গীত হয়। ঈশ্বরকে 'তুমি' সম্বোধন তখন অসহনীয়, কারণ সাধক তখন তার 'পিতার সঙ্গে অভিন্ন'।

ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য বেদের ততখানিই গ্রহণ করি, যতখানি যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদমতের অনেক অংশ বাহ্যতঃ পরস্পরবিরুদ্ধ। পাশ্চাত্যে যাকে 'প্রত্যাদিষ্ট বাণী' বলে এগুলি তা নয়, কিন্তু এগুলি ঈশ্বরের সমষ্টি জ্ঞান বা সর্বজ্ঞত্ব, যা আমাদের ভিতরেও আছে। তা ব'লে যে-বইগুলিকে আমরা বেদ বলি, শুধুমাত্র ঐগুলির মধ্যেই এই জ্ঞানভাণ্ডার নিঃশেষিত—এ-কথা বলা বাতুলতা। আমরা জানি, সব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের মধ্যেই তা বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। মনু বলেন, বেদের যে অংশটুকু বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, ততটুকুই যথার্থ বেদ; আমাদের আরও অনেক মনীষী এই মত পোষণ করেন। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র বেদই ঘোষণা করেন, বেদের নিছক অধ্যয়ন অতি গৌণ ব্যাপার।

স্বাধ্যায় তাকেই বলে, 'যার দ্বারা আমরা শাশ্বত-সনাতন সত্য উপলব্ধি করি', এবং তা নিছক পাঠ, বিশ্বাস বা তর্ক-যুক্তির দ্বারা সম্ভব নয়; সম্ভব একমাত্র অপরোক্ষানুভূতি ও সমাধির দ্বারা। সাধক যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি সগুণ ঈশ্বরের ভাব লাভ করেন। অর্থাৎ তখন 'আমি আর আমার পিতা এক।' নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে এক বলেই তিনি নিজেকে জানেন

এবং নিজেকে সগুণ ঈশ্বরের মতো মনে করেন। মায়ার আবরণ—অজ্ঞানের মধ্য দিয়ে দেখলে ব্রহ্মা সগুণ ঈশ্বর ব'লে বোধ হয়।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহায়ে যখন তাঁর কাছে সমুপস্থিত হই, তখন আমরা তাঁকে শুধু সগুণ ভগবান্ রূপেই ধারণা করতে পারি। ভাবটি হচ্ছে এই, আত্মা কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'তে পারেন না। জ্ঞাতা আবার নিজেকে জানবে কেমন করে? কিন্তু তিনি যেমন, ঠিক তেমনই নিজেকে প্রতিবিম্বিত করতে পারেন, আর এই প্রতিবিম্বের সর্বোচ্চ রূপ, আত্মার এই ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য অভিব্যক্তিই সগুণ ঈশ্বর। পরমাত্মাই হচ্ছে সনাতন তত্ত্বস্তু এবং তাকে প্রকটিত করবার জন্যই আমরা অনন্তকাল ধরে সাধন করছি, আর এই সাধনার মধ্য দিয়েই জগৎ-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে; ইহাই জড়। কিন্তু এ-সব খুব দুর্বল প্রয়াস, এবং আমাদের কাছে সম্ভবপর—আত্মার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হচ্ছে সগুণ ঈশ্বর।

তোমাদেরই জনৈক পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেছেন, 'একটি উত্তম ভগবান্ গড়াই মানুষের মহত্তম কীর্তি'; যেমন মানুষ, তেমন ভগবান্। এই রকম মানবিক প্রকাশ ছাড়া, অন্য কোন উপায়েই মানুষ ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারে না। যা ইচ্ছা বলো, যত খুশি চেষ্টা কর, তুমি ভগবান্‌কে মানুষ ব্যতীত অন্য কিছুই কল্পনা করতে পার না এবং তিনি ঠিক তোমারই মতো। একজন নির্বোধ লোককে বলা হয়েছিল—শিবের একটি মূর্তি নির্মাণ করতে; বেশ কিছুদিন দারুণ হাঙ্গামা ক'রে অবশেষে—সে একটি বানরের মূর্তি তৈরী করতে পেরেছিল মাত্র! ঠিক তেমনই, যখনই আমরা ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সত্তা ভাবতে চেষ্টা করি, তখনই নিদারুণ ব্যর্থতার সম্মুখীন হই, কারণ আমাদের মনের বর্তমান প্রকৃতি অনুযায়ী ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে দেখতেই আমরা বাধ্য। যদি মহিষেরা কখনও ভগবান্‌কে পূজা করবার বাসনা করে, তবে তাদের নিজ-প্রকৃতি অনুযায়ী তারা তাঁকে মস্ত একটা মহিষ বলেই ভাববে; একটা মাছ যদি ভগবান্‌কে উপাসনা করতে ইচ্ছা করে, তা হ'লে ঈশ্বর সম্বন্ধে তার কল্পনা হবে যে, তিনি নিশ্চয়ই প্রকাণ্ড এক মাছ; ঠিক সেই প্রকার মানুষ তাঁকে মানুষ বলেই চিন্তা করে। মনে কর যেন এই মানুষ, মহিষ এবং মাছ সব এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্র, নিজ নিজ আকার ও সামর্থ্যানুযায়ী তারা ঈশ্বররূপ সমুদ্রজলে পূর্ণ হ'তে চলেছে। মানুষের মাঝে সে-জল মানুষেরই

আকার নেবে, মহিষের মধ্যে মহিষের আকার এবং মাছেতে মাছের আকার; কিন্তু প্রতি পাত্রে ঈশ্বরসমুদ্রের সেই একই জল।

দু-রকম মানুষ ভগবান্‌কে ব্যক্তিরূপে উপাসনা করে না—নরপশু, যাদের ধর্ম ব'লে কিছু নেই; এবং পরমহংস, যিনি মনুষ্য-প্রকৃতির সকল সীমা অতিক্রম করেছেন। সমস্ত প্রকৃতিই তাঁর কাছে স্ব-স্বরূপ হয়ে গেছে, তিনিই শুধু ঈশ্বরকে তাঁর স্ব-রূপে পূজা করতে পারেন। সেই নরপশু উপাসনা করে না তার অজ্ঞতার জন্য, আর জীবন্মুক্তেরা উপাসনা করেন না, তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখছেন ব'লে। তাঁদের কোন সাধনা থাকে না, ঈশ্বরকে তাঁরা স্বীয় আত্মার স্বরূপ ব'লে বোধ করেন। তাঁরা বলেন, 'সোঽহং, সোঽহম্'—আমিই তিনি; তাঁরা নিজেদের উপাসনা নিজেরা আর করবেন কিভাবে?

একটা গল্প বলছি তোমাদের। একটি সিংহশিশু তার মরণাপন্ন জননীর দ্বারা কোনভাবে পরিত্যক্ত হয়ে একদল মেষের মধ্যে এসে জুটেছিল। মেষেরাই তাকে খাওয়াত আর আশ্রয়ও দিয়েছিল। সিংহটি ক্রমশঃ বড় হয়ে হাঁটতে শিখল এবং মেষেরা যখন 'ব্যা ব্যা' করে, সেও 'ব্যা ব্যা' করতে লাগলো। একদিন অপর একটি সিংহ কাছাকাছি এসে পড়ে। অবাক্ হয়ে দ্বিতীয় সিংহটি জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, 'আরে, তুমি এখানে কি ক'রছ?' কারণ সে শুনে ফেলেছিল, সিংহশিশুটিও বাকী সকলের সঙ্গে 'ব্যা ব্যা' ক'রে ডাকছে।

ছোট সিংহটি 'ব্যা ব্যা' ক'রে বললে, 'আমি ছোট মেষশিশু, আমি নেহাৎ শিশু, বড় ভয় পেয়েছি আমি।' প্রথম সিংহটি গর্জন ক'রে উঠল, 'আহাম্মক! চলে এসো, তোমাকে একটা মজা দেখাব।' তারপর সে তাকে একটা শান্ত জলাশয়ের ধারে নিয়ে গিয়ে, তার প্রতিবিম্বটি দেখিয়ে তাকে ব'লল, 'তুমি হচ্ছ একটি সিংহ—আমার দিকে তাকাও, ঐ মেষটিকে দেখ, আর তোমার নিজের চেহারাও এই দেখ।' সিংহশিশুটি তখন তাকিয়ে দেখল আর ব'লল, 'ব্যা ব্যা, আমি তো মেষের মতো দেখতে নই—ঠিক আমি সিংহই বটে!' তারপর এমন গর্জন সে ক'রে উঠল, যেন পাহাড়ের ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

আমাদেরও ঠিক এই অবস্থা। মেষ-সংস্কারের আবরণে আমরা সকলেই সিংহ। আমাদের পরিবেশই আমাদিগকে দুর্বল ও মোহগ্রস্ত ক'রে ফেলেছে।

বেদান্তের কার্য হচ্ছে এই মোহ-বিমোচন। মুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি আনুগত্য মুক্তি—এ-কথা আমি স্বীকার করি না। এ-কথার অর্থ যে কী, তা আমি বুঝি না। মানুষের উন্নতির ইতিহাস অনুযায়ী প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে যাওয়াই উন্নতির কারণ। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, সাধারণ নিয়মকে জয় করা তো উচ্চতর নিয়মের সাহায্যেই হয়ে থাকে, কিন্তু বিজয়ী মন সেখানেও মুক্তিকেই খুঁজে বেড়ায়, আর যখনই জানতে পারে, নিয়মের মধ্য দিয়েই সংগ্রাম, তখনই সে তাও জয় করতে চায়। সুতরাং মুক্তিই হ'ল সর্বকালের আদর্শ। বৃক্ষ কখনও নিয়মকে অমান্য করে না; কোন গরুকে কখনও চুরি করতে দেখিনি। ঝিনুক কদাপি মিথ্যা বলে না; তথাপি তারা মানুষের চেয়ে বড় নয়। নিয়মের প্রতি অনুরক্তি শেষ পর্যন্ত আমাদের জড় পদার্থেই পরিণত করে—তা সমাজে হোক, রাজনীতিতে হোক বা ধর্মেই হোক। এ-জীবন তো মুক্তিরই উদাত্ত নির্ঘোষ; আচার-নিয়মের আধিক্য মানে মৃত্যু। হিন্দুদের মতো অন্য কোন জাতির এত বেশী সামাজিক নিয়ম-কানুন নেই, যার ফল জাতীয় মৃত্যু। কিন্তু হিন্দুদের স্বাতন্ত্র্য এই যে, ধর্মের মধ্যে তারা কোন মতবাদ বা নিয়মাদি আনেনি। তাদের ধর্মের তাই সর্বোচ্চ বিকাশ হয়েছে। এই ধর্মের মধ্যেই আমরা সবচেয়ে বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন—আর তোমরা সেখানেই সবচেয়ে বাস্তব দৃষ্টিহীন।

আমেরিকাতে জনকয়েক লোক এসে ব'লল, 'আমরা একটা যৌথ কারবার ক'রব', পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা হয়ে গেল। ভারতবর্ষে কুড়িজন লোক মিলে দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ ধরে যৌথ কারবার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে এবং তাতেও হয়তো তা গঠিত হবে না; কিন্তু কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, চল্লিশ বৎসর ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যা করলে সে জ্ঞানলাভ করবে—তা সে তৎক্ষণাৎ করবে! কাজেই আমরা আমাদের ভাবে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, তোমরাও তেমনি তোমাদের ভাবে।

কিন্তু অনুভব-রাজ্যে প্রবেশের যত পথ, তার সেরা পথ হচ্ছে অনুরাগ। ঈশ্বরে অনুরাগ হ'লে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়, কারণ সবই তাঁর সৃষ্টি। ভক্ত বলেন, 'তাঁরই তো সব, আর তিনিই আমার প্রেমাস্পদ; আমি তাঁকেই ভালবাসি।' এমনি ক'রে ভক্তের কাছে সব কিছু পবিত্র হয়ে ওঠে,

কারণ সকল বস্তুই তাঁর। তা হ'লে আমরা কি করেই বা কাউকে কষ্ট দিতে পারি? কেমন ক'রে তবে অপরকে ভাল না বেসে পারি? ঈশ্বরকে ভালবাসবার সঙ্গে সঙ্গে—তারই ফলরূপে অবশেষে প্রত্যেকের প্রতিই ভালবাসা এসে যাবে। যতই ঈশ্বরের কাছাকাছি যাব, ততই দেখতে থাকব যে, তাঁতেই সব কিছু রয়েছে, আমাদের হৃদয় হবে তখন প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ। প্রেমের দিব্যালোকে মানুষ রূপান্তরিত হয়ে যায়, আর শেষ পর্যন্ত সেই মধুর এবং উদ্দীপনাময় সত্যটি উপলব্ধি করে—প্রেম; প্রেমিক আর প্রেমাস্পদ—তত্ত্বতঃ একই।

ধর্মের দাবি

আপনাদের অনেকেরই স্মরণ আছে যে আপনারা শিশুকালে উদীয়মান জ্যোতির্ময় সূর্যকে কত আনন্দের সহিতই না অবলোকন করিতেন; আর আপনারা সকলেই জীবনের কোন না কোন সময়ে ভাস্বর অস্তাচলগামী সূর্যকে স্থির দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া অন্ততঃ কল্পনাসহায়ে অদৃশ্য লোকে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টাও করেন। বস্তুতঃ এই ব্যাপারটি সমগ্র বিশ্বের ভিত্তিমূলে রহিয়াছে—অদৃশ্যলোক হইতে উদয় এবং উহাতেই পুনরায় অস্তগমন, অজানা হইতে এই সমগ্র বিশ্বের উদ্ভব, পুনরায় অজানার ক্রোড়ে অনুপ্রবেশ; শিশুর মতো অন্ধকার হইতে হামাগুড়ি দিয়া আবির্ভূত হওয়া এবং পুনরায় বৃদ্ধ বয়সে হামাগুড়ি দিয়া কোনপ্রকারে অন্ধকারের মধ্যে ফিরিয়া যাওয়া।

আমাদের এই বিশ্ব, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, এই যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্রহ্মাণ্ডটি উভয় প্রান্তেই অসীম, অজ্ঞেয় ও চির অজ্ঞাতের দ্বারা আবৃত। অনুসন্ধান—এই অজ্ঞাত সম্বন্ধেই অনুসন্ধান চলে, প্রশ্ন এখানেই চলে, তথ্যও এইখানেই রহিয়াছে, ইহারই মধ্য হইতে সেই আলোক বিচ্ছুরিত হয়, যাহা জগতে 'ধর্ম' নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহলোকের বস্তু নয়; ইহা অতীন্দ্রিয় স্তরের বস্তু। ইহা যুক্তি-বিচারের অতীত, ইহা বুদ্ধিগ্রাহ্য স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহা এমন একটি প্রত্যক্ষ দর্শন, এমন একটি দৈব-প্রেরণা, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের মধ্যে এমন এক আত্ম-নিমজ্জন যাহার ফলে অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত অপেক্ষাও নিবিড়ভাবে জানা যায়; কারণ লৌকিক অর্থে ইহার জ্ঞান সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস মানব-মনের এই অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির আদি হইতেই চলিয়া আসিতেছে। জগতের ইতিহাসে এমন কোন সময়ই ছিল না, যখন মানুষের বিচারশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ছিল অথচ এই প্রচেষ্টা—এই অতীন্দ্রিয় বস্তুর অনুসন্ধিৎসা ছিল না। আমরা হয়তো দেখিতে পাইলাম, আমাদের এই ক্ষুদ্র বিশ্বে, এই মানব-মনে একটি ভাবনার উদয় হইল, কিন্তু কোথা হইতে ইহার উদ্ভব হইল, তাহা আমরা জানি না, এবং যখন ইহা বিলুপ্ত হয়, তখনই বা ইহা কোথায় যায়, তাহাও আমরা

জানি না। এই ক্ষুদ্র জগৎ ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, একই উৎস হইতে উদ্ভূত হয়, একই ধারায় চলে, একই প্রকার স্তরসমষ্টি অতিক্রম করে এবং একই পর্দায় ঝঙ্কৃত হয়।

আমি আপনাদের সম্মুখে হিন্দুদের এই মতবাদ উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব যে, ধর্ম বাহির হইতে আসে না, অন্তর হইতে উৎসারিত হয়। আমার বিশ্বাস—ধর্ম মানুষের এমনই মজ্জাগত যে, যতক্ষণ মানুষ দেহ ও মন ত্যাগ না করে, চিন্তা ও প্রাণের গতি নিরুদ্ধ না করে, ততক্ষণ ধর্ম ত্যাগ করিতে পারিবে না। যতক্ষণ মানুষ চিন্তা করিতে সমর্থ থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত—এই প্রয়াস থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত মানুষের কোন না কোন রকম ধর্ম থাকিবেই, এই-রূপে আমরা দেখিতে পাই—জগতে নানা ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এইগুলির অনুশীলনে মানুষ দিশেহারা হইয়া যায়, কিন্তু অনেকে যদিও মনে করেন যে এ জাতীয় গবেষণা বৃথা, তথাপি বস্তুতঃ উহা বৃথা নয়। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও একটি সামঞ্জস্য আছে, এই-সকল বেতাল বেসুরের মধ্যেও একটি সঙ্গীতের ছন্দ পাওয়া যায়; যিনি শুনিতে চেষ্টা করিবেন, তিনিই সে ছন্দ শুনিতে পাইবেন।

বর্তমান সময়ে সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন হইল, যদি ইহাই সত্য হয় যে, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাত বস্তুর উভয় প্রান্তে অজ্ঞেয় এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অনন্তের বেষ্টন রহিয়াছে, তবে সেই অজানাকে জানিবার জন্য এত প্রয়াস কেন? কেন আমরা জ্ঞাত বস্তু লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব না, কেন আমরা পানাহার এবং সমাজের মঙ্গলসাধনকল্পে সামান্য কিছু করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিব না? এই ধারণাই সর্বত্র আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া আছে। পণ্ডিত অধ্যাপক হইতে আরম্ভ করিয়া অস্ফুটভাষাভাষী শিশু পর্যন্ত সকলেই বলে: জগতের উপকার কর; ধর্ম বলিতে এইটুকুই বুঝায়; ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু সম্পর্কে মাথা ঘামাইও না। এই কথা এত বেশী ক্ষেত্রে বলা হইয়া থাকে যে, এখন ইহা একটি অবধারিত সত্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমরা স্বভাবতই ইহারও ঊর্ধ্বে অনুসন্ধান করিতে বাধ্য। এই যে বর্তমান, এই যে ব্যক্ত, তাহা অব্যক্তের এক অংশ মাত্র। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব যেন সেই অনন্ত অধ্যাত্মলোকের এমন একটি অংশ, এমন একটি খণ্ড, যাহা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনস্তরের মধ্যে প্রসারিত

হইয়া পড়িয়াছে। সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে বাদ দিয়া কেবল এই প্রসারিত ক্ষুদ্র অংশটিকে কিরূপে বুঝা যায় বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব? সক্রেটিস সম্বন্ধে কথিত আছে যে, এথেন্স নগরীতে একদা বক্তৃতা করিবার কালে তিনি এমন একজন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পান, যিনি ভ্রমণ ব্যপদেশে গ্রীসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সক্রেটিস তাঁহাকে বলিলেন, মানুষের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় হইল 'মানুষ'। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'ঈশ্বরকে না জানিয়া আপনি মানুষকে জানিবেন কিরূপে?' এই যে ঈশ্বর, এই যে সদা অজ্ঞেয় সত্তা, অথবা পরমতত্ত্ব, অথবা অনন্ত বস্তু, অথবা নামহীন সত্তা—আপনি তাঁহাকে যে নামে ইচ্ছা অভিহিত করিতে পারেন—একমাত্র তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই জ্ঞাত ও জ্ঞেয় অর্থাৎ এই বর্তমান জীবনের যৌক্তিকতা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা বা অবস্থিতির মূল কারণ প্রদর্শন করা সম্ভব। আপনার সম্মুখস্থ যে-কোন অতি-জড়বস্তুই ধরুন—যে-সব বিদ্যা অতীব জড়-বিষয়সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলিয়া পরিচিত, তাহার যে-কোনটি—যথা রসায়ন-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান বা প্রাণী-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করুন; ক্রমাগত তাহার অনুশীলন করিয়া চলুন—দেখিবেন স্থূল রূপগুলি ক্রমেই বিলীন হইয়া সূক্ষ্মে পরিণত হইতেছে, অবশেষে এমন একটি বিন্দুসদৃশ কেন্দ্রে আসিয়া পৌছিতেছে, যেখানে আপনি জড় হইতে অ-জড়ে উপনীত হইবার জন্য একটি বৃহৎ লম্ফ প্রদান করিতে বাধ্য। স্থূল বিগলিত হইয়া সূক্ষ্মাকার গ্রহণ করে, পদার্থ-বিজ্ঞান দর্শন-শাস্ত্রে পরিণত হয়; জ্ঞানরাজ্যের সকল ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের যাহা কিছু আছে—আমাদের সমাজ, আমাদের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক, আমাদের ধর্ম এবং আপনারা যাহাকে নীতিশাস্ত্র নামে অভিহিত করেন—সর্ব ক্ষেত্রেই এই একই কথা প্রযোজ্য। কেবলমাত্র উপযোগিতার (utility) ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্র গড়িয়া তুলিবার বহু প্রচেষ্টা দেখা যায়। আমি প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে যে কোন ব্যক্তিকে এইরূপ কোন ন্যায়-সম্মত নীতিশাস্ত্র গড়িয়া তুলিতে আহ্বান করিতেছি। তিনি হয়তো অপরের উপকার সাধন করিতে উপদেশ দিবেন। 'কেন ঐরূপ করিব? যেহেতু ঐরূপ করাই মানবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী'। এখন ধরা যাক, কোন ব্যক্তি যদি বলে, 'আমি উপযোগিতা গ্রাহ্য করি না, আমি অপরের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া নিজে ধনী হইব।' আপনি তাহাকে কি উত্তর

দিবেন ? সে তো আপনার প্রয়োজনবাদেরই আশ্রয় লইয়া ঐ প্রয়োজনবাদকেই নস্যাৎ করিয়া দিল। আমি যদি জগতের উপকার সাধন করি, তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? আমি কি এতই নির্বোধ যে, অপরে যাহাতে সুখে থাকিতে পারে, তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়া জীবনপাত করিব ? যদি সমাজ ব্যতীত অপর কোন চেতন বস্তু না থাকে, পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যতীত জগতে অপর কোন শক্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি নিজেই বা সুখী হইব না কেন ? যদি আইন-রক্ষীদের করতল হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারি, তবে আমি কেন আমার ভ্রাতৃবর্গের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া নিজে সুখী না হইব ? আপনি ইহার কি উত্তর দিবেন ? আপনাকে ইহার সমর্থনে কোন উপযোগিতা দেখাইতে হইবে। এইরূপে যখনই আপনার যুক্তির ভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া হয়, তখনই আপনি বলেন, ওহে বন্ধুবর, জগতে ভাল করাই ভাল। মানব-মনের অন্তর্নিহিত যে শক্তি বলে, ভাল হওয়াই ভাল, যে শক্তি আমাদের নিকট অতি সমুজ্জ্বল আত্মার মহিমা প্রকাশ করে, সাধুত্বের সৌন্দর্য—পুণ্যের সর্বমনোহর আকর্ষণ প্রকটিত করে, মঙ্গলের অনন্ত শক্তির পরিচয় দেয়, সেই শক্তিটির স্বরূপ কি ? তাহাকেই তো আমরা 'ঈশ্বর' বলি। তাই নয় কি ?

দ্বিতীয়তঃ এবার আমি এমন এক ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছি, যেখানে সাবধানে কথা বলিতে হয়। আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি এবং অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে আপনারা আমার বক্তব্য শুনিয়াই দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া ফেলেন। আমরা এই জগতে উপকার সাধন বিশেষ কিছুই করিতে পারি না। জগতের কল্যাণ করা ভাল কথা। কিন্তু এই জগতের কোন বিশেষ উপকার আমরা করিতে পারি কি ? এই যে শত শত বৎসর ধরিয়া আমরা চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে কি খুব বেশী কিছু উপকার করিতে পারিয়াছি, জগতের মোট সুখের পরিমাণ কি বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছি ? জগতে সুখ-সৃষ্টির জন্য নিত্যই অসংখ্য উপায় উদ্ভাবিত হয়, এবং এই প্রক্রিয়া শত-সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। আমি আপনাদিগকে প্রশ্ন করি, এক শতাব্দীকাল পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মোট সুখের পরিমাণ কি বৃদ্ধি পাইয়াছে ? তাহা সম্ভব নয়। মহাসাগরের বুকে কোথাও না কোথাও গভীর গহ্বর সৃষ্টি করিয়াই উত্তাল তরঙ্গ উঠিতে পারে।

যদি কোন জাতি ধনী ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহা অন্য কোন জাতির ধনসম্পদ্ ও ক্ষমতার হ্রাস করিয়াই হইয়া থাকে। প্রতিটি নবাবিষ্কৃত যন্ত্র বিশ জনকে ধনী করিতেছে আর বিশ সহস্রকে দরিদ্র করিতেছে। সর্বত্রই দেখা যায়—প্রতিযোগিতার এই সাধারণ নিয়মের অভিব্যক্তি। মোট স্ফূর্ত শক্তির পরিমাণ সর্বদা একই থাকে। আরও দেখুন এই কার্যটাই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক; দুঃখকে বাদ দিয়া আমরা সুখের ব্যবস্থা করিতে পারি—ইহা অযৌক্তিক কথা। ভোগের এই-সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়া আপনারা জগতের অভাব বৃদ্ধি করিতেছেন এই মাত্র। আর অভাবের বৃদ্ধির অর্থ হইল অতৃপ্ত বাসনা, যাহা কখনও প্রশমিত হইবে না। কোন্ বস্তু এই অভাব—এই তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারে? যতক্ষণ এই তৃষ্ণা থাকিবে, ততক্ষণ দুঃখ অনিবার্য। জীবনের স্বাভাবিক ধারাই এই যে, পর পর দুঃখ এবং সুখ ভোগ করিতে হয়। তারপর আপনি কি মনে করেন যে, পৃথিবীর মঙ্গল-সাধনের কর্ম আপনার উপরই অর্পণ করা হইয়াছে। আর কি কোন শক্তি এই বিশ্বে কার্য করিতেছে না? যিনি সনাতন, সর্বশক্তিমান্, করুণাময়, চিরজাগ্রত—যিনি সমগ্র বিশ্ব নিদ্রামগ্ন হইলেও নিজে কখনও নিদ্রিত হন না, যাঁহার চক্ষু সতত নির্নিমেষ, সেই ঈশ্বর কি আমার ও আপনার হস্তে তাঁহার বিশ্বকে সমর্পণ করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন বা বিশ্ব হইতে বিদায় লইয়াছেন? এই অনন্ত আকাশ যাঁহার সদা উন্মীলিত চক্ষু-সদৃশ, তিনি কি মৃত্যু-কবলিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন? তিনি কি আর এই বিশ্বের পালনাদি করেন না? বিশ্ব তো বেশ ভালভাবেই চলিতেছে, আপনার ব্যস্ত হইবার তো কোন প্রয়োজন নাই; এ-সকল ভাবিয়া আপনার দুঃখ ভোগ করিবার প্রয়োজন নাই।

[স্বামীজী এখানে সেই লোকটির গল্প বলিলেন, যে ভূতের দ্বারা আপনার কর্ম করাইতে চাহিয়াছিল, এবং ভূতকে ক্রমাগত কর্মের নির্দেশ দিয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে আর তাহাকে নিযুক্ত রাখিবার মতো কোন কর্ম না পাওয়ায় একটি কুকুরের বাঁকা লেজকে সোজা করিতে দিয়াছিল।]

এই বিশ্বের উপকার-সাধন করিতে গিয়া আমাদেরও সেই একই অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরাও ঠিক তেমনি এই শতসহস্র

বৎসর ধরিয়া কুকুরের লেজ সোজা করিবার কাজে লাগিয়া আছি। ইহা বাতব্যাধির মতো। পাদদেশ হইতে বিতাড়িত করিলে উহা মস্তকে আশ্রয় লয়, মস্তক হইতে বিতাড়িত করিলে অপর কোন অঙ্গে আশ্রয় লয়।

আপনাদের অনেকেরই নিকট জগৎ সম্বন্ধে আমার এই মতটি ভয়াবহ-ভাবে নৈরাশ্যজনক বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। নৈরাশ্যবাদ ও আশাবাদ, দুই-ই ভ্রান্ত মত—দুই-ই অতিমাত্রায় চরম। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির অপর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় থাকে, পরিধানে উত্তম বস্ত্র থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অত্যন্ত আশাবাদী, কিন্তু সেই মানুষই যখন সবকিছু হারায়, তখন চরম নৈরাশ্যবাদী হইয়া উঠে। যখন কোন ব্যক্তি সর্বপ্রকার ধনসম্পদ্ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় এবং একেবারে দীন-দরিদ্র হইয়া যায়, কেবল তখনই মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত ধারণারাশি তাহার নিকট সবেগে আবির্ভূত হয়। সংসারের স্বরূপই এই। যতই দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া জগতের সহিত অধিক পরিচিত হইতেছি, যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি নিরাশাবাদ ও আশাবাদের মতো চরম মত পরিহার করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়; ইহা প্রভুর জগৎ। ইহা ভাল-মন্দ উভয়ের অতীত, নিজের দিক হইতে ইহা সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ। ভগবানেরই ইচ্ছায় কাজ চলিতেছে, এবং এই-সকল বিভিন্ন চিত্র আমাদের সম্মুখে আসিতেছে; অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া ইহা চলিতে থাকিবে। ইহা একটি সুবৃহৎ ব্যায়ামাগার তুল্য; এখানে আমাকে আপনাকে ও লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে আসিয়া ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইবে এবং নিজদিগকে সরল ও দোষশূন্য করিয়া লইতে হইবে। জগৎ এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ যে ত্রুটিহীন জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিতেন না বা জগতে দুঃখের ব্যবস্থা করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না, তাহা নয়।

আপনারা সেই ধর্মযাজক ও তরুণীর কাহিনী স্মরণ করুন; একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উভয়েই চন্দ্র অবলোকন করিয়া কলঙ্করেখাগুলি দেখিতে পাইলেন। ধর্মযাজক বলিলেন, 'ওইগুলি নিশ্চয়ই গির্জার চূড়া।' তরুণী বলিলেন 'বাজে কথা, ওরা নিশ্চয়ই চুম্বনরত তরুণ প্রণয়ীযুগল।' এই পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের দর্শনও অনুরূপ। আমরা যখন জগতের ভিতরে থাকি, তখন মনে করি, উহার অন্তর্ভাগ দেখিতেছি। আমরা

জীবনের যে স্তরে থাকি, তদনুযায়ী বিশ্বকে দেখি। রান্নাঘরের অগ্নি ভালও নয়, মন্দও নয়। যখন এই অগ্নি আপনার আহার্য প্রস্তুত করিয়া দেয়, তখন আপনি তাহার প্রশংসা করিয়া বলেন, 'অগ্নি কত ভাল!' অগ্নি যখন আপনার আঙুল দগ্ধ করে, তখন আপনি বলেন, 'ইহা কি জঘন্য!' ঠিক একইভাবে এবং সমযুক্তিসহায়ে এ-কথা বলা যায়, 'এই বিশ্ব ভালও নয়, মন্দও নয়।' এই সংসারটি সংসার ছাড়া আর কিছু নয়; এবং চিরকাল তাহাই থাকিবে। যখনই আমরা নিজদিগকে ইহার নিকট এমন-ভাবে খুলিয়া ধরিতে পারি যে, জাগতিক কার্যাবলী আমাদের অনুকূল হয়, তখন আমরা ইহাকে ভাল বলি। আবার যদি আমরা নিজেদের এমন অবস্থায় উপস্থাপিত করি যে, ইহা আমাদের দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দেয়, তাহা হইলে ইহাকে আমরা মন্দ বলি। ঠিক এইভাবে আপনারা সর্বদাই দেখিতে পাইবেন, নির্দোষ ও আনন্দময় যে শিশুদের মনে কাহারও প্রতি কোন অনিষ্টচিন্তা জাগ্রত হয় নাই, তাহারা আশাবাদী হয়, তাহারা সোনার স্বপ্ন দেখে। এদিকে যে-সব বয়স্ক ব্যক্তির অন্তর বাসনায় পূর্ণ, অথচ উহা পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই, বিশেষতঃ যাহারা সংসারে প্রচুর ঘাত-প্রতিঘাতে আবর্তিত হইয়াছে, তাহারা নৈরাশ্যবাদী হয়। ধর্ম সত্যকে জানিতে চায়; এবং প্রথম যে তত্ত্ব সে আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা হইল এই—সত্যের অনুভূতি ব্যতীত বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ নাই।

আমরা যদি লোকাতীতকে জানিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন মরুভূমিতে পরিণত হইবে, মানব-জন্ম বৃথা যাইবে। 'বর্তমানের বস্তু লইয়া সন্তুষ্ট থাকো'—ইহা বলিতে বেশ। গাভী, কুকুর এবং অন্যান্য পশুদের ক্ষেত্রে এইরূপ হওয়া সম্ভব, এবং এই সন্তোষই তাহাদের পশু করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং মানুষ যদি বর্তমানেই সন্তুষ্ট থাকে এবং লোকাতীতের উদ্দেশ্যে সমস্ত অনুসন্ধান পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে মানুষকে পুনরায় পশুত্বের স্তরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই ধর্ম, এই লোকাতীতের জন্য অনুসন্ধিৎসাই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। এ-কথাটা বেশ বলা হইয়াছে যে, মানুষই একমাত্র জীব যে স্বভাবতঃ ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে, অন্যান্য প্রাণী স্বভাব-বশেই নিম্নদৃষ্টি। এই যে ঊর্ধ্বদৃষ্টি এবং ঊর্ধ্বাভিমুখে গতি, ও পূর্ণতা-লাভের আকুতি—ইহাকেই মুক্তি বলা হয়, এবং যত শীঘ্র মানুষ ঊর্ধ্ব-

স্বরাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করে, তত শীঘ্রই সে এইরূপ ধারণায় উপনীত হয় যে, মুক্তি বলিতে সত্যকেই বুঝায়। তোমার পকেটে কত টাকা আছে, কিংবা তুমি কিরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিতেছ—কিংবা কি প্রকার গৃহে বাস করিতেছ, তাহার উপর মুক্তি নির্ভর করে না, নির্ভর করে তোমার মস্তিষ্কে কতটুকু অধ্যাত্ম-চিন্তা আছে, তাহার উপর। ইহারই ফলে মানুষের উন্নতি হয়, ইহাই জড়জগতে ও বুদ্ধিজগতে সর্বপ্রকার উন্নতির উৎস; ইহাই সেই মৌলিক আকূতি, সেই উৎসাহ যাহা মানুষকে প্রগতির পথে পরিচালিত করে।

তাহা হইলে মানব-জীবনের লক্ষ্য কি? সুখ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগই কি লক্ষ্য? পুরাকালে বলা হইত, মানুষ স্বর্গে গিয়া তুরী নিনাদ করিবে এবং রাজ-সিংহাসনের নিকটে বাস করিবে। বর্তমান যুগে দেখিতেছে, এই ধারণাকে অতি হীন বলিয়া মনে করা হয়। বর্তমান যুগে এই ধারণাটির উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে এবং বলা হয় যে, স্বর্গে সকলেই বিবাহ করিতে পাইবে এবং ঐ জাতীয় সবকিছুই সেখানে পাইবে। এই দুইটি ধারণার মধ্যে যদি কোনটির অগ্রগতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয়টির অগ্রগতি হইয়াছে মন্দেরই দিকে। স্বর্গ সম্পর্কে এই যে-সকল ধারণা উপস্থাপিত করা হইল, তাহা মনের দুর্বলতারই পরিচায়ক। এবং এই দুর্বলতার কারণ: প্রথমতঃ মানুষ মনে করে, ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের লক্ষ্য; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত কোন বস্তুর ধারণা সে করিতে পারে না। এই মতবাদীরা প্রয়োজন-বাদীদের মতোই যুক্তিহীন। তথাপি ইহারা অন্ততঃপক্ষে আধুনিক নাস্তিক প্রয়োজন-বাদীদের তুলনায় অনেক ভাল। পরিশেষে বলিতে হয়, প্রয়োজন-বাদীদের এই মতবাদটি বালকোচিত। আপনার এ-কথা বলিবার কি অধিকার আছে যে, 'এই আমার বিচারের মাপকাঠি এবং সমগ্র বিশ্বকে এই বিচারের মাপকাঠি অনুযায়ী চলিতে হইবে?' যে মাপকাঠির শিক্ষা হইল—শুধু অন্ন, অর্থ ও পোশাকই ঈশ্বর, সেই মাপকাঠি দ্বারা সকল সত্যকেই বিচার করিতে হইবে, এইরূপ বলিবার আপনার কি অধিকার আছে?

ধর্ম কোন খাদ্যের মধ্যে বা বাসস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আপনারা প্রায়ই এবংবিধ সমালোচনা শুনিতে পান যে, 'ধর্ম আবার মানুষের কি হিতসাধন করিতে পারে? ইহা কি দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করিতে পারে,

তাহাদিগকে পরিধানের বস্ত্র দিতে পারে?' ধরুন ধর্ম তাহা পারে না, ইহা দ্বারাই কি ধর্মের অসত্যতা প্রমাণিত হইবে? ধরুন জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত কোন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইতেছে, এমন সময় আপনাদের মধ্যে একটি শিশু উঠিয়া প্রশ্ন করিল, 'এই তত্ত্ব কি কোন ভাল খাবার উৎপন্ন করিতে পারিবে?' আপনি হয়তো বলিলেন, 'না, পারে না।' শিশুটি তখন বলিল, 'তাহা হইলে ইহা নিরর্থক।' শিশুরা সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখে—অর্থাৎ খাবার প্রস্তুতের দৃষ্টি দিয়া; আর এই সংসারে যাহারা শিশুসম, তাহারাও এইরূপ করে।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে এ-কথা বলিতে দুঃখ হয় যে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যাঁহাদিগকে পণ্ডিত, সর্বাধিক যুক্তিবাদী, সর্বাপেক্ষা ন্যায়কুশল এবং সর্বোত্তম মনীষাসম্পন্ন বলিয়া আমরা জানি, এই-সব ব্যক্তি ঐ শিশুদেরই মধ্যে পরিগণিত। উচ্চ তত্ত্বগুলিকে আমাদের এই হীন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা সঙ্গত নয়। প্রত্যেক বস্তুকে তাহার নিজস্ব মাপকাঠি দিয়া বিচার করিতে হইবে এবং অসীমকে অসীমেরই মান অনুসারে পরীক্ষা করিতে হইবে—অনন্তের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে হইবে। ধর্ম মানুষের সমগ্র জীবন, শুধু বর্তমান নয়, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সমগ্র জীবনধারাকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব ধর্ম হইল সনাতন আত্মার সহিত সনাতন ঈশ্বরের শাশ্বত সম্পর্ক। পাঁচ মিনিটের মানব-জীবনের উপর ইহা কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করে, তাহা দেখিয়া ইহার মূল্যনির্ধারণ করা কি ন্যায়সঙ্গত হইবে? কখনই নয়। এগুলি সমস্তই নেতিবাচক যুক্তি।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে—ধর্ম কি মানুষের জন্য সত্যই কিছু করিতে পারে? পারে। ধর্ম কি সত্যই মানুষের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারে? অবশ্যই পারে। ধর্ম সর্বদাই তাহা করে, এবং তদপেক্ষা অনেক বেশী কিছু করে: ইহা মানুষকে অনন্ত মহাজীবন আনিয়া দেয়। ইহা মানুষকে মানুষ করিয়াছে, এবং এই পশুমানবকে দেবত্বে উন্নীত করিবে। ইহাই হইল ধর্মের ফল। মানব-সমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দিন, কি থাকিবে? বর্বরে পরিপূর্ণ একটি অরণ্যানী ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। যেহেতু এইমাত্র আমি তোমাদের নিকট প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়সুখকে মানব-জীবনের লক্ষ্য মনে করা অসম্ভব, সেইহেতু আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতেছি

যে, জ্ঞানই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। আমি আপনাদের ইহাও দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, এই সহস্র বৎসর ধরিয়া সত্যানুসন্ধানের জন্য এবং মানব-কল্যাণের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিতে পারিয়াছি—খুবই অল্প। কিন্তু মানুষ জ্ঞানের অভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। জৈব-ভোগের ব্যবস্থা করাকেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপযোগিতা বলা চলে না; পরন্তু পশু-মানব হইতে দেবতার সৃষ্টি করাই হইবে ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। অতঃপর জ্ঞানলাভ হইলে উহা হইতে স্বভাবতই পরমানন্দ আবির্ভূত হয়।

শিশুগণ মনে করে, ইন্দ্রিয়সুখই হইল তাহাদের লভ্য সুখগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনারা প্রায় সকলেই জানেন যে, মানবজীবনে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ অপেক্ষা বুদ্ধিজ সম্ভোগ অধিকতর তৃপ্তিপ্রদ। কুকুর আহার করিয়া যে আনন্দ পায়, আপনারা কেহ তাহা পাইবেন না। আপনারা সকলেই ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারেন। মানুষের মধ্যে কোথা হইতে তৃপ্তিবোধ জাগ্রত হয়? আহার হইতে শূকর বা কুকুর যে আনন্দ পায়, আমি তাহার কথা বলিতেছি না। লক্ষ্য করুন—শূকর কিভাবে আহার করে। সে যখন খায়, তখন সমগ্র বিশ্ব ভুল হইয়া যায়; তাহার গোটা মন ঐ আহারের মধ্যে ডুবিয়া যায়। আহার-গ্রহণকালে তাহাকে হত্যা করিলেও সে গ্রাহ্য করিবে না। ভাবিয়া দেখুন, ঐ কালে শূকরটির আনন্দসম্ভোগ কত তীব্র। কোন মানুষেরই এই তীব্র সম্ভোগানুভূতি নাই। মানুষের সে অনুভূতি কোথায় গেল? মানুষ ইহাকে বুদ্ধিজ ভোগে পরিণত করিয়াছে। শূকর ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা উপভোগ করিতে পারে না। বুদ্ধিসাহায্যে উপভোগ অপেক্ষাও উহা উচ্চতর ও তীব্রতর স্তরে ঘটিয়া থাকে; ইহাই হইল আধ্যাত্মিক স্তর, ইহাই ঐশী বস্তুর আত্মিক সম্ভোগ, ইহা বুদ্ধি ও যুক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থিত। ইহা লাভ করিতে হইলে আমাদের এই-সকল ইন্দ্রিয় সুখ পরিত্যাগ করিতে হইবে। জীবনে ইহারই সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগিতা আছে। উপযোগিতা বলিতে তাহাই বুঝায়, যাহা আমি উপভোগ করিতে পারি, অপর সকলেও ভোগ করিতে পারে; এবং ইহারই দিকে আমরা সকলে ধাবমান। আমরা দেখিতে পাই, পশুগণের ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা মানুষ নিজ বুদ্ধিমত্তা হইতে অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে এবং ইহাও দেখি যে, মানুষ

তাহার বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষাও আধ্যাত্মিক স্বরূপ হইতে অধিকতর আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। অতএব এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই অনুভূতির সহিত আনন্দলাভও হইবে। এই জগৎ—এই যে-সকল দৃশ্যমান বস্তু—এ সকল তো সেই প্রকৃত সত্য এবং আনন্দের ছায়ামাত্র, উহার তৃতীয় অথবা চতুর্থ স্তরের নিম্নতর বিকাশমাত্র।

মানবপ্রেমের মধ্য দিয়া এই পরমানন্দই তোমাদের নিকট আসে; মানবীয় ভালবাসা এই আধ্যাত্মিক আনন্দেরই ছায়ামাত্র, কিন্তু মানবীয় আনন্দের সহিত ইহাকে এক করিয়া ফেলিও না। এই একটি বড় রকমের ভুল সর্বদাই হইতেছে। আমরা প্রতিমুহূর্তে আমাদের এই দৈহিক ভালবাসা, এই মানবীয় প্রেম, এই তুচ্ছ সসীমের প্রতি আকর্ষণ, সমাজের অন্তর্গত অপরাপর মানুষের প্রতি এই বিদ্যুৎসদৃশ আকর্ষণকে আমরা সর্বদাই পরমানন্দ বলিয়া ভুল করিতেছি। আমরা ইহাকেই সেই শাশ্বত বস্তু বলিয়া অভিহিত করিতেছি, প্রকৃত পক্ষে ইহা সেই বস্তু নয়। ইহার ঠিক কোন সমার্থক শব্দ ইংরেজী ভাষায় না থাকায়, আমি ইহাকেই Bliss বা পরমানন্দ বলিব। এই পরমানন্দ শাশ্বত জ্ঞানের সহিত অভিন্ন—এবং ইহাই আমাদের লক্ষ্য। বিশ্বের যেখানে যত ধর্ম আছে বা ভবিষ্যতে থাকিতে পারে, সকলেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত—এই একই উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং হইবে। এই পাশ্চাত্য দেশে তোমরা যাহাকে দিব্য প্রেরণা বলো, তাহাও এই উৎস ভিন্ন আর কিছু নয়। এই প্রেরণার স্বরূপ কি? প্রেরণাই ধর্মানুভূতির একমাত্র উৎস। আমরা দেখিয়াছি, ধর্ম অতীন্দ্রিয় স্তরের বস্তু। ধর্ম সেই বস্তু 'যেখানে চক্ষু বা কর্ণ গমন করিতে পারে না, মন যেখানে পৌঁছাইতে পারে না, বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না।' ইহাই ধর্মের ক্ষেত্র এবং লক্ষ্য; যাহাকে আমরা প্রেরণা নামে অভিহিত করিতেছি, তাহাও এখান হইতেই উদ্গত হয়। অতএব স্বভাবতই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এই ইন্দ্রিয়াতীত লোকে পৌঁছবার কোন না কোন পথ অবশ্যই আছে। ইহা সম্পূর্ণ সত্যকথা যে, যুক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে অতিক্রম করিতে পারে না, সমস্ত যুক্তি ইন্দ্রিয়ের পরিধির মধ্যে, ইন্দ্রিয়বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ; ইন্দ্রিয়গুলি যে-সকল তথ্যে উপস্থিত হইতে পারে, যুক্তি তাহারই ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। কোন মানুষ

কি ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করিতে পারে? কোন মানুষ কি এই অজ্ঞেয়কে জানিতে পারে? এই একটি প্রশ্নের ভিত্তিতেই ধর্মসম্বন্ধীয় সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে, ইতিপূর্বে তাহাই করা হইয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর—ইন্দ্রিয়ের বাধা বিদ্যমান রহিয়াছে; স্মরণাতীত কাল হইতে শত-সহস্র নরনারী এই প্রাচীর ভেদ করিবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ অকৃতকার্য হইয়াছে; অপরদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ কৃতকার্যও হইয়াছে। ইহাই হইল এই জগতের ইতিহাস। আবার আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে, যাহারা এ-কথা বিশ্বাস করে না যে, সত্যই কেহ কখন কৃতকার্য হইয়াছে। ইহারাই পৃথিবীর আধুনিক সন্দেহবাদী (sceptics)। মানুষ চেষ্টা করিলেই এই প্রাচীর ভেদ করিতে পারে। মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র যে যুক্তি আছে তাহা নয়, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সমূহ আছে তাহা নয়—তাহার মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে, যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত। আমরা এ-কথা একটু ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। আশা করি, তোমরাও অনুভব করিতে পারিবে যে, ইহা তোমাদের মধ্যেও আছে।

আমি যখন আমার হস্ত সঞ্চালন করি—তখন অনুভব করি এবং জানি যে, আমি হস্ত সঞ্চালন করিতেছি। ইহাকে আমরা চেতনা বলি। আমি এ বিষয়ে সচেতন যে, আমি হস্ত সঞ্চালন করিতেছি। আমার হৃৎপিণ্ডও স্পন্দিত হইতেছে। সে বিষয়ে আমি সচেতন নই; তথাপি আমার হৃৎপিণ্ড কে সঞ্চালন করিতেছে? ইহাও অবশ্য সেই একই সত্তা হইবে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, যে সত্তা হস্ত-সঞ্চালন ঘটাইতেছে, বাক্যস্ফূরণ করাইতেছে, অর্থাৎ সচেতন কর্ম সম্পন্ন করিতেছে, তাহাই অচেতন কার্যও সম্পন্ন করিতেছে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, এই সত্তা উভয় স্তরেই কার্য করিতে পারে—একটি চেতনার স্তর, অপরটি তাহার নিম্নবর্তী স্তর। অবচেতন-স্তর হইতে যে-সকল সঞ্চালন ঘটে, সেগুলিকে আমরা সহজাত-বৃত্তি নামে অভিহিত করি; এবং যখনই সেই সঞ্চালন চেতনার স্তর হইতে ঘটে, আমরা তাহাকে যুক্তি বলি। কিন্তু আর একটি উচ্চতর স্তর আছে, তাহা মানুষের অতি-চেতন স্তর। ইহা আপাততঃ অচেতন অবস্থার তুল্য, কারণ—ইহা চেতন স্তরের অতীত; বস্তুতঃ ইহা চেতনার ঊর্ধ্বে

অবস্থিত, নিম্নে নয়। ইহা সহজাত-বৃত্তি নয়, ইহা 'দিব্য-প্রেরণা'। ইহার সপক্ষে প্রমাণ আছে। সমগ্র জগতে যে-সকল অবতার পুরুষ ও সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করুন ; ইহা সর্বজনবিদিত যে, তাঁহাদের জীবনে এমন সকল মুহূর্ত আসিয়াছে, যখন আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের বাহ্য জগৎ সম্পর্কে অচেতন বলিয়া মনে হয় ; অতঃপর তাঁহাদের ভিতর হইতে যে জ্ঞানরাশি উৎসারিত হয়, সে সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, উহা তাঁহারা অতিচেতন স্তর হইতে পাইয়াছেন। সক্রেটিস সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি যখন একদা সৈনিকদলের সহিত চলিতেছিলেন, তখন অতি সুন্দর সূর্যোদয় হইতেছিল, ঐ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে কি এক চিন্তাপ্রবাহ শুরু হইল, যাহাতে তিনি উক্তস্থানে রৌদ্রের মধ্যে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া একাদিক্রমে দুইদিন দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সকল মুহূর্তই জগৎকে সক্রেটিসীয় জ্ঞানপ্রদান করিয়াছে। এইরূপে জগতের যাবতীয় অবতার ও সাধক পুরুষদের জীবনে এমন মুহূর্ত আসে, যখন তাঁহারা চেতন-স্তর হইতে উঠিয়া উর্ধ্বতন স্তরে আরোহণ করেন এবং যখন তাঁহারা পুনরায় চেতনার স্তরে আগমন করেন, তখন তাঁহারা জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া আসেন এবং সেই সর্বাতীত লোকের সংবাদ প্রদান করেন। ইহারাই জগতের দিব্যভাবে আরূঢ় ঋষি।

কিন্তু এখানে একটি বড় বিপদ রহিয়াছে। অনেকেই দাবি করিতে পারেন যে, তাঁহারা দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত ; প্রায়ই এইরূপ দাবি শোনা যায়। এ বিষয়ে পরীক্ষার উপায় কি? নিদ্রার সময় আমরা অচেতন থাকি ; ধরুন—একটি মূর্খ নিদ্রামগ্ন হইল, তিন ঘণ্টা তাহার সুনিদ্রা হইল ; যখন সে উক্ত অবস্থা হইতে ফিরিল, সে যে বোকা সে বোকাই রহিয়া গেল, যদি না তাহার আরও অবনতি হইয়া থাকে। এদিকে নাজারেথের যীশু দিব্যভাবে আরূঢ় হইলেন ; তিনি যখন ফিরিলেন, তখন তিনি যীশুখ্রীষ্টে পরিণত হইয়া গেলেন। এখানেই যা কিছু প্রভেদ। একটি হইল দিব্য প্রেরণা, অপরটি হইল সহজাত প্রবৃত্তি। একজন শিশু, অপরজন প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এই দিব্য প্রেরণা আমরা যে কেহ লাভ করিতে পারি ; ইহা যাবতীয় ধর্মের উৎপত্তিস্থল এবং চিরকাল ধরিয়া ইহা উচ্চতর জ্ঞানের উৎস হইয়া থাকিবে। তথাপি এ পথে বহু বিপদের সম্ভাবনা। অনেক-সময়েই ভণ্ড ব্যক্তি জনসমাজকে প্রতারিত করিতে চায়। বর্তমান যুগে

ইহাদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আমার জনৈক বন্ধুর একখানি চমৎকার চিত্রপট ছিল, অপর একজন অনেকাংশে ধর্মভাবাপন্ন অথচ ধনী ভদ্রলোকের উহার উপর লোভ ছিল; কিন্তু আমার বন্ধু উহা বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অপর ভদ্রলোকটি এক দিন আমার বন্ধুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'আমি দৈব প্রেরণা লাভ করিয়াছি, এবং ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া আসিয়াছি।' আমার বন্ধু প্রশ্ন করিলেন, 'ভগবানের নিকট হইতে আপনি কি আদেশ পাইয়াছেন?' 'আদেশটি এই যে, আপনাকে এই চিত্রটি আমায় অর্পণ করিতে হইবে।' আমার বন্ধুও ধূর্ততায় তাঁহার সমান; তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'ঠিক কথা; কি চমৎকার! আমিও ঠিক অনুরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছি যে, ছবিখানি আপনাকে দিতে হইবে। আপনি কি টাকাটা আনিয়াছেন?' 'টাকা? কিসের টাকা?' আমার বন্ধু বলিলেন, 'তাহা হইলে আপনার প্রত্যাদেশ ঠিক বলিয়া আমি মনে করি না। আমি যে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছি, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি একলক্ষ ডলার মূল্যের চেক দিবে, তাহাকেই যেন চিত্রখানি আমি দিই। আপনাকে নিশ্চয়ই চেকখানি আগে আনিতে হইবে।' অপর ব্যক্তি দেখিলেন, তিনি ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। তখন তিনি প্রত্যাদেশের কথা পরিহার করিলেন। এই হইল বিপদ। বোস্টন শহরে একদা এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলিল, তাহার এমন এক দৈবদর্শন হইয়াছে, যাহাতে তাহার সহিত হিন্দু-ভাষায় কথা বলা হইয়াছে। তখন আমি বলিলাম, 'যে যে কথা শুনিয়াছেন, সেগুলি শুনিলে আমি বিশ্বাস করিব।' কিন্তু ঐ ব্যক্তি কতগুলি অর্থহীন কথা লিখিল। আমি তাহা অনুধাবন করিবার অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সফল হইলাম না। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, আমার জ্ঞানমতে এইরূপ ভাষা ভারতবর্ষে কখনও ছিল না, কখনও হইবে না। তাহারা এখনও এরূপ ভাষা লাভ করিবার মত যথেষ্ট সুসভ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাতে অবশ্য সে মনে করিল যে, আমি ভাল লোক নই এবং সংশয়বাদী; সুতরাং সে প্রস্থান করিল। ইহার পর যদি আমি শুনিতে পাই যে, ঐ ব্যক্তি উন্মাদাগারে আশ্রয়লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে বিস্মিত হইব না। সংসারে এই দুই প্রকার বিপদের সম্ভাবনা সর্বদাই রহিয়াছে—এই বিপদ আসে হয় ভণ্ডদের নিকট হইতে, অথবা মূর্খদের

নিকট হইতে। কিন্তু এজন্য আমাদের দমিয়া যাওয়া উচিত নয়, কারণ জগতে যে-কোন মহৎ বস্তুলাভের পথই বিপদাকীর্ণ। কিন্তু আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অনেক সময় দেখিতে পাই, অনেক ব্যক্তি যুক্তি-অবলম্বনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অক্ষম। কেহ হয়তো আসিয়া বলিল, 'আমি এই এই দেবতার নিকট হইতে এই বাণী লাভ করিয়াছি' এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি ইহা অস্বীকার করিতে পারেন? ইহা কি সম্ভব নয় যে, এরূপ দেবতা আছেন এবং তিনি এরূপ আদেশ দিয়া থাকেন?' শতকরা নব্বইজন মূর্খ এ-কথা গলাধঃকরণ করিয়া লইবে। তাহারা মনে করে যে, ঐরূপ যুক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু একটি কথা আপনাদের জানা উচিত, যে-কোন ঘটনাই সম্ভবপর হইতে পারে; এবং ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, লুব্ধক নক্ষত্রের সংস্পর্শে আসিয়া পৃথিবী আগামী বৎসরে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আমি যদি এইরূপ সম্ভাবনা উপস্থাপিত করি, তবে আপনাদেরও অধিকার আছে যে, আপনারা আমাকে ইহা প্রমাণ করিতে বলিবেন। আইনজ্ঞেরা যাহাকে বলেন, 'প্রমাণ করার দায়িত্ব'; সে দায়িত্ব তাহার উপরই বর্তাইবে, যে ঐজাতীয় মতবাদ উপস্থিত করিবে। যদি আমি কোন দেবতার নিকট হইতে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব আমার, আপনার নহে, কারণ আমিই আপনাদের সম্মুখে প্রকল্পটি উপস্থিত করিয়াছি। যদি আমি ইহা প্রমাণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার জিহ্বাকে শাসন করা উচিত ছিল। এই উভয় বিপদকে পরিহার করুন, তারপর আপনি যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে পারেন। আমরা জীবনে অনেক দৈববাণী শুনিয়া থাকি, অথবা মনে করি যে, শুনিতে পাইলাম; যতক্ষণ পর্যন্ত এইগুলি আপনাদের নিজেদের বিষয়ে হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন; কিন্তু সেইগুলি যদি অপরের সহিত আপনার সম্বন্ধ বা অপরের প্রতি আচরণ বিষয়ে হয়, তবে সে সম্পর্কে কিছু করিবার পূর্বে একশ-বার বিবেচনা করিয়া দেখুন; তাহা হইলে আর বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।

আমরা দেখিলাম যে, দিব্য প্রেরণা ধর্মের উৎস; অথচ উহা নানা বিপদাকীর্ণ। সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিপদ হইল অতিরিক্ত দাবি।

এমন লোকও আছেন, অকস্মাৎ যাঁহাদের অভ্যুদয় হয়, আর তাঁহারা বলেন: ভগবানের নিকট হইতে তাঁহারা বার্তা লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা সর্বশক্তিমান্ ভগবানের বাণীই উচ্চারণ করিতেছেন এবং অপর কাহারও ঐরূপ বার্তালাভের অধিকার নাই। শুনিলেই মনে হয়, ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক। এই বিশ্বে যাহা কিছু থাকুক না কেন, উহা সকলের পক্ষে সমভাবে থাকা উচিত। এই বিশ্বে এমন কোন স্পন্দনই নাই, যাহা বিশ্বজনীন নয়, কারণ সমগ্র বিশ্বই নিয়মের অধীন। ইহা আগাগোড়া বিধিবদ্ধ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই কোথাও যদি কোন কিছু থাকে তো তাহার সর্বত্র থাকার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার সূর্য ও নক্ষত্রাদি যেভাবে গঠিত, একটি অণুও সেইভাবে গঠিত। যদি কখনও কেহ দিব্যভাবে অনুপ্রেরিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই দিব্য-প্রেরণার সম্ভাবনা আছে। আর ইহাই হইল ধর্ম। এই-সকল বিপদ্-বিভ্রম, প্রহেলিকা ও ভণ্ডামি এবং অতিরিক্ত দাবি পরিহার করুন; ধর্মতথ্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করুন, এবং ধর্মবিজ্ঞানের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসুন। ধর্ম মানে কতগুলি মতবাদ ও বিধিনিষেধ স্বীকার করা, বিশ্বাস করা, গির্জা বা মন্দিরে যাওয়া অথবা কোন বিশেষ গ্রন্থ অধ্যয়ন করা নয়। আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? আপনার কি আত্মদর্শন হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, আপনি কি সেজন্য প্রয়াস করিতেছেন? ইহা এখনই—এই বর্তমানেই লভ্য, ভবিষ্যতের জন্য আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না। ভবিষ্যৎ তো সীমাহীন বর্তমান ব্যতীত আর কিছু নয়। যাবতীয় সময় একটি মুহূর্তের পুনরাবর্তন ব্যতীত আর কি? ধর্ম এখানে এখনই আছে, এই বর্তমান জীবনেই রহিয়াছে।

আর একটি প্রশ্ন এই: মানব-জীবনের লক্ষ্য কি? বর্তমানে প্রচার করা হইতেছে যে, মানুষ ক্রমেই উন্নত হইতেছে; অনন্ত প্রগতি-পথের সে যাত্রী; এই উন্নতিলাভের কোনও নির্দিষ্ট সীমা বা লক্ষ্য নাই। সর্বদা সে কোন কিছুর দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে, অথচ লক্ষ্যে সে কোন কালেই পৌঁছিবে না—এ-কথার অর্থ যাহাই হউক, ইহা যত বিস্ময়করই হউক না কেন, শুনিলেই মনে হয় ইহা অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার। সরলরেখা অবলম্বনে কোন প্রকার গতি কি সম্ভব হয়? কোন সরলরেখাকে

অনন্তরূপে প্রসারিত করিলে ঐ রেখাটি এক বৃত্তে পরিণত হয়, যেখান হইতে রেখাটি প্রসারিত হইয়াছিল, আবার সেই বিন্দুতে ফিরিয়া আসে। যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেখানেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। এবং যেহেতু ঈশ্বর হইতেই আপনার যাত্রারম্ভ হইয়াছে, সেইহেতু তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে আর কি রহিল? রহিল আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি। অনন্তকাল ধরিয়া আপনাকে এই-সকল আনুষঙ্গিক কর্ম করিয়া যাইতে হইবে।

আরও একটি প্রশ্ন আছে। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে কি নূতন নূতন ধর্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে? হাঁ-ও বটে, না-ও বটে। প্রথমতঃ ধর্ম সম্বন্ধে আর নূতন কিছু জানা সম্ভব নয়; তাহার সবটুকুই জানা হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সকল ধর্মেই দেখা যায়, এই দাবি করা হইয়াছে যে, আমাদেরই মধ্যে কোথাও একটি মিলন-ভূমি আছে। যেহেতু ঈশ্বরের সহিত আমরা অভিন্ন, অতএব ঐ অর্থে আর কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়। জ্ঞানের অর্থ ই হইল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দর্শন করা। আমি আপনাদিগকে বিভিন্ন নর-নারীরূপে দেখিতেছি—ইহাই বৈচিত্র্য। যখন আপনাদের সকলকে গোষ্ঠীভুক্ত করিয়া একত্র মানব বলিয়া ভাবিব, তখনই তাহা বিজ্ঞান-জাতীয় জ্ঞানে পরিণত হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রসায়নবিজ্ঞানের কথা ধরুন; রাসায়নিকেরা সমগ্র জ্ঞাত বস্তুকে মূল ভৌতিক উপাদানে পরিণত করিতে সচেষ্ট আছেন এবং সম্ভব হইলে তাঁহারা এমন একটি মাত্র পদার্থ আবিষ্কার করিতে চান, যাহা হইতে এই বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি দেখানো যাইতে পারে। হয়তো এমন সময় আসিবে, যখন তাঁহারা উহা আবিষ্কার করিতে পারিবেন। উহাই হইবে সমস্ত পদার্থের মূল উপাদান। সেখানে উপনীত হইলে তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না; তখন রসায়ন-বিজ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। আমরাও যদি এই পূর্ণ ঐক্য আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে আর অধিকতর উন্নতি সম্ভব হইবে না।

যখন আবিষ্কৃত হইল, 'আমি ও আমার পিতা অভিন্ন' তখনই ধর্ম সম্বন্ধে শেষকথা বলা হইয়া গিয়াছে,—তারপর বাকি রহিল শুধু খুঁটিনাটি। প্রকৃত ধর্মে—অন্ধবিশ্বাস বশতঃ কোন কিছু বিশ্বাস করা বা মানিয়া

লওয়ার স্থান নাই। কোন ধর্মপ্রচারক মহাত্মা এরূপ প্রচার করেন নাই। অধঃপতনের সময়ে ইহা আসিয়া জোটে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা কোন কোন ধর্মনেতাদের অনুসরণকারী বলিয়া ভান করে, এবং তাঁহাদের কোন ক্ষমতা না থাকিলেও তাঁহারা মানব-সমাজকে অন্ধবিশ্বাস শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন। কি বিশ্বাস করিবে তাহারা? অন্ধবিশ্বাস করার অর্থ হইল মানবাত্মার অধঃপতন। নাস্তিক হইতে চাও তো তাই হও; কিন্তু বিনা প্রশ্নে কোন কিছু গ্রহণ করিবে না। মানবের আত্মাকে পশুত্বের স্তরে নামাইবে কেন? তোমরা যে ইহাতে শুধু নিজেদেরই অনিষ্ট করিতেছ তাহা নয়, তোমরা সমাজেরও ক্ষতি করিতেছ, এবং যাহারা তোমাদের পরে আসিবে, তাহাদের পথ বিপৎসঙ্কুল করিতেছ। উঠিয়া দাঁড়াও, বিচার কর, অন্ধবিশ্বাসের অনুবর্তী হইও না। ধর্মের অর্থ হইল—তদাকারকারিত হওয়া বা হইতে চেষ্টা করা, শুধু বিশ্বাস করা নয়। ইহাই ধর্ম; আর তুমি যখন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখনই ধর্মলাভ করিবে। তার পূর্বে তুমি পশু অপেক্ষা উচ্চতর নও। মহাত্মা বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'শুনিবামাত্র কিছু বিশ্বাস করিও না; বংশানুক্রমে কোন মতবাদ প্রাপ্ত হইয়াছ বলিয়াই তাহাতে বিশ্বাস করিও না; অপরে যেহেতু নির্বিচারে বিশ্বাস করিতেছে, সেইহেতু কোন কিছুতে আস্থা স্থাপন করিও না; কোন এক প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন বলিয়া কোন কিছু মানিয়া লইও না; যে-সকল তত্ত্বের সহিত নিজেকে অভ্যাসবশে জড়াইয়া ফেলিয়াছ, তাহাতে বিশ্বাস করিও না; শুধু আচার্য ও গুরুবাক্যের প্রমাণ-বলে কোন কিছু মানিয়া লইও না। বিচার ও বিশ্লেষণ কর, এবং যখন ফলগুলি যুক্তির সহিত মিলিয়া যাইবে, এবং সকলের পক্ষে হিতকারী হইবে, তখন তাহা গ্রহণ কর এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন কর।'

ধর্মসাধনা

আমরা বহু গ্রন্থ, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকি। শিশুকাল হইতেই আমরা বিবিধ ভাব আহরণ করি এবং প্রায় ভাবের পরিবর্তনও করি। তত্ত্বের দিক হইতে ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা আমাদের জানা আছে। আমরা মনে করি, ধর্মের প্রয়োগের দিকও বুঝি। এখানে আমি আপনাদের নিকট কর্মে পরিণত ধর্ম সম্বন্ধে আমার নিজস্ব ধারণা উপস্থিত করিব।

আমরা চারিদিকে প্রয়োগমূলক ধর্মের কথা শুনিতে পাই, এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া এই-কটি মূল কথায় পরিণত করা যায়: আমাদের সমশ্রেণীর জীবদের প্রতি করুণা করিতে হইবে। উহাই কি ধর্মের সবটুকু? এইদেশে প্রতিদিন আমরা কার্যে পরিণত খ্রীষ্টধর্মের কথা শুনিয়া থাকি, শুনিতে পাই—কোন ব্যক্তি তাহার সমশ্রেণীর জীবদের জন্য কোন হিতকর কার্য করিয়াছে। উহাই কি সব?

জীবনের লক্ষ্য কি? এই ঐহিক জগৎই কি জীবনের লক্ষ্য? আর কিছুই কি নয়? আমরা যেরূপ আছি, আমাদের কি সেরূপই থাকিতে হইবে, আর বেশী কিছু নয়? মানুষকে কি শুধু এরূপ একটি যন্ত্রে পরিণত হইতে হইবে, যাহা কোথাও বাধা না পাইয়া সাবলীল গতিতে চলিতে পারে? এবং আজ সে যে দুঃখের ভাগ ভোগ করিতেছে, তাহাই কি শেষ প্রাপ্য, সে কি আর কিছুই চায় না?

বহু ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ কল্পনা—ঐহিক জগৎ। বিশাল জনসমষ্টি সেই সময়েরই স্বপ্ন দেখিতেছে, যখন কোন রোগ, অসুস্থতা, দারিদ্র্য বা অপর কোন প্রকার দুঃখ এ জগতে আর থাকিবে না। সর্বতোভাবে তাহারা কেবল সুখময় জীবন উপভোগ করিবে। সুতরাং কার্যে পরিণত ধর্ম বলিতে শুধু এইটুকু বুঝায়, 'পথঘাট পরিষ্কার রাখো, আরও সুন্দর পথঘাট নির্মাণ কর।' সকলে ইহাতে কত আনন্দ পায়, তাহা দেখিতেই পাওয়া যায়। ভোগই জীবনের লক্ষ্য কি? তাই যদি হইত, তবে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করা একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছে। কুকুর কিংবা বিড়াল যে লোলুপতার সহিত আহার্য উপভোগ করে, কোন মানুষ অধিকতর আগ্রহের সহিত তাহা

পারে কি? আবদ্ধ বন্যপশুদের প্রদর্শনীতে গিয়া দেখ—পশুগণ কিরূপে হাড় হইতে মাংস বিচ্ছিন্ন করিতেছে। উন্নতির বিপরীত দিকে চলিয়া পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ কর। মানুষ হইয়া কি ভুলই না হইয়াছে! যে বৎসরগুলি —যে শত শত বৎসর ধরিয়া আমি শুধু এই ইন্দ্রিয়ভোগে পরিতৃপ্ত মানুষ হইবার জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছি, (ঐ দৃষ্টিতে) তাহা বৃথাই গিয়াছে!

তাহা হইলে বাস্তব ধর্মের অর্থটি কি দাঁড়ায় এবং উহা আমাদিগকে কোথায় লইয়া যায়, তাহা ভাবিয়া দেখ। দান করা খুব ভাল কথা, কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি বলিবে 'উহাই সব', তখনই তোমার জড়বাদীর দলে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। ইহা ধর্ম নয়, ইহা নাস্তিকতা অপেক্ষা কিছু ভাল নয়, বরং অপকৃষ্ট। তোমরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী, তোমরা কি সমগ্র বাইবেল পড়িয়া অপরের জন্য কর্ম করা, কিম্বা আরোগ্য-নিকেতন নির্মাণ করা ব্যতীত অন্য কিছুই খুঁজিয়া পাও নাই? কেহ হয়তো দোকানদার; সে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবে, যীশু দোকানী হইলে কিভাবে দোকান চালাইতেন! যীশু কখনও ক্ষৌরালয় বা দোকান চালাইতেন না, কিম্বা সংবাদপত্রও সম্পাদনা করিতেন না। ঐ ধরনের কার্যকর ধর্ম ভাল বটে, মন্দ নয়; কিন্তু ইহা শিশুবিদ্যালয়ের স্তরের ধর্ম। ইহা আমাদের কোন লক্ষ্যে লইয়া যাইতে পারে না। তোমরা যদি সত্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, যদি সত্যই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হও এবং বারংবার উচ্চারণ কর 'প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক', তবে ভাবিয়া দেখ, ঐ কথাটার তাৎপর্য কি? যখনই তোমরা বলো, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক', তখন সত্য কথা বলিতে গেলে তোমরা বলিতে চাও 'হে ঈশ্বর, আমার ইচ্ছা তোমার দ্বারা পূর্ণ হউক।' সেই অনন্ত পরমাত্মা তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আমরা যেন বলিতে চাই—তিনিও ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন, আমাকে ও তোমাকে তাহা সংশোধন করিতে হইবে। এই বিশ্বের যিনি বিশ্বকর্মা, তাঁহাকে কিনা কতকগুলি সূত্রধর শিক্ষা দিবে? তিনি জগৎকে একটি আবর্জনার স্তূপরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এখন তুমি তাহাকে সুন্দর করিয়া সাজাইবে?

এ-সকলের (কর্মের) লক্ষ্য কি? ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কি কখনও লক্ষ্য হইতে পারে? সুখ-সম্ভোগ কি কখনও লক্ষ্য হইতে পারে? ঐহিক জীবন কি কখনও আত্মার লক্ষ্য হইতে পারে? যদি তাই হয়, তাহা হইলে

বরং এই মুহূর্তে মরিয়া যাওয়া শ্রেয়, তবু ঐহিক জীবন চাওয়া উচিত নয়। ইহাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় যে, সে একটি ত্রুটিহীন যন্ত্রে পরিণত হইবে, তাহা হইলে তাহার তাৎপর্য হইল এই: আমরা পুনরায় বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতিতে পরিণত হইতে যাইতেছি। তুমি কি কখনও গাভীকে মিথ্যা কথা বলিতে শুনিয়াছ, কিংবা বৃক্ষকে চুরি করিতে দেখিয়াছ? তাহারা নিখুঁত যন্ত্র। তাহারা ভুল করে না, তাহারা এমন জগতে বাস করে, যেখানে সব কিছুই নিয়মের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ফেলিয়াছে। এই বাস্তব ধর্মকে যদি আদর্শ ধর্ম বলা না চলে, তবে সে আদর্শটি কি? ব্যাবহারিক ধর্ম কখনও সেই আদর্শ হইতে পারে না। আমরা কি উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে আসিয়াছি? আমরা এখানে আসিয়াছি মুক্তি ও জ্ঞান লাভের জন্য। আমরা মুক্তিলাভের জন্যই জ্ঞানার্জন করিতে চাই। ইহাই আমাদের বাঁচিয়া থাকার অর্থ—এই মুক্তিলাভের জন্য সর্বব্যাপী আকূতি। বীজ হইতে বৃক্ষ কেন উদ্গত হয়? কেন সে ভূমি বিদীর্ণ করিয়া ঊর্ধ্বাভিমুখে অভিযান করে? পৃথিবীর কাছে সূর্যের দান কি? তোমার জীবনের অর্থ কি? উহাও তো মুক্তির জন্য সেই একই প্রকার সংগ্রাম। প্রকৃতি আমাদিগকে চারিদিক হইতে দমন করিতে চায়, আর আত্মা চায় নিজেকে প্রকাশ করিতে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম সতত চলিতেছে। মুক্তির জন্য এই সংগ্রামের ফলে বহু জিনিস দলিত মথিত হইবে। ইহাই হইল তোমার দুঃখের প্রকৃত অর্থ। যুদ্ধক্ষেত্র প্রচুর পরিমাণ ধূলি ও জঞ্জালে পূর্ণ হইবে। প্রকৃতি বলে, 'জয় হইবে আমার', আত্মা বলে, 'বিজয়ী হইতে হইবে আমাকেই।' প্রকৃতি বলে, 'একটু থামো। আমি তোমাকে শান্ত রাখিবার জন্য একটু ভোগ দিতেছি।' আত্মা একটু ভোগ করে, মুহূর্তের জন্য সে বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু পরমুহূর্তে সে আবার মুক্তির জন্য ক্রন্দন করিতে থাকে। প্রত্যেকের বক্ষে এই যে চিরন্তন ক্রন্দন যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা কি লক্ষ্য করিয়াছ? আমরা দারিদ্র্য দ্বারা প্রবঞ্চিত হই, তাই আমরা ধন অর্জন করি; তখন আবার ধনের দ্বারা প্রবঞ্চিত হই। আমরা হয়তো মূর্খ, তাই আমরা বিদ্যা অর্জন করিয়া পণ্ডিত হই; তখন আবার পাণ্ডিত্যের দ্বারা বঞ্চিত হই। মানুষ কখনই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। তাহাই দুঃখের কারণ, আবার তাহাই আশীর্বাদের মূল। ইহাই জগতের প্রকৃত লক্ষণ। তুমি কিরূপে এই জগতের মধ্যে তৃপ্তি পাইবে?

যদি আগামীকাল এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হয়, তখনও আমরা বলিব, 'ইহা সরাইয়া লও, অপর কিছু দাও।'

এই অসীম মানবাত্মা স্বয়ং অসীমকে না পাইলে কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না। অনন্ত তৃষ্ণা কেবলমাত্র অনন্ত জ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়, তাহা ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা নয়। কত জগৎ যাইবে, আসিবে। তাহাতে কি আসে যায়? কিন্তু আত্মা বাঁচিয়া আছে এবং চিরকাল ধরিয়া অনন্তের দিকে চলিয়াছে। সমগ্র জগৎকে আত্মার মধ্যে লীন হইতে হইবে। মহাসাগরের বুকে যেমন জলবিন্দু মিলাইয়া যায়, সেইরূপ বিশ্ব জগৎ আত্মায় বিলীন হইবে। আর এই জগৎ কি আত্মার লক্ষ্য? যদি আমাদের সাধারণ বুদ্ধি থাকে, তবে আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারিব না, যদিও কবিদের রচনার বিষয় যুগ যুগ ধরিয়া ইহাই ছিল, যদিও সর্বদাই তাঁহারা আমাদের পরিতৃপ্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। অথচ আজ পর্যন্ত কেহই পরিতৃপ্ত হয় নাই। অসংখ্য ঋষিকল্প ব্যক্তি আমাদের বলিয়াছেন, 'নিজ নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকো।' কবিরাও তাহাই গাহিয়াছেন। আমরা নিজেদের শান্ত ও পরিতৃপ্ত থাকিতে বলিয়াছি, কিন্তু থাকিতে পারি নাই। ইহা সনাতন বিধান যে, এই পৃথিবীতে বা উর্ধ্বে স্বর্গলোকে, কিংবা নিম্নে পাতালে এমন কিছুই নাই, যাহা দ্বারা আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হইতে পারে। আমার আত্মার তৃষ্ণার কাছে নক্ষত্র এবং গ্রহরাজি, উর্ধ্ব এবং অধঃ, সমগ্র বিশ্ব কতকগুলি ঘৃণ্য পীড়াদায়ক বস্তুমাত্র, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ধর্ম ইহাই বুঝাইয়া দেয়। যাহা কিছু এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দেয় না, তাহার সবটাই অমঙ্গল নয়। প্রত্যেকটি বাসনাই দুঃখের কারণ, যদি না উহা এই তত্ত্বটি বুঝাইয়া দেয়, যদি না তুমি উহার প্রকৃত তাৎপর্য ও লক্ষ্য ধরিতে পারো। সমগ্র প্রকৃতি তাহার প্রত্যেক পরমাণুর মধ্য দিয়া একটি মাত্র জিনিসের জন্য আকূতি জানাইতেছে—উহা হইল মুক্তি।

তাহা হইলে কর্মে পরিণত ধর্মের অর্থ কি? ইহার অর্থ মুক্তির অবস্থায় উপনীত হওয়া বা মুক্তি-প্রাপ্তি। এবং যদি এই পৃথিবী আমাদের ঐ লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিতে সহায় হয়, তাহা হইলে ইহা মঙ্গলময়; কিন্তু যদি তা না হয়, যদি সহস্র বন্ধনের উপর ইহা একটি অতিরিক্ত বন্ধন সংযুক্ত করে, তাহা হইলে ইহা মন্দে পরিণত হয়। সম্পদ, বিদ্যা, সৌন্দর্য এবং অন্যান্য যাবতীয়

বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে সহায়তা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের ব্যাবহারিক মূল্য আছে। যখন মুক্তিরূপ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে আর সাহায্য করে না, তখন তাহারা নিশ্চিতরূপে ভয়াবহ। তাই যদি হয়, তাহা হইলে কার্যে পরিণত ধর্মের স্বরূপ কি? ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সব কিছু সেই এক উদ্দেশ্যে ব্যবহার কর, যাহাতে মুক্তিলাভ হয়। জগতে বিন্দুমাত্র ভোগ যদি পাইতে হয়, বিন্দুমাত্র সুখও যদি পাইতে হয়, তবে তাহার বিনিময়ে ব্যয় করিতে হইবে হৃদয়-মনের সম্মিলিত অসীম শক্তি।

এই জগতের ভাল ও মন্দের সমষ্টির দিকে তাকাইয়া দেখ। ইহাতে কি কোন পরিবর্তন হইয়াছে? যুগ যুগ অতিবাহিত হইয়াছে এবং যুগ যুগ ধরিয়া ব্যাবহারিক ধর্ম আপন কাজ করিয়া চলিয়াছে। প্রতিবার পৃথিবী মনে করিয়াছে যে, এইবার সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু সমস্যাটি যেমন ছিল, তেমনি থাকিয়া যায়। বড়জোর ইহার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। ইহা বিশ সহস্র বিপণিতে স্নায়ুরোগ ও ক্ষয়রোগের ব্যবসায়ের জন্য পণ্য সরবরাহ করে, ইহা পুরাতন বাতব্যাধির মতো। একস্থান হইতে বিতাড়িত কর, উহা অন্য কোন স্থানে আশ্রয় লইবে। শতবর্ষ আগে মানুষ পদব্রজে ভ্রমণ করিত বা ঘোড়া কিনিত। এখন সে খুব সুখী, কারণ রেলপথে ভ্রমণ করে; কিন্তু তাহাকে অধিকতর শ্রম করিয়া অধিকতর অর্থ উপার্জন করিতে হয় বলিয়া সে অসুখী। যে-কোন যন্ত্র শ্রম বাঁচায়, উহাই আবার শ্রমিকের উপর অধিক গুরুভার চাপায়।

এই বিশ্ব, এই প্রকৃতি কিংবা অপর যে নামেই ইহাকে অভিহিত কর না কেন, ইহা অবশ্যই সীমাবদ্ধ, ইহা কখনও অসীম হইতে পারে না। সর্বাতীত পরম সত্তাকেও জগতের উপাদানরূপে পরিণত হইতে গেলে দেশ কাল ও নিমিত্তের সীমার মধ্যে আসিতে হইবে। জগতে যতটুকু শক্তি আছে, তাহা সীমাবদ্ধ। তাহা যদি এক স্থানে ব্যয় কর, তাহা হইলে অপর স্থানে কম পড়িবে। সেই শক্তির পরিমাণ সর্বদা একই থাকিবে। কোন স্থানে কোথাও যদি তরঙ্গ উঠে, তবে অন্য কোথাও গভীর গহ্বর দেখা দিবে। যদি কোন জাতি ধনী হয়, তাহা হইলে অন্য জাতিরা দরিদ্র হইবে। ভালোর সহিত মন্দ ভারসাম্য রক্ষা করে। যে ব্যক্তি কোনকালে তরঙ্গশীর্ষে অবস্থান করিতেছে, সে মনে করে, সকলই ভালো; কিন্তু যে তরঙ্গের নীচে

দাঁড়াইয়া আছে, সে বলে, পৃথিবীর সব কিছুই মন্দ। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে, সে দেখে ঈশ্বরের লীলা কেমন চলিতেছে। কেহ কাঁদে, অপরে হাসে। আবার এখন যাহারা হাসিতেছে, সময়ে তাহারা কাঁদিবে, তখন প্রথম দল হাসিবে। আমরা কি করিতে পারি? আমরা জানি যে, আমরা কিছুই করিতে পারি না।

আমাদের মধ্যে কয়জন আছে, যাহারা জগতের হিতসাধন করিব বলিয়াই কাজে অগ্রসর হয়? এরূপ লোক মুষ্টিমেয়। তাহাদের সংখ্যা আঙুলে গণা যায়। আমাদের মধ্যে বাকী যাহারা হিতসাধন করি, তাহারা বাধ্য হইয়াই ঐরূপ করি। আমরা না করিয়া পারি না। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিতাড়িত হইতে হইতে আমরা আগাইয়া চলি। আমাদের করার ক্ষমতা কতটুকু? জগৎ সেই একই জগৎ থাকিবে, পৃথিবী সেই একই পৃথিবী থাকিবে। বড়জোর ইহা নীল রঙ হইতে বাদামী রঙ এবং বাদামী রঙ হইতে নীল রঙ হইবে। এক ভাষার জায়গায় অপর ভাষায়, এক ধরনের কতক মন্দের জায়গায় অন্য ধরনের কতকগুলি মন্দ—এই একই ধারা তো চলিতেছে। যাহাকে বলে ছয়, তাহাকেই বলে আধ ডজন। অরণ্যবিহারী আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা তোমাদের মতো দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিতে পারে না, কিন্তু তাহারা খাদ্য হজম করিতে পারে বেশ। তুমি তাহাদের একজনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলো, পরমুহূর্তে দেখিবে, সে ঠিক উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমার বা তোমার যদি সামান্য একটু ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে ছয় মাস কাল হাসপাতালে শুইয়া থাকিতে হইবে।

জীবদেহ যতই নিম্নস্তরের হইবে, তাহার ইন্দ্রিয়সুখ ততই তীব্রতর হইবে। নিম্নস্তরের প্রাণীদের এবং তাহাদের স্পর্শশক্তির কথা ভাবো। তাহাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ই বড়। মানুষের ক্ষেত্রে আসিয়া দেখিবে, লোকের সভ্যতার স্তর যত নিম্ন, তাহার ইন্দ্রিয়ের শক্তিও তত প্রবল। জীবদেহ যত উচ্চশ্রেণীর হইবে, ইন্দ্রিয়সুখের পরিমাণও তত কম হইবে। কুকুর খাইতে জানে, কিন্তু আধ্যাত্মিক চিন্তায় যে অনুপম আনন্দ হয়, তাহা সে অনুভব করিতে পারে না। তুমি বুদ্ধি হইতে যে আশ্চর্য আনন্দ পাও, তাহা হইতে সে বঞ্চিত। ইন্দ্রিয়জন্য সুখ অতি তীব্র। কিন্তু বুদ্ধিজ সুখ তীব্রতর। তুমি যখন প্যারিসে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের ভোজে যোগদান কর, তাহা খুবই সুখকর,

কিন্তু মানমন্দিরে গিয়া নক্ষত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করা, গ্রহসমূহের আবির্ভাব ও বিকাশ দর্শন করা—এই-সব কথা ভাবিয়া দেখ দেখি। এ আনন্দ নিশ্চয়ই বিপুলতর, কারণ আমি জানি, তোমরা তখন আহারের কথা ভুলিয়া যাও। সেই সুখ নিশ্চয়ই পার্থিব সুখ অপেক্ষা অধিক ; তোমরা তখন স্ত্রী-পুত্র, স্বামী এবং অন্য সব কিছু ভুলিয়া যাও ; ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জগৎ তখন ভুল হইয়া যায়। ইহাকেই বলে বুদ্ধিজ সুখ। সাধারণ বুদ্ধিতেই বলে যে, এই সুখ ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা নিশ্চয় তীব্রতর। তোমরা সর্বদা বড় সুখের জন্য ছোট সুখ ত্যাগ করিয়া থাকো। এই মুক্তি বা বৈরাগ্য-লাভই হইল কার্যে পরিণত ধর্ম। বৈরাগ্য অবলম্বন কর।

ছোটকে ত্যাগ কর, যাহাতে বড়কে পাইতে পারো। সমাজের ভিত্তি কোথায়? ন্যায়, নীতি ও আইনে। ত্যাগ কর, প্রতিবেশীর সম্পত্তি অপহরণ করিবার সমস্ত ইচ্ছা পরিত্যাগ কর, প্রতিবেশীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার সমস্ত প্রলোভন পরিহার কর, মিথ্যা বলিয়া অপরকে প্রবঞ্চনা করিয়া যে সুখ তাহা বর্জন কর। নৈতিকতাই কি সমাজের ভিত্তি নয়? ব্যভিচার পরিহার করা ছাড়া বিবাহের আর কি অর্থ আছে? বর্বর তো বিবাহ করে না। মানুষ বিবাহ করে, কারণ সে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। এইরূপই সর্বক্ষেত্রে। ত্যাগ কর, বৈরাগ্য অবলম্বন কর, পরিহার কর, পরিত্যাগ কর—শূন্যের নিমিত্ত নয়, নাস্তিভাবের জন্য নয়, কিন্তু শ্রেয়োলাভের জন্য। কিন্তু কে তাহা পারে? শ্রেয়োলাভের পূর্বে তুমি তাহা পারিবে না। মুখে বলিতে পারো, প্রয়াস করিতে পারো, অনেক কিছু করিবার চেষ্টাও করিতে পারো, কিন্তু শ্রেয়োলাভ হইলে বৈরাগ্য আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। অশ্রেয় তখন আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়ে। ইহাকেই বলে 'কার্যে পরিণত ধর্ম'। ইহা ছাড়া আর কিছুকে বলে কি—যেমন পথ মার্জনা করা এবং আরোগ্য-নিলয় গঠন করাকে? তাহাদের মূল্য শুধু ততটুকু, যতটুকু উহাদের মূলে বৈরাগ্য আছে। বৈরাগ্যের কোথাও সীমারেখা নাই। মুশকিল হয় সেখানেই, যেখানে কেহ সীমা টানিয়া বলে—এই পর্যন্তই, ইহার অধিক নয়। কিন্তু এই বৈরাগ্যের তো সীমা নাই।

যেখানে ঈশ্বর আছেন, সেখানে আর কিছু নাই। যেখানে সাংসারিকতা আছে, সেখানে ঈশ্বর নাই। এই উভয়ের কখনও মিলন ঘটিবে না—যথা,

আলো ও অন্ধকারের। ইহাই তো আমি খ্রীষ্টধর্ম ও তাহার প্রথম প্রচারকদের জীবনী হইতে বুঝিয়াছি। বৌদ্ধধর্মও কি তাহাই নয়? ইহাই কি সকল ঋষি ও আচার্যের শিক্ষা নয়? যে-সংসারকে বর্জন করিতে হইবে, তাহা কি? তাহা এখানেই রহিয়াছে। আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে সংসার লইয়া চলিয়াছি। আমার এই শরীরই সংসার। এই দেহের জন্য, এই দেহকে একটু ভাল ও সুখে রাখিবার জন্য আমি আমার প্রতিবেশীর উপর উৎপীড়ন করি। এই দেহের জন্য আমি অপরের ক্ষতিসাধন করি, ভুলভ্রান্তিও করি।

কত মহামানবের দেহত্যাগ হইয়াছে; কত দুর্বলচিত্ত মানুষ মৃত্যু-কবলিত হইয়াছে; কত দেবতারও মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যু, মৃত্যু, সর্বত্র মৃত্যুই বিরাজ করিতেছে। এই পৃথিবী অনাদি অতীতের একটি শ্মশানক্ষেত্র; তথাপি আমরা এই দেহকেই আঁকড়াইয়া থাকি আর বলি, 'আমি কখনও মরিব না।' জানি ঠিকই যে, দেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; অথচ উহাকেই আঁকড়াইয়া থাকি। ঠিক অমর বলিতে আত্মাকে বুঝায়, আর আমরা ধরিয়া থাকি এই শরীরকে—ভুল হইল এখানেই।

তোমরা সকলেই জড়বাদী, কারণ তোমরা সকলেই বিশ্বাস কর যে, তোমরা দেহমাত্র। কেহ যদি আমার শরীরে ঘুঁষি মারে, আমি বলিব আমাকে ঘুঁষি মারিয়াছে। যদি সে আমার শরীরে প্রহার করে, আমি বলিব যে, আমি প্রহৃত হইয়াছি। আমি যদি শরীরই না হইব, তাহা হইলে এরূপ কথা বলিব কেন? আমি যদিও মুখে বলি—আমি আত্মা, তাহা হইলেও তাহাতে কিছু তফাত হয় না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তের জন্য আমি শরীর; আমি নিজেকে জড়বস্তুতে পরিণত করিয়াছি। এইজন্যই আমাকে এই শরীর পরিহার করিতে হইবে, পরিবর্তে আমি স্বরূপতঃ যাহা, তাহার চিন্তা করিতে হইবে। আমি আত্মা—সেই আত্মা, যাহাকে কোন অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না, কোন তরবারি খণ্ডিত করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, বাতাস শুষ্ক করিতে পারে না। আমি জন্মরহিত, সৃষ্টিরহিত, অনাদি, অখণ্ড, মৃত্যুহীন, জন্মহীন এবং সর্বব্যাপী—ইহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ। সমস্ত দুঃখ-উৎপত্তির কারণ এই যে, আমি মনে করি—আমি ছোট একতাল মৃত্তিকা। আমি নিজেকে জড়ের সহিত এক করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহার ফল ভোগ করিতেছি।

কার্যে পরিণত ধর্ম হইল নিজেকে আত্মার সহিত এক করা। ভ্রমাত্মক অধ্যাসচিন্তা পরিহার কর। ঐদিকে তুমি কতদূর অগ্রসর হইয়াছ? তুমি দুই সহস্র আরোগ্য-নিকেতন নির্মাণ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, যদি না তুমি আত্মানুভূতি লাভ করিয়া থাকো? তুমি মরিবে সামান্য কুকুরেরই মতো কুকুরের অনুভূতি লইয়া। কুকুর মৃত্যুকালে চীৎকার করে আর কাঁদে, কারণ সে জানে যে, সে জড়বস্তু এবং সে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে।

তুমি জানো যে, মৃত্যু অনিবার্য; মৃত্যু আছে জলে বাতাসে—প্রাসাদে বন্দিশালায়—সর্বত্র। কোন্ বস্তু তোমাকে অভয় প্রদান করিবে? তুমি অভয় পাইবে তখনই, যখন তুমি তোমার স্বরূপ জানিতে পারিবে, জানিবে—তুমি অসীম, জন্মহীন, মৃত্যুহীন আত্মা; আত্মাকে অগ্নি দহন করিতে পারে না, কোন অস্ত্র হত্যা করিতে পারে না, কোন বিষ জর্জরিত করিতে পারে না। মনে করিও না—ধর্ম শুধু একটা মতবাদ, কেবল শাস্ত্রজ্ঞান। ধর্ম কেবল তোতাপাখির মুখস্থ বুলি নয়। আমার জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুদেব বলিতেন: তোতাপাখিকে যতই 'হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল' শেখাও না কেন, বেড়াল যখন গলা টিপে ধরে, তখন সব ভুল হয়ে যায়। তুমি সারাক্ষণ প্রার্থনা করিতে পারো, জগতের সব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারো, যত দেবতা আছেন, সকলের পূজা করিতে পারো, কিন্তু যতক্ষণ না আত্মানুভূতি হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি নাই। বাগাড়ম্বর নয়, তত্ত্বালোচনা নয়, যুক্তিতর্ক নয়, চাই অনুভূতি। ইহাকেই আমি বলি, বাস্তব জীবনে পরিণত ধর্ম।

প্রথমে আত্মা সম্পর্কে এই সত্য শ্রবণ করিতে হইবে। যদি শ্রবণ করিয়া থাকো, অতঃপর মনন কর। মনন করা হইলে ধ্যান কর। বৃথা তর্কবিচার আর নিষ্প্রয়োজন। একবার নিশ্চয় কর, তুমি সেই অসীম আত্মা; তাহা যদি সত্য হয়, তবে নিজেকে দেহ বলিয়া ভাবা তো মূর্খতা। তুমি তো আত্মা এবং এই আত্মানুভূতিই লাভ করিতে হইবে। আত্মা নিজেকে আত্মারূপে দেখিবে। বর্তমানে আত্মা নিজেকে দেহরূপে দেখিতেছে। তাহা বন্ধ করিতে হইবে। যে মুহূর্তে তাহা অনুভব করিতে আরম্ভ করিবে, সেই মুহূর্তে তুমি মুক্ত হইবে।

তোমরা এই কাচটিকে দেখিতেছ। তোমরা জান ইহা ভ্রান্তিমাত্র। কোন বৈজ্ঞানিক হয়তো তোমাকে বলিয়া দিবেন ইহা শুধু আলোক ও স্পন্দন…। আত্মদর্শন উহা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক পরিমাণে সত্য, উহা নিশ্চয়ই একমাত্র বাস্তব অবস্থা, একমাত্র সত্য-সংবেদন, একমাত্র বাস্তব প্রত্যক্ষ। এই যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ—এ-সকলই স্বপ্ন। আজকালকার দিনে তুমি তাহা জানো। আমি প্রাচীন বিজ্ঞানবাদীদের কথা বলিতেছি না, আধুনিক পদার্থবিদ্যাবিদ্‌ও বলিবেন দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে আছে শুধু আলোক-স্পন্দন। আলোক-স্পন্দনের সামান্য ইতরবিশেষের দ্বারাই সমস্ত পার্থক্য ঘটিতেছে।

তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। আত্মানুভূতি করিতেই হইবে, আর উহা বাস্তব ধর্ম। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়া গেলেন, 'যাহাদের চিত্ত বিনয়-নম্র, তাহারা ধন্য; কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই প্রাপ্য'। বাস্তব ধর্ম বলিতে তো তোমরা আর উহা মানিতে চাও না। তাঁহার ঐ উপদেশ কি শুধু একটা তামাশার কথা? তাহা হইলে বাস্তব ধর্ম বলিতে তোমরা কি বোঝ? তোমাদের বাস্তবতা হইতে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। 'যাহারা শুদ্ধচিত্ত, তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বর দর্শন করিবে।'—এই কথায় কি পথ পরিষ্কার করা, আরোগ্য-ভবন নির্মাণ করা প্রভৃতি বুঝায়? যখন শুদ্ধচিত্তে এ-সকল অনুষ্ঠান করিবে, তখনই ইহা সৎকর্ম। বিশ ডলার দান করিয়া নিজের নাম প্রকাশিত দেখিবার জন্য স্যান্ ফ্রান্সিস্কোর সমস্ত সংবাদপত্র ক্রয় করিতে যাইও না। নিজেদের ধর্মগ্রন্থে কি পাঠ কর নাই যে, কেহই তোমাকে সাহায্য করিবে না? ঈশ্বরের উপাসনার মনোভাব লইয়া ঈশ্বরকেই দরিদ্র, দুঃখী ও দুর্বলের মধ্যে সেবা কর। তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলে ফলপ্রাপ্তি গৌণ কথা। লাভের বাসনা না রাখিয়া ঐ ধরনের কর্ম অনুষ্ঠান করিলে আত্মার মঙ্গল সাধিত হয় এবং এরূপ ব্যক্তিদেরই স্বর্গরাজ্য লাভ হয়। এই স্বর্গরাজ্য রহিয়াছে আমাদেরই মধ্যে। সকল আত্মার আত্মা যিনি, তিনি সেখানেই বিরাজ করেন। তাঁহাকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি কর তাহাই কার্যে পরিণত ধর্ম, তাহাই মুক্তি। পরস্পরকে প্রশ্ন করিয়া দেখা যাক, আমরা কে কতদূর এই পথে অগ্রসর হইয়াছি, কতদূর আমরা এই দেহের উপাসক, কতদূরই বা পরমাত্মস্বরূপ ভগবানে ঠিক বিশ্বাস করি, এবং

কতদূরই বা আমাদিগকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করি? তখন সত্যসত্যই স্বার্থশূন্য হইব; ইহাই মুক্তি। ইহাই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা। আত্মোপলব্ধি কর। তাহাই একমাত্র কর্তব্য। নিজে স্বরূপতঃ যাহা, অর্থাৎ নিজেকে অসীম আত্মারূপে জানো, তাহাই বাস্তব ধর্ম। আর যাহা কিছু, সকলই অবাস্তব। কারণ আর যাহা কিছু আছে, সকলই বিলুপ্ত হইবে। একমাত্র আত্মাই কখনও বিলুপ্ত হইবে না; আত্মাই শাশ্বত। আরোগ্য-নিকেতন একদিন ধসিয়া পড়িবে। যাহারা রেলপথ-নির্মাতা, তাহারাও একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া উড়িয়া যাইবে, সূর্য নিশ্চিহ্ন হইবে। কিন্তু আত্মা চিরকাল ধরিয়া বিরাজ করিবেন।

কোন্‌টি শ্রেয়—এই-সকল ধ্বংসশীল বস্তুর পশ্চাদ্ধাবন, না চির অপরিবর্তনীয়ের উপাসনা? কোন্‌টি অধিক বাস্তব? তোমার জীবনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে-সকল বস্তু আয়ত্ত করিলে, সেগুলি আয়ত্তাধীন হইবার পূর্বে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই কি শ্রেয়? ঠিক যেমন সেই বিখ্যাত দিগ্‌বিজয়ীর ভাগ্যে ঘটিয়াছিল? তিনি সব দেশ জয় করিলেন, পরে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, 'আমার সম্মুখে কলসীভরতি দ্রব্যসম্ভার সাজিয়ে রাখো।' তারপর বলিলেন, 'বড় হীরকখণ্ডটি নিয়ে এস।' তখন ঐটি আপন বক্ষমধ্যে স্থাপন করিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করিলেন—ঠিক যেমন একটি কুকুর করিয়া থাকে।

মানুষ সদর্পে বলে, 'আমি বাঁচিয়া আছি;' সে জানে না যে, মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াই সে এই জীবনকে ক্রীতদাসের মতো আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। সে বলে, 'আমি সম্ভোগ করিতেছি।' সে কখনও বুঝিতে পারে না যে, প্রকৃতি তাহাকে দাস করিয়া রাখিয়াছে।

প্রকৃতি আমাদের সকলকে পেষণ করিতেছে। যে সুখ-কণিকা পাইয়াছ, তাহার হিসাব করিয়া দেখ, শেষ পর্যন্ত দেখিবে প্রকৃতি তোমাকে দিয়া নিজের কাজ করাইয়া লইয়াছে; এবং যখন তোমার মৃত্যু হইবে, তখন তোমার শরীর দ্বারা অপর বৃক্ষলতাদির পরিপুষ্টি হইবে। তথাপি আমরা সর্বদা মনে করি, আমরা স্বাধীনভাবেই সুখ পাইতেছি। এইরূপেই সংসার-চক্র আবর্তিত হইতেছে।

সুতরাং আত্মাকে আত্মারূপে অনুভব করাই হইল বাস্তব ধর্ম। অপর সব কিছু ঠিক ততটুকু ভাল, যতটুকু ঐগুলি আমাদিগকে এই এক অতি উত্তম ধারণায় উপনীত করিতে পারে। সেই অনুভূতি বৈরাগ্য ও ধ্যানের দ্বারা লভ্য। বৈরাগ্যের অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয় হইতে বিরতি এবং যত কিছু গ্রন্থি, যত কিছু শৃঙ্খল আমাদিগকে জড়বস্তুর সহিত আবদ্ধ রাখে, সেগুলি ছিন্ন করা। 'আমি এই জড়জীবন লাভ করিতে চাই না, এই ইন্দ্রিয়ভোগের জীবন কামনা করি না, আমি কামনা করি উচ্চতর বস্তুকে'—ইহাই হইল বৈরাগ্য। অতঃপর যে ক্ষতি আমাদের হইয়া গিয়াছে, ধ্যানের দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

আমরা প্রকৃতির আজ্ঞানুরূপ কার্য করিতে বাধ্য। যদি বাহিরে কোথাও শব্দ হয়, আমাকে তাহা শুনিতেই হইবে। যদি কিছু ঘটিতে থাকে, আমাকে তাহা দেখিতেই হইবে। ঠিক যেন বানরের মতো আমরা। আমরা প্রত্যেকে যেন দুই সহস্র বানরের এক-একটি ঝাঁক। বানর এক অদ্ভুত প্রাণী! ফলতঃ আমরা অসহায়; আর বলি কিনা, 'ইহাই আমাদের উপভোগ!' অপূর্ব এই ভাষা! পৃথিবীকে আমরা উপভোগই করিতেছি বটে! আমাদের ভোগ না করিয়া গত্যন্তর নাই। প্রকৃতি চায় যে, আমরা ভোগ করি। একটি সুললিত শব্দ হইতেছে, আর আমি শুনিতেছি। যেন উহা শোনা না শোনা আমার হাতে! প্রকৃতি বলে, 'যাও, দুঃখের গভীরে ডুবিয়া যাও,' মুহূর্তের মধ্যে আমি দুঃখে নিমজ্জিত হই। আমরা ইন্দ্রিয় ও সম্পদ্ সম্ভোগ করিবার কথা বলিয়া থাকি। কেহ হয়তো আমাকে খুব পণ্ডিত মনে করে, আবার অপর কেহ হয়তো মনে করে 'এ মূর্খ।' জীবনে এই অধঃপতন, এই দাসত্ব চলিয়াছে, অথচ আমাদের কোন বোধই নাই। আমরা একটি অন্ধকার কক্ষে পরস্পর মাথা ঠুকিয়া মরিতেছি।

ধ্যান কাহাকে বলে? ধ্যান হইল সেই শক্তি, যাহা আমাদের এই-সব কিছু প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা দেয়। প্রকৃতি আমাদের প্রলোভন দেখাইতে পারে, 'দেখ—কি সুন্দর বস্তু!' আমরা ফিরিয়াও দেখিব না। এইবার সে বলিবে, 'এই যে কি সুগন্ধ, আঘ্রাণ কর।' আমি আমার নাসিকাকে বলিব, 'আঘ্রাণ করিও না।' নাসিকা আর তাহা করিবে না। চক্ষুকে বলিব, 'দেখিও না।' প্রকৃতি একটি মর্মন্তুদ কাণ্ড করিয়া বসিল; সে আমার একটি

সন্তান হত্যা করিয়া বলিল, 'হতভাগা, এইবার তুই বসিয়া ক্রন্দন কর্। শোকের সাগরে ডুবিয়া যা।' আমি বলিলাম, 'আমাকে তাহাও করিতে হইবে না।' আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম; আমাকে স্বাধীন হইতে হইবে। ইহা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখ না। এক মুহূর্তের ধ্যানের ফলে এই প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনিতে পারিবে। মনে কর, তোমার নিজের মধ্যে যদি সে ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে উহাই কি স্বর্গসদৃশ হইত না, উহাই কি মুক্তি হইত না? ইহাই হইল ধ্যানের শক্তি।

কি করিয়া উহা আয়ত্ত করা যাইবে? নানা উপায়ে তাহা পারা যায়। প্রত্যেকের প্রকৃতির নিজস্ব গতি আছে। কিন্তু সাধারণ নিয়ম হইল এই যে, মনকে আয়ত্তে আনিতে হইবে। মন একটি জলাশয়ের মতো; যে-কোন প্রস্তরখণ্ড উহাতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাই তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই তরঙ্গগুলি আমাদের স্বরূপ-দর্শনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। জলাশয়ে পূর্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; কিন্তু জলাশয়ের বক্ষ এত আলোড়িত যে, প্রতিবিম্বটি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি না। ইহাকে শান্ত হইতে দাও। প্রকৃতি যেন উহাতে তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে না পারে। শান্ত হইয়া থাকো; তাহা হইলে কিছু পরে প্রকৃতি তোমাকে ছাড়িয়া দিবে। তখন আমরা জানিতে পারিব, আমরা স্বরূপতঃ কি। ঈশ্বর সর্বদা কাছেই রহিয়াছেন; কিন্তু মন বড়ই চঞ্চল, সে সর্বদা ইন্দ্রিয়াদির পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিলেও তোমার ঘূর্ণিপাকের অবসান হইবে না। এই মুহূর্তে মনে করিতেছি, আমি ঠিক আছি, ঈশ্বরের ধ্যান করিব; অমনি মুহূর্তের মধ্যে আমার মন চলিল লণ্ডনে। যদি বা তাহাকে সেখান হইতে জোর করিয়া টানিয়া আনিলাম, তা অতীতে আমি নিউইয়র্কে কি করিয়াছি, তাহাই দেখিবার জন্য মন ছুটিল নিউইয়র্কে। এই-সকল তরঙ্গকে ধ্যানের দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে।

ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা তামাশার কথা নয়, একদিনের বা কয়েক বৎসরের অথবা হয়তো কয়েক জন্মেরও কথা নয়। কিন্তু সেজন্য দমিয়া যাইও না। সংগ্রাম চালাইতে হইবে। জ্ঞানতঃ—স্বেচ্ছায় এই সংগ্রাম চালাইতে হইবে। তিল তিল করিয়া আমরা নূতন ভূমি জয় করিয়া লইব। তখন আমরা এমন প্রকৃত সম্পদের

অধিকারী হইব, যাহা কেহ কখনও আমাদের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইতে পারিবে না; এমন সম্পদ, যাহা কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না; এমন আনন্দ, যাহার উপর আর কোন বিপদের ছায়া পড়িবে না।

এতকাল ধরিয়া আমরা অন্যের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছি। যখন আমি সামান্য সুখ পাইতেছিলাম, তখন সুখের কারণ যে ব্যক্তি, সে প্রস্থান করিলে অমনি আমি সুখ হারাইতাম। মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখ! আপনার সুখের জন্য সে অন্যের উপর নির্ভর করে! সকল বিয়োগই দুঃখময়। ইহা স্বাভাবিক। সুখের জন্য ধনের উপর নির্ভর করিবে? ধনের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। সুখের জন্য স্বাস্থ্য অথবা অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করিলে আজ অথবা কাল দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

অনন্ত আত্মা ব্যতীত আর সব কিছু পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের চক্র আবর্তিত হইতেছে! স্থায়িত্ব তোমার নিজের অন্তরে ব্যতীত অন্য কোথাও নাই। সেখানেই অপরিবর্তনীয় অসীম আনন্দ রহিয়াছে। ধ্যানই সেখানে যাইবার দ্বার। প্রার্থনা, ক্রিয়াকাণ্ড এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপাসনা ধ্যানের প্রাথমিক শিক্ষা মাত্র। তুমি প্রার্থনা করিতেছ, অর্ঘ্যদান করিয়া থাকো; একটি মত ছিল যাহাতে বলা হইত, এ-সকলই আত্মিক শক্তির বৃদ্ধিসাধন করে; জপ, পুষ্পাঞ্জলি, প্রতিমা, মন্দির, দীপারতি প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে মনে তদনুরূপ ভাবের সঞ্চয় হয়; কিন্তু ঐ ভাবটি সর্বদা মানবের নিজের মধ্যেই রহিয়াছে, অন্যত্র নয়। সকলেই ঐরূপ করিতেছে; তবে লোকে যাহা না জানিয়া করে, তাহা জানিয়া করিতে হইবে। ইহাই হইল ধ্যানের শক্তি। তোমারই মধ্যে যাবতীয় জ্ঞান আছে। তাহা কিরূপে সম্ভব হইল? ধ্যানের শক্তির দ্বারা। আত্মা নিজের অন্তঃপ্রদেশ মন্থন করিয়া উহা উদ্ধার করিয়াছে। আত্মার বাহিরে কখন কোন জ্ঞান ছিল কি? পরিশেষে এই ধ্যানের শক্তিতে আমরা আমাদের নিজ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হই; তখন আত্মা আপনার সেই জন্মহীন মৃত্যুহীন স্বরূপকে জানিতে পারে। তখন আর কোন দুঃখ থাকে না, এই পৃথিবীতে আর জন্ম হয় না, ক্রমবিকাশও হয় না। আত্মা তখন জানে যে, সে সর্বদা পূর্ণ ও মুক্ত।

ধর্মের সাধন-প্রণালী ও উদ্দেশ্য

পৃথিবীর ধর্মগুলি পর্যালোচনা করিলে আমরা সাধারণতঃ দুইটি সাধন-পথ দেখিতে পাই। একটি ঈশ্বর হইতে মানুষের দিকে বিসর্পিত। অর্থাৎ সেমিটিক ধর্মগোষ্ঠীতে দেখিতে পাই—ঈশ্বরীয় ধারণা প্রায় প্রথম হইতেই স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল, অথচ অত্যন্ত আশ্চর্য যে, আত্মা সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা ছিল না। ইহা অতি উল্লেখযোগ্য যে, অতি-আধুনিক কালের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যে জীবাত্মা-সম্পর্কে কোন চিন্তার স্ফুরণ হয় নাই। মন ও কতিপয় জড় উপাদানের সংমিশ্রণে মানুষের সৃষ্টি, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। মৃত্যুতেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি। অথচ এই জাতির মধ্যেই ঈশ্বর সম্বন্ধে অতি বিস্ময়কর চিন্তাধারার বিকাশ হইয়াছিল। ইহাও অন্যতম সাধন-পথ। অন্য সাধনপথ—মানুষের ভিতর দিয়া ঈশ্বরাভিমুখে। এই দ্বিতীয় প্রণালীটি বিশেষরূপে আর্যজাতির, আর প্রথমটি সেমিটিক জাতির।

আর্যগণ প্রথমে আত্মতত্ত্ব লইয়া শুরু করিয়াছিলেন; তখন তাঁহাদের ঈশ্বরবিষয়ক ধারণাগুলি অস্পষ্ট, পার্থক্য-নির্ণয়ে অসমর্থ ও অপরিচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু কালক্রমে আত্মা সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা যতই স্পষ্টতর হইতে লাগিল, ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সম অনুপাতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। সেইজন্য দেখা যায়, বেদসমূহে যাবতীয় জিজ্ঞাসাই সর্বদা আত্মার মাধ্যমে উত্থাপিত হইয়াছিল এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে আর্যদিগের যত কিছু জ্ঞান সবই জীবাত্মার মধ্য দিয়াই স্ফূর্তি পাইয়াছে। সেইহেতু তাঁহাদের সমগ্র দর্শন-সাহিত্যে অন্তর্মুখী ঈশ্বরানুসন্ধানের বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার একটি বিচিত্র ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে।

আর্যগণ নিজেদের অন্তরেই চিরদিন ভগবানের অনুসন্ধান করিয়াছেন। কালক্রমে ঐ সাধনপ্রণালী তাঁহাদের নিকট স্বাভাবিক ও নিজস্ব হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের শিল্পচর্চা ও প্রাত্যহিক আচরণের মধ্যেও ঐ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বর্তমানকালেও ইওরোপে উপাসনারত কোন ব্যক্তির প্রতিকৃতি আঁকিতে গিয়া শিল্পী তাঁহার দৃষ্টি উর্ধ্বে স্থাপন করাইয়া থাকেন।

উপাসক প্রকৃতির বাহিরে ভগবান্‌কে অনুসন্ধান করেন, দূর মহাকাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত রহিয়াছে—এইভাবে সেই প্রতিমূর্তি অঙ্কিত হয়। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে উপাসকের মূর্তি অন্যরূপ। এখানে উপাসনায় চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত থাকে, উপাসকের দৃষ্টি যেন অন্তর্মুখী।

এই দুইটিই মানুষের শিক্ষণীয় বস্তু—একটি বহিঃপ্রকৃতি, অপরটি অন্তঃপ্রকৃতি। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী হইলেও সাধারণ মানুষের নিকট বাহ্যপ্রকৃতি—অন্তঃপ্রকৃতি বা চিন্তা-জগৎ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গঠিত। অধিকাংশ দর্শনশাস্ত্রে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে, প্রথমেই অনুমিত হইয়াছে যে, জড়বস্তু এবং চেতন মন—দুইটি বিপরীতধর্মী। কিন্তু পরিণামে আমরা দেখি, উহারা বিপরীতধর্মী নয়; বরং ধীরে ধীরে উহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিবে এবং চরমে একত্র মিলিত হইয়া এক অন্তহীন অখণ্ড বস্তু সৃষ্টি করিবে। সুতরাং এই বিশ্লেষণ দ্বারা কোন একটি মতকে অপর মত হইতে উচ্চাবচ প্রতিপন্ন করা আমার অভিপ্রায় নয়। বহিঃপ্রকৃতির সাহায্যে সত্যানুসন্ধানে যাঁহারা ব্যাপৃত, তাঁহারা যেমন ভ্রান্ত নন, অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য দিয়া সত্যলাভের যাঁহারা প্রয়াসী, তাঁহাদিগকেও তেমনি উচ্চ বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই। এই দুইটি পৃথক্ প্রণালী মাত্র। দুইটিই জগতে টিকিয়া থাকিবে; দুইটিরই অনুশীলন প্রয়োজন; পরিণামে দেখা যাইবে যে, দুইটি মতেরই পরস্পর মিলন হইতেছে। আমরা দেখি যে, মন যেমন দেহের পরিপন্থী নয়, দেহও তেমনি মনের পরিপন্থী নয়, যদিও অনেকে মনে করে, এই দেহটি একান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। প্রাচীনকালে প্রতিদেশেই এমন বহু লোক ছিল, যাহারা দেহকে শুধু আধি, ব্যাধি, পাপ ও ঐ জাতীয় বস্তুর আধাররূপেই গণ্য করিত। যাহা হউক, উত্তরকালে আমরা দেখিতে পাই, বেদের শিক্ষা অনুসারে এই দেহ মনে মিশিয়া গিয়াছে এবং মন দেহে মিশিয়া গিয়াছে।

একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে, যাহা সমগ্র বেদে[১] ধ্বনিত হইয়াছে: যথা, যেমন একটি মাটির ডেলা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে আমরা বিশ্বের সমস্ত মাটির বিষয় জানিতে পারি, তেমনি সেই বস্তু কি, যাহা জানিলে আমরা অন্য সবই

---

১ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতঃ মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি? যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।—ছান্দোগ্য উপ., ৬।১।৩-৪

জানিতে পারি? কমবেশি স্পষ্টতঃ বলিতে গেলে এই তত্ত্বই সমগ্র মানব-জ্ঞানের বিষয়বস্তু। এই একত্ব উপলব্ধির দিকেই আমরা সকলে অগ্রসর হইতেছি। আমাদের জীবনের প্রতি কর্ম—তাহা অতি বৈষয়িক, অতি স্থূল, অতি সূক্ষ্ম, অতি উচ্চ, অতি আধ্যাত্মিক কর্মই হউক না কেন—সমভাবে সেই একই আদর্শ একত্বানুভূতির দিকে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে। এক ব্যক্তি অবিবাহিত। সে বিবাহ করিল। বাহ্যতঃ ইহা একটি স্বার্থপূর্ণ কাজ হইতে পারে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে প্রেরণা—যে উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহাও ঐ একত্ব উপলব্ধির চেষ্টা। তাহার পুত্র-কন্যা আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে; সে তাহার দেশকে ভালবাসে, এই পৃথিবীকে ভালবাসে এবং পরিণামে সমগ্র বিশ্বে তাহার প্রেম পরিব্যাপ্ত হয়। দুর্নিবার গতিতে আমরা সেই পূর্ণতার দিকে চলিতেছি—এই ক্ষুদ্র আমিত্ব নাশ করিয়া এবং উদার হইতে উদারতর হইয়া অদ্বৈতানুভূতির পথে। উহাই চরম লক্ষ্য; ঐ লক্ষ্যের দিকেই সমগ্র বিশ্ব দ্রুত-ধাবমান, প্রতি অণু-পরমাণু পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রধাবিত। অণুর সহিত অণুর, পরমাণুর সহিত পরমাণুর মুহুর্মুহু মিলন হইতেছে, আর বিশালাকৃতি গোলক, ভূলোক, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহের উৎপত্তি হইতেছে। আবার উহারাও যথানিয়মে পরস্পরের দিকে বেগে ছুটিতেছে এবং এ-কথা আমরা জানি যে, চরমে সমগ্র জড়-জগৎ ও চেতন-জগৎ এক অখণ্ড সত্তায় মিশিয়া একীভূত হইবে।

নিখিল বিশ্বের বিপুলভাবে যে ক্রিয়া চলিতেছে, ব্যষ্টি-মানুষেও স্বল্পায়তনে সেই ক্রিয়াই চলিতেছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যেমন একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে, অথচ একত্বের—অখণ্ডত্বের দিকে নিয়তই উহা ধাবমান, আমাদের ক্ষুদ্রতর ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ প্রতি জীব যেন জগতের অবশিষ্টাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিত্য নবজন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। যে যত বেশী মূর্খ ও অজ্ঞান, সে নিজেকে বিশ্ব হইতে তত বেশী বিচ্ছিন্ন মনে করে। যে যত বেশী অজ্ঞান, সে তত বেশী মনে করে যে, সে মরিবে অথবা জন্মগ্রহণ করিবে ইত্যাদি—এ-সকল ভাব এই অনৈক্য বা ভিন্নতাই প্রকাশ করে অথবা বিচ্ছিন্ন ভাবেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু দেখা যায়, জ্ঞানোৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, নীতিজ্ঞান অভিব্যক্ত হয় এবং মানুষের মধ্যে অখণ্ড চেতনার উন্মেষ হয়। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই

হউক, ঐ শক্তিই পিছনে থাকিয়া মানুষকে নিঃস্বার্থ হইতে প্রেরণা দেয়। উহাই সকল নীতিজ্ঞানের ভিত্তি; পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় বা যে-কোন ধর্মে বা যে-কোন অবতারপুরুষ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মনীতির ইহাই সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য অংশ। 'নিঃস্বার্থ হও,' 'নাহং, নাহং—তুঁহু, তুঁহু'—এই ভাবটিই সকল নীতি ও অনুশাসনের পটভূমি। তুমি আমার অংশ, এবং আমিও তোমার অংশ। তোমাকে আঘাত করিলে আমি নিজেই আঘাতপ্রাপ্ত হই, তোমাকে সাহায্য করিলে আমার নিজেরই সাহায্য হইয়া থাকে, তুমি জীবিত থাকিলে সম্ভবতঃ আমারও মৃত্যু হইতে পারে না—ইহার অর্থ এই ব্যক্তিভাবশূন্যতার স্বীকৃতি। যতক্ষণ এই বিপুল বিশ্বে একটি কীটও জীবিত থাকে, ততক্ষণ কিরূপে আমি মরিতে পারি? কারণ আমার জীবন তো ঐ কীটের জীবনের মধ্যেও অনুস্যূত রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই শিক্ষাও পাই যে, কোন মানুষকে সাহায্য না করিয়া আমরা পারি না, তাহার কল্যাণে আমারই কল্যাণ।

এই বিষয়ই সমগ্র বেদান্ত এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্য দিয়া অনুস্যূত। এ-কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধারণভাবে ধর্মমাত্রই তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথমাংশ দর্শন—প্রত্যেক ধর্মের মূলনীতি ও সারকথা। সেই তত্ত্বগুলি পুরাণাখ্যায়িকা—মহাপুরুষ বা বীরগণের জীবন, দেবতা উপদেবতা বা দেবমানবদের কাহিনীর মধ্য দিয়া রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুতঃ শক্তির প্রকাশনাই সকল পুরাণ সাহিত্যের মূল ভাব। নিম্নস্তরের পুরাণগুলিতে —আদিমযুগের রচনায়—এই শক্তির অভিব্যক্তি দেখা যায় দেহের পেশীতে। পুরাণগুলিতে বর্ণিত নায়কগণ আকৃতিতেও যেমন বিশাল, বিক্রমেও তেমনি বিপুল। একজন বীরই যেন বিশ্বজয়ে সমর্থ। মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তি দেহ অপেক্ষা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে মহাপুরুষগণ উচ্চতর নীতিজ্ঞানের নিদর্শনরূপে পুরাণাদিতে চিত্রিত হইয়াছেন। পবিত্রতা এবং উচ্চনীতিবোধের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ—স্বার্থপরতা ও নীতিহীনতার দুর্বার স্রোত প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের আছে। সকল ধর্মের তৃতীয় অংশ—প্রতীকোপাসনা; ইহাকে তোমরা যাগযজ্ঞ, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম বলো। কিন্তু পৌরাণিক উপাখ্যান এবং

মহাপুরুষগণের চরিত্রও সর্বস্তরের নরনারীর প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। এমন নিম্নপর্যায়ের মানুষও সংসারে আছে, যাহাদের জন্য শিশুদের মতো ধর্মের 'কিণ্ডারগার্টেন' প্রয়োজন। এভাবেই প্রতীকোপাসনা ও ব্যাবহারিক দৃষ্টান্তের হাতে-নাতে প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে; এগুলি ধরা যায়, বোঝা যায়—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জড়বস্তুর মতো দেখা যায় এবং অনুভব করা যায়।

অতএব প্রত্যেক ধর্মেই তিনটি স্তর বা পর্যায় দেখা যায়; যথা—দর্শন, পুরাণ ও পূজা-অনুষ্ঠান। বেদান্তের পক্ষে একটি সুবিধার কথা বলা যায় যে, সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে ধর্মের এই তিনটি পর্যায়ের সংজ্ঞাই সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য ধর্মে মূলতত্ত্বগুলি উপাখ্যান অংশের সহিত এমনভাবে জড়িত যে, একটিকে অপরটি হইতে স্বতন্ত্র করা বড় কঠিন। উপাখ্যান-ভাগ যেন তত্ত্বাংশকে গ্রাস করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সাধারণ মানুষ তত্ত্বগুলি একরূপ ভুলিয়া যায়, তত্ত্বাংশের তাৎপর্য আর ধরিতে পারে না। তত্ত্বের টীকা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি মূলতত্ত্বকে গ্রাস করে এবং সকলে এগুলি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে ও অবতার, প্রচারক, আচার্যদের কথাই কেবল চিন্তা করে। মূলতত্ত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়—এতদূর লুপ্ত হয় যে, বর্তমানকালেও যদি কেহ যীশুকে বাদ দিয়া খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বসমূহ প্রচার করিতে প্রয়াসী হয়, তবে লোকে তাহাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিবে এবং ভাবিবে সে অন্যায় করিয়াছে এবং খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। অনুরূপভাবে যদি কেহ হজরত মহম্মদকে বাদ দিয়া ইসলামধর্মের তত্ত্বগুলি প্রচার করিতে অগ্রসর হয়, তবে মুসলমানগণও তাহাকে সহ্য করিবে না। কারণ বাস্তব উদাহরণ—মহাপুরুষ ও পয়গম্বরের জীবনকাহিনীই তত্ত্বাংশকে সর্বতোভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

বেদান্তের প্রধান সুবিধা এই যে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়। সুতরাং স্বভাবতঃ বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের ন্যায় কোন প্রত্যাদিষ্ট বা প্রেরিতপুরুষের প্রভাব উহার তত্ত্বাংশগুলিকে সর্বতোভাবে গ্রাস অথবা আবৃত করে নাই।...

তত্ত্বমাত্রই শাশ্বত ও চিরন্তন, এবং প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ যেন গৌণপর্যায়-ভুক্ত—তাঁহাদের কথা বেদান্তশাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। উপনিষদসমূহে

কোন বিশেষ প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের বিষয় বলা হয় নাই, তবে বহু মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষ ও নারীর কথা বলা হইয়াছে। প্রাচীন ইহুদীদের এই ধরনের কিছু ভাব ছিল; তথাপি দেখিতে পাই মোজেস্ হিব্রু সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছেন। অবশ্য আমি বলিতে চাই না যে, এই সিদ্ধ মহাপুরুষগণ কর্তৃক একটা জাতির ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়া খারাপ। কিন্তু যদি কোন কারণে ধর্মের সমগ্র তত্ত্বাংশকে উপেক্ষা করা হয়, তবে তাহা জাতির পক্ষে নিশ্চয়ই ক্ষতিকর হইবে। তত্ত্বের দিক দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনেকটা ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাইতে পারি, কিন্তু ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া তাহা সম্ভব নয়। ব্যক্তি আমাদের হৃদয়াবেগ স্পর্শ করে; তত্ত্বের আবেদন উচ্চতর ক্ষেত্র অর্থাৎ আমাদের শান্ত বিচারবুদ্ধিকে স্পর্শ করে। তত্ত্বই চরমে জয়লাভ করিবে, কারণ উহাই মানুষের মনুষ্যত্ব। ভাবাবেগ অনেক সময়ই আমাদিগকে পশুস্তরে নামাইয়া আনে। বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গুলির সহিতই ভাবাবেগের সম্বন্ধ বেশি; সুতরাং যখন তত্ত্বসমূহ সর্বতোভাবে উপেক্ষিত হয়, এবং ভাবাবেগ প্রবল হইয়া উঠে, তখনই ধর্ম গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয় এবং ঐ অবস্থায় ধর্ম এবং দলীয় রাজনীতি ও অনুরূপ বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। তখন ধর্মসম্বন্ধে মানুষের মনে অতি উৎকট ও অন্ধ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং হাজার হাজার মানুষ পরস্পরের গলায় ছুরি দিতেও দ্বিধা করে না। যদিও এ-সকল প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের জীবন—সৎকর্মের মহতী প্রেরণাস্বরূপ, নীতিচ্যুত হইলে ইহাই আবার মহা অনর্থের হেতু হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়া সর্বযুগেই মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার পথে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং ধরিত্রীকে রক্তস্নাত করিয়াছে। বেদান্ত এই বিপদ এড়াইয়া যাইতে সমর্থ, কারণ ইহাতে কোন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের স্থান নাই। বেদান্তে অনেক মন্ত্রদ্রষ্টার কথা আছে—'ঋষি' বা 'মুনি' শব্দে তাঁহারা অভিহিত। 'দ্রষ্টা' শব্দটিও আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত। যাঁহারা সত্য দর্শন করিয়াছেন, মন্ত্রার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহারাই দ্রষ্টা।

'মন্ত্র' শব্দের অর্থ যাহা মনন করা হইয়াছে, যাহা মনে ধ্যানের দ্বারা লব্ধ; এবং ঋষি এই-সব মন্ত্রের দ্রষ্টা। এই মন্ত্রগুলি কোন মানবগোষ্ঠীর অথবা কোন বিশেষ নর বা নারীর নিজস্ব সম্পত্তি নয়, তা তিনি যত বড়ই হউন। এমন কি, বুদ্ধ বা যীশুখ্রীষ্টের মতো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদেরও নিজস্ব সম্পত্তি নয়।

এই মন্ত্রগুলি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রেরও যেমন সম্পত্তি, বুদ্ধদেবের মতো মহামানবেরও তেমনি সম্পত্তি; অতি নগণ্য কীটেরও যেমন সম্পত্তি, খ্রীষ্টেরও তেমনি সম্পত্তি, কারণ এগুলি সার্বভৌম তত্ত্ব। এই মন্ত্রগুলি কখনও সৃষ্ট হয় নাই—চিরন্তন, শাশ্বত; এগুলি অজ—আধুনিক বিজ্ঞানের কোন বিধি বা নিয়মের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, এই মন্ত্রগুলি আবৃত থাকে এবং আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু অনন্তকাল প্রকৃতিতে আছে। নিউটন জন্মগ্রহণ না করিলেও জগতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিরাজ করিত এবং ক্রিয়াশীল থাকিত। নিউটনের প্রতিভা ঐ শক্তি উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করিয়াছিল, সজীব করিয়াছিল এবং মানবীয় জ্ঞানের বিষয়বস্তুতে রূপায়িত করিয়াছিল মাত্র। ধর্মতত্ত্ব এবং সুমহান্ আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ সম্পর্কেও ঐকথা প্রযোজ্য। এগুলি নিত্যক্রিয়াশীল। যদি বেদ, বাইবেল, কোরান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ মোটেই না থাকিত, যদি ঋষি এবং অবতারপ্রথিত পুরুষগণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তথাপি এই ধর্মতত্ত্বগুলির অস্তিত্ব থাকিত। এগুলি শুধু সাময়িকভাবে স্থগিত আছে, এবং মনুষ্যজাতি ও মনুষ্যপ্রকৃতির উন্নতি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ধীর-স্থিরভাবে ক্রিয়াশীল থাকিবে। কিন্তু তাঁহারাই অবতারপুরুষ, যাঁহারা এই তত্ত্বগুলি দর্শন ও আবিষ্কার করেন,—তাঁহারাই আধ্যাত্মিক রাজ্যের আবিষ্কারক। নিউটন ও গ্যালিলিও যেমন পদার্থবিজ্ঞানের ঋষি ছিলেন, অবতারপুরুষগণও তেমনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ঋষি। ঐ-সকল তত্ত্বের উপর কোন বিশেষ অধিকার তাঁহারা দাবি করিতে পারেন না, এগুলি বিশ্বপ্রকৃতির সাধারণ সম্পদ্।

হিন্দুদের মতে বেদ অনন্ত। বেদের অনন্তত্বের তাৎপর্য এখন আমরা বুঝিতে পারি। ইহার অর্থ—প্রকৃতির যেমন আদি বা অন্ত বলিয়া কিছু নাই, এ-সকল তত্ত্বেরও তেমনি আরম্ভ বা শেষ বলিয়া কিছু নাই। পৃথিবীর পর পৃথিবী, মতবাদের পর মতবাদ উদ্ভূত হইবে, কিছুকাল চলিতে থাকিবে এবং পরে আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি একরূপই থাকিবে। লক্ষ লক্ষ মতবাদের উদ্ভব হইতেছে, আবার বিলয় হইতেছে। কিন্তু বিশ্ব একইভাবে থাকে। কোন একটি গ্রহ সম্পর্কে সময়ের আদি-অন্ত হয়তো বলা যাইতে পারে, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ঐরূপ সীমানির্দেশ একেবারে অর্থহীন। নৈসর্গিক নিয়ম, জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের তত্ত্বাদি সম্পর্কেও ঐ কথা সত্য। আদি-অন্তহীন কালের মধ্যে তাহারা বিরাজমান, এবং মানুষ

অতি-সম্প্রতি, তুলনামূলকভাবে বলিতে গেলে বড় জোর কয়েক হাজার বৎসর যাবৎ মানুষ এগুলির স্বরূপ-নির্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছে। অজস্র উপাদান আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। অতএব বেদ হইতে একটি মহান্ সত্য আমরা প্রথমে শিক্ষা করি যে, ধর্ম সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। আধ্যাত্মিক সত্যের অসীম সমুদ্র আমাদের সম্মুখে প্রসারিত। ইহা আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে, কার্যকর করিতে হইবে এবং জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে। সহস্র সহস্র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আবির্ভাব জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আরও লক্ষের আবির্ভাব ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ করিবে।

প্রাচীন যুগে প্রতি সমাজেই অনেক প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। এমন সময় আসিবে, যখন পৃথিবীতে প্রতি নগরের পথে পথে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ প্রাচীনযুগের সমাজব্যবস্থায় অসাধারণ ব্যক্তিগণই—বলিতে গেলে অবতাররূপে চিহ্নিত হইত। সময় আসিতেছে, যখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যে, ধর্মজীবন লাভ করার অর্থই ঈশ্বরকর্তৃক প্রত্যাদেশ লাভ করা এবং নর বা নারী সত্যদ্রষ্টা না হইয়া কেহই ধার্মিক হইতে পারে না। আমরা বুঝিতে পারিব যে, ধর্মতত্ত্ব শুধু মানসিক চিন্তা বা ফাঁকা কথার মধ্যে নিহিত নয়; পরন্তু বেদের শিক্ষা এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, উচ্চ হইতে উচ্চতর তত্ত্বের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার এবং সমাজে উহার প্রচারের মধ্যেই ধর্মের মূল রহস্য নিহিত। প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা ঋষি গড়িয়া তোলাই ধর্মচর্চার উদ্দেশ্য এবং বিদ্যায়তনগুলিও সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই গড়িয়া উঠিবে। সমগ্র বিশ্ব প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণে পূর্ণ হইবে। যে পর্যন্ত মানুষ প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ না হয়, ধর্ম তাহার নিকটে উপহাসের বস্তু এবং শুধু কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। দেয়ালকে যেমন দেখি, তাহা অপেক্ষাও সহস্রগুণ গভীরভাবে ধর্মকে আমরা প্রত্যক্ষ করিব, উপলব্ধি করিব—অনুভব করিব।

ধর্মের এ-সকল বিবিধ বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে একটি মূলতত্ত্ব বিদ্যমান এবং আমাদের জন্য তাহা পূর্বেই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক জড়বিজ্ঞান ঐক্যের সন্ধান পাইয়া শেষ হইবে, কারণ ইহার বেশি আর আমরা যাইতে অক্ষম। পূর্ণ ঐক্যে পৌছিলে তত্ত্বের দিক দিয়া বিজ্ঞানের আর বেশি বলিবার কিছুই থাকে না। ব্যাবহারিক ধর্মের কাজ শুধু

প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটিগুলির ব্যবস্থা করা। উদাহরণস্বরূপ, যে-কোন একটি বিজ্ঞানশাখা—যথা রসায়নশাস্ত্রের কথা ধরা যাইতে পারে। মনে করুন, এমন একটি মূল উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেল, যাহা হইতে অন্যান্য উপাদানগুলি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তখনই বিজ্ঞান-হিসাবে রসায়নশাস্ত্র চরম উৎকর্ষ লাভ করিবে। তারপর বাকী থাকিবে প্রতিদিন ঐ মূল উপাদানটির নব নব সংযোগ আবিষ্কার করা এবং জীবনের প্রয়োজনে ঐ যৌগিক পদার্থগুলি প্রয়োগ করা। ধর্ম সম্বন্ধেও সেই কথা। ধর্মের মহান্ তত্ত্বসমূহ, উহার কার্যক্ষেত্র ও পরিকল্পনা সেই স্মরণাতীত যুগেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যে-যুগে জ্ঞানের চরম এবং পরম বাণী বলিয়া কথিত—বেদের সেই 'সোঽহম্' তত্ত্বটি মানুষ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর মধ্যে এই সমগ্র জড়জগৎ ও মনোজগৎ সমন্বিত, ইঁহাকে কেহ ঈশ্বর, কেহ ব্রহ্ম, কেহ আল্লা, কেহ জিহোবা অথবা অন্য কোন নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই মহান্ তত্ত্ব আমাদের জন্য পূর্বেই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে; ইহার বাহিরে যাওয়া আমাদের সাধ্য নাই। আমাদের কর্মে, আমাদের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে উহাকে সার্থক করিতে হইবে, পূর্ণ করিতে হইবে। এখন আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে—যেন আমরা প্রত্যেকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হইতে পারি। আমাদের সম্মুখে বিরাট কাজ।

প্রাচীনকালে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের তাৎপর্য অনেকে উপলব্ধি করিতে পারিত না। সে-কালে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করা হইত। তাহারা মনে করিত, প্রবল ইচ্ছাশক্তি বা তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে কোন ব্যক্তি উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হইতেন। আধুনিক কালে আমরা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত যে, এই জ্ঞান প্রত্যেক জীবের—সে যে-ই হউক বা যেখানেই বাস করুক—জন্মগত অধিকার এই জগতে আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া কিছু নাই। যে-ব্যক্তি আকস্মিকভাবে কিছু লাভ করিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, সেও ইহা পাইবার জন্য যুগযুগব্যাপী ধীর ও অব্যাহত তপস্যা করিয়াছে। সমগ্র প্রশ্নটি আমাদের উপর নির্ভর করে; আমরা কি সত্যই ঋষি বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হইতে চাই? যদি চাই, তবে অবশ্যই আমরা তাহা হইব।

প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ গড়িবার এই বিরাট কাজ আমাদের সম্মুখে বর্তমান। জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, জগতের প্রধান ধর্মগুলি এই

মহৎ উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া যাইতেছে। পার্থক্য শুধু এই যে, দেখিবে বহু ধর্মমত ঘোষণা করে: আধ্যাত্মিক সত্যের এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি এ-জীবনে হইবার নয়, মৃত্যুর পর অন্য জগতে এক সময় আসিবে, যখন সে সত্য দর্শন করিবে, এখন তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা এ-সব কথা বলে, তাহাদিগকে বেদান্ত জিজ্ঞাসা করে: অবস্থা যদি বাস্তবিক এইরূপই হয়, তবে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রমাণ কোথায়? উত্তরে তাহাদের বলিতে হইবে সর্বকালেই কতগুলি বিশিষ্ট মানুষ থাকিবেন, যাঁহারা এ জীবনেই সেই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত বস্তুসমূহের আভাস পাইয়াছেন।

অবশ্য ইহাতেও সমস্যার সমাধান হইবে না। যদি ঐ-সকল ব্যক্তি অসাধারণই হইয়া থাকেন, যদি অকস্মাৎই তাঁহাদের মধ্যে ঐ শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিবার অধিকার আমাদের নাই। যাহা দৈবাৎ-লব্ধ তাহা বিশ্বাস করাও আমাদের পক্ষে পাপ, কারণ আমরা তাহা জানিতে পারি না। জ্ঞান কাহাকে বলে? জ্ঞানের অর্থ—বিশেষত্ব বা অদ্ভুতত্বের বিনাশ। মনে করুন, একটি বালক রাস্তায় বা কোন পশু-প্রদর্শনীতে গিয়া অদ্ভুত আকৃতির একটি জন্তু দেখিতে পাইল। সেই জন্তুটি কি—সে চিনিতে পারিল না। তারপর সে এমন এক দেশে গেল, যেখানে ঐ-জাতীয় জন্তু অসংখ্য রহিয়াছে। তখন সে উহাদিগকে একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্তু বলিয়া বুঝিল এবং সন্তুষ্ট হইল। তখন মূল তত্ত্বটি জানার নামই হইল জ্ঞান। তত্ত্ব-বর্জিত কোন একটি বস্তুবিশেষের যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞান নয়। মূল সত্যটি হইতে বিচ্ছিন্ন কোন একটি বিষয়, অথবা অল্প কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমরা যখন জ্ঞান লাভ করি, তখন আমাদের জ্ঞান হয় না, আমরা অজ্ঞানই থাকি। অতএব যদি এই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ বিশেষ ধরনের ব্যক্তিই হইয়া থাকেন, যদি সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে যে-জ্ঞান, তাহা লাভ করিবার অধিকার শুধু তাঁহাদেরই হইয়া থাকে এবং অন্য কাহারও না থাকে, তবে তাঁহা-দিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। কারণ তাঁহারা বিশেষ ধরনের দৃষ্টান্ত মাত্র, মূলতত্ত্বের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক নাই। আমরা নিজেরা যদি প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হই, তবেই আমরা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারিব।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমুদ্র-নাগিনী সম্পর্কে নানা কৌতুকাবহ ঘটনার কথা তোমরা শুনিয়াছ। এরূপ কেন হইবে? কারণ দীর্ঘকাল অন্তর কয়েক-

জন মানুষ আসিয়া লোকসমাজে ঐ সমুদ্র-নাগিনীদের কাহিনী প্রচার করেন, অথচ অন্য কেহ কখনও উহাদিগকে দেখে নাই। তাহাদের উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ তত্ত্ব নাই; কাজেই জগৎ উহা বিশ্বাস করে না। বস্তুতঃ ঐ-সকল কাহিনীর পশ্চাতে কোন শাশ্বত সত্য নাই বলিয়াই জগৎ উহা বিশ্বাস করে না। যদি কেহ আমার সম্মুখে আসিয়া বলে যে, একজন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ তাঁহার স্থূলশরীর সহ অকস্মাৎ ব্যোমপথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন, তাহা হইলে সেই অসাধারণ ব্যাপারটি দর্শন করিবার অধিকার আমার আছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি—'তোমার পিতা কিংবা পিতামহ কি দৃশ্যটি দেখিয়াছিলেন?' সে উত্তরে বলে, 'না, তাঁহারা কেহই দেখেন নাই, কিন্তু পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।'—এবং ঐরূপ ঘটনা যদি আমি বিশ্বাস না করি, তবে অনন্তকালের জন্য আমাকে নরকে দগ্ধ হইতে হইবে।

এ কী কুসংস্কার! আর ইহারই ফলে মানুষ তাহার দেব-স্বভাব হইতে পশু-স্বভাবে অবনত হইতেছে। যদি আমাদিগকে সব কিছু অন্ধভাবেই বিশ্বাস করিতে হয়, তবে বিচারবুদ্ধি আমরা লাভ করিয়াছি কেন? যুক্তি-বিরোধী কোন কিছু বিশ্বাস করা কি মহাপাপ নয়? ঈশ্বর যে উৎকৃষ্ট সম্পদটি আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাহা যথাযথভাবে ব্যবহার না করিবার কী অধিকার আমাদের আছে? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরদত্ত শক্তির ব্যবহারে অক্ষম অন্ধবিশ্বাসী অপেক্ষা যুক্তিবাদী অবিশ্বাসীকে ভগবান্ সহজে ক্ষমা করিবেন। অন্ধবিশ্বাসী শুধু নিজের প্রকৃতিকে অবনমিত করে এবং পশুস্তরে অধঃপতিত হয়—বুদ্ধিনাশের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যুক্তিবিচারের আশ্রয় আমরা অবশ্য গ্রহণ করিব এবং সকল দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত এই-সকল ঈশ্বরের দূত বা মহাপুরুষের কাহিনীকে যখন যুক্তিসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিব, তখন আমরা তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিব। যখন আমাদের মধ্যেও তাঁহাদের মতো প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে দেখিতে পাইব, তখনই তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিব। তখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা বিচিত্র ধরনের কোন জীব নন, পরন্তু কতকগুলি তত্ত্বের জীবন্ত উদাহরণ মাত্র। জীবনে তাঁহারা তপস্যা করিয়াছেন, কর্ম করিয়াছেন, ফলে ঐ নীতি বা তত্ত্ব স্বতই তাঁহাদের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমাদিগকেও ঐ অবস্থা লাভ করিতে হইলে অবশ্য কর্ম করিতে হইবে। যখন আমরা প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হইব, তখনই আমরা তাঁহাকে

চিনিতে পারিব। তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন, ইন্দ্রিয়ের পরিধি অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় সত্য দর্শন করিতেন—এ-সকল কথা আমরা তখনই বিশ্বাস করিব, যখন ঐরূপ অবস্থা নিজেরা লাভ করিতে সমর্থ হইব, তৎপূর্বে নয়।

বেদান্তের ইহাই একমাত্র মূলনীতি। বেদান্ত ঘোষণা করেন যে, প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত উপলব্ধিই ধর্মের প্রাণ; কারণ ইহকাল ও পরকাল, জন্ম ও মৃত্যু, ইহলোক ও পরলোকের প্রশ্ন, সবই সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রশ্ন মাত্র। কাল অনন্ত, মানুষ তাহাকে খণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সামান্য প্রাকৃতিক পরিবর্তন ভিন্ন দশ ঘটিকা এবং বার ঘটিকা সময়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কালপ্রবাহ অন্তহীন গতিতে চলিয়াছে। সুতরাং এই জীবন বা জীবনান্তরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উহা সময়ের প্রশ্ন মাত্র এবং সময়ের হিসাবে যেটুকু ক্ষতি হয়, কর্মের গতিবৃদ্ধিতে তাহার পূরণ হইয়া থাকে। অতএব বেদান্ত ঘোষণা করিতেছেন—ধর্ম বর্তমানেই উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তোমাকে ধার্মিক হইতে হইলে সংস্কারমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন মন লইয়া কঠোর শ্রমের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে, তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রত্যেকটি বিষয় স্বয়ং দর্শন করিতে হইবে; তাহা হইলেই যথার্থ ধর্মলাভ করিবে। ইহার পূর্বে তুমি নাস্তিক ছাড়া আর কিছু নও, অথবা নাস্তিক অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কারণ নাস্তিক তবু ভাল, কারণ সে অকপট। অকপট ভাবেই সে বলে, 'আমি এ-সকল জানি না।' আর অপর সকলে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজেদের জাহির করিয়া বলে, 'আমরা অতি ধার্মিক।' কেহ জানে না, তাহার ধর্ম কি, কারণ প্রত্যেকে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র কতকগুলি আজগবি কাহিনী গলাধঃকরণ করিয়াছে, পুরোহিতরা সেইগুলি বিশ্বাস করিতে তাহাদিগকে বলিয়াছে; না করিলে তাহাদের উদ্ধার নাই। যুগে যুগে এই ধারাই চলিয়া আসিতেছে।

ধর্মের প্রত্যক্ষানুভূতিই একমাত্র পথ। আমাদের প্রত্যেককেই সেই-পথটি আবিষ্কার করিতে হইবে। প্রশ্ন উঠিবে, বাইবেল-প্রমুখ শাস্ত্রসমূহের তবে মূল্য কি? শাস্ত্রগুলির মূল্য অবশ্য যথেষ্টই আছে, যেমন কোন দেশকে জানিতে হইলে তাহার মানচিত্রের প্রয়োজন। ইংলণ্ডে আসিবার পূর্বে আমি ইংলণ্ডের মানচিত্র অসংখ্যবার দেখিয়াছি। ইংলণ্ড সম্বন্ধে মোটা-মুটি একটি ধারণা পাইতে মানচিত্র আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তথাপি

যখন এদেশে আসিলাম, তখন বুঝিলাম মানচিত্রে ও বাস্তব দেশে কত প্রভেদ! উপলব্ধি এবং শাস্ত্রের মধ্যেও তেমনি পার্থক্য। শাস্ত্রগুলি মানচিত্র মাত্র—এগুলি অতীত মহাপুরুষগণের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা। এগুলি আমাদিগকে একই ভাবে একই অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিলাভে সাহস দেয় ও অনুপ্রাণিত করে।

বেদান্তের প্রথম তত্ত্ব এই—অনুভূতিই ধর্ম; অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিই ধার্মিক, অনুভূতিহীন ব্যক্তিতে ও নাস্তিকে কোন পার্থক্য নাই। বরং নাস্তিক ভাল, কারণ সে নিজের অজ্ঞতা অকপটে স্বীকার করে। আবার ধর্মশাস্ত্রসমূহ ধর্মানুভূতিলাভে প্রভূত সাহায্য করে। এগুলি শুধু আমাদের পথ-প্রদর্শক নয়, পরন্তু আমাদিগকে সাধনপ্রণালীর উপদেশ দেয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব অনুসন্ধান-প্রণালী আছে। এ-জগতে এমন বহুলোক আছেন, যাঁহারা বলেন, 'আমি ধার্মিক হইতে চাহিয়াছিলাম, সত্য উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু পারি নাই; সুতরাং আমি কিছু বিশ্বাস করি না।' শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে। বহু লোক তোমাকে বলিবে, 'আমি ধার্মিক হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আজীবন দেখিয়াছি, উহার মধ্যে কিছু নাই।' আবার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপার দেখিবে: মনে কর, একজন রাসায়নিক—বড় বৈজ্ঞানিক তোমার নিকট আসিয়া রসায়নশাস্ত্রের কথা বলিলেন। যদি তুমি তাঁহাকে বলো, 'আমি রসায়নবিদ্যার কিছুই বিশ্বাস করি না, কারণ আজীবন রাসায়নিক হইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু উহার মধ্যে কিছুই পাই নাই।' তখন বৈজ্ঞানিক তোমাকে প্রশ্ন করিবেন, 'কখন তুমি ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলে?' তুমি বলিবে, 'যখন ঘুমাইতে যাইতাম, তখন পুনঃ পুনঃ এই কথা উচ্চারণ করিতাম—হে রসায়নশাস্ত্র, আমার নিকট এসো। কিন্তু সে কখনও আসে নাই।' উহাও ঠিক তেমনি। উত্তরে বৈজ্ঞানিক হাস্য করিবেন এবং বলিবেন, 'না, উহা যথার্থ প্রণালী নয়। কেন তুমি পরীক্ষাগারে গিয়া ক্ষাররস, অম্লরস প্রভৃতি মিশাইয়া দিনের পর দিন গবেষণায় তোমার হাত পোড়াও নাই? ঐ প্রণালীতেই তুমি ধীরে ধীরে রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতে।' ধর্ম সম্বন্ধে ঐরূপ শ্রম স্বীকার করিতে কি প্রস্তুত আছ? প্রত্যেক বিজ্ঞানশাখারই যেমন শিক্ষার একটি বিশিষ্ট প্রণালী আছে, ধর্মানুশীলনেরও সেরূপ আছে। ধর্মেরও নিজস্ব পদ্ধতি আছে। এই বিষয়ে পৃথিবীর প্রাচীন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষগণের, যাঁহারা ধর্ম উপলব্ধি

করিয়াছেন এবং কিছু লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অবশ্য আমরা ধর্মলাভের কোন-না কোন শিক্ষা পাইতে পারি এবং পাইব। তাঁহারা আমাদিগকে ধর্মের বিবিধ প্রণালী, বিশেষ পদ্ধতি শিখাইবেন, এবং এগুলির সাহায্যেই আমরা ধর্মের নিগূঢ় সত্যসমূহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। তাঁহারা আজীবন সাধনা করিয়াছেন, মনকে সূক্ষ্মতম অনুভূতির উপযোগী করিয়া মানসিক উৎকর্ষের বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই সূক্ষ্মানুভূতির সহায়তায় ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। ধার্মিক হইতে হইলে, ধর্মকে উপলব্ধি ও অনুভব করিতে হইলে, প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হইতে হইলে তাঁহাদের প্রদর্শিত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী সাধন করিতে হইবে। তারপরও যদি কিছু না পাওয়া যায়, তখন অবশ্য এ-কথা বলিবার অধিকার আমাদের হইবে, 'ধর্মের মধ্যে কিছুই নাই, কারণ আমি পরীক্ষা করিয়াছি এবং বিফল হইয়াছি।'

ইহাই সকল ধর্মের ব্যাবহারিক দিক। জগতের সকল ধর্মগ্রন্থেই ইহা পাইবে। কতকগুলি মত ও নীতিকথাই ধর্ম শিক্ষা দেয় না, পরন্তু মহাপুরুষদের জীবনে ধর্মের আচরণ বা তপস্যা দেখিতে পাও। যে-সকল আচার-আচরণের বিষয় হয়তো শাস্ত্রে পরিষ্কারভাবে লিখিত নাই, সেগুলিও এই-সকল মহাপুরুষের প্রাত্যহিক জীবনে—আহারে ও বিহারে প্রতিপালিত এবং অনুসৃত হয় দেখিতে পাইবে। মহাপুরুষদের সমগ্র জীবন, আচরণ, কর্ম-পদ্ধতি প্রভৃতি সব কিছুই জনসাধারণের জীবনধারা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেইজন্যই তাঁহারা উচ্চতর জ্ঞান ও ভগবদ্দর্শনের অধিকার লাভ করিয়াছেন। আর আমরাও যদি ঐরূপ দর্শন লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকেও অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তপস্যা ও অভ্যাস-যোগের দ্বারাই আমরা ঐরূপ অবস্থায় উন্নীত হইতে পারিব। সুতরাং বেদান্তের পদ্ধতি এই: প্রথমে ধর্মের মূলনীতিগুলি নির্ধারিত করিতে হয়, লক্ষ্যবস্তুটি চিহ্নিত করিতে হয়, তারপর যে-প্রণালী সহায়ে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, সেই নীতি শিখিতে হয়, বুঝিতে হয় এবং উপলব্ধি করিতে হয়।

আবার এ-সকল প্রণালীও বহুমুখী হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রকৃতি পরস্পর হইতে এত স্বতন্ত্র যে, একই প্রণালী আমাদের একাধিক ব্যক্তির পক্ষে ক্বচিৎ সমভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের রুচি ও প্রকৃতি

পৃথক্, সুতরাং প্রণালীও ভিন্ন হওয়া উচিত। দেখিবে কেহ কেহ অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, কেহ কেহ দার্শনিক ও যুক্তিবাদী; কেহ কেহ আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনার পক্ষপাতী—স্থূলবস্তুর সহায়তা পাইতে চান। আবার দেখিবে, কেহ কেহ কোনপ্রকার রূপ, মূর্তি বা পূজা-অনুষ্ঠান পছন্দ করে না, ঐসব তাহাদের পক্ষে মৃত্যুতুল্য। আবার আর একজন একবোঝা তাবিজ, কবচ সারা শরীরে ধারণ করে; সে এই-সকল প্রতীকের প্রতি এত অনুরাগী! আর একজন ভাবপ্রবণ ব্যক্তি দানধ্যানের পক্ষপাতী; সে কাঁদে, ভালবাসে, আরও কত প্রকারে অন্তরের ভাব ব্যক্ত করে। অতএব এই-সকল ব্যক্তির জন্য কখনও একই প্রণালী উপযোগী হইতে পারে না। যদি ধর্মজগতে সত্য-লাভের জন্য একটি মাত্র পথ নির্দিষ্ট থাকিত, তবে ঐ পথ যাহাদের উপযোগী নয়, তাহাদের পক্ষে মহা অনিষ্টের কারণ হইত, মৃত্যুতুল্য হইত। সুতরাং সাধনপ্রণালী বিভিন্ন হইবে। বেদান্ত সেইজন্য রুচির বৈচিত্র্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পথের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তদনুযায়ী নির্দেশ দিয়া থাকেন। তোমার রুচি অনুযায়ী যে-কোন একটি পথ গ্রহণ কর। একটি তোমার উপযোগী না হইলে অন্য একটি হয়তো উপযোগী হইবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে আমরা দেখি যে, জগতে প্রচলিত একাধিক ধর্ম আমাদের পক্ষে কত গৌরবের বিষয়! বহুলোকের ইচ্ছানুযায়ী মাত্র একজন আচার্য ও প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ না হইয়া বহু ধর্মগুরুর আবির্ভাব কত কল্যাণকর! মুসলমানগণ সমস্ত পৃথিবীকে ইসলামধর্মে, খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টধর্মে এবং বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিতে চান; কিন্তু বেদান্তের ঘোষণা এই: জগতের প্রত্যেকটি নরনারী নিজ নিজ পৃথক্ মতে বিশ্বাসী হউক। মতগুলির পশ্চাতে একই তত্ত্ব, একই একত্ব বিদ্যমান। যত অধিক সংখ্যায় প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, যত বেশী শাস্ত্র থাকিবে, যত বেশী মন্ত্রদ্রষ্টা থাকিবেন, যত মত ও পথ থাকিবে, জগতের পক্ষে ততই মঙ্গল।

যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজে যত বেশী বৃত্তির সংস্থান থাকে, জনসাধারণের পক্ষে তত অধিক পরিমাণে কর্মলাভের সুযোগ হয়, ভাবজগতে এবং কর্মজগতেও সেরূপ হইয়া থাকে। বর্তমানকালে বিজ্ঞানের বহুমুখী বিকাশ হওয়াতে মানসিক উৎকর্ষের কী বহুবিধ সুযোগ মানুষের সম্মুখে

উপস্থিত হইয়াছে! জাগতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন এবং রুচি অনুসারে নানা সামগ্রী আয়ত্তের মধ্যে পাইলে মানুষের পক্ষে কত বেশী সুবিধা হয়! ধর্ম-জগতেও সেইরূপ। ইহা ভগবানেরই এক মহিমময় বিধান যে, জগতে বহু ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছে। প্রার্থনা করি, এই ধর্মমতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হউক এবং কালক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সংস্কার অনুযায়ী স্বতন্ত্র ধর্মমতের অনুবর্তী হইবার সুযোগ লাভ করুক।

বেদান্ত এই নিগূঢ় প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া এক সত্য প্রচার করেন এবং একাধিক সাধনপ্রণালী স্বীকার করেন। তুমি খ্রীষ্টান বৌদ্ধ ইহুদী বা হিন্দু হও না কেন, যে-কোন পুরাণশাস্ত্রে বিশ্বাসী হওনা কেন, ন্যাজারেথের ঈশদূত, মক্কার প্রেরিতপুরুষ মহম্মদ, ভারতের বা অন্য কোন স্থানের অবতার ও প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের প্রতি আনুগত্য স্বীকার কর না কেন, তুমি নিজেই একজন সত্যদ্রষ্টা হও না কেন, বেদান্ত এ সম্বন্ধে কিছুই বলিবে না। বেদান্ত শুধু সেই শাশ্বত নীতি প্রচার করেন, যাহা সকল ধর্মের ভিত্তি এবং যাহার জীবন্ত উদাহরণ ও প্রকাশরূপে অবতারপুরুষ ও মুনি-ঋষিগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হন। তাঁহাদের সংখ্যা যতই বর্ধিত হউক, তাহাতে বেদান্ত কোন আপত্তি উত্থাপন করিবে না। বেদান্ত শুধু তত্ত্বটি প্রচার করে এবং সাধনপ্রণালী তোমার উপর ছাড়িয়া দেয়। যে-কোন পথ অনুসরণ কর, যে-কোন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের অনুগামী হও—তাহাতে কিছু আসে যায় না। শুধু লক্ষ্য রাখিও সাধনপথটি যেন তোমার সংস্কার অনুযায়ী হয়, তাহা হইলেই তোমার উন্নতি নিশ্চিত।

ভারতীয় ধর্মচিন্তা

আমেরিকার ব্রুকলীন শহরে ক্লিণ্টন অ্যাভেন্যু-এর উপর অবস্থিত পাউচ ম্যানসনে আর্ট-গ্যালারী কক্ষে ব্রুকলীন এথিক্যাল সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

ভারতবর্ষ আকারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক হইলেও তাহার জনসংখ্যা উনত্রিশ কোটি; এবং অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান, বৌদ্ধ[১] এবং হিন্দু এই তিনটি ধর্মমতের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছয় কোটি, দ্বিতীয়টির সংখ্যা নব্বই লক্ষ এবং প্রায় বিশ কোটি ষাট লক্ষ নরনারী শেষোক্ত ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহা ধ্যানাশ্রয়ী ও তত্ত্বচিন্তাশ্রয়ী দার্শনিক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বেদের নানাখণ্ডে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার উপর স্থাপিত। এই বেদ দাবি করেন যে, দেশের দিক হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড অসীম এবং কালের দিক হইতে উহা অনন্ত। ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই। জড়জগতে আত্মার শক্তির, সান্তের উপর অনন্ত শক্তির অসংখ্য বিকাশ ও প্রভাব ঘটিয়াছে; তথাপি অনন্ত অপরিমেয় আত্মা স্বয়ম্ভু, শাশ্বত ও চির-অপরিবর্তনীয়। অনন্তের বক্ষে কালের গতি কোনরূপ চিহ্নই অঙ্কিত করিতে পারে না। মানবীয় বুদ্ধির অগম্য ইহার অতীন্দ্রিয় স্তরে অতীত বলিয়া কিছু নাই, ভবিষ্যৎ বলিয়াও কিছু নাই। বেদ প্রচার করেন, মানবাত্মা অবিনশ্বর। শরীর ক্ষয়-বৃদ্ধির নিয়মের অধীন—যাহারই বৃদ্ধি আছে, তাহারই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রত্যগাত্মার সম্পর্ক অন্তহীন শাশ্বত জীবনের সহিত; ইহার কোনদিন আদি ছিল না, আবার কোনদিন অন্তও হইবে না। হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্য এই যে, খ্রীষ্টধর্মের মতে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের মুহূর্তকেই প্রত্যেক মানবাত্মার আরম্ভকাল ধরা হয়; কিন্তু হিন্দুধর্ম দাবি করে যে, মানবের আত্মা সনাতন ঐশী সত্তারই বহিঃপ্রকাশ এবং ঈশ্বরের যেমন আদি নাই, আত্মারও তেমনি আদি নাই। এক ব্যক্তিত্ব হইতে অপর ব্যক্তিত্বে নিরন্তর গমনাগমনের পথে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের

১ জৈন সমেত

মহান্ নিয়মানুসারে অগণিত রূপ পাইয়াছে এবং পূর্ণতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রকার রূপ পাইতে থাকিবে; তারপর আর পরিবর্তন ঘটিবে না।

এ-সম্পর্কে এই প্রশ্ন প্রায়ই করা হয় যে, তাই যদি সত্য হয়, তবে অতীত জীবনসমূহের কিছুই কেন আমরা স্মরণ করিতে পারি না? আমাদের উত্তর এই যে, আমরা মানস মহাসমুদ্রের শুধু উপরিভাগের নাম দিয়াছি 'চেতনা', কিন্তু তাহার অতল গভীরে সঞ্চিত আছে আমাদের সর্বপ্রকার সুখ-দুঃখময় অভিজ্ঞতা। মানবাত্মা এমন কিছু পাইবার জন্যই লালায়িত, যাহা চিরস্থায়ী। কিন্তু আমাদের মন ও শরীর—বস্তুতঃ এই দৃশ্যমান বিশ্ব-প্রপঞ্চের সবকিছুই নিরন্তর পরিবর্তনশীল। অথচ আমাদের আত্মার তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা এমন কিছুর জন্য, যাহার পরিবর্তন নাই, যাহা চিরকালের জন্য পরিপূর্ণতায় স্থিতি লাভ করিয়াছে। অসীম ভূমারই জন্য মানবাত্মার এই তৃষ্ণা। আমাদের নৈতিক উন্নতি যত গভীর হইবে, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ যত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইবে, এই কূটস্থ নিত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষাও ততই তীব্র হইবে।

আধুনিক বৌদ্ধেরা এই শিক্ষা দেন, যাহা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, তাহার অস্তিত্বই সম্ভব নয় এবং মানবাত্মার কোন স্বতন্ত্র সত্তা আছে—এ-বিশ্বাস ভ্রম মাত্র। অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদীরা (Idealist) দাবি করেন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র সত্তা আছে, এবং তাহার মনোজগতের ধারণার বাহিরে বহির্বিশ্বের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। এই দ্বন্দ্বের নিশ্চিত সমাধান এই যে, বস্তুতঃ বিশ্ব-প্রপঞ্চ স্বাতন্ত্র্য ও পরতন্ত্রতার—বস্তু ও ধারণার সংমিশ্রণ। আমাদের দেহ-মন বহির্জগতের উপর নির্ভরশীল এবং বহির্জগতের সহিত দেহমনের সম্বন্ধের অবস্থানুযায়ী এই নির্ভরশীলতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর যেমন স্বাধীন, প্রত্যগাত্মাও তেমনি মুক্ত, এবং শরীর ও মনের বিকাশ অনুযায়ী তাহাদের গতিকেও অল্পাধিক নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ।

মৃত্যু বলিতে অবস্থার পরিবর্তন মাত্রই বুঝায়। আমরা সেই একই বিশ্বের মধ্যে থাকিয়া যাই এবং পূর্বের মতো সেই একই নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকি। এই বিশ্বকে যাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন, জ্ঞান ও সৌন্দর্য বিকাশের উচ্চতর লোকে যাঁহারা উপনীত, তাঁহারা তাঁহাদেরই অনুগামী বিশ্বব্যাপী সৈন্যবর্গের অগ্রগামী দল ভিন্ন আর কিছুই নন। এইরূপে সর্বোত্তম বিকাশপ্রাপ্ত আত্মা

সর্বনিম্ন অনুন্নত আত্মার সহিত সম্বন্ধ এবং অসীম পূর্ণতার বীজ সকলের মধ্যেই নিহিত আছে। অতএব আমাদের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুশীলন করিতে হইবে এবং সকলের মধ্যেই যাহা কিছু উত্তম নিহিত আছে, তাহাই দেখিবার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। বসিয়া বসিয়া শুধু আমাদের শরীর-মনের অপূর্ণতা লইয়া বিলাপ করিলে কোন লাভ হইবে না। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে দমন করিবার জন্য যে বীরোচিত প্রচেষ্টা, তাহাই আমাদের আত্মাকে উন্নতির পথে চালিত করে। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিক উন্নতির নিয়মগুলিকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করা। খ্রীষ্টানরা এ-বিষয়ে হিন্দুদের নিকট হইতে শিখিতে পারে। হিন্দুরাও খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে শিখিতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে মূল্যবান্ অবদান রহিয়াছে।

আপনারা সন্তান-সন্ততিদের এই শিক্ষাই দিন যে, প্রকৃত ধর্ম ইতিমূলক সৎ বস্তু, নেতিমূলক নয়; এই শিক্ষা দিন যে, শুধু পাপ হইতে বিরত থাকাই ধর্ম নয়, নিরন্তর মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম। প্রকৃত ধর্ম কোন মানুষের নিকট হইতে শিক্ষাদ্বারা প্রাপ্য নয়, পুস্তকপাঠের দ্বারাও লভ্য নয়; প্রকৃত ধর্ম হইল অন্তরাত্মার জাগরণ এবং এই জাগরণ বীরোচিত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা সংঘটিত হয়। এই পৃথিবীতে জাত প্রত্যেক শিশুই পূর্ব পূর্ব অতীত জীবন হইতে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে; এই-সকল সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট চিহ্ন তাহাদের দেহ-মনের গঠনে লক্ষিত হয়। কিন্তু আমাদের সকলের মধ্যেই যে একপ্রকার স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, শরীর ও মন ব্যতীত আরও কিছু আমাদের মধ্যে বিরাজমান। আমাদের সকলের অন্তরে যে-আত্মা আধিপত্য করে, তাহা স্বাধীন এবং তাহাই আমাদের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়। আমরা নিজেরা যদি মুক্ত না হই, তাহা হইলে এই পৃথিবীর উন্নতিসাধনের আশা কিরূপে করি? আমরা বিশ্বাস করি যে, মানবের প্রগতি আত্মার কার্যকলাপের ফলেই সম্ভব হয়। এই পৃথিবী যাহা এবং আমরা যাহা, তাহা আত্মার মুক্তস্বভাবেরই ফল।

আমাদের বিশ্বাস—ঈশ্বর এক। তিনি আমাদের সকলের পিতা, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান্ এবং তিনি তাঁহার সন্তানদের অসীম ভালবাসার সহিত পরিচালন ও পরিপালন করেন। আমরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ন্যায় সগুণ

ঈশ্বরে বিশ্বাস করি; কিন্তু সেখানেই ক্ষান্ত নই, আমরা আরও অগ্রসর হইয়া বলি যে, আমিই সেই ঈশ্বর; আমরা বলি যে, তাঁহারই ব্যক্তিত্ব আমাদের মধ্যে বিকশিত, আমাদের অন্তরে তিনিই বাস করেন এবং আমরা তাঁহাতেই অবস্থিত। আমরা বিশ্বাস করি, সকল ধর্মেই কিছু না কিছু সত্যের বীজ নিহিত আছে, এবং হিন্দুগণ সকল ধর্মের নিকটই শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করেন; কারণ এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে ক্রমবৃদ্ধির নিয়মেই সত্য লাভ হয়, অবিরাম বাদ দেওয়ার নিয়মে নয়। আমরা ভগবানের চরণে সকল ধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরাশি দ্বারা সজ্জিত একটি স্তবক নিবেদন করিব। আমরা তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসিব, কোন কিছু লাভের আশায় নয়। আমরা কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করিব, কোন পুরস্কারের প্রত্যাশায় নয়। আমরা সৌন্দর্যের জন্যই সৌন্দর্যের উপাসনা করিব, লাভের আকাঙ্ক্ষায় নয়। এইরূপে চিত্তের পবিত্রতা লইয়াই আমরা ভগবানের দর্শন পাইব। যাগ-যজ্ঞ, মুদ্রা ও ন্যাস, মন্ত্রোচ্চারণ বা মন্ত্রজপ প্রভৃতিকে ধর্ম বলা চলে না। এ-সকল তখনই প্রশংসনীয়, যখন সেগুলি আমাদের মনে সাহসের সহিত সুন্দর ও বীরোচিত কর্ম সম্পাদনের জন্য উৎসাহ সঞ্চার করে এবং আমাদের চিত্তকে ভগবানের পূর্ণতা উপলব্ধি করিবার স্তরে উন্নীত করে।

যদি প্রতিদিন শুধু প্রার্থনাকালে স্বীকার করি যে, ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক মানুষের সহিত ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার না করি, তাহা হইলে কি লাভ? পুস্তক-রচনার উদ্দেশ্য শুধু আমাদের জন্য উচ্চতর জীবনের পথ নির্দেশ করা। কিন্তু কোন শুভ ফলই আসিবে না, যদি না অবিচলিত পদে সেই পথে আমরা চলিতে পারি। প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিত্বকে একটি কাঁচের গোলকের সঙ্গে তুলনা করিতে পারা যায়। প্রত্যেকটির কেন্দ্র একই শুভ্র জ্যোতি, ঐশী সত্তার একইরূপ বিচ্ছুরণ; কিন্তু কাঁচের আবরণের বর্ণ ও ঘনত্বের পার্থক্যে রশ্মি-নিঃসরণে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা ঘটিতেছে। কেন্দ্রে অবস্থিত শিখাটির দীপ্তি ও সৌন্দর্য সমান, কিন্তু যে জাগতিক যন্ত্রের মাধ্যমে তাহার প্রকাশ হয়, কেবল তাহারই অপূর্ণতাবশতঃ তারতম্যের প্রতীতি ঘটে। বিকাশের মানদণ্ড অনুসারে আমরা যতই উচ্চে আরোহণ করিতে থাকিব, ততই প্রকাশযন্ত্র স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর হইতে থাকিবে।

কল্পকালীন স্থিতি ও পরিবর্তন

প্রথমবার আমেরিকায় অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে লিখিত।

জগতের সমতা নষ্ট হইয়াছে; বিনষ্ট সাম্যাবস্থার দৃষ্টান্ত এই সমগ্র বিশ্ব। জগতের সব গতিকেই এই সাম্যাবস্থা ফিরিয়া পাইবার প্রয়াস বলা যায়; সেজন্য ইহাকে 'গতি' আখ্যা দেওয়া চলে না। অন্তর্জগতের সাম্যাবস্থা এমন একটি জিনিস, যাহা আমাদের চিন্তার অতীত; কারণ চিন্তা নিজেই গতি-বিশেষ। প্রসার মানে পূর্ণ সমতার দিকে অগ্রসর হওয়া; আর সমগ্র জগৎ সেইদিকেই ধাবমান। কাজেই পূর্ণসাম্যাবস্থা কখনই লাভ করা যায় না— এ-কথা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। সাম্যাবস্থায় কোনরূপ বৈচিত্র্য থাকা অসম্ভব, উহাকে বৈচিত্র্যহীন হইতেই হইবে। কারণ যতক্ষণ মাত্র দুটি পরমাণুও থাকিবে, ততক্ষণ উহারা পরস্পরকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিয়া সাম্যভাব নষ্ট করিবে। সাম্যাবস্থা—একত্ব, স্থিতি ও সাদৃশ্যের অবস্থা। অন্তর্জগতের দিক হইতে এই সাম্যাবস্থা চিন্তাও নয়, শরীরও নয়, এমন কি যাহাকে আমরা গুণ বলি, তাহাও নয়। নিজের স্বরূপ বলিতে যাহা বুঝায়, এ অবস্থায় একমাত্র তাহাই থাকে; ইহাই সৎ-, চিৎ- ও আনন্দ-স্বরূপ।

একই কারণে এই অবস্থা কখনও দুই প্রকার হইতে পারে না। ইহা অদ্বিতীয়। এখানে তুমি-আমি প্রভৃতি সর্ববিধ কৃত্রিম বৈচিত্র্য অন্তর্হিত হইবেই; কারণ বৈচিত্র্য পরিবর্তন বা অভিব্যক্তির অবস্থা, উহা মায়ার অন্তর্গত। অবশ্য বলিতে পারো, আত্মার এই অভিব্যক্ত অবস্থা দেখিয়া আত্মা পূর্বে স্থির ও মুক্ত ছিল, এ-কথা মনে হইলেও বর্তমান ভেদপূর্ণ অবস্থাই উহার প্রকৃত স্বরূপ; যাহা হইতে আত্মা এই পরিবর্তনশীল অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা আত্মার আদিম অপরিণত অবস্থা; সে অবস্থায় আবার ফিরিয়া যাওয়া মানে অধঃপতন। এ-কথা বলিতে পারো বটে, তবে এ-কথার কোন মূল্য বা গুরুত্ব নাই; থাকিত, যদি প্রমাণিত হইত যে, আত্মার একরূপতা ও নানাধর্মিতা নামক অবস্থাপ্রাপ্তি মাত্র একবারই ঘটে। কিন্তু তাহা তো নয়, যাহা একবার ঘটে, বারবার তাহার পুনরাবৃত্তি হইবেই। স্থিতিকে অনুসরণ করে পরিবর্তন—জগৎ। স্থিতির পূর্বে পরিবর্তন নিশ্চয়ই ছিল, এবং পরিবর্তনের

পর স্থিতি আবার আসিবেই ; বারবার এরূপ ঘটিবে। এ-কথা চিন্তা করা হাস্যকর যে, একদা নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি ছিল এবং তার পর নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন আসিয়াছে। প্রকৃতির প্রতিটি কণা দেখাইতেছে যে, ক্রমান্বয়ে স্থিতি ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়া উহা নিয়মিতভাবে চলিতেছে।

দুইটি স্থিতিকালের মধ্যবর্তী ব্যবধানের নাম কল্প। কাল্পিক স্থিতি একটি পূর্ণ সমজাতীয় অবস্থা হইতে পারে না ; হইলে ভাবী বিকাশের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ-কথা বলা অযৌক্তিক যে, বর্তমান পরিবর্তনের অবস্থা পূর্বের স্থিতি অবস্থার তুলনায় উন্নততর ; কারণ তাহা হইলে ভাবী স্থিতি-অবস্থার কাল পূর্ববর্তী পরিবর্তন-অবস্থার কাল অপেক্ষা অধুনাতন হওয়ার জন্য সে অবস্থা পূর্ণতর হইবে ! প্রকৃতি একই রূপ বারেবারে দেখাইতেছে ; নিয়ম বলিতে বস্তুতঃ ইহাই বুঝায়। জীবাত্মাদের বেলা কিন্তু (বিভিন্ন কল্পে ক্রমশঃ) উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে ; অর্থাৎ জীবাত্মারা কল্প হইতে কল্পান্তরে নিজ স্বরূপের অধিকতর নিকটবর্তী হয় ; এভাবে ক্রমোন্নত হইতে হইতে প্রতি কল্পেই অনেক জীবাত্মা মুক্ত হইয়া যায়, আর তাহাদের সংসার-চক্রে আবর্তিত হইতে হয় না।

বলিতে পারো, জীবাত্মা তো জগৎ ও প্রকৃতির অংশ, জগৎ ও প্রকৃতির মতো সেও তো বারবার পুনরাবর্তন করিবে, তাহার মুক্তি হইতে পারে না ; জগতের ধ্বংস না হইলে তাহার মুক্তি হইবে কিরূপে ? উত্তরে বলা যায়, জীবাত্মা মায়ার কল্পনা মাত্র, প্রকৃতির মতো স্বরূপতঃ সে বাস্তব সত্তা, ব্রহ্ম।

জীবাত্মাই নির্বিশেষ-ব্রহ্ম। প্রকৃতির ভিতর যাহা সৎ বস্তু, তাহাই ব্রহ্ম. মায়ার অধ্যাসের জন্য তিনিই এই নানাত্ব বা প্রকৃতি বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। মায়া দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র ; সেজন্য মায়াকে সৎ বলা যাইতে পারে না। তথাপি মায়া এই দৃশ্য-জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। যদি বলো, মায়া নিজে অসৎ হইয়া সৃষ্টি করে কিরূপে ? তাহার উত্তরে বলা যায়—যাহা সৃষ্ট হয়, তাহাও যে অজ্ঞান (অসৎ), কাজেই স্রষ্টা তো অজ্ঞানী (অসৎ) হইবেই। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান সৃষ্ট হইতে পারে কিভাবে ? কাজেই বিদ্যা ও অবিদ্যা— এই দুইরূপে মায়া কার্য করিতেছে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে নাশ করিয়া বিদ্যা নিজেও বিনষ্ট হয়। এভাবে মায়া নিজেকে নিজেই বিনাশ করে ; যাহা বাকি থাকে, তাহাই সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্ম। প্রকৃতির ভিতর যাহা সৎবস্তু, তাহাই

ব্রহ্ম। প্রকৃতি তিনটি রূপে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়—ঈশ্বর, চিৎ বা জীব, এবং অচিৎ বা জড়বস্তু। এ-সবেরই প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্ম। মায়ার ভিতর দিয়া দেখি বলিয়া তিনি নানারূপে প্রতিভাত হন। তবে ঈশ্বর-দর্শন করাই—চরম সত্তাকে ঈশ্বররূপে দর্শন করাই চরম সত্তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়া, এবং ইহাই সর্বোত্তম দর্শন। সগুণ ঈশ্বরের ভাবই মানুষের ভাবের সর্বোচ্চ অবস্থা; প্রকৃতির গুণগুলি যে অর্থে সত্য, ঈশ্বরে আরোপিত গুণগুলিও সেই অর্থে সত্য। তথাপি এ-কথা যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না যাই যে, নির্গুণ ব্রহ্মকে মায়ার ভিতর দিয়া দেখিলে যেরূপ দেখায়, তাহাই সগুণ ঈশ্বর।

বিস্তারের জন্য সংগ্রাম

প্রথমবার আমেরিকায় অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যের প্রশ্নে লিখিত।

আমাদের সর্ববিধ জ্ঞানের ভিতর অনুস্যূত রহিয়াছে সেই প্রাচীন সমস্যা—বীজ বৃক্ষের পূর্বে, না বৃক্ষ বীজের পূর্বে, সত্তার অভিব্যক্তির ক্রমে চৈতন্য প্রথম, না জড় প্রথম ; ভাব প্রথম, না বাহ্য প্রকাশ প্রথম ; মুক্তি আমাদের প্রকৃত স্বরূপ না নিয়মের বন্ধন ; চিন্তা জড়ের স্রষ্টা, না জড় চিন্তার স্রষ্টা ; প্রকৃতিতে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন স্থিতির পূর্বের অবস্থা, না স্থিতির ভাবটি পরিবর্তনের পূর্বের অবস্থা—এই-সব প্রশ্নের সমাধান সমভাবেই দুরূহ। তরঙ্গমালার পর্যায়ক্রমে উত্থান ও পতনের মতো উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলিও অনিবার্য পরম্পরায় একটি আর একটিকে অনুসরণ করে এবং মানুষ তাহার রুচি, শিক্ষা বা মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন না কোন একটি পক্ষ সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা যায় যে, প্রকৃতির বিভিন্ন অংশগুলির ভিতর যে-সঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়—উহা চেতনাত্মক কার্যেরই ফল ; পক্ষান্তরে তর্ক করা যাইতে পারে, চৈতন্যের অস্তিত্ব জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে থাকা সম্ভব নয়, কারণ বিবর্তনের ফলে উহা জড় এবং শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। যদি বলা যায়, প্রতিটি রূপের পশ্চাতে মনে একটি ভাবাদর্শ অবশ্যই থাকিবে, তাহা হইলে সমান জোর দিয়া বলিতে পারা যায়, ভাবাদর্শের সৃষ্টিই হইয়াছিল বহুবিধ বাহ্য অভিজ্ঞতার দ্বারা। একদিকে মুক্তি সম্বন্ধে আমাদের চিরন্তন ধারণার প্রতি আবেদন, অপরদিকে এ ধারণাও রহিয়াছে যে, জগতে কোন কিছুই কারণহীন নয় বলিয়া কি স্থূল, কি মানসিক—সব কিছুই কার্য-কারণ-নিয়মের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। শক্তির দ্বারা উৎপন্ন শরীরের পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার পর যদি স্বীকার করা যায়, চিন্তাই স্পষ্টতঃ এই শরীরের স্রষ্টা, তাহা হইলে ইহাও স্পষ্ট যে, শরীরের পরিবর্তনে চিন্তার পরিবর্তন হয় বলিয়া শরীর নিশ্চয়ই মনের স্রষ্টা। যদি যুক্তি প্রদর্শন করা যায়, সর্বজনীন পরিবর্তন নিশ্চয়ই একটি পূর্ববর্তী স্থিতির ফলস্বরূপ, তাহা হইলে সমান যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যাইবে যে, অপরিবর্তনীয়তার ভাব একটি বিভ্রমজনক

আপেক্ষিক ধারণা মাত্র, গতির তুলনামূলক প্রভেদের দ্বারা ইহার উদ্ভব হইয়াছে।

এইরূপে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমস্ত জ্ঞানই এই বিষচক্রে পর্যবসিত হয়; কার্য ও কারণের অনির্দিষ্ট পরস্পর নির্ভরশীলতাই এই চক্র—ইহার ভিতর কোন্‌টি আগে, কোন্‌টি পরে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যুক্তির নিয়মে বিচার করিলে এই জ্ঞান ভুল; এবং সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত কথা এই যে, এই জ্ঞান ভুল প্রমাণিত হয়, যথার্থ জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া নয়, পরন্তু সেই একই বিষচক্রের উপর নির্ভরশীল নিয়মগুলিরই দ্বারা। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায়, আমাদের সমস্ত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা নিজেই নিজের অপরিপূর্ণতা প্রমাণ করে। আবার আমরা ইহাও বলিতে পারি না যে, এই জ্ঞান মিথ্যা, কারণ যে-সব সত্য আমরা জানি বা চিন্তা করি, সেগুলি এই জ্ঞানের ভিতর রহিয়াছে। আবার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সব কিছুর জন্যই এই জ্ঞান যে যথেষ্ট, এ-কথা অস্বীকার করিতেও পারা যায় না। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ মানবিক জ্ঞানের এই অবস্থার অন্তর্গত এবং ইহাকেই বলা হয় 'মায়া'। ইহা মিথ্যা, কারণ ইহা নিজেই নিজের অশুদ্ধতা প্রমাণ করে। আর এই অর্থে ইহা সত্য যে, ইহা পশু-মানবের সকল প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট।

বহির্জগতে ক্রিয়াকালে মায়া নিজেকে প্রকাশ করে আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তিরূপে এবং অন্তর্জগতে—প্রবৃত্তি- ও নিবৃত্তিরূপে। সমগ্র জগৎ বাহিরের দিকে ধাবিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। প্রতিটি পরমাণু উহার কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট। অন্তর্জগতে প্রতিটি চিন্তা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আবার বহির্জগতে প্রতিটি কণা আর একটি শক্তি—কেন্দ্রাভিগ শক্তি দ্বারা নিরুদ্ধ হইতেছে; এই শক্তি কণাটিকে কেন্দ্রের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সেইরূপ চিন্তাজগতে সংযম-শক্তি এই-সব বহির্মুখী প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতেছে। জড়ের দিকে অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি অর্থাৎ যন্ত্রবৎ চালিত হইবার দিকে ক্রমশঃ নামিয়া যাইবার প্রবৃত্তি পশুমানবের ধর্ম। যখন ইন্দ্রিয়ের বন্ধন রোধ করিবার ইচ্ছা মানুষের হয়, শুধু তখনই তাহার মনে ধর্মের উদয় হয়। এইরূপে আমরা দেখি যে, ধর্মের কার্যক্ষেত্র হইতেছে মানুষকে ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে পড়িতে না দেওয়া এবং মুক্তিলাভের জন্য তাহাকে সাহায্য করা। সেই উদ্দেশ্যে নিবৃত্তি-

শক্তির প্রথম প্রয়াসকে বলা হয় নীতি। সকল নীতির উদ্দেশ্য হইতেছে এই অধঃপতনকে রোধ করা ও এই বন্ধনকে ভাঙিয়া ফেলা। সকল চরিত্র-নীতিকে 'বিধি' ও 'নিষেধ'—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এই নীতি বলে, হয় 'ইহা কর,' না হয় বলে, 'ইহা করিও না।' যখন ইহা বলে, 'করিও না', তখন স্পষ্টই বুঝিয়া হইতে হইবে যে, একটি বাসনাকে সংযত করিতে বলা হইতেছে, যে-বাসনা মানুষকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিবে। আর যখন ইহা বলে, 'কর,' তখন ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষকে মুক্তির পথ দেখানো এবং যে-কোন অধঃপতন মানুষের হৃদয়কে পূর্বেই অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া।

মানুষের সম্মুখে একটি মুক্তির আদর্শ থাকিলে তবেই চরিত্র-নীতির সার্থকতা। পূর্ণ মুক্তিলাভের সম্ভাবনার প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও ইহা স্পষ্ট যে, সমগ্র জগৎটাই হইতেছে বিস্তারের জন্য সংগ্রামের বা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্তস্থল; একটি পরমাণুর জন্যও এই অনন্ত বিশ্ব যথেষ্ট স্থান নয়। বিস্তারের জন্য এই সংগ্রাম অনন্তকাল ধরিয়া চলিবেই, যতদিন না মুক্তিলাভ হয়। ইহা বলা যাইতে পারে না যে, সন্তাপ এড়ানো বা আনন্দলাভই এই মুক্তি-সংগ্রামের উদ্দেশ্য। যাহাদের ভিতর এইরূপ বোধশক্তি নাই, সেই নিম্নতম পর্যায়ের প্রাণীরাও বিস্তারের জন্য প্রয়াস করিতেছে এবং অনেকের মতে মানুষ নিজেই এই-সকল প্রাণীর বিস্তার।

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম

ইওরোপে অবস্থানকালে—'বেদান্তদর্শনে ঈশ্বরের যথার্থ স্থান কোথায়'—এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেন :

ঈশ্বর সকল ব্যষ্টির সমষ্টিস্বরূপ। তথাপি তিনি 'ব্যক্তি'-বিশেষ, যেমন মনুষ্যদেহ একটি বস্তু, ইহার প্রত্যেক কোষ একটি ব্যষ্টি। সমষ্টি—ঈশ্বর, ব্যষ্টি—জীব। সুতরাং দেহ যেমন কোষের উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব তেমনি জীবের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। ইহার বিপরীতটিও ঠিক তেমনি। এইরূপে জীব ও ঈশ্বর সহাবস্থিত দুইটি সত্তা—একটি থাকিলে অপরটি থাকিবেই। অধিকন্তু আমাদের এই ভূলোক ব্যতীত অন্যান্য উচ্চতর লোকে শুভের পরিমাণ অশুভের পরিমাণ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী থাকায় সমষ্টি (ঈশ্বর)-কে সর্বমঙ্গলস্বরূপ বলা যাইতে পারে। সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ গুণ, এবং সমষ্টির দিক হইতেই ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্ম এই উভয়ের ঊর্ধ্বে এবং একটি সপ্রতিবন্ধ বা সাপেক্ষ অবস্থা নয়। ব্রহ্মই একমাত্র স্বয়ংপূর্ণ, যাহা বহু এককের দ্বারা গঠিত হয় নাই। জীবকোষ হইতে ঈশ্বর পর্যন্ত যে-তত্ত্ব অনুস্যূত, যাহা ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না, এবং যাহা কিছু সত্য, তাহাই সেই তত্ত্ব বা ব্রহ্ম। যখন চিন্তা করি—আমি ব্রহ্ম, তখন মাত্র আমিই থাকি ; সকলের পক্ষেই এ-কথা প্রযোজ্য ; সুতরাং প্রত্যেকেই সেই তত্ত্বের সামগ্রিক বিকাশ।

যোগের চারিটি পথ

আমেরিকায় প্রথমবার অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে লিখিত।

মুক্ত হওয়াই আমাদের জীবনের প্রধান সমস্যা। আমরাই পরব্রহ্ম—যতক্ষণ না আমাদের এই উপলব্ধি হইতেছে, ততক্ষণ আমরা যে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হই না, এ-কথা অতি স্পষ্ট। এই অনুভূতি-লাভের বহু পথ; এই পথগুলির একটি সাধারণ নাম আছে। উহাকে বলা হয়, 'যোগ' (যুক্ত করা, আমাদের সত্তার সহিত নিজেদের যুক্ত করা)। নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও এই যোগগুলিকে মূলতঃ চারিটি পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক যোগই গৌণতঃ সেই পরমকে উপলব্ধি করিবার পথ, সেইজন্য এগুলি বিভিন্ন রুচির পক্ষে উপযোগী। এখন আমাদিগকে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে, কল্পিত মানবই প্রকৃত মানব বা 'পরম' হয় না। পরমে রূপান্তরিত হওয়া যায় না। পরম নিত্যমুক্ত, নিত্যপূর্ণ, কিন্তু সাময়িকভাবে অবিদ্যা ইহার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অবিদ্যার এই আবরণ সরাইয়া ফেলিতে হইবে। প্রত্যেক ধর্মই এক-একটি যোগের প্রতিনিধি। যোগগুলি শুধু অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন করে এবং আত্মাকে নিজের স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য মুক্তির প্রধান সহায়। আসক্তিশূন্যতাকে বলা হয় 'বৈরাগ্য', কারণ ভোগৈষণা বন্ধন সৃষ্টি করে। যে-কোন একটি যোগের নিয়ত অনুশীলনকে 'অভ্যাস' বলা হয়।

কর্মযোগ : কর্মযোগ হইল কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করা। ভাল অথবা মন্দ কর্ম করিলে ঐ কর্মের ফল অবশ্যই ভাল বা মন্দ হইবে। যদি অন্য কোন কারণ না থাকে, কোন শক্তিই উহার কার্য রোধ করিতে পারে না। সৎ কর্মের ফল সৎ এবং অসৎ কর্মের ফল অসৎ হইবে এবং মুক্তির কোন সম্ভাবনা না রাখিয়া আত্মা চিরবন্ধনের ভিতর আবদ্ধ থাকিবে। কর্মের ভোক্তা কিন্তু দেহ অথবা মন, আত্মা কখনই নয়। কর্ম কেবল আত্মার সম্মুখে একটি আবরণ নিক্ষেপ করিতে পারে। অবিদ্যা—অশুভ কর্মের দ্বারা নিক্ষিপ্ত আবরণ। সৎ কর্ম নৈতিক শক্তিকে দৃঢ় করিতে পারে এবং এইরূপে নৈতিক

শক্তি দ্বারা অনাসক্তির অভ্যাস হয়। নৈতিক শক্তি অসৎ কর্মের প্রবণতা উৎসাদন করে এবং চিত্ত শুদ্ধ করে। কিন্তু যদি ভোগের উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয়, তাহা হইলে ঐ কর্ম সেই বিশেষ ভোগটি উৎপাদন করে এবং চিত্ত শুদ্ধ করে না। সুতরাং ফলাসক্তিশূন্য হইয়া সকল কর্ম করিতে হইবে। কর্মযোগীকে সকল ভয় ও ইহামুত্রফলভোগ চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে। উপরন্তু এষণাবিহীন কর্মসকল বন্ধনের মূল—স্বার্থপরতা বিনষ্ট করিবে। কর্মযোগীর মূলমন্ত্র 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' এবং কোন আত্মত্যাগই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু স্বর্গপ্রাপ্তি, নাম, যশ বা কোন জাগতিক সিদ্ধির জন্য তিনি কর্ম করেন না। এই নিঃস্বার্থ কর্মের ব্যাখ্যা ও উপপত্তি কেবল জ্ঞানযোগেই আছে, তথাপি সব সম্প্রদায়ভুক্ত সব মতাবলম্বী মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব তাহাদের ভিতর লোককল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের অনুরাগ বাড়াইয়া তোলে। আবার অনেকের নিকট বিত্তের বন্ধন অত্যন্ত কঠিন। যে-বিত্তলালসা দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহা ভাঙিবার জন্য বিত্তকামীদের পক্ষে কর্মযোগ একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভক্তিযোগ: ভক্তি বা পূজা বা কোন-না-কোন প্রকার অনুরক্তি মানুষের সর্বাপেক্ষা সহজ, সুখকর এবং স্বাভাবিক পথ। এই বিশ্বের স্বাভাবিক অবস্থা হইতেছে আকর্ষণ, উহা কিন্তু নিশ্চিতভাবে একটি চূড়ান্ত বিচ্ছেদে পরিণত হয়। তাহা সত্ত্বেও প্রেম মানব-হৃদয়ে মিলনের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। প্রেম নিজে দুঃখের একটি মহা কারণ হইলেও, যোগ্য বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত হইলে মুক্তি আনয়ন করে। ভক্তির লক্ষ্য হইল ঈশ্বর। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ বিনা প্রেম থাকিতে পারে না। প্রথমে এমন একজন প্রেমাস্পদ থাকা চাই, যিনি আমাদের প্রেমের প্রতিদান দিতে পারেন। সুতরাং ভক্তের ভগবান্‌কে এক অর্থে মানবীয় ভগবান্ হইতেই হইবে। তিনি অবশ্যই প্রেমময় হইবেন। এইরূপ ভগবান্ আছেন বা নাই—এই প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও ইহা সত্য যে, যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম আছে, তাঁহাদের নিকট এই নির্গুণ ব্রহ্মই প্রেমময় ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হন।

ভগবান্ বিচারক, শাস্তিদাতা বা এমন একজন, যাঁহাকে ভয়ে মানিতে হইবে—এই-সব ভাব নিম্ন পর্যায়ের পূজা। এই প্রকার পূজাকে প্রেমের পূজা

বলা যায় না; এই-সব পূজা অবশ্য ধীরে ধীরে উচ্চাঙ্গের পূজায় রূপান্বিত হয়। আমরা এখন নিরূপণ করিব, প্রেম কি বস্তু। আমরা প্রেমকে একটি ত্রিভুজের দ্বারা ব্যাখ্যা করিব, যে ত্রিভুজের পাদদেশের প্রথম কোণ ভয়শূন্যতা। যতক্ষণ ভয় থাকিবে, ততক্ষণ উহা প্রেম নয়। প্রেম সব ভয় দূর করে। শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য মাতা ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হন। দ্বিতীয় কোণ হইল—প্রেম কখনও কিছু চায় না, ভিক্ষা করে না। তৃতীয় বা শীর্ষকোণ হইতেছে—প্রেমের জন্যই প্রেম। এই প্রেম বিষয়-বিষয়ি-সম্পর্কশূন্য। ইহাই হইল প্রেমের সর্বোচ্চ বিকাশ এবং পরমের সহিত সমার্থক।

রাজযোগ: এই যোগ আর সব যোগের সহিত খাপ খাইয়া যায়। বিশ্বাস-যুক্ত বা বিশ্বাসহীন সর্ব-শ্রেণীর জিজ্ঞাসুর পক্ষে রাজযোগ উপযুক্ত। রাজযোগ আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার যথার্থ যন্ত্র। যেমন প্রত্যেক বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের জন্য এক-একটি স্বকীয় ধারা থাকে, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রে রাজযোগ। বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী এই রাজযোগ-বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিভিন্নভাবে হয়। ইহার প্রধান অঙ্গ হইল প্রাণায়াম, ধারণা ও ধ্যান। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর পক্ষে গুরু-লব্ধ প্রণব বা ওঁকার বা অন্য কোন মন্ত্র খুব সহায়ক হইবে। প্রণব-মন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ, উহা নির্গুণ ব্রহ্মের বাচক। জপের সহিত এই-সব মন্ত্রের অর্থভাবনাই এখানে প্রধান সাধনা।

জ্ঞানযোগ: জ্ঞানযোগ তিন ভাগে বিভক্ত। (১) শ্রবণ, অর্থাৎ আত্মা একমাত্র সৎ পদার্থ এবং অন্যান্য সবকিছু মায়া—এই তত্ত্ব শোনা। (২) মনন, অর্থাৎ সর্বদিক হইতে এই তত্ত্বকে বিচার করা। (৩) নিদিধ্যাসন, অর্থাৎ সমস্ত বিচার ত্যাগ করিয়া তত্ত্বকে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধির চারিটি সাধন, যথা (১) 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'রূপ দৃঢ় ধারণা; (২) সর্ব এষণা ত্যাগ; (৩) শমদমাদি ও (৪) মুমুক্ষুত্ব। তত্ত্বের নিরন্তর ধ্যান এবং আত্মাকে উহার প্রকৃত স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দেওয়া এই যোগের একমাত্র পথ। এই যোগ সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু কঠিনতম। এই যোগ অনেকের বুদ্ধিগ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু অতি অল্প লোকই এই যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

লক্ষ্য ও উহার উপলব্ধির উপায়

যদি সমগ্র মানবজাতি কেবল একটি ধর্ম—একটিমাত্র সর্বজনীন পূজা-পদ্ধতিকে এবং একটিমাত্র নৈতিক মানদণ্ডকে স্বীকার ও গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তবে পৃথিবীর উপর কঠিন দুর্ভাগ্য নামিয়া আসিবে। সমস্ত ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে উহা মৃত্যু-সদৃশ আঘাত হইবে। নিজেদের মতানুযায়ী সর্বোচ্চ সত্যের আদর্শটিকে সৎ বা অসৎ উপায়ে সকলকে গ্রহণ করাইবার জন্য উৎসাহ দিয়া এই ধ্বংসকারী ঘটনাটিকে বাস্তব রূপ দিবার চেষ্টা না করিয়া আমাদের উচিত চলার পথের সমস্ত অন্তরায়গুলি অপসারণ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া, যাহাতে মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুযায়ী অগ্রসর হইতে পারে।

সমগ্র মানবজাতির শেষ পরিণতি, সর্বধর্মের লক্ষ্য ও পরিসমাপ্তি একই—ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলন, বা অন্য ভাষায় দেবত্বে-পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এই দেবত্বই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু লক্ষ্য এক হইলেও উপলব্ধির পন্থা মানুষের রুচি অনুযায়ী ভিন্ন হইতে পারে।

দেবত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্য ও পদ্ধতি উভয়কেই 'যোগ' বলা হয়। ইংরেজী 'Yoke' অর্থাৎ যুক্ত হওয়া—এই অর্থেই সংস্কৃতেও যোগ-শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। যোগ আমাদের স্বরূপের সহিত ঈশ্বরের যোগ করিয়া দেয়। এইরূপ যোগ বা মিলনের পদ্ধতি অনেক আছে; সেগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং জ্ঞানযোগ।

প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বভাব অনুযায়ী নিজেকে বিকশিত করিতে বাধ্য। যেমন প্রত্যেক বিজ্ঞানের একটি স্বকীয় পদ্ধতি আছে, তেমনি প্রত্যেক ধর্মেরও আছে। ধর্মে সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায়কে যোগ বলা হয়। মানুষের বিভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী যোগগুলি আমরা শিক্ষা দিই। উক্ত যোগগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করি:

(১) কর্মযোগ—যে-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মানুষ কর্ম ও কর্তব্যের মাধ্যমে স্বীয় দেবত্ব উপলব্ধি করে।

(২) ভক্তিযোগ—সগুণ ভগবানে ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা দেবত্বের অনুভূতি।

(৩) রাজযোগ—মনঃসংযোগের দ্বারা দেবত্বের উপলব্ধি।

(৪) জ্ঞানযোগ—জ্ঞানের দ্বারা দেবত্বের উপলব্ধি।

এই বিভিন্ন পথগুলি একই কেন্দ্রে অর্থাৎ ঈশ্বর সমীপে লইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-বিশ্বাসের বহুলতায় সুবিধাই আছে; মানুষকে ধর্মজীবন যাপন করিতে যতক্ষণ উৎসাহ দেয়, ততক্ষণ সব বিশ্বাসই শুভ। ধর্মমত যত অধিক হয়, ততই মানুষের ভিতর যে দেবত্বের সংস্কার আছে, তাহার নিকট আবেদন করিবার বেশী সুযোগ পাওয়া যায়।

Oak Beach Christian Unity-র সমক্ষে বিশ্বজনীন মিলন-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন :

শেষ পর্যন্ত সকল ধর্মই এক—ইহা অতি সত্য কথা, যদিও খ্রীষ্টান চার্চ বাইবেলের উপাখ্যানের ফ্যারিসিদের মতো ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দেয়, এবং ভাবে যে, খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র সত্য, অপর ধর্মগুলি সব ভুল এবং সেগুলির খ্রীষ্টধর্মের আলোকে আলোকিত হইবার প্রয়োজন আছে; তথাপি এ-কথা সত্য যে, পরিণামে সব ধর্মই এক। উদার ভাবের জন্য পৃথিবী খ্রীষ্টান চার্চের সহিত সংযুক্ত হইতে ইচ্ছুক, এজন্য খ্রীষ্টধর্মকে পরমতসহিষ্ণু অবশ্যই হইতে হইবে। ঈশ্বর সকলের হৃদয়েই আছেন; যাঁহারা যীশুখ্রীষ্টের অনুসরণকারী, তাঁহাদের এই তত্ত্বটিকে স্বীকার করিতে সংকোচ বোধ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে যীশুখ্রীষ্ট প্রত্যেক সৎ মানবকে ঈশ্বরের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। যে-মানুষ স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে-ই সৎ, আর যে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করে, সে সৎ নয়। সৎ হওয়া এবং সৎকর্ম করা—এই ভিত্তির উপরেই সমগ্র জগৎ মিলিতে পারে।

ধর্মের মূলসূত্র

[একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ, মিস ওয়াল্ডোর কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত]

পৃথিবীর প্রাচীন বা আধুনিক, লুপ্ত বা জীবন্ত ধর্মগুলি এই চারপ্রকার বিভাগের মধ্য দিয়া ভালরূপে ধারণা করিতে পারি :

১. প্রতীক—মানুষের ধর্মভাব বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য বিবিধ বাহ্য সহায় অবলম্বন।

২. ইতিহাস—প্রত্যেক ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব, যাহা দিব্য বা মানবীয় আচার্যগণের জীবনে রূপায়িত। পুরাণাদি ইহার অন্তর্গত, কারণ এক জাতি বা এক যুগের পক্ষে যাহা পুরাণ, অন্য জাতি বা যুগের নিকট তাহাই ইতিহাস। আচার্যগণের সম্বন্ধেও বলা যায়, তাঁহাদের জীবনের অনেকটাই পরবর্তীকালের মানুষেরা পৌরাণিক কাহিনী বলিয়া গ্রহণ করে।

৩. দর্শন—প্রত্যেক ধর্মের যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তিসমূহ।

৪. অতীন্দ্রিয়বাদ—ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও যুক্তি অপেক্ষা মহত্তর এমন কিছু, যাহা কোন কোন বিশেষ অবস্থায় কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সকল ব্যক্তি লাভ করেন। ধর্মের অন্যান্য বিভাগেও এই অতীন্দ্রিয়বাদের কথা আছে।

পৃথিবীর প্রাচীন বা আধুনিক সকল ধর্মেই এই মূলনীতিগুলির একটি, দুইটি বা তিনটি বর্তমান দেখা যায়; অতি উন্নত ধর্মগুলিতে চারিটি তত্ত্বই আছে। অতি উন্নত ধর্মগুলির মধ্যে কতকগুলির আবার কোন ধর্মগ্রন্থ বা পুস্তক ছিল না, বা সেগুলি লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু যে-সকল ধর্ম পবিত্র গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি আজও টিকিয়া আছে। সুতরাং পৃথিবীর আধুনিক সব ধর্মই পবিত্র গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত :

বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত বেদের উপর

—(ভুল করিয়া বলা হয়, হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম);

পারসীক ধর্ম আবেস্তার উপর;

মুশার ধর্ম ওল্ড টেস্টামেণ্টের উপর ;
বৌদ্ধধর্ম ত্রিপিটকের উপর ;
খ্রীষ্টধর্ম নিউ টেস্টামেণ্টের উপর ;
ইসলাম কোরানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

চীনের তাও এবং কনফুসিয়াস মতাবলম্বীদেরও ধর্মগ্রন্থ আছে, কিন্তু ঐগুলি বৌদ্ধধর্মের সহিত এমন নিবিড়ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, ঐগুলিকে বৌদ্ধ-ধর্মের অন্তর্গত বলিয়া গণনা করা যায়।

আবার যদিও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে সম্পূর্ণ জাতিগত কোন ধর্ম নাই, তবু বলা যায়—ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে বৈদিক, ইহুদী ও পারসীক ধর্মগুলি যে-সকল জাতির মধ্যে পূর্ব হইতে ছিল, সেই-সকল জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; আর বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম প্রথমাবধি প্রচারশীল।

বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে জগৎজয়ের সংগ্রাম চলিবে, এবং জাতিগত ধর্মগুলিকেও অনিবার্যভাবে এই সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে। এই জাতিগত বা প্রচারশীল ধর্মগুলির প্রত্যেকটি ইতিমধ্যেই নানা শাখায় বিভক্ত হইয়েছে এবং নিজেকে পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ধর্মগুলির মধ্যে একটিও এককভাবে সমগ্র মানবজাতির ধর্ম হইবার উপযোগী নয়। যে-জাতি হইতে যে-ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে, সেই জাতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লইয়াই ঐ ধর্ম গঠিত ; ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি থাকায় ঐ-সকলের কোনটিই সমগ্র মানবজাতির উপযোগী হইতে পারে না। শুধু তাই নয়, উহাদের প্রত্যেক ধর্মে একটি নেতিবাচক ভাব আছে। প্রত্যেক ধর্ম মানব-প্রকৃতির একটি অংশের অবশ্য শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সাহায্য করে, কিন্তু ইহা ছাড়া যাহা কিছু তাহার ধর্মে নাই, তাহাই দমন করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ একটি ধর্ম যদি বিশ্বজনীন হয়, তাহা হইলে তাহা মানবজাতির বিপদ্ ও অবনতির কারণ।

পৃথিবীর ইতিহাস পড়িলে দেখা যায়, সার্বভৌম রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী ধর্মরাজ্য-বিষয়ক স্বপ্ন-দুইটি মানবজাতির মনে বহুকাল যাবৎ ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু পৃথিবীর সামান্য একটি অংশ বিজিত হইবার পূর্বেই অধিকৃত রাজ্যগুলি শতধা ছিন্নভিন্ন হইয়া মহান্ দিগ্বিজয়ীদের পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ করিয়া দেয়,

সেরূপ প্রত্যেক ধর্মই তাহার শৈশব অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

তথাপি ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় যে, অনন্ত বৈচিত্র্য-সম্ভাবনাময় মানবজাতির সামাজিক ও ধর্মীয় সংহতিই প্রকৃতির পরিকল্পনা। সর্বাপেক্ষা অল্প বাধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া যদি যথার্থ কর্মপন্থা হয়, তবে আমার মনে হয়, প্রত্যেক ধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলে উহা দ্বারা ধর্মরক্ষাই হয়, ইহাতে কঠোর একঘেয়েমির প্রবণতা ব্যর্থ হয় এবং স্পষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়।

অতএব মনে হয়, উদ্দেশ্য—সম্প্রদায়গুলির ধ্বংস নয়, বরং উহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি, যে পর্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই একটি সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়ায়। অন্যপক্ষে আবার সব ধর্ম মিলিত হইয়া একটি বিরাট দর্শনে পরিণত হইলেই ঐক্যের পটভূমিকা সৃষ্ট হয়। পৌরাণিক কাহিনী বা ধর্মানুষ্ঠানগুলি দ্বারা কখনও ঐক্য সাধিত হয় না, কারণ সূক্ষ্ম ব্যাপার অপেক্ষা স্থূল বিষয়েই আমাদের মতদ্বৈধ হয়। একই মূলতত্ত্ব স্বীকার করিলেও মানুষ তাহার আদর্শস্থানীয় ধর্মগুরুর মহত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে।

সুতরাং এই মিলন দ্বারা ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে দর্শনের সমন্বয় পাওয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আচার্য বা সাধন-পদ্ধতি নির্বাচন করিবার স্বাধীনতা পাইবে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এইরূপ মিলন স্বাভাবিকভাবে চলিয়া আসিতেছে; শুধু পারস্পরিক বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা এই মিলন মাঝে মাঝে শোচনীয়ভাবে প্রতিহত হইয়াছে।

অতএব পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া প্রত্যেক জাতির আচার্যগণকে অন্য জাতির নিকট পাঠাইয়া সমগ্র মানবসমাজকে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম শিক্ষা দেওয়া উচিত; ইহা দ্বারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের সহায়তা হইবে। কিন্তু খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে ভারতের মহামতি বৌদ্ধ-সম্রাট্ অশোক যেরূপ করিয়াছিলেন, আমরাও যেন সেইরূপ অন্যের নিন্দা হইতে বিরত হই ও অপরের দোষানুসন্ধান না করিয়া তাহাকে সাহায্য করি ও তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া তাহার জ্ঞানলাভের সহায় হই।

জড়বিজ্ঞানের বিপরীত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আজ সারা বিশ্বে এক মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের ঐহিক জীবন ও এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের

সীমার বহির্ভূত সকল ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অতি দ্রুত একটি ফ্যাশনে পরিণত হইতেছে, এমন কি ধর্মপ্রচারকেরাও একের পর এক এই ফ্যাশনের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছেন। অবশ্য চিন্তাহীন জনসাধারণ সর্বদা সুখাবহ ভাবরাশিই অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞান আশা করা যায়, তাঁহারা যখন নিজেদের দার্শনিক বলিয়া প্রচার করেন এবং এই অর্থহীন ফ্যাশন অনুসরণ করেন, তখন উহা সত্যই দুঃখজনক।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যতক্ষণ স্বাভাবিক-শক্তিসম্পন্ন, ততক্ষণ আমাদের সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য পথপ্রদর্শক এবং সেগুলি যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেয়, সে-সব যে মানবীয় জ্ঞানসৌধের ভিত্তি—এ-কথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু যদি কেহ মনে করে, মানুষের সমগ্র জ্ঞান শুধু ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি—আর কিছু নয়, তবে আমরা উহা অস্বীকার করিব। যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিতে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই বুঝায়—তার বেশী আর কিছু নয়, তবে আমরা বলিব, এরূপ বিজ্ঞান কোন দিন ছিল না, কোন দিন হইবেও না। উপরন্তু শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন জ্ঞান কখনও বিজ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইতে পারিবে না।

অবশ্য ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে, এবং উহাদের সাদৃশ্য ও বৈষম্য অনুসন্ধান করে, কিন্তু ঐখানেই উহাদের থামিতে হয়।

প্রথমতঃ বাহিরের তথ্যসংগ্রহ ব্যাপারও অন্তরের কতকগুলি ভাব এবং ধারণা—যথা দেশ ও কালের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ মানস পটভূমিকায় কিছুটা বিমূর্ত ভাব ব্যতীত তথ্যগুলির বর্গীকরণ বা সামান্যীকরণ অসম্ভব। সামান্যীকরণ যত উচ্চধরনের হইবে, বিমূর্ত পট-ভূমিকাও তত ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে থাকিবে। সেইখানেই অসংলগ্ন তথ্যগুলি সাজানো হয়। এখন জড়বস্তু, শক্তি, মন, নিয়ম, কারণ, দেশ, কাল প্রভৃতি ভাবগুলি অতি উচ্চ বিমূর্তনের ফল ; কেহই কোনদিন এগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করে নাই ; অথবা বলা যায়, এগুলি একেবারে অতিপ্রাকৃতিক বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। অথচ এগুলি ছাড়া কোন প্রাকৃতিক তথ্য বোঝা যায় না। একটি গতিকে বোঝা যায়—একটি শক্তির সাহায্যে। কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হয় জড়বস্তুর মাধ্যমে। বাহ্য পরিবর্তনগুলি বোঝা যায়—প্রাকৃতিক নিয়মের ভিতর দিয়া, মানসিক পরিবর্তনগুলি ধরা

পড়ে চিন্তায় বা মনে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি শুধু কার্য-কারণের শৃঙ্খল দ্বারাই বোঝা যায়। অথচ কেহই কখন জড় বা শক্তি, নিয়ম বা কারণ, দেশ বা কাল—কিছুই দেখে নাই, এমন কি কল্পনাও করে নাই।

তর্কচ্ছলে বলা যাইতে পারে—বিমূর্তভাবরূপে এগুলির অস্তিত্ব নাই, এগুলি বর্গ বা শ্রেণী হইতে পৃথক্ কিছু নয়, উহা হইতে এগুলি পৃথক্ করা যায় না। ইহাদিগকে কেবল গুণ বলা যাইতে পারে।

এই বিমূর্তন (abstraction) সম্ভব কিনা বা সামান্যীকৃত বর্গ ব্যতীত উহাদের আর কিছু অস্তিত্ব আছে কিনা—এই প্রশ্ন ছাড়াও ইহা স্পষ্ট যে, জড় বা শক্তির ধারণা, কাল বা দেশের ধারণা, নিমিত্ত নিয়ম বা মনের ধারণা—এগুলি বিভিন্ন বর্গের নিরপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ একক, এগুলিকে যখন শুধু এইভাবে—বিমূর্ত নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করা যায়, তখনই ইহারা ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ তথ্য-গুলির ব্যাখ্যারূপে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ এই ভাব বা ধারণাগুলি শুধু যে সত্য তাহা নয়, উহা ব্যতীত ইহাদের বিষয়ে দুইটি তথ্য পাওয়া যায়: প্রথম এগুলি অতিপ্রাকৃতিক, দ্বিতীয় অতিপ্রাকৃতিকরূপেই এগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করে, অন্যরূপে নয়।

* * *

বাহ্যজগৎ অন্তর্জগতের অনুরূপ বা অন্তর্জগৎ বাহ্যজগতের অনুরূপ, জড়বস্তু মনেরই প্রতিকৃতি বা মন জড়জগতের প্রতিকৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনকে নিয়ন্ত্রিত করে অথবা মনই পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, ইহা অতি পুরাতন প্রাচীন প্রশ্ন, তবুও ইহা এখনও পূর্ববৎ নূতন ও সতেজ, ইহাদের কোন্‌টি পূর্বে বা কোন্‌টি পরে, কোন্‌টি কারণ ও কোন্‌টি কার্য, মনই জড়বস্তুর কারণ বা জড়বস্তুই মনের কারণ—এ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিলেও ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, বাহ্যজগৎ অন্তর্জগতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলেও উহা অন্তর্জগতের অনুরূপ হইতে বাধ্য, না হইলে উহাকে জানিবার আমাদের অন্য উপায় নাই। যদি ধরিয়াও লওয়া যায়, বাহ্যজগৎই আমাদের অন্তর্জগতের কারণ, তবুও বলিতে হইবে, এই বাহ্যজগৎ যাহাকে আমরা আমাদের মনের কারণ বলিতেছি, উহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, কেন-না আমাদের মন উহার ততটুকু বা সেই ভাবটুকুই জানিতে পারে, যাহা উহার সহিত উহার প্রতিবিম্বরূপে মেলে। প্রতিবিম্ব কখনও বস্তুটির কারণ হইতে পারে না।

সুতরাং বাহ্যজগতের যে অংশটুকু—আমরা উহার সমগ্র হইতে যেন কাটিয়া লইয়া আমাদের মনের দ্বারা জানিতে পারিতেছি, তাহা কখনও আমাদের মনের কারণ হইতে পারে না, কারণ উহার অস্তিত্ব আমাদের মনের দ্বারাই সীমাবদ্ধ (—মনের দ্বারাই উহাকে জানা যায়)।

এজন্যই মনকে জড়বস্তু হইতে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে না। উহা বলাও অসঙ্গত, কেন-না আমরা জানি যে, এই বিশ্ব-অস্তিত্বের যে অংশটুকুতে চিন্তা বা জীবনীশক্তি নাই ও যাহাতে বাহ্য অস্তিত্ব আছে, তাহাকেই আমরা জড়বস্তু বলি, এবং যেখানে এই বাহ্য অস্তিত্ব নাই এবং যাহাতে চিন্তা বা জীবনী শক্তি রহিয়াছে, তাহাকেই আমরা মন বলি। সুতরাং এখন যদি আমরা জড় হইতে মন বা মন হইতে জড় প্রমাণ করিতে যাই, তাহা হইলে যে-সকল গুণ দ্বারা উহাদিগকে পৃথক্ করা হইয়াছিল, তাহাই অস্বীকার করিতে হইবে। অতএব মন হইতে জড় বা জড় হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে, বলা শুধু কথার কথা মাত্র।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে, এই বিতর্কটি মন ও জড়ের ভ্রান্ত সংজ্ঞার উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে, আমরা মনকে কখন বা জড়ের বিপরীত ও জড় হইতে পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করিতেছি, আবার কখন বা উহাকে মন ও জড়—জড়ের বাহ্য ও আন্তর অংশ মন ব্যতীত কিছুই নয়—উভয়রূপেই বর্ণনা করিতেছি। জড়কেও সেরূপ কখন বা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগৎ-রূপে আবার কখন বা বাহ্য ও আন্তর উভয় জগতের কারণরূপে বর্ণনা করা হইতেছে। জড়বাদিগণ ভাববাদিগণকে আতঙ্কিত করিয়া যখন বলেন, তাঁহারা তাঁহাদের পরীক্ষাগারের মূলতত্ত্বগুলি হইতে মন প্রস্তুত করিবেন, তখন তাঁহারা কিন্তু এমন এক বস্তুকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, যাহা তাঁহাদের সকল মূলতত্ত্বের ঊর্ধ্বে—বাহ্য ও অন্তর্জগৎ যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহাকে তিনি জড় প্রকৃতিরূপে আখ্যা দিতেছেন, ভাববাদীও সেইরূপ যখন জড়বাদীর মূলতত্ত্ব-গুলি তাঁহারই চিন্তাতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন, তখন কিন্তু তিনি এমন এক বস্তুর ইঙ্গিত পাইতেছেন, যাহা হইতে জড় ও চেতন উভয় বস্তুই উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহাকেই তিনি বহু সময়ে ঈশ্বর আখ্যাও দিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, একদল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অংশ মাত্র জানিয়া উহাকে 'বাহ্য' বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন এবং অন্যদল উহার অপর অংশ জানিয়া উহাকেই

'আন্তর' আখ্যা দিতেছেন। এই উভয় প্রয়াসই নিষ্ফল। মন বা জড় কোনটিই অপরটিকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। এমন আর একটি বস্তুর আবশ্যক, যাহা ইহাদের উভয়কেই ব্যাখ্যা করিতে পারে।

এইরূপ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে যে, চিন্তাও কখন মন ব্যতীত থাকিতে পারে না। যদি এমন এক সময় কল্পনা করা যায়, যখন চিন্তার অস্তিত্ব ছিল না, তখন জড়—যেরূপে উহাকে আমরা জানি—কি করিয়া থাকিবে? অপর পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয় এবং যখন ঐ অনুভূতি বাহ্যজগতের উপর নির্ভর করে, তখন আমাদের মনের অস্তিত্বও বাহ্যজগতের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে।

ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, ইহাদের (জড় ও মনের) একটি আরম্ভকাল (beginning) রহিয়াছে। সামান্যীকরণ ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয়। সামান্যীকরণও আবার কতকগুলি সদৃশ বস্তুর পূর্বাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। পূর্ব অনুভূতি ব্যতীত একটির সহিত আর একটির তুলনাও সম্ভব নয়। জ্ঞান সেইজন্য পূর্বজ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেজন্যই উহা চিন্তা ও জড়ের পূর্বাস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে, উহাদের আরম্ভকাল সেইজন্য সম্ভব নয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান যাহার উপর নির্ভর করে, সেই সামান্যীকরণের পশ্চাতেও আবার এমন একটি বস্তু থাকা আবশ্যক, যাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংলগ্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি একত্র হইতে পারে, চিত্রাঙ্কনের জন্য যেমন চিত্রের পশ্চাতে একটি পটের একান্ত আবশ্যক, আমাদের বাহ্যানুভূতির জন্যও সেইরূপ একটি কিছুর একান্ত প্রয়োজন, যাহার উপর ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি একত্র হইতে পারে, যদি চিন্তা বা মনকে ঐ বস্তু বলা যায়, তবে উহার একত্রীকরণের জন্য আবার আর একটি বস্তুর প্রয়োজন হইবে। মন একটি অনুভূতির প্রবাহ ব্যতীত অন্য কিছু নয়, সুতরাং উহাদের একত্রীকরণের জন্য ঐরূপ একটি পটভূমিকার একান্ত প্রয়োজন হইবে। এই পটভূমিকা পাইলেই আমাদের সকল বিশ্লেষণ থামিয়া যায়। এই অবিভাজ্য একত্বে না পৌছানো পর্যন্ত আমরা থামিতে পারি না। ঐ একত্বই আমাদের জড় ও চিন্তার একান্ত-পটভূমি।

*　　*　　*

বেদান্তের আলোকে

বেদান্তদর্শন-প্রসঙ্গে

বেদান্তবাদী বলেন যে, মানুষ জন্মায় না বা মরে না বা স্বর্গেও যায় না এবং আত্মার পক্ষে পুনর্জন্ম একটা নিছক কাহিনী মাত্র। দৃষ্টান্ত দিয়া বলা যায় যে, যেন একটি পুস্তকের পাতা উলটানো হইতেছে; ফলে পুস্তকটির পাতার পর পাতা শেষ হইতেছে, কিন্তু পাঠকের উহাতে কিছুই হইতেছে না। প্রত্যেক আত্মা সর্বব্যাপী; সুতরাং উহা কোথায় যাইবে বা কোথা হইতে আসিবে? এই-সব জন্ম-মৃত্যুতে প্রকৃতির পরিবর্তন হয় এবং আমরা ভুলক্রমে উহাকে আমাদের পরিবর্তন বলিয়া মনে করি। পুনর্জন্ম প্রকৃতির অভিব্যক্তি এবং অন্তরে স্থিত ভগবানের বিকাশ।

বেদান্ত-মতে প্রত্যেক জীবন অতীতের উপর গঠিত এবং যখন আমরা আমাদের সমগ্র অতীতটাকে দেখিতে পাইব, তখনই আমরা মুক্ত হইব। মুক্ত হইবার ইচ্ছা শৈশবেই ধর্মপ্রবণতার রূপ লয়। সমগ্র সত্যটি মুমুক্ষুর নিকট পরিস্ফুট হইতে কয়েক বৎসর যেন লাগে। এই জন্ম পরিত্যাগ করিবার পর পরবর্তী জন্মের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; তখনও মানুষ মায়ার ভিতর থাকে।

আমরা আত্মাকে এইভাবে বর্ণনা করি: শস্ত্র উহাকে ছেদন করিতে পারে না, বর্শা বা কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র উহাকে ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি উহাকে দহন করিতে পারে না, জল উহাকে দ্রব করিতে পারে না; উহা অবিনাশী, সর্বব্যাপী। সুতরাং ইহার জন্য শোক করা উচিত নয়।

যদি আমাদের অবস্থা বর্তমানে খুব খারাপ হইয়া থাকে, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, অনাগত ভবিষ্যতে উহা ভাল হইবেই। সকলের জন্য শাশ্বত মুক্তি—ইহাই হইল আমাদের মূল নীতি। প্রত্যেককেই ইহা লাভ করিতে হইবে। মুক্তি ছাড়া অন্য সমস্ত বাসনাই ভ্রমপ্রসূত। বেদান্তী বলেন, প্রত্যেক সৎ কর্ম সেই মুক্তিরই প্রকাশ।

আমি বিশ্বাস করি না যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন জগৎ হইতে সমস্ত অশুভ অন্তর্হিত হইবে। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? এই প্রবাহ চলিতেছে। এক প্রান্ত দিয়া জল বাহির হইয়া যাইতেছে, আবার অন্য প্রান্ত

দিয়া উহা পুনরায় প্রবেশ করিতেছে। বেদান্ত বলেন, তুমি শুদ্ধ ও পূর্ণ; এবং এমন একটি অবস্থা আছে, যাহা শুভ ও অশুভের ঊর্ধ্বে। উহাই হইল তোমার স্বরূপ। আমরা যাহাকে শুভ বলি, তাহা অপেক্ষাও উহা উচ্চতর। অশুভ হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মাত্র। অশুভ (পাপ) বলিয়া আমাদের কোন তত্ত্ব নাই। আমরা ইহাকে অজ্ঞান বলি।

আমাদের নীতিশাস্ত্র, আমাদের লোক-ব্যবহার—উহা যতদূর পর্যন্ত যাক না কেন, সবই মায়ার জগতের ভিতরে। সত্যের পরিপূর্ণ বিবৃতি হিসাবে অজ্ঞানাদি বিশেষণ ঈশ্বরে প্রয়োগ করিবার চিন্তাও আমরা করিতে পারি না। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা শুধু বলি, তিনি সৎস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। চিন্তা ও বাক্যের প্রত্যেক প্রয়াস দ্রষ্টাকে দৃশ্যে পরিণত করিবে এবং উহার স্বরূপের হানি ঘটাইবে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে: আমিই ব্রহ্ম—এই কথা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যদি তুমি বলো—আমিই ব্রহ্ম, তাহা হইলে অন্যায় কর্ম করিতে কে তোমাকে বাধা দিবে? সুতরাং তোমার ঈশ্বরত্ব শুধু মায়ার জগতের ঊর্ধ্বেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যদি আমি যথার্থই ব্রহ্ম হই, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের আক্রমণের ঊর্ধ্বে আমি অবশ্যই থাকিব এবং কোন অসৎ কর্ম করিতে পারিব না। নৈতিকতা অবশ্য মানুষের লক্ষ্য নয়, কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্তির ইহা একটি উপায়। বেদান্ত বলেন, যোগও একটি পথ, যে-পথে মানুষ এই ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। বেদান্ত বলেন, অন্তরে যে মুক্তি আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই ব্রহ্মানুভূতি হয়। নৈতিকতা ও নীতিশাস্ত্র ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র, ঐসবকে যথাযথ স্থানে বসাইতে হয়।

অদ্বৈত দর্শনের বিরুদ্ধে যত সমালোচনা হয়, তাহার সারমর্ম হইল এই যে, অদ্বৈত বেদান্ত ইন্দ্রিয়ভোগে উৎসাহ দেয় না। আমরা আনন্দের সহিতই উহা স্বীকার করি। বেদান্তের আরম্ভ নিতান্ত দুঃখবাদে এবং শেষ হয় যথার্থ আশাবাদে। ইন্দ্রিয়জ আশাবাদ আমরা অস্বীকার করি, কিন্তু অতীন্দ্রিয় আশাবাদ আমরা জোরের সহিত ঘোষণা করি। প্রকৃত সুখ ইন্দ্রিয়ভোগে নাই—উহা ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে এবং উহা প্রতি মানুষের ভিতরেই রহিয়াছে। জগতে আমরা যে আশাবাদের নিদর্শন দেখি, উহা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ধ্বংসের

অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। আমাদের দর্শনে ত্যাগকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ ত্যাগ বা নেতিভাব আত্মার যথার্থ অস্তিত্বই সূচিত করে। বেদান্ত ইন্দ্রিয়জগৎকে অস্বীকার করেন—এই অর্থে বেদান্ত নৈরাশ্যবাদী, কিন্তু প্রকৃত জগতের কথা ঘোষণা করে বলিয়া আশাবাদী।

বেদান্ত মানুষের বিচারশক্তিকে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেয়, যদিও ইহাতে বুদ্ধির অতীত আর একটি সত্তা রহিয়াছে, কিন্তু উহারও উপলব্ধির পথ বুদ্ধির ভিতর দিয়া। সমস্ত পুরাতন কুসংস্কার দূর করিবার জন্য যুক্তি একান্ত প্রয়োজন। তারপর যাহা থাকিবে, তাহাই বেদান্ত। একটি সুন্দর সংস্কৃত কবিতা আছে, যেখানে ঋষি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'হে সখা, কেন তুমি ক্রন্দন করিতেছ? তোমার জন্ম-মরণ-ভীতি নাই। তুমি কেন কাঁদিতেছ? তোমার কোন দুঃখ নাই, কারণ তুমি অসীম নীল আকাশ-সদৃশ, অবিকারী তোমার স্বভাব। আকাশের উপর নানা বর্ণের মেঘ আসে, মুহূর্তের জন্য খেলা করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আকাশ সেই একই থাকে। তোমাকে কেবল মেঘগুলি সরাইয়া দিতে হইবে।'[১]

আমাদের কেবল দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে এবং পথ পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। জল আপন বেগে ধাবিত হইবে এবং নিজের স্বভাবেই ক্ষেত্রটিকে আপ্লুত করিয়া ফেলিবে, কেন-না জল তো পূর্বেই সেখানে ছিল।

মানুষ অনেকটা চেতন, কিছুটা অচেতন আবার চেতনের ঊর্ধ্বে যাইবারও সম্ভাবনা তাহার আছে। কেবল আমরা যখন যথার্থ মানুষ হইতে পারিব, তখনই আমরা বিচারের উপরে উঠিতে পারিব। 'উচ্চতর' বা 'নিম্নতর' শব্দগুলি কেবল মায়ার জগতে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু সত্যের জগতে উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ সেখানে কোন ভেদ নাই। মায়ার জগতে মনুষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। বেদান্তী বলেন, মানুষ দেবতা অপেক্ষা বড়। দেবতাদেরও মরিতে হইবে এবং পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিতে হইবে। কেবলমাত্র নরদেহে তাহারা পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে।

ইহা সত্য যে, আমরা একটা মতবাদ সৃষ্টি করিতেছি। আমরা স্বীকার করি যে, ইহা ত্রুটিহীন নয়, কারণ সত্য অবশ্যই সমস্ত মতবাদের ঊর্ধ্বে।

---

১ দ্রষ্টব্য: অবধূতগীতা, ৩।৩৪-৩৭

কিন্তু অন্য মতবাদগুলির সহিত তুলনা করিলে আমরা দেখিব যে, বেদান্তই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মতবাদ। তবুও ইহা সম্পূর্ণ নয়, কারণ যুক্তি ও বিচার সম্পূর্ণ নয়। ইহাই একমাত্র সম্ভাব্য যুক্তিসঙ্গত মতবাদ, যাহা মানব-মন ধারণা করিতে পারে।

ইহা অবশ্য সত্য যে, একটি মতবাদকে শক্তিশালী হইতে হইলে তাহাকে প্রচারশীল হইতে হইবে। বেদান্তের ন্যায় কোন মতবাদ এত প্রচারশীল হয় নাই। আজও পর্যন্ত ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারাই যথার্থ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বহু অধ্যয়নের দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। যাঁহারা যথার্থ মানুষ ছিলেন, ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারাই তাঁহারা ঐরূপ হইতে পারিয়াছিলেন। ইহা সত্য যে, প্রকৃত মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প, কিন্তু কালে তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িবে। তথাপি তোমরা বিশ্বাস করিতে পার না যে, এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা সকলেই দার্শনিক হইয়া যাইব। আমরা বিশ্বাস করি না যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন একমাত্র সুখই থাকিবে এবং কোন দুঃখই থাকিবে না।

মধ্যে মধ্যে আমাদের জীবনে পরম আনন্দের মুহূর্ত আসে, যখন আনন্দ ছাড়া আমরা আর কিছুই চাই না, আর কিছুই দিই না বা জানি না। তারপর সেই ক্ষণটি চলিয়া যায় এবং আমাদের সম্মুখে জগৎপ্রপঞ্চ অবস্থিত দেখি। আমরা জানি, ঈশ্বরের উপর একটি পর্দা চাপানো হইয়াছে মাত্র এবং ঈশ্বরই সমস্ত বস্তুর পটভূমিকারূপে অবস্থান করিতেছেন।

বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে, নির্বাণ এই জীবনেই পাওয়া যাইতে পারে, উহা পাওয়ার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। আত্মানুভূতিই নির্বাণ এবং এক মুহূর্তের জন্যও উহা একবার সাক্ষাৎ করিলে আর কখনও কেহ ব্যক্তিত্বের মরীচিকায় মোহগ্রস্ত হয় না। আমাদের চক্ষু আছে, সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমরা অবশ্যই দেখিব, কিন্তু সর্বদা আমরা জানিব, উহা কি। আমরা ইহার প্রকৃত স্বভাব জানিয়া ফেলিয়াছি। আবরণই আত্মাকে আচ্ছাদিত করে, আত্মা কিন্তু অপরিবর্তনীয়। আবরণ খুলিয়া যায় এবং আত্মাকে ইহার পশ্চাতে দেখিতে পাই। সব পরিবর্তনই এই আবরণে। মহাপুরুষে আবরণটি সূক্ষ্ম এবং আত্মা তাঁহার ভিতর দিয়া প্রায়ই প্রকাশিত হয়। পাপীতে আবরণটি ঘন, সেজন্য তাহার আবরণের

পশ্চাতে যে আত্মা রহিয়াছেন এবং মহাপুরুষের আবরণের পশ্চাতেও যে সেই একই আত্মা বিরাজ করিতেছেন—এই সত্যটি আমরা ভুলিয়া যাই। যখন আবরণটি নিঃশেষে অপসারিত হইবে, তখন আমরা দেখিব, উহা কখনই ছিল না এবং আমরা আত্মা ছাড়া আর কিছুই নই। আবরণের অস্তিত্বও আর আমাদের স্মরণে থাকিবে না।

জীবনে এই বৈশিষ্ট্যের দুইটি দিক আছে। প্রথমতঃ জাগতিক কোন বস্তু দ্বারা আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রভাবিত হন না। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র তিনিই জগতের কল্যাণ করিতে সমর্থ হন। পরোপকার করার পশ্চাতে যে যথার্থ প্রেরণা, তাহা তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন, কারণ তাঁহার কাছে এক ছাড়া আর দ্বিতীয় নাই। ইহাকে অহংকার বলা যায় না, কারণ উহা ভেদাত্মক। ইহাই একমাত্র নিঃস্বার্থপরতা। তাঁহার দৃষ্টি বিশ্বজনীন, ব্যক্তি-সর্বস্ব নয়। প্রেম ও সহানুভূতির প্রত্যেক ব্যাপার এই বিশ্বজনীনতার প্রকাশ—'নাহং, তুঁহু' তাঁহার এই ভাবটিকে দার্শনিক পরিভাষায় বলা যাইতে পারে, 'তুমি অপরকে সাহায্য কর, কারণ তুমি যে তাহাতে আছ এবং সেও যে তোমাতে আছে।' একমাত্র প্রকৃত বেদান্তীই তাঁহার ন্যায় মানুষকে সাহায্য করিতে পারিবেন ও বিনা দ্বিধায় তাঁহার জীবনদান করিবেন, কারণ তিনি জানেন যে, তাঁহার মৃত্যু নাই। জগতে যতক্ষণ একটিমাত্র পোকাও জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ তিনিও জীবিত থাকিবেন, যতক্ষণ একটিমাত্র জীবও ভক্ষণ করিবে, ততক্ষণ তিনিও ভক্ষণ করিবেন। সুতরাং তিনি পরোপকার করিয়া যান, দেহকে সর্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে—এই আধুনিক ধারণা তাঁহাকে কখনও বাধা দিতে পারিবে না। যখন মানুষ ত্যাগের এই শীর্ষে উপনীত হন, তখন তিনি নৈতিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সব কিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তিনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, গরু, কুকুর ও অতিশয় দূষিত স্থানকে আর ব্রাহ্মণ, গরু, কুকুর ও দূষিত স্থানরূপে দেখেন না, কিন্তু দেখেন সেই একই ব্রহ্ম স্বয়ং সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন।[১]

এইরূপ সমদর্শী পুরুষই সুখী এবং তিনিই ইহজীবনে সংসার জয় করিয়াছেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর পারে গিয়াছেন।[২] ঈশ্বর দ্বন্দ্বাদি-বর্জিত;

১ গীতা, ৫।১৮ ২ গীতা, ৫।১৯

সুতরাং বলা হয় যে, সমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরলাভ হইয়াছে, তিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াছেন।

যীশু বলেন, 'আব্রাহামের পূর্বেও আমি ছিলাম।' ইহার অর্থ এই যে, যীশু এবং তাঁহার মতো অবতার-পুরুষেরা মুক্ত আত্মা। নাজারেথের যীশু তাঁহার প্রারব্ধের বশবর্তী হইয়া মানবরূপ ধারণ করেন নাই, করিয়াছিলেন মানব-কল্যাণের জন্যই। ইহা ভাবা উচিত নয় যে, মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখন সে কর্ম করিতে পারে না ও একটা জড় মৃৎপিণ্ডে পরিণত হয়। পরন্তু সেই মানুষ অপরের অপেক্ষা অধিকতর উদ্যমী হন, কারণ অপরে বাধ্য হইয়া কর্ম করে, আর তিনি স্বাধীনভাবে কর্ম করেন।

যদি আমরা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হই, তাহা হইলে কি আমাদের কোন স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই থাকিবে। ঈশ্বরই আমাদের স্বকীয়তা। এখন যে তোমার স্বাতন্ত্র্য আছে, উহা অবশ্য সেরূপ নয়। তুমি উহার দিকে অগ্রসর হইতেছ। স্বকীয়তার অর্থ এই যে, উহা এক অবিভাজ্য বস্তু। বর্তমান স্বাতন্ত্র্যকে কি করিয়া তুমি স্বকীয়তা বলো? এখন তুমি এক রকম চিন্তা করিতেছ, এক ঘণ্টা পরে আবার আর এক রকম এবং দুই ঘণ্টা পরে আবার অন্য রকম চিন্তা করিবে। স্বকীয়তার পরিবর্তন নাই। উহা সর্ব বস্তুর উপরে—অপরিবর্তনীয়। আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, ঐ অবস্থায় চিরকাল থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ তাহা হইলে তস্কর তস্করই থাকিয়া যাইবে, বদমাশ বদমাশই থাকিবে, অন্য কিছু হইতে পারিবে না। প্রকৃত স্বকীয়তার কোনই পরিবর্তন হয় না এবং কোন কালে হইবেও না এবং উহাই ঈশ্বর, যিনি আমাদের ভিতর নিত্য বিরাজমান।

বেদান্ত এক বিশাল পারাবার-বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হইতে পারে। এই বেদান্ত-মহাসাগরে একজন প্রকৃত যোগী—একজন পৌত্তলিক বা এমন কি একজন নাস্তিকের সহিতও সহ-অবস্থান করিতে পারেন। শুধু তাই নয়, বেদান্ত-মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী সব এক—সকলেই সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সন্তান।

সভ্যতার অন্যতম শক্তি বেদান্ত

ইংলণ্ডের অন্তর্গত রিজওয়ে গার্ডেনস-এ অবস্থিত এয়ালি লজে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ।

যাঁহাদের দৃষ্টি শুধু বস্তুর স্থূল বহিরঙ্গে আবদ্ধ, তাঁহারা ভারতীয় জাতির মধ্যে দেখিতে পান—কেবল একটি বিজিত ও নির্যাতিত জনসমাজ, কেবল এক দার্শনিক ও স্বপ্নবিলাসী মানব-গোষ্ঠী। ভারতবর্ষ যে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে জগজ্জয়ী, মনে হয়—তাঁহারা ইহা অনুভব করিতে অক্ষম। অবশ্য এ-কথা সত্য যে, যেমন অতিমাত্র কর্মচঞ্চল পাশ্চাত্য জাতি প্রাচ্যের অন্তর্মুখীনতা ও ধ্যানমগ্নতার সাহায্যে লাভবান্ হইতে পারে, সেইরূপ প্রাচ্যজাতিও অধিকতর কর্মোদ্যম ও শক্তি-অর্জনের দ্বারা লাভবান্ হইতে পারে। তাহা সত্ত্বেও এ প্রশ্ন অনিবার্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি একে একে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হইলেও কোন্ শক্তিবলে নিপীড়িত এবং নির্যাতিত হিন্দু ও ইহুদী জাতিই (যে দুইটি জাতি হইতে পৃথিবীর সব ধর্মমতের সৃষ্টি হইয়াছে) আজও বাঁচিয়া আছে? একমাত্র তাহাদের অধ্যাত্ম-শক্তিই ইহার কারণ হইতে পারে। নীরব হইলেও হিন্দুজাতি আজও বাঁচিয়া আছে, আর প্যালেস্টাইনে বাসকালে ইহুদীদের যে সংখ্যা ছিল, বর্তমানে তাহা বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ ভারতের দর্শনচিন্তা সমগ্র সভ্যজগতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহার রূপান্তর সাধন করিয়া চলিয়াছে এবং তাহাতে অনুস্যূত হইয়া আছে। পুরাকালে যখন ইওরোপখণ্ডের অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল, তখনও ভারতের বাণিজ্য সুদূর আফ্রিকার উপকূলে উপনীত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল; ফলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয়েরা কখনও তাহাদের দেশের বাহিরে পদার্পণ করেন নাই—এ বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি নাই।

ইহাও লক্ষণীয় যে, ভারতে কোনও বৈদেশিক শক্তির আধিপত্য-বিস্তার যেন সেই বিজয়ী শক্তির ইতিহাসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ; কারণ সেই সন্ধিক্ষণেই তাহার লাভ হইয়াছে—ঐশ্বর্য, অভ্যুদয়, রাজ্যবিস্তার এবং অধ্যাত্ম-সম্পদ। পাশ্চাত্য দেশের লোক সর্বদা ইহাই নির্ণয় করিতে সচেষ্ট যে, এ জগতে কত বেশি বস্তু সে আয়ত্ত করিয়া ভোগ করিতে পারিবে। প্রাচ্যদেশের

লোক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া চলে ও পরিমাণ করিতে চায় যে, কত অল্প ঐহিক সম্পদের দ্বারা তাহার দিন চলিতে পারে। বেদে আমরা এই সুপ্রাচীন জাতির ঈশ্বর-অনুসন্ধানের প্রয়াস দেখিতে পাই। ঈশ্বরের অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া তাঁহারা ধর্মের বিভিন্ন স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্বপুরুষদের উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অগ্নি অর্থাৎ অগ্নির অধিষ্ঠাতা দেবতা, ইন্দ্র অর্থাৎ বজ্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা, এবং বরুণ অর্থাৎ দেবগণের দেবতার উপাসনায় উপনীত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণার ক্রমবিকাশ—এই বহু দেবতা হইতে এক পরম দেবতার ধারণায় উপনীত হওয়া আমরা সকল ধর্মমতেই দেখিতে পাই। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, যিনি বিশ্বের সৃষ্টি ও পরিপালন করিতেছেন, এবং যিনি সকলের অন্তর্যামী, তিনিই সকল উপজাতীয় দেবতার অধিনায়ক। ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ক্রমবিকাশের পথে চলিয়া বহুদেবতাবাদ হইতে একেশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরকে এই প্রকার মানবীয় রূপগুণে বিভূষিত ভাবিয়া হিন্দুমন পরিতৃপ্ত হয় নাই, কারণ যাঁহারা ঈশ্বরানুসন্ধানে ব্যাপৃত, তাঁহাদের নিকট এই মত অত্যন্ত মানবীয় ভাবে পূর্ণ।

সুতরাং অবশেষে তাঁহারা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ ও জড়বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরানুসন্ধানের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্জগতে তাহাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিলেন। অন্তর্জগৎ বলিয়া কিছু আছে কি? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার স্বরূপ কি? ইহা স্বরূপতঃ আত্মা, ইহা তাঁহাদের নিজ সত্তার সহিত অভিন্ন এবং একমাত্র এই বস্তু সম্বন্ধেই মানুষ নিশ্চিত হইতে পারে। আগে নিজেকে জানিতে পারিলেই মানুষ বিশ্বকে জানিতে পারে, অন্যথা নয়। এই একই প্রশ্ন সৃষ্টির আদিকালে ঋগ্বেদে ভিন্নভাবে করা হইয়াছিল—'সৃষ্টির আদি হইতে কে বা কোন্ তত্ত্ব বর্তমান?' এই প্রশ্নের সমাধান ক্রমে বেদান্ত-দর্শনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। বেদান্তদর্শন বলেন, আত্মা আছেন অর্থাৎ যাহাকে আমরা পরমতত্ত্ব, সর্বাত্মা বা স্ব-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করি, তাহা হইল সেই শক্তি, যাহা দ্বারা আদিকাল হইতে সব কিছু প্রকাশমান হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে।

বৈদান্তিক একদিকে যেমন প্রশ্নের সমাধান ঐ করিলেন, তেমনি আবার নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিও আবিষ্কার করিয়া দিলেন। যদিও সকল ধর্মসম্প্রদায়ই

'হত্যা করিও না, অনিষ্ট করিও না, প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাসো' ইত্যাদি নীতিবাক্য শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি কেহই তাহাদের কারণ নির্দেশ করেন নাই। 'কেন আমি আমার প্রতিবেশীর ক্ষতিসাধন করিব না?'—এই প্রশ্নের সন্তোষজনক বা সংশয়াতীত কোন উত্তরই ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দুরা শুধু মতবাদ লইয়া তৃপ্ত না থাকিয়া আধ্যাত্মিক গবেষণা-সহায়ে ইহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। হিন্দু বলেন, আত্মা নির্বিশেষ ও সর্বব্যাপী, এবং সেইজন্য অনন্ত। অনন্ত বস্তু কখনও দুইটি হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে এক অনন্তের দ্বারা অপর অনন্ত সীমাবদ্ধ হইবে। জীবাত্মা সেই অনন্ত সর্বব্যাপী পরমাত্মার অংশবিশেষ, অতএব প্রতিবেশীকে আঘাত করিলে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই আঘাত করা হইবে। এই স্থূল আধ্যাত্মিক তত্ত্বটিই সর্বপ্রকার নীতিবাক্যের মূলে নিহিত আছে। অনেক সময়ই বিশ্বাস করা হয় যে, পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রগতির কালে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে উপনীত হয় এবং এক ধারণা হইতে অপর ধারণায় উপনীত হইতে হইলে পূর্বেরটি বর্জন করিতে হয়। কিন্তু ভ্রান্তি কখনও সত্যে লইয়া যাইতে পারে না। আত্মা যখন বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সে এক সত্য হইতে অপর সত্যে উপনীত হয়, এবং তাহার পক্ষে প্রত্যেক স্তরই সত্য। আত্মা ক্রমে নিম্নতর সত্য হইতে উর্ধ্বতর সত্যে উপনীত হয়। বিষয়টি এইভাবে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে পারা যায়। এক ব্যক্তি সূর্যের অভিমুখে যাত্রা করিল এবং প্রতি পদে সে আলোক-চিত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রথম চিত্রটি দ্বিতীয় চিত্র হইতে কতই না পৃথক্ হইবে, এবং তৃতীয়টি হইতে কিংবা সূর্যে উপনীত হইলে সর্বশেষটি হইতে উহা আরও কত পৃথক্ হইবে! এই চিত্রগুলি পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটিই সত্য; বিশেষ শুধু এইটুকু যে, দেশকালের পরিবেশ পরিবর্তিত হওয়ায় তাহারা বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। এই সত্যের স্বীকৃতির ফলেই হিন্দুগণ সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ ধর্মের মধ্যেই নিহিত সর্বসাধারণ সত্যকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এইজন্যই সকল জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দুগণই ধর্মের নামে কাহারও উপর অত্যাচার করে নাই। কোন মুসলমান সাধকের স্মৃতিসৌধের কথা মুসলমানরা বিস্মৃত হইলেও হিন্দুদের দ্বারা তাহা পূজিত হয়। হিন্দুগণের এইরূপ পরধর্ম-সহিষ্ণুতার বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রাচ্য মন যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির বাঞ্ছিত লক্ষ্য—ঐক্য না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনমতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক একমাত্র অণু বা পরমাণুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেন। যখন তিনি উহা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার আর কোন কিছু আবিষ্কার করিবার থাকে না। আর আমরা যখন আত্মার বা স্ব-স্বরূপের ঐক্য দর্শন করি, তখন আর অধিক অগ্রসর হইতে পারি না। আমাদের নিকট তখন ইহা স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, সেই একমাত্র সত্তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যাবতীয় বস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। অণুর নিজস্ব দৈর্ঘ্য বা বিস্তৃতি না থাকিলেও অণুগুলির মিশ্রণের ফলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বিস্তৃতির উদ্ভব হয়—এইরূপ কথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-দিগকে বাধ্য হইয়া অধ্যাত্মশাস্ত্রের সত্যতাও স্বীকার করিতে হয়। যখনই এক অণু অপর অণুর উপর ক্রিয়া করে, তখনই একটি যোগসূত্রের প্রয়োজন হয়। এই যোগসূত্রটি কিরূপ? যদি ইহা একটি তৃতীয় অণু হয়, তাহা হইলে সেই পূর্বের প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থাকিয়া যায়, কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় অণু কিরূপে তৃতীয় অণুর উপর কার্য করিবে? এইরূপ যুক্তি যে অনবস্থাদোষদুষ্ট, তাহা অতি সুস্পষ্ট। সকল প্রকার পদার্থবিদ্যা এই এক আপাতসত্য মতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে যে, বিন্দুর নিজের কোন পরিমাণ নাই, আর বিন্দুর মিলনে গঠিত রেখার দৈর্ঘ্য আছে অথচ প্রস্থ নাই—এই স্বীকৃতিতেও পরস্পর-বিরোধ থাকিয়া যায়। এইগুলি দেখা যায় না, ধারণাও করা যায় না। কেন? কারণ এগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়, অধ্যাত্ম বা তাত্ত্বিক ধারণা মাত্র। সুতরাং পরিশেষে দেখা যায়, মনই সকল অনুভবের আকার দান করে। আমি যখন কোন চেয়ার দেখি, তখন আমি আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বাহিরে অবস্থিত বাস্তব চেয়ারটি দেখি না, বহিঃস্থ বস্তু এবং তাহার মানস প্রতিচ্ছায়া—এই উভয়ই দেখি; অতএব শেষ পর্যন্ত জড়বাদীও ইন্দ্রিয়াতীত অধ্যাত্ম-তত্ত্বে উপনীত হন।

বেদান্ত-দর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব

বস্টনের টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবে প্রদত্ত ভাষণ।

আজ যখন সুযোগ পাইয়াছি, তখন এই অপরাহ্ণের আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করার পূর্বে একটু ধন্যবাদ প্রকাশের অনুমতি নিশ্চয় পাইব। আমি আপনাদের মধ্যে তিন বৎসর বাস করিয়াছি এবং আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছি। এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এই সুযোগে এথেন্স নগরী-সদৃশ আমেরিকার এই শহরে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া যাওয়া খুবই সঙ্গত। এদেশে প্রথম পদার্পণের অল্প কয়েক দিন পরেই মনে করিয়াছিলাম, এই জাতি-সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিব। কিন্তু আজ তিন বৎসর অতিবাহিত করিবার পরও দেখিতেছি যে, এ সম্বন্ধে একখানি পৃষ্ঠা পূর্ণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর বহু বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া আমি দেখিতেছি, বেশভূষা, আহার-বিহার বা আচার-ব্যবহারের খুঁটিনাটি সম্পর্কে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, মানুষ—পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ; সেই একই আশ্চর্য মানব-প্রকৃতি সর্বত্র বিরাজিত। তথাপি প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু আছে এবং এদেশীয়গণ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার সার আমি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। এই আমেরিকা মহাদেশে কেহ কোন ব্যক্তিগত বিচিত্র ব্যবহারাদি সম্বন্ধে সমালোচনা করে না। মানুষকে তাহারা নিছক মানুষরূপেই দেখে এবং মানুষরূপেই হৃদয় দিয়া বরণ করে। এই গুণটি আমি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখি নাই।

আমি এদেশে একটি ভারতীয় দর্শনমতের প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলাম; তাহা বেদান্ত-দর্শন নামে পরিচিত। এই দর্শন অতি প্রাচীন। ইহা বেদনামে খ্যাত প্রাচীন সুবিশাল আর্য-সাহিত্য হইতে উদ্ভূত। বহু শতাব্দী ধরিয়া সংগৃহীত এবং সঙ্কলিত সেই বিশাল সাহিত্যে যে-সব উপলব্ধি, তত্ত্বালোচনা, বিশ্লেষণ এবং অনুধ্যান সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা যেন তাহা হইতেই প্রস্ফুটিত একটি সুকোমল পুষ্প। এই বেদান্ত-দর্শনের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ ইহা সম্পূর্ণরূপে নৈর্ব্যক্তিক, ইহার উদ্ভবের জন্য ইহা কোনও ব্যক্তি বা ধর্মগুরুর নিকট ঋণী নয়; ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে

কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে নাই। অথচ যে-সব ধর্মমত ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে, তাহাদের বিরুদ্ধে ইহার কোন বিদ্বেষ নাই। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া বহু দর্শনমত ও ধর্মতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে—যথা বৌদ্ধধর্ম কিম্বা আধুনিককালের কয়েকটি ধর্মমত। খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদেরই মতো এই-সকল ধর্মসম্প্রদায়েরও প্রত্যেকটির একজন ধর্মনেতা আছেন এবং তাহারা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগত। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের স্থান যাবতীয় ধর্মমতের পটভূমিকায়। বেদান্তের সহিত পৃথিবীর কোন ধর্ম বা দর্শনের বিবাদ-বিসংবাদ নাই।

বেদান্ত একটি মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়াছে এবং বেদান্ত দাবি করে যে, উহা পৃথিবীর সব ধর্মমতের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এই তত্ত্বটি হইল এই যে, মানুষ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ; আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বে যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই সেই ঐশী চেতনা হইতে প্রসূত। মানব-প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু বীর্যবান্, যাহা কিছু মঙ্গলময় এবং যাহা কিছু ঐশ্বর্যবান্, সে-সবই ঐ ব্রহ্মসত্তা হইতে উদ্ভূত ; এবং যদিও তাহা অনেকের মধ্যেই সুপ্তভাবে বিরাজমান, তথাপি প্রকৃতপক্ষে মানুষে মানুষে কোনও প্রভেদ নাই, কারণ সকলেই সমভাবে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। যেন এক অনন্ত মহাসমুদ্র পশ্চাতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আমি ও আপনারা সকলে সেই অনন্ত মহাসমুদ্র হইতে একটি তরঙ্গরূপে উত্থিত হইয়াছি। আমরা প্রত্যেকেই সেই অনন্তকে বাহিরে প্রকাশ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। সুতরাং সুপ্ত সম্ভাবনার দিক হইতে দেখিতে গেলে যে সৎ- চিৎ- ও আনন্দময় মহাসাগরের সহিত আমরা স্বভাবতঃ অভিন্ন, সেই মহাসাগরে আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার রহিয়াছে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সেই ঐশী সম্ভাবনাকে প্রকাশ করিবার তারতম্যের দরুন ঘটিয়াছে। অতএব বেদান্তের অভিমত এই যে, প্রত্যেক মানুষ যতটুকু ব্রহ্মশক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই দিক হইতে বিচার না করিয়া তাহার স্বরূপের দিক হইতেই তাহাকে বিচার করিতে হইবে। সকল মানুষই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ; অতএব কোন আচার্য যখন কাহাকেও সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তখন নিন্দাবাদ ছাড়িয়া দিয়া ঐ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম-শক্তিকে জাগাইবার জন্যই তাঁহাকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

বেদান্ত ইহাও প্রচার করে যে, সমাজ-জীবনে ও প্রতি কর্মক্ষেত্রে আমরা যে বিশাল শক্তিপুঞ্জের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃতপক্ষে অন্তর হইতে বাহিরে উৎসারিত হয়। অতএব অন্য ধর্মসম্প্রদায় যাহাকে অনুপ্রেরণা বা ঐশী শক্তির অন্তঃপ্রবেশ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, বেদান্তবাদী তাহাকেই মানবের ঐশী শক্তির বহির্বিকাশ নামে অভিহিত করিতে চান; অথচ তিনি অপর ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ করিতে চান না। যাঁহারা মানুষের এই ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহাদের সহিত বেদান্তবাদীর কোন বিরোধ নাই। কারণ জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ব্রহ্মশক্তিরই উন্মেষে যত্নপর।

মানুষ যেন ক্ষুদ্র আধারে আবদ্ধ, অথচ সতত প্রসারশীল একটি অনন্ত শক্তিমান্ স্প্রীং-এর মতো; পরিদৃশ্যমান সমগ্র সামাজিক ঘটনা-পরম্পরা এই মুক্তি-প্রয়াসেরই ফল। আমাদের আশেপাশে যত কিছু প্রতিযোগিতা, হানাহানি এবং অশুভ দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই এই মুক্তি-প্রয়াসের কারণ বা পরিণাম নয়। আমাদের একজন প্রখ্যাত দার্শনিকের দৃষ্টান্ত অনুসারে ধরা যাক, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের নিমিত্ত উচ্চস্থানে কোথাও পরিপূর্ণ জলাশয় অবস্থান করিতেছে; জলপ্রবাহ কৃষিক্ষেত্র অভিমুখে ছুটিতে চায়, কিন্তু একটি রুদ্ধ দ্বারের দ্বারা প্রতিহত। দ্বারটি যেই উদ্‌ঘাটিত হইবে, অমনি জলরাশি নিজবেগে প্রবাহিত হইবে। পথে আবর্জনা বা মলিনতা থাকিলে প্রবহমান জলধারা তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু এই-সকল আবর্জনা ও মলিনতা মানবের এই দেবত্ব-বিকাশের পরিণামও নয়, কারণও নয়। ঐগুলি আনুষঙ্গিক অবস্থা মাত্র। অতএব ঐগুলির প্রতিকার সম্ভব।

বেদান্তের দাবি এই যে, এই চিন্তাধারা ভারতের ও বাহিরের সকল ধর্মমতের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়; তবে কোথাও উহা পুরাণের রূপক-কাহিনীর আকারে প্রকাশিত, আবার কোথাও প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপিত। বেদান্তের দৃঢ় অভিমত এই যে, এমন কোন ধর্ম-প্রেরণা এ-যাবৎ প্রকটিত হয় নাই, কিংবা এমন কোন মহান্ দেবমানবের অভ্যুত্থান হয় নাই, যাঁহাকে মানবপ্রকৃতির এই স্বতঃসিদ্ধ অসীম একত্বের অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা না চলে। নৈতিকতা, সততা, পরোপকার বলিয়া যাহা কিছু আমাদের নিকট পরিচিত, তাহাও ঐ একত্বেরই প্রকাশ ব্যতীত

আর কিছুই নয়। জীবনে এরূপ অনেক মুহূর্ত আসে, যখন প্রত্যেক মানুষই অনুভব করে যে, সে বিশ্বের সহিত এক ও অভিন্ন, এবং সে জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক এই অনুভূতিই জীবনে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই ঐক্যের প্রকাশকেই আমরা প্রেম ও করুণা নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং ইহাই আমাদের সমস্ত নীতিশাস্ত্র ও সততার মূলভিত্তি। বেদান্ত-দর্শনে ইহাকেই 'তত্ত্বমসি'—'তুমিই সেই'—এই মহাবাক্যে সূত্রাকারে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

প্রত্যেক মানুষকে বেদান্ত এই শিক্ষাই দেয়—সে এই বিশ্ব-সত্তার সহিত এক ও অভিন্ন; তাই যত আত্মা আছে, সব তোমারই আত্মা; যত জীবদেহ আছে, সব তোমারই দেহ; কাহাকেও আঘাত করার অর্থ নিজেকেই আঘাত করা এবং কাহাকেও ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা। তোমার অন্তর হইতে ঘৃণারাশি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অপর কাহাকেও তাহা আঘাত করুক না কেন, তোমাকেই আঘাত করিবে নিশ্চয়। আবার তোমার অন্তর হইতে প্রেম নির্গত হইলে প্রতিদানে তুমি প্রেমই পাইবে, কারণ আমিই বিশ্ব—সমগ্র বিশ্ব আমারই দেহ। আমি অসীম, তবে সম্প্রতি আমার সে অনুভূতি নাই। কিন্তু আমি সেই অসীমতার অনুভূতির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং যখন আমাতে সেই অসীমতার পূর্ণ চেতনা জাগরিত হইবে, তখন আমার পূর্ণতা-প্রাপ্তিও ঘটিবে।

বেদান্তের অপর একটি বিশিষ্ট ভাব এই যে, ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এই অসীম বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে এবং সকলেরই লক্ষ্য এক বলিয়া সকলকেই একই মতে আনয়নের চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হইবে। বেদান্তবাদীর কবিত্বময় ভাষায় বলা যায়, 'যেমন বিভিন্ন স্রোতস্বতী বিভিন্ন পর্বত-শিখর হইতে উদ্গত হইয়া নিম্নভূমিতে অবতরণ করে এবং সরল বা বক্রগতিতে যথেচ্ছ প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে সাগরে আসিয়া উপনীত হয়, তেমনি হে ভগবান্, এই-সকল বিভিন্ন বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস ও পথ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জন্মলাভ করিয়া সরল বা কুটিল পথে ধাবিত হইয়া অবশেষে তোমাতেই আসিয়া উপনীত হয়।'

বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, এই অভিনব ভাবরাশির আধারভূত এই প্রাচীন দার্শনিক মতটি সর্বত্র নিজ প্রভাব বিস্তার

করিয়া প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীর প্রথম প্রচারশীল ধর্মমত বৌদ্ধধর্মকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং আলেকজান্দ্রিয়াবাসী, অজ্ঞেয়বাদী ও মধ্যযুগের ইওরোপীয় দার্শনিকদের মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মকেও প্রভাবিত করিয়াছে। পরবর্তী কালে ইহা জার্মান-দেশীয় চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিয়া দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। অথচ এই অসীম প্রভাব প্রায় অলক্ষিতভাবেই পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়াছে। রাত্রির মৃদু শিশিরসম্পাতে যেমন শস্যক্ষেত্রে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, ঠিক তেমনি অতি ধীর গতিতে এবং অলক্ষ্যে এই অধ্যাত্ম-দর্শন মানবের কল্যাণার্থ সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। এই ধর্ম-প্রচারের জন্য সৈন্যগণের রণযাত্রার প্রয়োজন হয় নাই। পৃথিবীর অন্যতম প্রধান প্রচারশীল ধর্ম বৌদ্ধধর্মে আমরা দেখি, প্রথিতযশা সম্রাট্ অশোকের শিলালিপিসমূহ সাক্ষ্য দিতেছে, কিরূপে একদা বৌদ্ধধর্মপ্রচারকেরা আলেকজান্দ্রিয়া, আন্টিওক, পারস্য, চীন প্রভৃতি তদানীন্তন সভ্য জগতের বহু দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐ শিলালিপিতে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের তিনশত বৎসর পূর্বে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা যেন অপর ধর্মকে নিন্দা না করেন। বলা হইয়াছিল, 'যেখানকারই হউক, সকল ধর্মেরই ভিত্তি এক; সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা কর, তোমার যাহা বলিবার আছে, সে-সকলই শিক্ষা দাও, কিন্তু এমন কিছু করিও না যাহাতে কাহারও ক্ষতি হয়।'

এইরূপে দেখা যায়, ভারতবর্ষে হিন্দুদের দ্বারা অপর ধর্মাবলম্বীরা কখনও নির্যাতিত হয় নাই; প্রত্যুত এখানে দেখা যায় এক অত্যাশ্চর্য শ্রদ্ধা, যাহা তাহারা পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমত সম্বন্ধে পোষণ করিয়াছে। নিজেদের দেশ হইতে বিতাড়িত ইহুদীদের একাংশকে তাহারা আশ্রয় দিয়াছিল; তাহারই ফলে মালাবারে আজও ইহুদীরা বর্তমান। অপর এক সময়ে তাহারা ধ্বংসপ্রায় পারসীক জাতির যে একাংশকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, আজও তাঁহারা আমাদের জাতির অংশরূপে, আমাদের একান্ত প্রিয়জনরূপে আধুনিক বোম্বাই-প্রদেশবাসী পারসীকগণের মধ্যে রহিয়াছেন। যীশু-শিষ্য সেণ্ট টমাসের সহিত এদেশে আগমন করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন, এইরূপ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরাও এদেশে আছেন; তাঁহারা ভারতে বসবাস করিতে এবং নিজেদের ধর্মমত স্বাধীনভাবে পোষণ করিতে অনুমতি

পাইয়াছিলেন; তাঁহাদের একটি পল্লী আজও এদেশে বর্তমান। পরধর্মে বিদ্বেষহীনতার এই মনোভাব আজও ভারতে বিনষ্ট হয় নাই, কোন দিনই হইবে না এবং হইতেও পারে না।

বেদান্ত যে-সব মহতী বাণী প্রচার করে, সেগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহাই যখন স্থির হইল যে, আমরা জানিয়া হউক বা না জানিয়াই হউক একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তখন অপরের অক্ষমতায় ধৈর্যহারা হইব কেন? কেহ অপরের তুলনায় শ্লথগতি হইলেও আমাদের তো ধৈর্য হারাইয়া কোন লাভ হইবে না, তাহাকে আমাদের অভিশাপ দিবার অথবা নিন্দা করিবারও প্রয়োজন নাই। আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে, চিত্ত শুদ্ধ হইলে দেখিতে পাইব—সর্বকার্যে সেই একই ব্রহ্মশক্তির প্রভাব বিদ্যমান, সর্বমানব-হৃদয়ে সেই একই ব্রহ্মসত্তার বিকাশ ঘটিতেছে। শুধু সেই অবস্থাতেই আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের দাবি করিতে পারিব।

মানুষ যখন তাহার বিকাশের উচ্চতম স্তরে উপনীত হয়, যখন নর-নারীর ভেদ, লিঙ্গভেদ, মতভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন ভেদ তাহার নিকট প্রতিভাত হয় না, যখন সে এই-সকল ভেদবৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্বমানবের মিলনভূমি মহামানবতা বা একমাত্র ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎকার লাভ করে, কেবল তখনই সে বিশ্বভ্রাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র ঐরূপ ব্যক্তিকেই প্রকৃত বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে।

ইতিহাসে বেদান্তদর্শনের বাস্তবিক কার্যকারিতার যে-সকল সাক্ষ্য পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লিখিত হইল।

বেদান্ত ও অধিকার

লণ্ডনে প্রদত্ত

আমরা অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্বাংশ প্রায় শেষ করিয়াছি। একটা বিষয় এখনও বাকি আছে; বোধ হয় উহা সর্বাপেক্ষা দুরূহ। এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে আমাদের চারিদিকে দৃশ্যমান বস্তুনিচয়—সমগ্র জগৎই সেই এক সত্তা-স্বরূপের বিবর্তন। সংস্কৃতে এই সত্তাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। ব্রহ্ম প্রপঞ্চে পরিবর্তিত হইয়াছেন। কিন্তু এখানে একটি অসুবিধাও আছে। ব্রহ্মের পক্ষে বিশ্বপ্রকৃতিতে রূপায়িত হওয়া কি করিয়া সম্ভব? কেনই বা ব্রহ্ম বিপরিণত হইলেন? সংজ্ঞা হইতেই বোঝা যায় ব্রহ্ম অপরিণামী। অপরিবর্তনীয় বস্তুর পরিবর্তন একটি স্ববিরোধী উক্তি। যাঁহারা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁহাদেরও ঐ একই অসুবিধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করা যায়—এই সৃষ্টির কি প্রকারে উদ্ভব হইল? ইহা নিশ্চয়ই কোন সত্তাশূন্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; হইলে উহা স্ববিরোধী হইবে। সত্তাশূন্য কোন কিছু হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হওয়া কখনই সম্ভব নয়। কার্য কারণেরই অন্য রূপমাত্র। বীজ হইতে মহা মহীরুহ উৎপন্ন হয়। বৃক্ষটি বায়ু- ও জল-সংযুক্ত বীজ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বৃক্ষ-শরীর গঠনের নিমিত্ত যে পরিমাণ বায়ু ও জলের প্রয়োজন, তাহা নির্ধারণ করিবার যদি কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমরা দেখিতাম—কার্যরূপ বৃক্ষে যে পরিমাণ জল ও বায়ু আছে, উহার কারণরূপ জল ও বায়ুর পরিমাণও ঠিক তদ্রূপ। আধুনিক বিজ্ঞানও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে যে, কারণই অন্য আকারে কার্যে পরিণত হইতেছে। কারণের বিভিন্ন সমন্বিত অংশ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কার্যে পরিণত হয়। জগৎ কারণহীন—এইরূপ কষ্টকল্পনা আমাদের বর্জন করিতেই হইবে। সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, ঈশ্বরই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন।

কিন্তু আমরা একটি সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অপর একটি সঙ্কটে পতিত হইলাম। প্রত্যেক মতবাদেই ঈশ্বরের ধারণার সহিত তাঁহার অপরিণামিত্বের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত—একটির ভিতর দিয়াই

অপরটি আসিয়া পড়ে। অত্যন্ত আদিম অস্পষ্ট ঈশ্বরানুসন্ধান-ব্যাপারেও একটিমাত্র ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা হইল মুক্তি। এই ধারণা কিভাবে আসিল, তাহার ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতি আমরা দেখাইয়াছি। মুক্তি ও অপরিণামিত্ব একই কথা। যাহা মুক্ত, তাহাই অপরিণামী। যাহা অপরিণামী, তাহাই মুক্ত। কোন কিছুর ভিতরে কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইলে তাহার ভিতরে বা বাহিরে এমন কিছু থাকা চাই, যাহা ঐ বস্তুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা ঐ বস্তু অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহা এইরূপ এক বা একাধিক কারণ দ্বারা বদ্ধ, যেগুলি নিজেরাও ঐরূপ পরিবর্তনশীল। যদি মনে করা যায়—ঈশ্বরই জগৎ হইয়াছেন, তাহা হইলে ঈশ্বর এখানে তাঁহার স্বরূপ পরিবর্তন করিয়াছেন। আবার যদি মনে করি, অনন্ত ব্রহ্ম এই সান্ত জগৎ হইয়াছেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের অসীমত্বও তদনুপাতে হ্রাস পাইল, সুতরাং তাঁহার অসীমত্ব হইতে এই জগৎ বাদ পড়িতেছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে। পরিণামী ঈশ্বর ঈশ্বরই হইতে পারেন না। ঈশ্বরই জগৎ-রূপে পরিণত হন—এই মতবাদের দার্শনিক অসুবিধা পরিহার করিবার জন্য বেদান্তের একটি নির্ভীক মতবাদ আছে। তাহা এই যে, জগৎকে যেভাবে আমরা জানি বা উহার সম্বন্ধে যেভাবে আমরা চিন্তা করি, সেইভাবে উহার কোন অস্তিত্ব নাই। বেদান্ত বলেন, সেই অপরিণামীর কখনও পরিবর্তন হয় নাই, আর এই সমগ্র জগৎ একটি প্রাতিভাসিক সত্তা মাত্র, ইহার বাস্তব কোন সত্তা নাই। বেদান্ত বলেন, আমাদের এই যে অংশের ধারণা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর ধারণা এবং উহাদের পারস্পরিক পৃথক্‌ত্বের ধারণা, সে-সকলই বাহ্য—ঐগুলির কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। ঈশ্বরের কোনই পরিবর্তন হয় নাই; তিনি জগৎ-রূপে কখনও পরিণত হন নাই। আমরা ঈশ্বরকে যে জগৎ-রূপে দেখিয়া থাকি, তাহার কারণ আমরা দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখি। এই দেশ, কাল ও নিমিত্তই এই আপাত-প্রতীয়মান পার্থক্য সৃষ্টি করে, কিন্তু উহা পারমার্থিক নয়। ইহা সত্যসত্যই একটি দ্ব্যর্থহীন নির্ভীক মতবাদ। এখন এই মতবাদটি আমাদের আরও একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইবে। ভাববাদ (Idealism) সাধারণতঃ যে অর্থে গৃহীত হয়, ইহা সেইরূপ ভাববাদ নয়। ইহা বলে না যে, এই

জগতের কোন অস্তিত্ব নাই; ইহা বলে যে, ইহার অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু ইহাকে আমরা যে-ভাবে দেখিতেছি, ইহা তাহা নয়। এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য অদ্বৈত বেদান্ত একটি সুবিদিত উদাহরণ দেন। রাত্রির অন্ধকারে একটি গাছের গুঁড়িকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি ভূত বলিয়া মনে করে; দস্যু মনে করে, উহা পুলিস; বন্ধুর জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি মনে করে, উহা তাহারই বন্ধু। এই-সকল ব্যাপারে গাছের গুঁড়িটির কিন্তু কোনই পরিবর্তন হয় নাই, কতকগুলি আপাত-প্রতীয়মান পরিবর্তন অবশ্যই ঘটিয়াছিল এবং উহা ঘটিয়াছিল তাহাদেরই মনে, যাহারা ইহা দেখিয়াছিল। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে নিজের অনুভূতির (Subjective) দিক হইতে ইহা আমরা আরও বেশী বুঝিতে পারি। আমাদের বাহিরে এমন একটা কিছু আছে, যাহার যথার্থ স্বরূপ আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; ইহাকে বলা যাক 'ক'। আমাদের ভিতরেও আরও এমন একটা কিছু আছে, যাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; ইহাকে বলা যাক 'খ'। জ্ঞেয় বস্তু মাত্রই এই 'ক' এবং 'খ'-এর সমষ্টি; সুতরাং আমরা যে-সকল বস্তু জানি, সেগুলির প্রত্যেকটিরই দুইটি অংশ অবশ্যই থাকিবে—'ক' বহির্ভাগ এবং 'খ' অন্তর্ভাগ এবং 'ক' এবং 'খ'-এর সমষ্টিলব্ধ বস্তুকেই আমরা জানিতে সমর্থ হই। অতএব জগতের প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তু আংশিকভাবে আমাদের সৃষ্টি এবং উহার অপর অংশটি বাহ্য। এখন বেদান্ত বলেন, এই 'ক' এবং 'খ' এক অখণ্ড সত্তা।

হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক ও অন্য কয়েকজন আধুনিক দার্শনিক ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যখন বলা হয়—যে-শক্তি পুষ্পের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সেই শক্তিই আমার চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে—বৈদান্তিকও এই একই ভাব প্রচার করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা বলেন, বহির্জগতের সত্যতা এবং অন্তর্জগতের সত্যতা একই। এমন কি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, উহা আমাদেরই সৃষ্টি। আমরাই উহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করিয়াছি। বস্তুতঃ বাহ্যজগৎ বা অন্তর্জগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমাদের যদি আর একটি ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হয়, সমগ্র জগৎ আমাদিগের নিকট পরিবর্তিত হইয়া

যাইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, আমাদের মনই আমাদের অনুভূত বিষয়কে পরিবর্তিত করে। আমি যদি পরিবর্তিত হই, তবে বাহ্যজগৎও পরিবর্তিত হইবে। সুতরাং বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে—তুমি, আমি এবং বিশ্বের সর্ববস্তুই সেই নিরতিশয় ব্রহ্ম, আমরা ব্রহ্মের অংশবিশেষ নই, সমগ্রভাবেই আমরা ব্রহ্ম। তুমি সেই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের সবটুকুই; অন্যান্য সকলেও ঠিক তাই। কারণ এই অখণ্ড সত্তার অংশবিশেষের ধারণা হইতে পারে না। এই-সকল জাগতিক বিভাগ, এই-সকল সসীমত্ব প্রতীতি মাত্র, স্বরূপতঃ অসম্ভব। আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বাঙ্গসুন্দর; আমি কখনও বদ্ধ হই নাই। বেদান্ত নির্ভীকভাবে প্রচার করেন: তুমি যদি মনে কর—তুমি বদ্ধ, তাহা হইলে তুমি বদ্ধই থাকিয়া যাইবে; তুমি যদি বুঝিয়া থাকো তুমি মুক্ত, তবে তুমি মুক্তই থাকিবে। সুতরাং এই দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য হইল আমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, আমরা সর্বদাই মুক্ত ছিলাম এবং চিরদিনই মুক্ত থাকিব। আমাদের কখনও কোন পরিবর্তন হয় না, আমাদের মৃত্যু নাই, আমরা কখনই জন্মগ্রহণ করি না। তাহা হইলে এই পরিবর্তনসমূহ কি? এই বাহ্যজগতের অবস্থা কি দাঁড়াইবে? এই জগৎ একটি প্রাতিভাসিক জগৎ মাত্র—ইহা দেশ, কাল ও নিমিত্ত দ্বারা বদ্ধ। বেদান্তদর্শনে ইহাকে বিবর্তবাদ বলা হয়, প্রকৃতির এই ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়াই ব্রহ্ম প্রকাশিত হইতেছেন। ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন নাই; তাঁহার কোন পরিণামও নাই। অতি ক্ষুদ্র জীবকোষেও সেই অনন্ত পূর্ণব্রহ্মই অন্তর্নিহিত। বাহ্য আবরণের জন্যই ইহাকে জীবকোষ বলা হয়; কিন্তু জীবকোষ হইতে মহামানব পর্যন্ত সকলের আভ্যন্তর সত্তার কোন পরিবর্তন নাই—ইহা এক ও অপরিবর্তনীয়; কেবল বাহিরের আবরণেরই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

ধরা যাক এখানে একটি পর্দা রহিয়াছে এবং ইহার বাহিরে রহিয়াছে সুন্দর দৃশ্য। পর্দার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে; ইহার ভিতর দিয়াই আমরা বাহিরের দৃশ্যটির খানিকটা দেখিতে পাইতেছি। মনে করুন—এই ছিদ্রটি বাড়িতে লাগিল; ইহা যতই বড় হইতে লাগিল, ততই দৃশ্যটি অধিকতর-ভাবে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। পর্দাটি যখন তিরোহিত হইল, তখন আমরা সমগ্র দৃশ্যটির সম্মুখীন হইলাম। বাহিরের দৃশ্যটি হইল আত্মা; আমাদের ও দৃশ্যটির মধ্যে যে পর্দা, তাহা হইল মায়া—অর্থাৎ দেশ, কাল ও

নিমিত্ত। উহার কোথাও একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, যাহার মধ্য দিয়া আমি আত্মাকে এক ঝলক মাত্র দেখিতে পাইতেছি। ছিদ্রটি বড় হইলে আমি আত্মাকে আরও পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইব; আর যখন পর্দাটি একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখন অনুভব করিব—আমিই আত্মস্বরূপ। সুতরাং জাগতিক পরিবর্তন নিরতিশয় ব্রহ্মে সাধিত হয় না—হয় প্রকৃতিতে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম স্বপ্রকাশিত না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতিতে ক্রমবিবর্তন চলিতে থাকে। প্রত্যেকের মধ্যেই ব্রহ্ম রহিয়াছেন, কেবল কাহারও মধ্যে অন্যের তুলনায় তিনি অধিকতর প্রকাশিত। সমগ্র জগৎ পরমার্থতঃ এক। আত্মা-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক আত্মা অন্য আত্মা অপেক্ষা বড়—এরূপ বলার কোন অর্থ হয় না। মানুষ ইতর প্রাণী হইতে বা উদ্ভিদ অপেক্ষা বড়, এ-কথা বলাও সেজন্য নিরর্থক। সমগ্র জগৎ এক। উদ্ভিদের মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশের বাধা খুব বেশী, ইতর প্রাণীর মধ্যে একটু কম; মানুষের মধ্যে আরও কম; সংস্কৃতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিতে তদপেক্ষাও কম; কিন্তু পূর্ণতম ব্যক্তিতে আত্মপ্রকাশের বাধা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। আমাদের সমস্ত সংগ্রাম, প্রচেষ্টা, সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, যাহা কিছু আমরা ভাবি বা করি—সবই সেই একই লক্ষ্যের দিকে—পর্দাটিকে ছিন্ন করা, ছিদ্রটিকে বৃহত্তর করা, অভিব্যক্তি ও অন্তরালে অবস্থিত সত্যের মধ্যবর্তী আবরণকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া তোলা। সুতরাং আমাদের কাজ আত্মার মুক্তিসাধন নয়, আমাদের নিজেদের বন্ধনমুক্ত করা। সূর্য মেঘস্তরের দ্বারা আবৃত, কিন্তু মেঘস্তর সূর্যের কোন পরিবর্তন সংঘটন করিতে পারে না। বায়ুর কাজ মেঘগুলিকে সরাইয়া দেওয়া; আর মেঘগুলি যত সরিয়া যাইবে, সূর্যালোক তত প্রকাশ পাইবে। আত্মাতে কোন পরিবর্তন নাই—ইহা অনন্ত, নিত্য, নিরতিশয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। আত্মার কোন জন্ম বা মৃত্যু হইতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম, স্বর্গগমন—এই-সব আত্মার ধর্ম নয়। এইগুলি বিভিন্ন আপাতপ্রতীয়মান অভিব্যক্তি মাত্র—মরীচিকা বা নানাবিধ স্বপ্ন। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি জগৎসম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিতেছে—সে এখন দুর্ভাবনা এবং দুষ্কর্মের স্বপ্নে মশগুল, কিছু সময় পরে সেই স্বপ্নেরই ভাবনা তাহার পরবর্তী স্বপ্ন সৃষ্টি করিবে। সে স্বপ্নে দেখিতে পাইবে যে, সে একটি ভয়ঙ্কর স্থানে রহিয়াছে এবং নির্যাতিত হইতেছে। যে ব্যক্তি শুভ ভাবনা ও শুভকর্মের

স্বপ্ন দেখিতেছে, সে এই স্বপ্নের অবসানে আবার স্বপ্ন দেখিবে যে, সে আরও ভাল জায়গায় রহিয়াছে। এইভাবে স্বপ্নের পর স্বপ্ন আসিতে থাকে। কিন্তু এমন এক সময় আসিবে, যখন এই সমস্ত স্বপ্ন বিলীন হইয়া যাইবে। আমাদের প্রত্যেকের এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে, যখন মনে হইবে সমগ্র জগৎ স্বপ্নমাত্র ছিল; তখন আমরা দেখিতে পাইব—আত্মা তাহার এই পরিবেশ হইতে অনন্ত গুণে বড়। এই পরিবেশের ভিতর দিয়া সংগ্রাম করিতে করিতে এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা দেখিতে পাইব—অনন্তশক্তিসম্পন্ন আত্মার তুলনায় এই পরিবেশগুলির কোনই অর্থ নাই। অবশ্য এই প্রকার অনুভূতি কালসাপেক্ষ; আর অনন্তের তুলনায় এই কাল কিছুই নহে, ইহা সমুদ্রের মধ্যে বিন্দুতুল্য। সুতরাং শান্তভাবে আমরা অপেক্ষা করিতে পারি।

এইরূপে দেখিতে পাই, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র জগৎ সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চন্দ্র অন্যান্য গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে; একদিন না একদিন ইহা নিশ্চয়ই বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু যাঁহারা সজ্ঞানে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা শীঘ্রই কৃতকার্য হইবেন। কার্যতঃ এই বৈদান্তিক মতবাদের একটি সুবিধা এই যে, যথার্থ বিশ্বপ্রেমের ধারণা কেবল এই দৃষ্টিকোণ হইতেই সম্ভব। সকলেই আমাদের সহযাত্রী, সকলেই এক পথের পথিক—সকল জীবন, সকল তরু-গুল্ম, সকল প্রাণী—সকলেই সেই দিকে যাইতেছে; শুধু আমার মানুষ-ভ্রাতা নয়, জন্তু-জানোয়ার, তরু-গুল্ম, আমার সকল ভাই-ই সেই দিকে চলিয়াছে; কেবল আমার ভাল ভাইটি নয়, আমার খারাপ ভাইটিও, শুধু আমার ধার্মিক ভাইটি নয়, আমার দুর্বৃত্ত ভাইটিও—সকলেই একই লক্ষ্যে যাইতেছে। প্রত্যেকেই একই প্রবাহে ভাসমান, প্রত্যেকেই অনন্ত মুক্তির দিকে ছুটিতেছে। আমরা এই গতি বন্ধ করিতে পারি না; কেহই পারে না; হাজার চেষ্টা করিলেও কেহই ইহা হইতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না, মানুষ সম্মুখে চালিত হইবেই এবং পরিণামে মুক্তিলাভ করিবেই। সৃষ্টির অর্থ মুক্তির অবস্থায় পুনর্বার ফিরিয়া যাইবার জন্য সংগ্রাম। মুক্তিই আমাদের সত্তার কেন্দ্রস্থল; ইহা হইতে আমরা যেন উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা যে এখানে রহিয়াছি, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, আমরা কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি এবং এই কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণের অভিব্যক্তিকেই আমরা বলি 'প্রেম'।

এইরূপ প্রশ্ন করা হয়—এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? কোথায় ইহার স্থিতি? কোথায়ই বা ইহা ফিরিয়া যায়? উত্তর হইল—প্রেম হইতে ইহার উৎপত্তি, প্রেমেই ইহার স্থিতি, প্রেমেই ইহার প্রত্যাবর্তন। এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, কেহ পছন্দ করুক বা না করুক, কাহারও পক্ষে পশ্চাদপসরণ সম্ভব নহে। যতই পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করা যাক না কেন, প্রত্যেককেই কেন্দ্রস্থলে উপনীত হইতে হইবে। তবুও আমরা যদি জ্ঞাতসারে—সজ্ঞানে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের গতিপথ মসৃণ হইবে, ঘাত-প্রতিঘাতের কর্কশত্ব অনেকটা মন্দীভূত হইবে এবং আমাদের লক্ষ্যপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত হইবে। ইহা হইতে আমরা স্বভাবতঃ আর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই—সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত শক্তি আমাদের ভিতরে, বাহিরে নয়। যাহাকে আমরা প্রকৃতি বলি, তাহা একটি প্রতিবিম্বক কাঁচ মাত্র। আমাদের সমস্ত জ্ঞান আমাদের ভিতর হইতে আসিয়া প্রকৃতিরূপ এই কাঁচের উপরে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির এইটুকু মাত্রই প্রয়োজন; যাহাকে আমরা শক্তি বলি, প্রাকৃতিক রহস্য বলি, বেগ বলি, সে-সবই আমাদের ভিতরে। বাহ্যজগতে রহিয়াছে কেবল এক পরিবর্তনের পরম্পরা। প্রকৃতিতে কোন জ্ঞান নাই; আত্মা হইতেই সমস্ত জ্ঞান আসে। মানুষই আপনার মধ্যে জ্ঞানকে আবিষ্কার করে, উহাকে প্রকাশ করে। এই জ্ঞান অনন্তকাল ধরিয়া সেখানে রহিয়াছে। প্রত্যেকেই জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত আনন্দস্বরূপ এবং অনন্ত সত্তাস্বরূপ। অন্যত্র আমরা যেমন দেখিয়াছি, সাম্যের নৈতিক ফল যেরূপ, এই প্রকার বোধেরও ফল সেইরূপ।

বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার ধারণা মনুষ্যজীবনের কলঙ্কস্বরূপ। দুইটি শক্তি যেন নিয়ত ক্রিয়া করিতেছে; একটি বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা ভাঙিতেছে। অন্য ভাবে বলিতে গেলে একটি সুবিধার সৃষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা ভাঙিতেছে। আর যতই ব্যক্তিগত সুবিধা ভাঙিয়া যায়, ততই সে সমাজে জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি আসিতে থাকে। এইরূপ সংগ্রাম আমরা আমাদের চতুর্দিকে দেখিতে পাই। অবশ্য প্রথমে আসে পাশব সুবিধার ধারণা—দুর্বলের উপর সবলের অধিকারের চেষ্টা। এই জগতে ধনের অধিকারও ঐরূপ। একটি লোকের অপরের

তুলনায় যদি বেশী অর্থ হয়, তাহা হইলে যাহারা কম অর্থশালী সে তাহাদের উপর একটু অধিকার স্থাপন বা সুবিধা ভোগ করিতে চায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের অধিকার-লিপ্সা সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী। যেহেতু একটি লোক অন্যদের তুলনায় বেশী জানে শোনে, সেইজন্য সে অধিকতর সুবিধার দাবি করে। সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকার হইল আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার। ইহা নিকৃষ্টতম, কেন-না ইহা সর্বাধিক পরপীড়ক। যাহারা মনে করে যে, আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহারা বেশী জানে, তাহারা অন্যের উপর অধিকতর অধিকার দাবি করে। তাহারা বলে, 'হে সাধারণ ব্যক্তিগণ, এসো, আমাদের পূজা কর। আমরা ঈশ্বরের দূত; তোমাদের আমাদিগকে পূজা করিতেই হইবে।' কিন্তু বৈদান্তিক কাহাকেও শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনরূপ অধিকার দিতে পারেন না, একেবারেই নয়। একই শক্তি তো সকলের মধ্যেই বর্তমান; কোথাও সেই শক্তির অধিক প্রকাশ, কোথাও বা কিছু অল্প প্রকাশ। একই শক্তি সুপ্তাকারে প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে। অধিকারের দাবি তবে কোথায়? প্রত্যেক জীবেই পূর্ণজ্ঞান বিদ্যমান; মূর্খতমের মধ্যেও উহা রহিয়াছে, সে এখনও তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই; সম্ভবতঃ প্রকাশের সুযোগ পায় নাই; চতুর্দিকের পরিবেশ হয়তো তাহার অনুকূল হয় নাই। যখন সে সুযোগ পাইবে, তখন তাহা প্রকাশ করিবে। একজন লোক অন্য লোক হইতে বড় হইয়া জন্মিয়াছে—বেদান্ত কখনই এই ধারণা পোষণ করে না। দুইটি জাতির মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা স্বভাবতই উন্নততর—বৈদান্তিকের নিকট এই ধারণাও একেবারে নিরর্থক। তাহাদিগকে একই পরিবেশে ফেলিয়া দিয়া দেখ তো—একই রূপ বুদ্ধিবৃত্তি উহাদের ভিতরে প্রকাশ পায় কি না। তৎপূর্বে এক জাতি অপর জাতি হইতে বড়—এ-কথা বলিবার তোমার কোনই অধিকার নাই। আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই বিষয়ে কাহারও কোন বিশেষ অধিকার দাবি করা উচিত নয়। মনুষ্যজাতির সেবা করাই একটি অধিকার; ইহাই তো ঈশ্বরের আরাধনা। ঈশ্বর এখানেই আছেন, এই সমস্ত মানুষের মধ্যেই আছেন। তিনিই মানুষের অন্তরাত্মা। মানুষ আর কি অধিকার চাহিতে পারে? ঈশ্বরের বিশেষ দূত কেহ নাই, কখনও ছিল না এবং কখনও হইতে

পারে না। ছোট বা বড় সমস্ত প্রাণীই সমভাবে ঈশ্বরের রূপ; পার্থক্য কেবল উহার প্রকাশের মধ্যে। চিরপ্রচারিত সেই এক শাশ্বত বাণী তাহাদের নিকট ক্রমে ক্রমে আসিতেছে। সেই শাশ্বত বাণী প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে লিখিত হইয়াছে। উহা সেখানেই বিরাজমান, এবং সকলেই উহা প্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট। অনুকূল পরিবেশে কেহ কেহ অন্যের তুলনায় ইহা কিছুটা ভালভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছে, কিন্তু বাণীর বাহক হিসাবে তাহারা একই। এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের কী দাবি হইতে পারে? অতীতের সকল ঈশ্বরপ্রেরিতের মতো মূর্খতম মানব, অজ্ঞানতম শিশুও ঈশ্বরপ্রেরিত, এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা মহামানব হইবেন, তাঁহারা তাহাদেরই মতো; মূর্খতম ও অজ্ঞানতম মানবগণও সমভাবে মহান্। প্রত্যেক জীবের অন্তস্তলে চিরকালের জন্য সেই অনন্ত শাশ্বত বাণী রক্ষিত আছে। জীবমাত্রেরই মধ্যে সেই 'মহতো মহীয়ান্' ব্রহ্মের অনন্ত বাণী নিহিত রহিয়াছে। ইহা তো সদা বর্তমান। সুতরাং অদ্বৈতের কাজ হইল এই-সকল অধিকার ভাঙিয়া দেওয়া। ইহা কঠিনতম কাজ এবং আশ্চর্যের বিষয়—ইহা অন্য দেশের তুলনায় স্বীয় জন্মভূমিতেই কম সক্রিয়। অধিকারবাদের যদি কোন দেশ থাকে, তাহা হইলে ইহা সেই দেশই, যাহা এই অদ্বৈতদর্শনের জন্মভূমি—এই দেশেই অধ্যাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির এবং উচ্চবংশজাত ব্যক্তির বিশেষ অধিকার রহিয়াছে। সেখানে অবশ্য আর্থিক অধিকারবাদ ততটা নাই (আমার মনে হয়, ইহাই উহার ভাল দিক্), কিন্তু জন্মগত ও ধর্মগত অধিকার সেখানে সর্বত্র বিদ্যমান।

একবার এই বৈদান্তিক নীতিপ্রচারের প্রচণ্ড চেষ্টা হইয়াছিল; উহা বেশ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া সফলও হইয়াছিল। আমরা জানি ইতিহাসে ঐ কালটি ঐ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। আমি বৌদ্ধগণের অধিকারবাদ-খণ্ডনের কথা বলিতেছি। বুদ্ধের প্রতি প্রযুক্ত কয়েকটি অতি সুন্দর বিশেষণ আমার মনে আছে। ঐগুলি হইতেছে—'হে তথাগত, তুমি বর্ণাশ্রম-খণ্ডন-কারী, তুমি সর্ব-অধিকার-বিধ্বংসী, তুমি সর্বপ্রাণীর ঐক্য-বিঘোষক।' তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তিনি একমাত্র ঐক্যের ভাবই প্রচার করিয়াছিলেন। এই ঐক্যভাবের অন্তর্নিহিত শক্তি বুদ্ধের শ্রমণসংঘ অনেকটা ধরিতে পারে নাই। আমরা দেখিতে পাই, ঐ সংঘকে

একটি উচ্চ ও নীচ পার্থক্য-যুক্ত যাজক-সম্প্রদায়ে পরিণত করিবার শত শত চেষ্টা হইয়াছে। মানুষমাত্রকে যখন বলা হয়, 'তোমরা সকলেই দেবতা' তখন এই ধরনের সংঘ গঠন সম্ভব নয়—সংঘের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না। বেদান্তের অন্যতম শুভফল হইল ধর্মচিন্তা-বিষয়ে সকলকে স্বাধীনতা দেওয়া; ভারতবর্ষ তাহার ইতিহাসে সকল যুগেই এই স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে। ইহা যথার্থ গৌরবের বিষয় যে, ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যেখানে কখনও ধর্মের জন্য উৎপীড়ন হয় নাই, যেখানে ধর্মবিষয়ে মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

বৈদান্তিক নীতির এই বহিরাবরণ দিকটির পূর্বে যেরূপ প্রয়োজনীয়তা ছিল, এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। বরং অতীতের তুলনায় ইহা বোধ হয় অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, কারণ জ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার অধিকার দাবি করাও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ঈশ্বর ও শয়তানের ধারণা অথবা অহুরা মাজ্‌দা ও অহ্রিমানের ধারণার মধ্যে যথেষ্ট কবিকল্পনা আছে। ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে পার্থক্য অন্য কিছুতে নয়, কেবল স্বার্থশূন্যতা ও স্বার্থপরতায়। ঈশ্বর যতটুকু জানেন, শয়তানও ততটুকুই জানে; সে ঈশ্বরের মতোই শক্তিশালী, কেবল তাহার পবিত্রতা নাই—এই পবিত্রতার অভাবই তাহাকে শয়তান করিয়াছে। এই একই মাপকাঠি বর্তমান জগতের প্রতি প্রয়োগ কর: পবিত্রতা না থাকিলে জ্ঞান ও শক্তির আধিক্য মানুষকে শয়তানে পরিণত করে। বর্তমানে যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম নির্মাণ দ্বারা অসাধারণ শক্তি সঞ্চিত হইতেছে এবং এমন সব অধিকার দাবি করা হইতেছে, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনও করা হয় নাই। এই কারণেই বেদান্ত এই অধিকারবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে চায়, মানবাত্মার উপর এই উৎপীড়ন চূর্ণবিচূর্ণ করিতে চায়।

তোমাদের মধ্যে যাহারা গীতা অধ্যয়ন করিয়াছ, এই স্মরণীয় উক্তিগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের মনে আছে: 'যিনি বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর অথবা চণ্ডালে সমদর্শী, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তি', 'যাঁহাদের মন সর্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা ইহজীবনেই জন্মান্তর জয় করেন; যেহেতু ব্রহ্ম সর্বত্র এক ও গুণদোষাদি দ্বন্দ্বহীন, সেইহেতু তাঁহারাও ব্রহ্মে অবস্থিত হন অর্থাৎ তাঁহারা জীবন্মুক্ত হন।'

সকলের প্রতি এই সমভাব—ইহাই বৈদান্তিক নীতির সারমর্ম। আমরা দেখিয়াছি, আমাদেরই মন বাহ্যজগতের উপর প্রভুত্ব করে। বিষয়ীকে (subject) পরিবর্তন কর, বিষয়ও (object) পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। নিজেকে পবিত্র কর; তাহা হইলে জগৎ পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। এই বিষয়ই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আমরা উত্তরোত্তর আমাদের প্রতিবেশীদের লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি; কিন্তু নিজেদের লইয়া আমাদের ব্যস্ততা ক্রমশই কমিতেছে। আমরা যদি বদলাইয়া যাই, জগৎও বদলাইয়া যাইবে। আমরা যদি পবিত্র হই, জগৎও পবিত্র হইবে। কথা হইতেছে এই যে, অন্যের মধ্যে আমি মন্দ দেখিব কেন? আমি নিজে মন্দ না হইলে কখনও মন্দ দেখিতে পারি না। আমি নিজে দুর্বল না হইলে কখনও কষ্ট পাইতে পারি না। আমার শৈশবে যে-সকল বস্তু আমাকে কষ্ট দিত, এখন তাহারা আর কষ্ট দেয় না। বেদান্ত বলেন—বিষয়ীর পরিবর্তন হওয়াতে বিষয়ও পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। যখন আমরা ঐ প্রকার অত্যাশ্চর্য ঐক্য ও সাম্যের অবস্থায় উপনীত হইব, তখন যে-সকল বস্তুকে আমরা দুঃখ ও মন্দের কারণ বলিতেছি, সেইগুলিকে উপেক্ষা করিব, সেগুলির দিকে আমরা উপহাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। বেদান্তে ইহাকেই মুক্তিলাভ বলে। মুক্তি যে ক্রমশঃ আসিতেছে, এই সমভাব ও ঐক্যবোধের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই তাহার সূচনা। সুখ ও দুঃখে সমভাব, জয় ও পরাজয়ে তুল্যভাব—এই প্রকার মনই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে বুঝিতে হইবে।

মনকে সহজে জয় করা যায় না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যাপারে, স্বল্পতম উত্তেজনায় বা বিপদে যে-সকল মন তরঙ্গায়িত হয়, তাহাদের কিরূপ অদ্ভুত অবস্থা ভাবিয়া দেখুন! মনের উপর যখন এই পরিবর্তনগুলি আসে, তখন মহত্ত্ব বা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কিছু বলা অবান্তর মাত্র। মনের এই অস্থির অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতেই হইবে। আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে বাহিরের বিরুদ্ধ শক্তি আসিলে আমরা কতটুকুই বা তাহা দ্বারা প্রভাবিত হই, আর উহা সত্ত্বেও কতটুকুই বা আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারি। আমাদিগকে সাম্য হইতে বিচ্যুত করিতে উদ্যত সকল শক্তিকে যখন আমরা বাধা দিতে পারিব, তখনই আমরা মুক্তিলাভ

করিব, ইহার পূর্বে নয়। এই অব্যাহত সাম্যই মুক্তি। ইহাই মুক্তি; এই অবস্থা ব্যতীত অন্য কিছুকে মুক্তি বলা যাইতে পারে না। এই ধারণা হইতেই—এই উৎস হইতেই সর্বপ্রকার সুন্দর ভাবধারা এই জগতের উপর প্রবাহিত হইয়াছে; প্রকাশভঙ্গীতে আপাততঃ পরস্পরবিরোধী হওয়ায় সাধারণতঃ এগুলি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—বহু নির্ভীক ও অদ্ভুত অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তি বাহ্য-জগতের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ধ্যান-ধারণার জন্য গিরিগুহা বা অরণ্যে বাস করিতেছেন। মুক্তিলাভই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর প্রতিভাবান্ বরণীয় ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা দুর্গত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানবজাতিকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট। আপাততঃ এই দুই পন্থা পরস্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। যে-ব্যক্তি মানবসমাজ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া গিরিগুহায় বাস করেন, তিনি মানবজাতির অভ্যুত্থানের জন্য ব্যাপৃত ব্যক্তিদের নিতান্ত করুণা ও উপহাসের পাত্র বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, 'কি মূর্খ! জগতে করণীয় কি আছে? মায়ার জগৎ সর্বদা ঐরূপই থাকিবে। ইহার পরিবর্তন হইতে পারে না।' ভারতবর্ষে আমি যদি আমাদের কোন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি কি বেদান্তে বিশ্বাসী?' তিনি বলিবেন, 'তাই তো আমার ধর্ম; আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি; বেদান্তই আমার প্রাণ।' 'আচ্ছা, তবে কি আপনি সর্ববস্তুর সাম্যে, সর্বপ্রাণীর ঐক্যে বিশ্বাসী?' তিনি বলিবেন, 'নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস করি।' পরমুহূর্তে যখন একটি নীচজাতির লোক এই পুরোহিতের নিকটে আসিবে, তখন সেই লোকটির স্পর্শ এড়াইবার জন্য তিনি লাফ দিয়া রাস্তার একধারে চলিয়া যাইবেন। যদি প্রশ্ন করেন, 'আপনি লাফ দিতেছেন কেন?' তিনি বলিবেন, 'কারণ তাহার স্পর্শমাত্রই যে আমাকে অপবিত্র করিয়া ফেলিত।' 'কিন্তু আপনি এই মাত্র তো বলিতেছিলেন, আমরা সকলেই সমান; আপনি তো স্বীকার করেন, আত্মাতে আত্মাতে কোন পার্থক্য নাই।' উত্তরে তিনি বলিবেন, 'ঠিকই, তবে গৃহস্থদের পক্ষে ইহা একটি তত্ত্বমাত্র। যখন বনে যাইব, তখন আমি সকলকে সমান জ্ঞান করিব।' তুমি তোমাদের ইংলণ্ডের বংশমর্যাদায় এবং ধনকৌলীন্যে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা কর, একজন খ্রীষ্টান হিস্যাবে তিনি মানবভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী কি না;

সকলেই তো ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে। তিনি বলিবেন, 'নিশ্চয়ই'; কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি সাধারণ লোক সম্বন্ধে একটা কিছু অশোভন মন্তব্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানবভ্রাতৃত্ব একটি কথার কথা-রূপে রহিয়া গিয়াছে; কখনই ইহা কার্যে পরিণত হয় নাই। সকলেই ইহা বুঝে, সত্য বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু যখনই তুমি তাহাদিগকে ইহা কার্যে পরিণত করিতে বলিবে, তখনই তাহারা বলিবে, ইহা কার্যে পরিণত করিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিবে।

একজন রাজার বহুসংখ্যক সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই বলিতেন, 'আমি আমার প্রভুর জন্য আমার জীবন বিসর্জন করিতে প্রস্তুত; আমার মতো অকপট ব্যক্তি কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।' কালক্রমে একজন সন্ন্যাসী সেই রাজার নিকট আসিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, 'কোন দিনই কোন রাজার আমার মতো এতজন অকপট বিশ্বস্ত সভাসদ্ ছিল না।' সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, 'আমি ইহা বিশ্বাস করি না।' রাজা বলিলেন, 'আপনি ইচ্ছা করিলে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।' ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী ঘোষণা করিলেন, 'আমি একটি বিরাট যজ্ঞ করিব, যাহা দ্বারা এই রাজার রাজত্ব দীর্ঘকাল থাকিবে। অবশ্য একটা শর্ত আছে—যজ্ঞের জন্য একটি ক্ষুদ্র দুগ্ধ-পুষ্করিণী করিতে হইবে, উহাতে রাজার প্রত্যেক সভাসদ্‌কে অন্ধকার রাত্রিতে এক কলসী দুধ ঢালিতে হইবে।' রাজা হাসিয়া বলিলেন, 'ইহাই কি পরীক্ষা?' তিনি তাঁহার সভাসদ্‌গণকে তাঁহার নিকট আসিতে বলিলেন এবং কি করিতে হইবে নির্দেশ দিলেন। তাঁহারা সকলে সেই প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। নিশীথ রাত্রিতে তাঁহারা আসিয়া পুষ্করিণীতে স্ব স্ব কলসী শূন্য করিলেন, কিন্তু প্রভাতে দেখা গেল পুষ্করিণীটি কেবল জলে পূর্ণ। সভাসদ্‌গণকে একত্র করাইয়া এই ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইল। তাঁহাদের প্রত্যেকেই ভাবিয়াছিলেন, যখন এত কলসী দুধ ঢালা হইতেছে, তখন তিনি যে জল ঢালিতেছেন, তাহা কেহ ধরিতে পারিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই এইরূপ ধারণা। গল্পের সভাসদ্‌গণের ন্যায় আমরাও স্ব স্ব ভাগের কাজ ঐরূপে করিয়া যাইতেছি।

পুরোহিত বলেন, জগতে এত বেশী ঐক্যের বোধ রহিয়াছে যে, আমি যদি আমার ক্ষুদ্র অধিকারটুকু লইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা কেহ ধরিতে পারিবে না। আমাদের ধনীরাও অনুরূপ বলিয়া থাকেন, প্রত্যেক দেশের উৎপীড়করাও এইরূপ বলে। উৎপীড়কদের তুলনায় উৎপীড়িতদের জীবনে বেশী আশা আছে। উৎপীড়কদের পক্ষে মুক্তিলাভ করিতে অনেক বেশী সময় লাগিবে, অন্যের পক্ষে সময় লাগিবে কম। খেঁকশিয়ালের নিষ্ঠুরতা সিংহের নিষ্ঠুরতা হইতে ভীষণতর। সিংহ একবার আঘাত করিয়া কিছুকালের জন্য শান্ত থাকে, কিন্তু খেঁকশিয়াল বারবার তাহার শিকারের পশ্চাতে ছুটিবার চেষ্টা করে, একবারও সুযোগ হারায় না। পুরোহিত-তন্ত্র স্বভাবতই নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ। সেই জন্যই যেখানে পুরোহিত-তন্ত্রের উদ্ভব হয়, সেখানে ধর্মের পতন বা গ্লানি হয়। বেদান্ত বলেন, আমাদিগকে অধিকারের ভাব ছাড়িয়া দিতে হইবে ; ইহা ছাড়িলেই ধর্ম আসিবে। তৎপূর্বে কোন ধর্ম আসে না।

তুমি কি খ্রীষ্টের এই কথা বিশ্বাস কর—'তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দাও এবং ঐ অর্থ দরিদ্রগণকে দান কর'? এইখানেই যথার্থ ঐক্য, শাস্ত্রবাক্যকে এখানে আপন ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা নাই, এখানে সত্যকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা হইতেছে। শাস্ত্রবাক্যকে ইচ্ছানুরূপ ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিও না। আমি শুনিয়াছি, এইরূপ বলা হয় যে, মুষ্টিমেয় ইহুদী—যাঁহারা যীশুর উপদেশ শুনিতেন, তাঁহাদিগকেই কেবল এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইলে অন্যান্য ব্যাপারেও একই যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তবে তাঁহার অন্যান্য উপদেশও শুধু ইহুদীদের জন্য বলা হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। ইচ্ছানুরূপ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিও না ; যথার্থ সত্যের সম্মুখীন হইবার সাহস অবলম্বন কর। যদি বা আমরা সত্যে উপনীত হইতে না পারি, আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা, অক্ষমতা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা যেন আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করি। আমরা যেন অন্তরে এই আশা পোষণ করি—কোন দিন আমরা সত্যে উপনীত হইবই ; আমরা ইহার জন্য যেন সচেষ্ট থাকি। আদর্শটি এই—'তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রগণকে ঐ অর্থ দান কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।' এইরূপে সকল অধিকারকে এবং আমাদের মধ্যে অধিকারের পরিপোষক সবকিছুকে নিষ্পিষ্ট করিয়া আমরা যেন সেই জ্ঞান-

লাভের চেষ্টা করি, যাহা সকল মানবজাতির প্রতি সাম্যবোধ আনয়ন করিবে। তুমি মনে কর যে, তুমি একটু বেশী মার্জিত ভাষায় কথা কও বলিয়া পথচারী লোকটি অপেক্ষা তুমি উন্নততর। স্মরণ রাখিও, তুমি যখন এইরূপ ভাবিতে থাকো, তখন তুমি মুক্তির দিকে অগ্রসর না হইয়া বরং নিজের পায়ের জন্য নূতন শৃঙ্খল নির্মাণ করিতেছ। সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতার অহঙ্কার যদি তোমাতে প্রবেশ করে, তবে তোমার সর্বনাশ অনিবার্য। ইহাই সর্বাপেক্ষা নিদারুণ বন্ধন। ঐশ্বর্য বা অন্য কোন বন্ধন মানবাত্মাকে এরূপ শৃঙ্খলিত করিতে পারে না। 'আমি অন্যের অপেক্ষা পবিত্রতর'—ইহা অপেক্ষা সর্বনাশকর অন্য কোন চিন্তা মানুষ করিতে পারে না। তুমি কি অর্থে পবিত্র? তোমার অন্তঃস্থিত ঈশ্বর সকলেরই অন্তরে অবস্থিত। তুমি যদি এই তত্ত্ব না জানিয়া থাকো, তাহা হইলে তুমি কিছুই জান নাই। পার্থক্য কি করিয়া থাকিবে? সব বস্তুই এক। প্রত্যেক জীবই সেই সর্ববৃহৎ 'মহতো-মহীয়ান্' ঈশ্বরের মন্দির। তুমি যদি ইহা দেখিতে পারো, তবে ভাল; যদি না পারো, তবে আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে তোমার এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে।

অধিকার

লণ্ডনের সিসেম ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা।

সমগ্র প্রকৃতিতে দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া মনে হয়। একটি সর্বদাই এক বস্তু হইতে অপর বস্তুকে পৃথক্ করিতেছে এবং অপরটি প্রতি মুহূর্তে বস্তুগুলিকে সর্বদা এক সূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথমটি উত্তরোত্তর পৃথক্ পৃথক্ সত্তা সৃষ্টি করিতেছে; অন্যটি যেন সত্তাগুলিকে একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করিতেছে এবং এই-সব পরিদৃশ্যমান পৃথক্ত্বের মধ্যে ঐক্য ও সাম্য আনে। মনে হয়, এই দুইটি শক্তির ক্রিয়া প্রকৃতি ও মনুষ্যজীবনের প্রত্যেক বিভাগে বিদ্যমান। বাহ্যজগতে বা ভৌতিক জগতে এই দুইটি শক্তি অতি স্পষ্টভাবে সক্রিয়, আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। ইহারা ব্যক্তি-ভাবগুলিকে পরস্পর পৃথক্ করিতেছে, অন্যগুলি হইতে স্পষ্টতর করিয়া তুলিতেছে; আবার এগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া অভিব্যক্তি ও আকৃতির সাদৃশ্য প্রকাশ করিতেছে। মানুষের সামাজিক জীবনেও এই একই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ-জীবন গড়িয়া ওঠার সময় হইতেই এই দুইটি শক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে—একটি ভেদ সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি ঐক্য স্থাপন করিতেছে। ইহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন আকারে দেখা দেয় এবং ইহা বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। কিন্তু মূল উপাদান সকলের মধ্যেই বর্তমান। একটির কাজ বস্তুগুলিকে পরস্পর পৃথক্ করা এবং অপরটির কাজ ঐগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। একটি বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি উহা ভাঙিতেছে; একটি শ্রেণী ও অধিকার সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি সেগুলি ধ্বংস করিতেছে। সমগ্র বিশ্ব এই দুইটি শক্তির দ্বন্দ্বক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়। এক পক্ষ বলে, যদিও এই একীকরণ-শক্তি বিদ্যমান, তথাপি সর্বশক্তি দ্বারা আমাদিগকে ইহার প্রতিরোধ করিতে হইবে, কারণ ইহা মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়। পূর্ণ ঐক্য ও পূর্ণ বিলয় একই কথা; জগতে এই নিত্যক্রিয়াশীল বৈষম্য-উৎপাদিকা শক্তি যখন বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন জগৎ লোপ পাইবে। বৈষম্য বা বৈচিত্র্যই দৃশ্যমান জগতের কারণ; একীকরণ বা ঐক্য দৃশ্যমান জগৎকে সমরূপ প্রাণহীন জড়পিণ্ডে পরিণত

করে। মানবজাতি অবশ্যই এইরূপ অবস্থা পরিহার করিতে চায়। আমরা আমাদের আশে-পাশে যে-সকল বস্তু ও ব্যাপার দেখি, সেগুলির ক্ষেত্রেও এই একই যুক্তি প্রয়োগ করা হয়। জোরের সহিত এরূপও বলা হয় যে, জড়দেহে এবং সামাজিক শ্রেণী-বিভাগে সম্পূর্ণ সমতা স্বাভাবিক মৃত্যু আনে এবং সমাজের বিলোপ সাধন করে। চিন্তা এবং অনুভূতির ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সমতা মননশক্তির অপচয় ও অবনতি ঘটায়। সুতরাং সম্পূর্ণ সমতা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। ইহা এক পক্ষের যুক্তি, প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন সময়ে শুধু ভাষার পরিবর্তনের দ্বারা ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে; ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ যখন জাতিবিভাগ সমর্থন করিতে চান, যখন সমাজের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ শ্রেণীর অধিকার রক্ষা করিতে চান, তখন কার্যতঃ তাঁহারাও এই যুক্তির উপরই জোর দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ বলেন, জাতিবিভাগ বিলুপ্ত হইলে সমাজ ধ্বংস হইবে এবং সগর্বে এই ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপিত করেন যে, ভারতীয় ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজই সর্বাধিক দীর্ঘায়ু। সুতরাং বেশ কিছু জোরের সহিতই তাঁহারা তাঁহাদের এই যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিছুটা দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিতই তাঁহারা বলেন, যে সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু করে, তাহা অপেক্ষা যে-ব্যবস্থায় সে দীর্ঘতম জীবন লাভ করিতে পারে, তাহা অবশ্যই শ্রেয়ঃ।

পক্ষান্তরে সকল সময়েই ঐক্যের সমর্থক একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং অন্যান্য মহান্ ধর্মপ্রচারকদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত নূতন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, এবং নিপীড়িত পদদলিত ও অধিকার-বঞ্চিতদের দাবিতে এই ঐক্য ও সমতার বাণীই বিঘোষিত হইতেছে। কিন্তু মানবপ্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিবেই। যাঁহাদের ব্যক্তিগত সুবিধা আছে, তাঁহারা উহা রাখিতে চান, এবং ইহার পক্ষে কোন যুক্তি পাইলে ঐ যুক্তি যতই অদ্ভুত ও একদেশদর্শী হউক না কেন, তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন। এই মন্তব্য উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য।

দর্শনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আর একটি রূপ ধারণ করে। বৌদ্ধগণ বলেন, পরিদৃশ্যমান ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-স্থাপনকারী কোন-কিছুর সন্ধান করার প্রয়োজন নাই; এই জগৎপ্রপঞ্চ লইয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বৈচিত্র্য যতই দুঃখজনক ও দুর্বল বলিয়া মনে হউক না কেন, ইহাই জীবনের

সারবস্তু, ইহার চেয়ে বেশী আমরা কিছু পাইতে পারি না। বৈদান্তিক বলেন, একমাত্র একত্বই বর্তমান রহিয়াছে। বৈচিত্র্য শুধু বহির্বিষয়ক, ক্ষণস্থায়ী এবং আপাতপ্রতীয়মান। বৈদান্তিক বলেন, 'বৈচিত্র্যের দিকে তাকাইও না। একত্বের নিকট ফিরিয়া যাও।' বৌদ্ধ বলেন, 'ঐক্য পরিহার কর, ইহা একটি ভ্রম। বৈচিত্র্যের দিকে যাও।' ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে মতের এই পার্থক্য আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, কারণ প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক তত্ত্বের সংখ্যা খুবই অল্প। দর্শন ও দার্শনিক ভাবধারা, ধর্ম ও ধর্মবিষয়ক জ্ঞান পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিয়াছিল; আমরা বিভিন্ন ভাষায় একই প্রকার সত্যসমূহের পুনরাবৃত্তি করিতেছি মাত্র; কখন অভিনব উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে সমৃদ্ধ করিতেছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আজ পর্যন্ত একই সংগ্রাম চলিতেছে। এক পক্ষ চান—আমরা জগৎপ্রপঞ্চ ও উহার এই-সব বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে আঁকড়াইয়া থাকি; প্রভূত যুক্তি দ্বারা তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন, বৈচিত্র্য থাকিবেই, উহা বন্ধ হইয়া গেলে সব কিছুই লুপ্ত হইবে। জীবন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য দ্বারাই সংঘটিত হয়। অপর পক্ষ আবার নিঃসঙ্কোচে একত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নীতিশাস্ত্রে ও আচরণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক প্রচণ্ড পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। সম্ভবতঃ নীতিশাস্ত্র একমাত্র বিজ্ঞান, যাহা এই দ্বন্দ্ব হইতে দৃঢ়তার সহিত দূরে রহিয়াছে; কেন-না ঐক্যই যথার্থ নীতি, প্রেমই ইহার ভিত্তি। ইহা তো বৈচিত্র্যের দিকে, পরিবর্তনের দিকে তাকাইবে না। নৈতিক চর্যার একমাত্র লক্ষ্য এই ঐক্য, এই সমতা। বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবজাতি যে মহত্তম নৈতিক নিয়মাবলী আবিষ্কার করিয়াছে, ঐগুলির কোন পরিবর্তন নাই; একটু অপেক্ষা করিয়া পরিবর্তনের দিকে তাকাইবার তাহাদের সময় নাই। এই নৈতিক নিয়মগুলির একটি উদ্দেশ্য—ঐ একত্ব বা সাম্যের বোধ সুগম করা। ভারতীয় মন—বৈদান্তিক মনকেই আমি ভারতীয় মন মনে করি—অধিকতর বিশ্লেষণপ্রবণ বলিয়া ইহার সকল বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ এই ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছে এবং সব কিছুকেই এই একমাত্র ঐক্যের ধারণার উপর স্থাপন করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, এই একই দেশে অন্য মতবাদীরা—যেমন বৌদ্ধগণ

কোথাও ঐ ঐক্য দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের নিকট সকল সত্য কতকগুলি বৈচিত্র্যের সমষ্টিমাত্র; একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কোনই সম্পর্ক নাই।

অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মূলারের কোন এক পুস্তকে বর্ণিত একটি গল্পের কথা আমার মনে পড়িতেছে। ইহা একটি গ্রীক গল্প—কিভাবে একজন ব্রাহ্মণ এথেন্সে সক্রেটিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?' সক্রেটিস উত্তর দিলেন, 'মানুষকে জানাই সকল জ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'কিন্তু ঈশ্বরকে না জানিয়া আপনি মানুষকে কিভাবে জানিতে পারেন?' এক পক্ষ—অর্থাৎ বর্তমান ইওরোপের প্রতিনিধি গ্রীক পক্ষ মানুষকে জানার উপর জোর দিল। পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মসমূহের প্রতিনিধি, প্রধানতঃ ভারতীয় পক্ষ ঈশ্বরকে জানার উপর জোর দিয়াছে। এক পক্ষ প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, অপর পক্ষ ঈশ্বরের মধ্যে প্রকৃতিকে দর্শন করে। বর্তমানে হয়তো এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দূরে থাকিয়া সমগ্র সমস্যার প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি অবলম্বন করিবার অধিকার আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা সত্য যে, বৈচিত্র্য আছে; এবং জীবনের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। ইহাও সত্য যে, এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া ঐক্য অনুভব করিতে হইবে। ইহা সত্য যে, প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। আবার ইহাও সত্য যে, ঈশ্বরের মধ্যে প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়। মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, এবং মানুষকে জানিয়াই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি। আবার ইহাও সত্য যে, ঈশ্বরের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, এবং ঈশ্বরকে জানিয়াই আমরা মানুষকে জানিতে পারি। এই দুইটি উক্তি আপাতবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মনুষ্য-প্রকৃতির পক্ষে আবশ্যক। সমগ্র বিশ্ব—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এবং ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের ক্রীড়াক্ষেত্র; সমগ্র জগৎ—সাম্য ও বৈষম্যের খেলা; সমগ্র বিশ্ব—অসীমের মধ্যে সসীমের ক্রীড়াভূমি। একটিকে গ্রহণ না করিয়া আমরা অপরটিকে গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু আমরা ইহাদের দুইটিকে একই অনুভূতির—একই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তথাপি ব্যাপার সর্বদা এইভাবেই চলিবে।

আমাদের আরও বিশেষ উদ্দেশ্য—ধর্মের বিষয় (নীতির নয়) বলিতে গেলে বলিতে হয়, যতদিন পর্যন্ত সৃষ্টিতে প্রাণের ক্রিয়া চলিবে, ততদিন সর্বপ্রকার

ভেদ ও পার্থক্যের বিলয় এবং ফলস্বরূপ এক নিষ্ক্রিয় সমাবস্থা অসম্ভব। এইরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয়ও নয়। আবার এই সত্যের আর একটি দিক্‌ও আছে, অর্থাৎ এই ঐক্য তো পূর্ব হইতেই বর্তমান রহিয়াছে। অদ্ভুত দাবি এই—এই ঐক্য স্থাপন করিতে হইবে না, ইহা তো পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। এই ঐক্য ছাড়া বৈচিত্র্য তোমরা মোটেই উপলব্ধি করিতে পারিতে না। ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে হইবে না, ঈশ্বর তো পূর্ব হইতেই আছেন। সকল ধর্মই এই দাবি করিয়া আসিতেছেন। যখনই কেহ সান্তকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তখনই তিনি অনন্তকেও উপলব্ধি করিয়াছেন। কেহ কেহ সান্তের উপর জোর দিয়া ঘোষণা করিলেন, 'আমরা বহির্জগতে সান্তকেই উপলব্ধি করিয়াছি।' কেহ কেহ অনন্তের উপর জোর দিয়া বলিলেন, 'আমরা কেবল অনন্তকেই উপলব্ধি করিয়াছি।' কিন্তু আমরা জানি একটি ছাড়া অন্যটি উপলব্ধি করিতে পারি না—ইহা যুক্তির দিক্ দিয়া অপরিহার্য। সুতরাং দাবি করা হইতেছে—এই সমতা, এই ঐক্য, এই পূর্ণতা—যে-কোন নামেই ইহাকে অভিহিত করি না কেন—সৃষ্ট হইতে পারে না, ইহা তো পূর্ব হইতেই বর্তমান এবং এখনও রহিয়াছে। আমাদের কেবল ইহা বুঝিতে হইবে এবং উপলব্ধি করিতে হইবে। আমরা ইহা জানি বা না জানি, পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি বা না পারি, এই উপলব্ধি ইন্দ্রিয়ানুভূতির শক্তি ও স্বচ্ছতা লাভ করুক বা না করুক, ইহা বর্তমান রহিয়াছেই। আমাদের মনের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই ঐক্য বর্তমান রহিয়াছে, তাহা না হইলে সসীমের উপলব্ধি সম্ভব হইত না। আমি 'দ্রব্য' ও 'গুণে'র পুরাতন ধারণার কথা বলিতেছি না, আমি একত্বের কথাই বলিতেছি। এই-সব জাগতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে যখনই আমরা 'তুমি' ও 'আমি' পৃথক্—এই উপলব্ধি করিতেছি, তখনই 'তোমার' ও 'আমার' অভিন্নতার উপলব্ধিও স্বতই আমাদের মনে আসিতেছে। এই ঐক্যবোধ ছাড়া জ্ঞান কখনও সম্ভব হইত না। সমতার ধারণা ব্যতীত অনুভূতি বা জ্ঞান কিছুই সম্ভব হইত না। সুতরাং উভয় ধারণাই পাশাপাশি চলিতেছে।

সুতরাং অবস্থার পূর্ণ সমতা নৈতিক আচরণের লক্ষ্য হইলেও তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, সকল মানুষ

একরূপ হউক—ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। মানুষ পরস্পর পৃথক্ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ অন্য লোকের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী, কেহ কেহ স্বভাবতই ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে, আবার কেহ কেহ এইরূপ হইবে না। কেহ কেহ সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে, কেহ কেহ হইবে না। আমরা কখনও এই পার্থক্য বন্ধ করিতে পারি না। আবার বিভিন্ন আচার্য-ঘোষিত এই-সকল আশ্চর্য নীতিবাক্য আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়: এইরূপে মুনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না এবং সেইহেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। যাঁহাদের মন সর্বভূতস্থ ব্রহ্মে নিশ্চল, ইহজীবনেই তাঁহারা জন্ম-মৃত্যু জয় করিয়াছেন; কারণ ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমদর্শী। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত। ইহাই যে যথার্থ ভাব, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; তথাপি আবার মুশকিল এই যে, বিভিন্ন বস্তুর আকৃতি ও অবস্থানগত সমতা কখনও লাভ করা যায় না।

কিন্তু অধিকার-বিলোপ আমরা নিশ্চয়ই ঘটাইতে পারি। সমগ্র জগতের সম্মুখে ইহাই যথার্থ কাজ। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের সামাজিক জীবনে ইহাই একমাত্র সংগ্রাম। এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা স্বভাবতই বেশী বুদ্ধিমান্—ইহা আমাদের সমস্যা নয়; আমাদের সমস্যা হইল এই যে, বুদ্ধির আধিক্যের সুযোগ লইয়া এই শ্রেণীর লোক অল্পবুদ্ধি লোকদের নিকট হইতে তাহাদের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যও কাড়িয়া লইবে কিনা। এই বৈষম্যকে ধ্বংস করিবার জন্যই সংগ্রাম। কেহ কেহ অন্যান্য অপেক্ষা অধিকতর দৈহিক বলশালী হইবে এবং এরূপে স্বভাবতই দুর্বল লোকদিগকে দমন বা পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে—ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, কিন্তু এই শারীরিক শক্তির জন্য তাহারা জীবনের যাহা কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়, তাহাই নিজেদের জন্য কাড়িয়া লইবে—এই প্রকার অধিকার-বোধ তো নীতিসম্মত নয় এবং ইহার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। একদল লোক স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতাবশতঃ অন্যের অপেক্ষা বেশী ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে—ইহা তো স্বাভাবিক। কিন্তু ধনসঞ্চয়ের এই সামর্থ্য-হেতু তাহারা অসমর্থ ব্যক্তিদের উৎপীড়ন এবং নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করিবে—ইহা তো নীতিসম্মত নয়; এই অধিকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। অন্যকে বঞ্চিত করিয়া নিজে সুবিধা ভোগ করার নামই অধিকারবাদ এবং

যুগযুগান্ত ধরিয়া নীতিধর্মের লক্ষ্য এই অধিকারবাদকে ধ্বংস করা। বৈচিত্র্যকে নষ্ট না করিয়া সাম্য ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ।

এই-সকল বৈচিত্র্য, পার্থক্য অনন্তকাল বিরাজ করুক। এই বৈচিত্র্য জীবনের অপরিহার্য সারবস্তু। এভাবেই আমরা অনন্তকাল খেলা করিব। তুমি হইবে ধনী এবং আমি হইব দরিদ্র; তুমি হইবে বলবান্ এবং আমি হইব দুর্বল; তুমি হইবে বিদ্বান্ এবং আমি হইব মূর্খ; তুমি হইবে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন, আমি হইব অল্প অধ্যাত্মপ্রবণ। তাহাতে কি আসে যায়? আমাদিগকে এরূপই থাকিতে দাও, কিন্তু তুমি আমা অপেক্ষা শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে অধিকতর বলবান্ বলিয়া আমা অপেক্ষা বেশী অধিকার ভোগ করিবে, ইহা হইতে পারে না; আমা অপেক্ষা তোমার ধনৈশ্বর্য বেশী আছে বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় বিবেচিত হইবে, ইহাও হইতে পারে না, কারণ অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের ভিতরে সেই একই সমতা বর্তমান।

বাহ্যজগতে পার্থক্যের বিনাশ এবং সমতার প্রতিষ্ঠা—কখনই নৈতিক আচরণের আদর্শ নয়, এবং কখনও হইবে না। ইহা অসম্ভব, ইহা মৃত্যু ও ধ্বংসের কারণ হইবে। যথার্থ নৈতিক আদর্শ—এই-সকল বৈচিত্র্য সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত ঐক্যকে স্বীকার করা, সর্বপ্রকার বিভীষিকা সত্ত্বেও অন্তর্যামী ঈশ্বরকে স্বীকার করা, সর্বপ্রকার আপাত-দুর্বলতা সত্ত্বেও সেই অনন্ত শক্তিকে প্রত্যেকের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করা এবং সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ বাহ্য প্রতিভাস সত্ত্বেও আত্মার অনন্ত অসীম শুদ্ধস্বরূপতা স্বীকার করা। এই তত্ত্ব আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। কেবল একটা দিক গ্রহণ করিলে, সমগ্র তত্ত্বের একাংশমাত্র স্বীকার করিলে উহা বিপজ্জনকই হইবে এবং কলহের পথ প্রশস্ত করিবে। সমগ্র তত্ত্বটি আমাদিগকে যথাযথ গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহাকে প্রয়োগ করিতে হইবে।

হিন্দু দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন স্তর

যে-শ্রেণীর ধর্মচিন্তার উন্মেষ সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—আমি অবশ্য স্বীকৃতির যোগ্য ধর্মচিন্তার কথাই বলিতেছি, যে-সকল নিম্নস্তরের চিন্তা 'ধর্ম' সংজ্ঞা লাভের অযোগ্য, আমি সেগুলির কথা বলিতেছি না—ঐ উচ্চতর চিন্তারাশির মধ্যে ভগবৎ-প্রেরণা, শাস্ত্রের অলৌকিকতা ইত্যাদি ভাব স্বীকৃত হয়। ঈশ্বরবিশ্বাস হইতেই আদিম ধর্মচিন্তাসমূহ আরম্ভ হয়। এই বিশ্বকে আমরা দেখিতেছি; ইহার স্রষ্টা নিশ্চয়ই কেহ আছেন। জগতে যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার সৃষ্টি। এই ধারণার সহিত পরবর্তী স্তরের চিন্তাধারায় আত্মার ধারণা সম্মিলিত হইয়াছে। আমাদের এই দেহ চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান; ইহার অভ্যন্তরে এমন কিছু আছে, যাহা দেহ নয়। ধর্মের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি, তাহার মধ্যে এইটুকুই প্রাচীনতম। ভারতেও এমন অনেকে ছিলেন, যাঁহারা এই চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা অত্যল্পকালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্ম-চিন্তাসমূহ এক অনন্যসাধারণ স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। তাই বর্তমান কালে একমাত্র অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বিচার ও অনুমান-সহায়ে আমরা কখন কখন বুঝিতে সমর্থ হই যে, এইরূপ এক স্তর ভারতীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান ছিল। সহজবোধ্য যে স্তরে আমরা ভারতীয় ধর্মচিন্তার পরিচয় লাভ করি, উহা কিন্তু পরবর্তী স্তর, প্রথম স্তর নয়। অতি আদিম স্তরে সৃষ্টির ধারণা বড়ই অভিনব। তখন এই ধারণা ছিল যে, সমগ্র বিশ্ব শূন্যাবস্থা হইতে ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে; একসময় এই বিশ্বের কিছুই ছিল না এবং সেই সম্পূর্ণ অভাব হইতে ইহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। পরবর্তী স্তরে আমরা দেখি, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয় উঠিয়াছে—'অভাব হইতে কিরূপে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে?' বেদান্তের প্রথম পদক্ষেপেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই বিশ্বের মধ্যে যদি কোন সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই কোন ভাববস্তু হইতে উদ্গত হইয়াছে, কারণ ইহা অতি সহজেই অনুভূত হয় যে, অভাব হইতে কোথাও কোন ভাববস্তুর উৎপত্তি হয় না। মানুষ হাতে-নাতে যাহা কিছু গড়ে, তাহাই উপাদান-সাপেক্ষ। কোন

গৃহ নির্মিত থাকিলে তাহার উপাদান পূর্ব হইতেই ছিল; কোন নৌকা থাকিলে তাহারও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল; যদি কোন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহারও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল। যাহা কিছু কার্যবস্তু, তাহা এইভাবেই উৎপন্ন হয়। অতএব অভাব হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—এই প্রথম ধারণাটি স্বভাবতই বর্জিত হইল এবং এই বিশ্ব যে মূল উপাদান হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক হইল। বস্তুতঃ সমগ্র ধর্মচিন্তার ইতিহাস এই উপাদানের অনুসন্ধানেই পর্যবসিত।

কোন্ বস্তু হইতে এই-সকল উৎপন্ন হইয়াছে? এই সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন ছাড়াও, ভগবানের বিশ্বসৃষ্টি-বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন হইল—'কি সেই উপাদান, যাহা হইতে তিনি সৃষ্টি করিলেন?' সকল দর্শনমত যেন এই একটি প্রশ্নের সমাধানেই ব্যাপৃত। ইহার একটি সমাধান হইল এই যে—প্রকৃতি, ঈশ্বর এবং আত্মা এই তিনটিই শাশ্বত সনাতন সত্তা, যেন তিনটি সমান্তরাল রেখা অনন্তকাল ধরিয়া পাশাপাশি চলিতেছে; এই-সকল দার্শনিকের মতে এই তিনটির মধ্যে প্রকৃতি ও আত্মার অস্তিত্ব পরতন্ত্র, কিন্তু ভগবানের সত্তা স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দ্রব্যকণিকা যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, তেমনি প্রত্যেক আত্মাও তাঁহার ইচ্ছাধীন। ধর্মচিন্তা সম্পর্কে অন্যান্য স্তরের আলোচনার পূর্বে আমরা আত্মার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করিব এবং দেখিব যে, সকল পাশ্চাত্য দর্শনমতের সহিত বৈদান্তিক দর্শনের এক বিরাট্ পার্থক্য রহিয়াছে। বেদান্তবাদীরা সকলেই একটি সাধারণ মনোবিজ্ঞান মানিয়া চলেন। দার্শনিক মতবাদ যাহার যাহাই হউক না কেন, ভারতের যাবতীয় মনোবিজ্ঞান একই প্রকার, উহা প্রাচীন সাংখ্য মনস্তত্ত্বের অনুরূপ। এই মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যক্ষানুভূতির ধারা এই: বাহ্য ইন্দ্রিয়গোলকের উপর বিষয়গুলি হইতে যে কম্পন প্রথমে সংক্রামিত হয়, তাহা বাহিরের ইন্দ্রিয়গোলক হইতে ভিতরের ইন্দ্রিয়সমূহে সঞ্চারিত হয়; অন্তরিন্দ্রিয় হইতে উহা মনে এবং মন হইতে বুদ্ধিতে প্রেরিত হয়; বুদ্ধি হইতে উহা এমন এক সত্তার নিকট উপস্থিত হয়, যাহা এক এবং যাহাকে তাঁহারা 'আত্মা' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত বিজ্ঞান বিভিন্ন সংবেদনের কেন্দ্রস্থলগুলি আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা নিম্নস্তরের কেন্দ্রগুলির

সন্ধান পাইয়াছে, তদুপরি উচ্চস্তরের কেন্দ্রগুলির অবস্থান আবিষ্কার করিয়াছে ; এই উভয় জাতীয় কেন্দ্রকে ভারতীয় দর্শনের অন্তরিন্দ্রিয় এবং মনের অনুরূপ বলা যাইতে পারে ; কিন্তু এই-সকল বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, এইরূপ কোন একটি বিশেষ কেন্দ্র শারীরবিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং ঐ-সকল বিভিন্ন কেন্দ্রের ঐক্য কোথায়, তাহা শারীরবিজ্ঞান আমাদের বলিতে পারে না। এই-সকল কেন্দ্রের ঐক্য কোথায় সংস্থাপিত ? মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, এবং সকল কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে—এরূপ কোন কেন্দ্র সেখানে নাই। সুতরাং ভারতীয় মনস্তত্ত্ব যতটুকু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করা চলে না। আমাদের এমন একটি ঐক্যস্থান চাই, যাহার উপর সংবেদনগুলি প্রতিফলিত হইবে, এবং যাহা একটি পূর্ণ অনুভব গড়িয়া তুলিবে। যতক্ষণ না সেই বস্তুটিকে স্বীকার করি, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের সম্পর্কে বা কোন চিত্র বা অন্য কোন কিছু সম্পর্কে আমরা কোন ঐক্যবদ্ধ ধারণা করিতে পারি না। যদি এই ঐক্যস্থলটি না থাকে, তাহা হইলে আমরা হয়তো কেবল দেখিব, তাহার কিছুক্ষণ পরে হয়তো নিঃশ্বাস গ্রহণ করিব, তারপর শুনিব, ইত্যাদি। ফলে যখন কাহারও কথা শুনিব, তখন তাহাকে আদৌ দেখিতে পাইব না, কারণ সংবেদনের কেন্দ্রগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন।

আমাদের এই শরীর জড়বস্তু নামে পরিচিত কতকগুলি কণিকার সমষ্টি মাত্র। ইহা অনুভূতিহীন ও অচেতন। বৈদান্তিকগণ যাহাকে সূক্ষ্মশরীর বলেন, উহাও ঐরূপ। তাঁহাদের মতে এই সূক্ষ্মদেহটি স্বচ্ছ হইলেও জড় ; ইহা অতি ক্ষুদ্র কণিকাদ্বারা গঠিত ; এই কণিকাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রসহায়েও সেগুলি দেখা যায় না। এই দেহ কোন্ প্রয়োজনে লাগে ? ইহা অতি সূক্ষ্মশক্তির আধার। এই স্থূলদেহ যেমন স্থূলশক্তির আধার, সূক্ষ্মদেহও তেমনি সেই-সকল সূক্ষ্মশক্তির আধার, যাহাকে আমরা বিভিন্ন বৃত্তির আকারে উদিত চিন্তা নামে অভিহিত করি। প্রথমে পাই স্থূলশক্তিসহ স্থূল জড়ের সমষ্টি মানবদেহ। আধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না। শক্তি নিজের অবস্থানের জন্য জড়বস্তুর মুখাপেক্ষী। কাজেই স্থূলতর শক্তি আমাদের এই দেহ-অবলম্বনে কার্য করে এবং এই শক্তিগুলিই আবার সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। যে শক্তি স্থূলাকারে কার্য করিতেছে, তাহাই আবার

সূক্ষ্মাকার কার্যের আকর হয় এবং চিন্তার আকারে পরিণত হয়। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন বাস্তব ভেদ নাই; তাহারা একই শক্তির শুধু স্থূল ও সূক্ষ্ম বিকাশ। স্থূলশরীর এবং সূক্ষ্মশরীরের মধ্যেও কোন বাস্তব ভেদ নাই। সূক্ষ্মদেহও জড়বস্তু দ্বারা গঠিত, যদিও এই জড়পদার্থগুলি অতি সূক্ষ্ম। আর এই স্থূলদেহ যেমন স্থূলশক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র, তেমনি এই সূক্ষ্মদেহও সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র। কোথা হইতে এই-সকল শক্তি আসে? বেদান্ত-দর্শনের মতে প্রকৃতিতে দুইটি বস্তু আছে, একটিকে তাঁহারা 'আকাশ' বলেন, উহাই উপাদান পদার্থ এবং উহা অতি সূক্ষ্ম। অপরটিকে তাঁহারা বলেন 'প্রাণ', উহাই হইল শক্তি। যাহা কিছু আপনারা বায়ু মাটি বা অন্য কোন পদার্থরূপে দেখেন, স্পর্শ করেন অথবা শুনেন, সে-সবই জড়বস্তু; সবই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এগুলি প্রাণের ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হইয়া ক্রমশই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অথবা স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া থাকে। আকাশের ন্যায় প্রাণও সর্বব্যাপী এবং সর্বানুস্যূত। আকাশকে যদি জলের সহিত তুলনা করা যায়, তবে বিশ্বের অন্যান্য পদার্থসকলকে জল হইতে উৎপন্ন এবং জলের উপর ভাসমান তুষারখণ্ড বলা চলে। যে শক্তি আকাশকে এই বিবিধ আকারে পরিবর্তিত করে, তাহাই হইল প্রাণ। পেশী চালনা, হাঁটা, বসা, কথা বলা ইত্যাদিরূপে স্থূলস্তরে প্রাণের বিকাশের জন্য আকাশ হইতে এই স্থূলদেহরূপ যন্ত্রটি গঠিত হইয়াছে। ঐ একই প্রাণের সূক্ষ্মতর আকারে চিন্তারূপে বিকাশের জন্য পূর্বোক্ত সূক্ষ্মদেহটিও আকাশ অর্থাৎ আকাশের অতি সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সর্বাগ্রে আছে এই স্থূল-দেহ, তাহার ঊর্ধ্বে আছে এই সূক্ষ্মদেহ। তাহারও ঊর্ধ্বে আছে জীব বা প্রকৃত মানুষ। নখগুলি যেমন আমাদের দেহের অংশ হইলেও ঐগুলিকে বার বার কাটিয়া ফেলা চলে, স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধও তদনুরূপ। ইহা ঠিক নয় যে, মানবের দুইটি দেহ আছে—একটি সূক্ষ্ম এবং অপরটি স্থূল। প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র দেহই আছে, তবে যে অংশ দীর্ঘস্থায়ী, তাহাকে সূক্ষ্মশরীর, এবং যাহা দ্রুতবিনাশী, তাহাকে স্থূল বলে। যেমন আমি এই নখগুলি যতবার ইচ্ছা কাটিয়া ফেলিতে পারি, সেইরূপ লক্ষ লক্ষ বার আমি এই স্থূলশরীর ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তবু সূক্ষ্মশরীরটি থাকিয়া যায়। দ্বৈতবাদীদের মতে এই জীব বা প্রকৃত মানব অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, মানুষ বলিতে এমন একটি ব্যক্তিকে বুঝায়, যাহার প্রথমতঃ আছে একটি অনন্ত ধ্বংসশীল স্থূলদেহ, তারপর আছে একটি বহুযুগস্থায়ী সূক্ষ্মদেহ, সর্বোপরি আছে একটি জীবাত্মা। বেদান্তের মতে এই জীবাত্মা ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। প্রকৃতিও নিত্য, কিন্তু পরিণামী নিত্য। প্রকৃতির যাহা উপাদান—অর্থাৎ প্রাণ এবং আকাশ—তাহাও নিত্য; কিন্তু তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হইতেছে। জীব আকাশ কিম্বা প্রাণের দ্বারা নির্মিত নয়; ইহা জড়সম্ভূত নয় বলিয়া নিত্য। ইহা প্রাণ ও আকাশের কোন প্রকার মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় নাই। যাহা যৌগিক পদার্থ নয়, তাহা কোন দিনই ধ্বংস হইবে না। কারণ ধ্বংসের অর্থ হইল কারণে প্রত্যাবর্তন। স্থূলদেহ আকাশ এবং প্রাণের মিলনে গঠিত; অতএব ইহার ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু জীব অযৌগিক পদার্থ; কাজেই তাহার কখনও ধ্বংস নাই। এই একই কারণে ইহা কখনও জন্মে নাই। কোন অযৌগিক পদার্থেরই জন্ম হইতে পারে না। এই একই যুক্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একমাত্র যৌগিক পদার্থেরই জন্ম সম্ভব। লক্ষ লক্ষ আত্মাসহ এই প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, নিরাকার এবং তিনি প্রকৃতির সহায়ে দিবারাত্রি সকল সময় কার্য করিতেছেন। ইহার সবটুকুই তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি বিশ্বের চিরন্তন অধিপতি। ইহাই হইল দ্বৈতবাদীদের মত। এখন প্রশ্ন এই—ঈশ্বরই যদি বিশ্বের নিয়ন্তা হন, তবে কেন তিনি এই পাপময় বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, কেন আমরা এত দুঃখকষ্ট পাইব? দ্বৈতবাদীদের মতে: ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। নিজেদের দোষেই আমরা কষ্ট পাই। যেমন কর্ম, তেমনি ফল। তিনি মানুষকে সাজা দিবার জন্য কোন কিছুই করেন নাই। মানুষ দরিদ্র বা অন্ধ হইয়া বা অন্য কোন দুরবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তাহার কারণ কি? ঐরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে সে নিশ্চয়ই কিছু করিয়াছে। জীব অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান রহিয়াছে এবং কখনও সৃষ্ট হয় নাই। আর এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সে কত কিছু করিয়াছে। যাহা কিছু আমরা করি না কেন, তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ভাল কাজ করিলে আমরা সুখী হই, আর মন্দ কাজ করিলে দুঃখ পাই। ঐরূপেই জীব দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে থাকে এবং নানারূপ কার্যও করিতে থাকে।

মৃত্যুর পর কি হয়? এই-সকল বেদান্ত-সম্প্রদায়গুলির অন্তর্গত সকলেই স্বীকার করেন, জীব স্বরূপতঃ পবিত্র। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, অজ্ঞান জীবের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে। পাপকর্ম করিলে যেমন সে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, পুণ্যকর্মের ফলে তেমনই আবার তাহার স্বরূপ-চেতনা জাগরিত হয়। জীব একদিকে যেমন নিত্য, অপরদিকে তেমনি বিশুদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ।

যখন পুণ্যকর্মের দ্বারা তাহার সমস্ত পাপকর্মের বিলোপ হয়, তখন জীব পুনর্বার বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ হইয়া সে 'দেবযান' নামে কথিত পথে উর্ধ্বে গমন করে। তখন ইহার বাগিন্দ্রিয় মনে প্রবেশ করে। শব্দের সহায়তা ব্যতীত কেহ চিন্তা করিতে পারে না। চিন্তা থাকিলে শব্দও অবশ্যই থাকিবে। শব্দ যেমন মনে প্রবেশ করে, মনও তেমনি প্রাণে এবং প্রাণ জীবে বিলীন হয়। তখন জীব এই শরীর হইতে দ্রুত বহির্গত হয়, এবং সূর্যলোকে গমন করে। এই বিশ্বজগৎ মণ্ডলাকারে সজ্জিত। এই পৃথিবীকে বলে ভূমণ্ডল, যেখানে চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি দেখা যায়। তাহার উর্ধ্বে সূর্যলোক অবস্থিত; তাহার পরে আছে আর একটি লোক, যাহাকে চন্দ্রলোক বলে। তাহারও পরে আছে বিদ্যুল্লোক নামে আর একটি লোক। জীব ঐ বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হইলে পূর্ব হইতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত অপর এক ব্যক্তি তাহার অভ্যর্থনার জন্য সেখানে উপস্থিত হন এবং তিনি তাহাকে অপর একটি লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক নামক সর্বোত্তম স্বর্গে লইয়া যান। সেখানে জীব অনন্তকাল ধরিয়া বাস করে; তাহার আর জন্ম-মৃত্যু কিছুই হয় না। এই ভাবে জীব অনন্তকাল ধরিয়া আনন্দ ভোগ করে, এবং একমাত্র সৃষ্টি-শক্তি ছাড়া ঈশ্বরের আর সর্ববিধ ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়। বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা আছেন এবং তিনি ঈশ্বর। অপর কেহই তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। কেহ যদি ঈশ্বরত্বের দাবি করেন, তাহা হইলে দ্বৈতবাদীদের মতে তিনি ঘোর নাস্তিক। সৃষ্টি-শক্তি ছাড়া ঈশ্বরের অপর শক্তিসমূহ জীবে সঞ্চারিত হয়। উক্ত জীবাত্মা যদি শরীর গ্রহণ করিতে চান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কর্ম করিতে চান, তাহা হইলে তাহাও করিতে পারেন। তিনি যদি সকল দেব-দেবীকে নিজের সম্মুখে আসিতে নির্দেশ দেন, কিংবা যদি পিতৃপুরুষদের আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহার ইচ্ছানুসারে তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার

তখন এমনই শক্তি লাভ হয় যে, তাঁহার আর দুঃখভোগ হয় না, এবং ইচ্ছা করিলে তিনি অনন্তকাল ধরিয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে পারেন। তাঁহাকেই বলি শ্রেষ্ঠ মানব, যিনি ঈশ্বরের ভালবাসা অর্জন করিয়াছেন, যিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ হইয়াছেন, সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করিয়াছেন, সকল বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং উপাসনা ছাড়া অন্য কোন কর্ম করিতে চাহেন না।

অপর একশ্রেণীর জীব আছেন, যাঁহারা এত উন্নত নন; তাঁহারা সৎকর্ম করেন অথচ পুরস্কার প্রত্যাশা করেন। তাঁহারা বলেন যে দরিদ্রকে তাঁহারা কিছু দান করিবেন, কিন্তু বিনিময়ে তাঁহারা স্বর্গলাভ কামনা করেন। মৃত্যুর পর তাঁহাদের কিরূপ গতি হয়? তাঁহাদের বাক্য মনে লীন হয়, মন প্রাণে লয় পায়, প্রাণ জীবাত্মায় লীন হয়, জীবাত্মা দেহত্যাগ করিয়া বহির্গত হয় এবং চন্দ্রলোকে যায়। ঐ জীব সেখানে দীর্ঘকালের জন্য অত্যন্ত সুখে সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহার সৎকর্মের ফল যতকাল থাকে, ততদিন ধরিয়া তিনি সুখভোগ করেন। যখন সেই সকল নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন তিনি পুনরায় ধরাতলে অবতীর্ণ হন, এবং নিজ বাসনানুযায়ী ধরাধামে নূতন জীবন আরম্ভ করেন। চন্দ্রলোকে জীবগণ দেবজন্ম প্রাপ্ত হয়, কিম্বা খ্রীষ্টধর্মে এবং মুসলমান ধর্মে উল্লিখিত দেবদূতরূপে জন্মগ্রহণ করে। দেবতা অর্থে কতকগুলি উচ্চপদমাত্রই বুঝিতে হইবে। যথা দেবগণের অধিপতিত্ব বা ইন্দ্রত্ব একটি উচ্চপদের নাম। বহু সহস্র মানুষ সেই পদ লাভ করিয়া থাকে। সর্বোত্তম বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানকারী কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তিনি দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হন; এদিকে ততদিনে পূর্ববর্তী ইন্দ্রের পতন হয় এবং তাঁহার পুনর্বার মর্ত্যলোকে জন্মলাভের কাল আসিয়া পড়ে। ইহলোকে যেমন রাজার পরিবর্তন হয়, তেমনই দেবতাদেরও পরিবর্তন হয়, তাঁহাদেরও মৃত্যু হয়। স্বর্গবাসী সকলেরই মৃত্যু আছে। একমাত্র মৃত্যুহীন স্থান হইল ব্রহ্মলোক; সেখানে জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই।

এইরূপে জীবগণ স্বর্গে গমন করেন এবং মাঝে মাঝে দৈত্যদের উৎপাতের কথা ছাড়িয়া দিলে স্বর্গফল তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুখকরই হইয়া থাকে। পুরাণের মতে দৈত্য আছে, তাহারা মাঝে মাঝে দেবতাদের নানারূপে

তাড়না করে। পৃথিবীর যাবতীয় পুরাণে এই দেবদানবের সংগ্রামের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আরও দেখা যায় যে, অনেক সময় দৈত্যগণ দেবগণকে জয় করিত। অবশ্য অনেক সময়ই মনে হয়, দেবগণ অপেক্ষা দৈত্যগণের দুষ্কর্ম বরং কিছু কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সকল পুরাণেই দেবগণ কামপরায়ণ বলিয়া মনে হয়। এইরূপে পুণ্যকর্মের ফলভোগ শেষ হইলে দেবগণের পতন হয়। তখন তাহারা মেঘ এবং বারিবিন্দু অবলম্বন করিয়া কোন শস্য বা উদ্ভিদে সঞ্চারিত হয় এবং ঐরূপে মানবের দ্বারা ভক্ষিত খাদ্যের মধ্য দিয়া মানবশরীরে প্রবেশ করে। পিতার নিকট হইতে তাহারা উপযুক্ত দেহ-গঠনের উপাদান পায়। যখন সেই উপাদানের উপযোগিতা শেষ হইয়া যায়, তখন তাহাদের নূতন দেহ সৃষ্টি করিতে হয়। এখন—এরূপ অনেক শয়তান প্রকৃতির লোক আছে, যাহারা নানাপ্রকার দানবীয় কার্য সাধন করে। তাহারা পুনরায় ইতরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং তাহারা অত্যন্ত হীনকর্মা হইলে অতি নিম্নস্তরের প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে অথবা বৃক্ষলতা কিংবা প্রস্তরাদিতে পরিণত হয়।

দেবজন্মে কোন কর্মফল অর্জিত হয় না; একমাত্র মানুষই কর্মফল অর্জন করে। কর্ম বলিতে এমন কাজ বুঝায়, যাহার ফল আছে। যখন মানুষ মরিয়া দেবতা হয়, তখন তাহাদের কেবল সুখ ও আরামের সময়, সেই সময় তাহারা নূতন কর্ম করে না; স্বর্গ তাহাদের অতীত সৎকর্মের পুরস্কার মাত্র। যখন সৎকর্মের ফল নিঃশেষিত হয়, তখন অবশিষ্ট কর্ম তাহার ফল প্রসব করিতে উদ্যত হয়, এবং সেই জীব পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে। তখন যদি সে অতিশয় শুভ কর্মের অনুষ্ঠান রাখিয়া আবার নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করিতে পারে, তাহা হইলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না।

নিম্নতর স্তরগুলি হইতে উচ্চ স্তরের দিকে ক্রমবিকাশের পথে পশুত্ব একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র। সময়ে পশুও মানুষ হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় যে, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। পশুদের আত্মা মানবে রূপায়িত হইতেছে, বহু বিভিন্ন শ্রেণীর পশু ইতিপূর্বেই মানবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই-সকল বিলুপ্ত পশুপক্ষী আর কোথায় বা যাইতে পারে?

বেদে নরকের কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের পরবর্তী কালের গ্রন্থ পুরাণের রচয়িতাদের মনে হইল যে, নরকের কল্পনাকে বাদ দিয়া কোনও ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, তাই তাঁহারা নানা রকম নরক কল্পনা করিয়াছেন। এইসব নরকের কতগুলিতে মানুষকে করাত দিয়া চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইতেছে এবং তাহাদের উপর অবিরাম যাতনা চলিতেছে, কিন্তু তবু তাহাদের মৃত্যু নাই। তাহারা প্রতি মূহূর্তে তীব্র বেদনায় জর্জরিত হইতেছে। তবে দয়া করিয়া এই সকল গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, এই সব যন্ত্রণা চিরস্থায়ী নহে। এই অবস্থায় তাহাদের অসৎকর্মের ক্ষয় হয়; অনন্তর তাহারা মর্ত্যে পুনরাগমন করে এবং আবার নূতন সুযোগ পায়। সুতরাং এই মানবদেহে একটি মহা সুযোগ লাভ হয়। তাই ইহাকে কর্ম-শরীর বলে। ইহার সাহায্যে আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করি। আমরা একটি বিরাট চক্রে ঘুরিতেছি এবং এই চক্রে এইটিই হইল আমাদের ভবিষ্যৎ-নির্ধারক বিন্দু। সুতরাং এই দেহটিকে জীবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রূপ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। মানুষ দেবতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

এই পর্যন্ত খাঁটি এবং জটিলতাহীন দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করা হইল। এইবারে আমরা উচ্চতর বেদান্তদর্শনে আসিতেছি, যাহা পূর্বোক্ত মতবাদকে অযৌক্তিক মনে করে। এই মতে ঈশ্বর এই বিশ্বের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ উভয়ই। ঈশ্বরকে যদি আপনারা এক অসীম পুরুষ বলিয়া মানেন, এবং জীবাত্মা ও প্রকৃতিকে অসীম বলেন, তবে আপনারা এই অসীম বস্তুগুলির সংখ্যা যথেচ্ছ বাড়াইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাহা অত্যন্ত অসম্ভব কথা; এভাবে চলিলে আপনারা সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং ঈশ্বর এই বিশ্বের অভিন্ন-নিমিত্ত-উপাদান কারণ; তিনি নিজের মধ্য হইতেই এই বিশ্বকে বাহিরে বিকশিত করিয়াছেন। তাহা হইলে কি ঈশ্বর এই দেওয়াল, এই টেবিল হইয়াছেন, তিনি কি শূকর এবং হত্যাকারী ইত্যাদি জগতের যাবতীয় হীন বস্তু হইয়াছেন? আমরা বলিয়া থাকি, ঈশ্বর শুদ্ধ-স্বভাব। তিনি কিরূপে এই সকল হীন বস্তুতে পরিণত হইতে পারেন? আমাদের উত্তর এই—ইহা ঠিক যেন আমাদেরই মতো। এই ধরুন আমি একটি দেহধারী আত্মা। এক অর্থে এই দেহ আমা হইতে পৃথক্ নয়। তথাপি আমি—প্রকৃত আমি—এই দেহ নই; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে,

আমি নিজেকে শিশু, তরুণ যুবক বা বৃদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিই; অথচ ইহাতে আমার আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না। উহা সর্বদা একই আত্মারূপে অবস্থান করে। ঠিক সেইরূপ প্রকৃতি-সমন্বিত সমগ্র বিশ্ব এবং অগণিত আত্মাগুলি যেন ঈশ্বরের অসীম দেহ। তিনি এই সকলের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। একমাত্র তিনিই অপরিবর্তনীয় কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, আত্মাও পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতি এবং আত্মার পরিবর্তনের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না। প্রকৃতির পরিবর্তন কিরূপে হয়? প্রকৃতির পরিবর্তন বলিতে রূপের (আকৃতির) পরিবর্তন বুঝায়। ইহা নূতন রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মার অনুরূপ পরিবর্তন হয় না। আত্মার জ্ঞানের সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণ হয়। অসৎ কর্মের দ্বারা ইহার সঙ্কোচন ঘটে। যে কর্মের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা ও জ্ঞানের সঙ্কোচন ঘটে, তাহাকে অশুভ কর্ম বলে। আবার যে-সকল কর্মের ফলে আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়, তাহাকে শুভ কর্ম বলে। সকল আত্মাই পবিত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের সঙ্কোচন হইয়াছে। ঈশ্বর কৃপায় এবং সৎকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা আবার তাহারা সম্প্রসারিত হইবে এবং স্বাভাবিক পবিত্রতা লাভ করিবে। প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ আছে এবং প্রত্যেকেই অবশেষে অবশ্যই মুক্তির অধিকারী হইবে। কিন্তু এই জগৎ-সংসারের কখনও অবসান হইবে না, কারণ ইহা শাশ্বত। ইহাই হইল দ্বিতীয় মতবাদ। প্রথমটিকে বলা হয় 'দ্বৈতবাদ'। দ্বিতীয় মতে ঈশ্বর, আত্মা এবং প্রকৃতি—এই তিনটিরই অস্তিত্ব আছে, এবং আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহ; এই তিন মিলিয়া একটি অভিন্ন সত্তা গঠন করিয়াছে। ইহা ধর্মবিকাশের একটি উচ্চতর স্তরের নিদর্শন এবং ইহাকে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' বলা হয়। দ্বৈতবাদে এই বিশ্বকে ঈশ্বর-কর্তৃক চালিত একটি সুবৃহৎ যন্ত্ররূপে কল্পনা করা হয়; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ইহাকে জীবদেহের মতো একটি জীবন্ত ও পরমাত্মার দ্বারা অনুস্যূত অখণ্ড সত্তারূপে কল্পনা করা হয়।

সর্বশেষে আসিতেছেন অদ্বৈতবাদীরা। তাহারাও সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন যে, ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ এই উভয়ই হইতে হইবে। এই মতে ঈশ্বরই এই সমগ্র বিশ্ব হইয়াছেন এবং এই কথা মোটেই অস্বীকার করা চলে না। অপরেরা যখন বলেন, ঈশ্বর এই বিশ্বের আত্মা, বিশ্ব তাঁহার দেহ এবং সেই দেহ পরিবর্তনশীল হইলেও

ঈশ্বর কূটস্থ নিত্য, তখন অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ইহা অর্থহীন কথা। তাই যদি হয়, তবে ঈশ্বরকে উপাদান-কারণ বলিয়া লাভ কি? উপাদান কারণ আমরা তাহাকেই বলি, যাহা কার্যে পরিণত হয়; কার্য বলিতে কারণের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়। কার্য দেখিলেই বুঝিতে হইবে, উহা কারণেরই অন্যরূপে আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই বিশ্ব যদি কার্য হয় এবং ঈশ্বর যদি কারণ হন, তবে এই বিশ্ব ঈশ্বরেরই অন্যরূপে আবির্ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহ যদি বলেন, এই বিশ্ব ঈশ্বরের শরীর; ঐ শরীর সঙ্কুচিত ও সূক্ষ্মাকার হইয়া কারণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ কারণ হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব ঘটে, তবে অদ্বৈতবাদী বলিবেন, ফলতঃ ভগবান্ নিজেই এই বিশ্বরূপ ধারণ করেন। এখানে এক অতি সূক্ষ্ম প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। ভগবানই যদি নিখিলবিশ্ব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য হইয়া পড়ে—আপনারা সকলে এবং সব কিছুই ঈশ্বর। এই গ্রন্থখানি ঈশ্বর এবং প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর। আমার শরীর ঈশ্বর, মনও ঈশ্বর, আত্মাও ঈশ্বর। তাই যদি হয়, তবে এত জীবাত্মা আসিল কোথা হইতে? ঈশ্বর কি তবে লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন? সেই এক ঈশ্বরই কি এই লক্ষ লক্ষ জীবে পরিণত হইয়াছেন? ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে? কেমন করিয়া সেই অনন্ত শক্তি ও অসীম বস্তু—বিশ্বের সেই অখণ্ড সত্তা কিরূপে বিখণ্ডিত হইতে পারেন? অনন্ত বস্তুর বিভাজন সম্ভব নহে। সেই অখণ্ড অবিমিশ্র সত্তা কিরূপে এই বিশ্ব হইতে পারেন? যদি তিনিই এই বিশ্ব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পরিবর্তনশীল এবং যদি তিনি পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃতির অংশ এবং যাহাই প্রকৃতির অংশ তাহারই পরিবর্তন আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। যদি আমাদের ঈশ্বর পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তাঁহারও কোন না কোন দিন মৃত্যু হইবে। এই তথ্যটি সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক। আবার প্রশ্ন এই, ঈশ্বরের কি পরিমাণ অংশ এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে? যদি এই অংশ (বীজ-গণিতের অজ্ঞাত পরিমাণ) হয়, তাহা হইলে পরবর্তী সময়ে সেই অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট পরিমাণ ঈশ্বর বর্তমান রহিলেন। কাজেই সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর যেরূপ ছিলেন, এখন আর তিনি ঠিক সেইরূপ রহিলেন না, কারণ তাঁহার ঐ পরিমাণ অংশ এখন বিশ্বে পরিণত হইয়াছে।

অতএব অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, 'এই বিশ্বের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, এ সকলই মায়া। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, এই দেবগণ, দেবদূতগণ, জন্মমৃত্যুর অধীন অন্যান্য প্রাণী, এবং চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ এই অনন্তকোটি আত্মা এই সমস্তই স্বপ্নমাত্র।' জীব বলিয়া মোটেই কিছু নাই; অতএব তাহাদের অগণিত সংখ্যাই বা কিরূপে হইবে? একমাত্র সেই অনন্ত সত্তা আছেন। যেমন একই সূর্য বিভিন্ন জলবিন্দুর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হয়, কোটি কোটি জলকণিকা যেমন কোটি কোটি সূর্যকে প্রতিফলিত করে এবং প্রত্যেকটি জলকণিকাই সূর্যের পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি ধারণ করে, অথচ সূর্য একটিমাত্রই থাকে, ঠিক সেইরূপে এই-সকল জীব বিভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব মাত্র। এই-সকল বিভিন্ন অন্তঃকরণ যেন বিভিন্ন জলবিন্দুর মতো সেই এক সত্তাকে প্রতিফলিত করিতেছে। ঈশ্বর এই-সকল বিভিন্নজীবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। কিন্তু সত্যকে বাদ দিয়া কোন নিছক স্বপ্ন থাকিতে পারে না; সেই অনন্ত সত্তাই সেই সত্য। এই শরীর-মন, আত্মা রূপে আপনি একটি স্বপ্নমাত্র; কিন্তু স্বরূপতঃ আপনি সেই সচ্চিদানন্দ, আপনিই এই বিশ্বের ঈশ্বর; আপনিই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছেন, আবার আপনাতে টানিয়া লইতেছেন। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদীর মত। সুতরাং এই-সকল জন্ম এবং পুনর্জন্ম, এই-সকল আসা যাওয়া মায়াসৃষ্ট অলীক কল্পনা মাত্র। আপনি তো অসীম। আপনি আবার কোথায় যাইবেন? এই সূর্য, এই চন্দ্র, এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার সর্বাতীত স্বরূপের মধ্যে যেন কয়েকটি কণিকামাত্র। অতএব আপনার কিরূপে জন্ম মৃত্যু হইবে? আমি কখনও জন্মগ্রহণ করি নাই এবং কখনও করিব না। আমার কোন দিন পিতা-মাতা, বন্ধু, শত্রু ছিল না, কারণ আমি সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। আমিই তিনি, আমিই তিনি। তাহা হইলে এই দর্শন-মতানুযায়ী মানবজীবনের লক্ষ্য কি? যাঁহারা উক্ত জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা বিশ্বের সহিত অভিন্ন হইয়া যান; তাঁহাদের পক্ষে সকল স্বর্গ, এমন কি ব্রহ্মলোকও লয় পায়, সমগ্র স্বপ্ন বিলীন হইয়া যায় এবং তাঁহারা নিজেদের এই বিশ্বের সনাতন ঈশ্বররূপে দেখিতে পান। তাঁহারাই অনন্ত জ্ঞান ও শান্তি মণ্ডিত প্রকৃত নিজস্ব ব্যক্তিত্ব খুঁজিয়া পান এবং মুক্তি লাভ করেন। তাঁহাদের তখন তুচ্ছবস্তুতে আনন্দের অবসান ঘটে। আমরা এই ক্ষুদ্র দেহে এবং ক্ষুদ্র

ব্যক্তিত্বেও আনন্দ পাই। যখন এই সমগ্র বিশ্ব আমার দেহ হইবে, তখন আনন্দ আরও কতগুণ বৃদ্ধি পাইবে! শরীরও যখন সুখের আকর, তখন নিখিল শরীর আমার হইয়া গেলে সুখও যে অপরিমিত হইবে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন; তখনই মুক্তিলাভ হইবে। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাতীত বেদান্তদর্শন বলা হয়।

বেদান্তদর্শন এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে; আমরা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারি না, কারণ একত্বের উর্ধ্বে গমন করা সাধ্যাতীত। কোন বিজ্ঞান একবার এই একত্বের ধারণায় উপনীত হইলে আর কোন উপায়েই এই একত্বকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। মানুষ এই পরম অখণ্ড বস্তুর অতীত আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না।

সকল মানুষের পক্ষে এই অদ্বৈতবাদ স্বীকার করা সম্ভব নয়; ইহা অতি দুরূহ। প্রথমতঃ ইহা বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করাই কঠিন, ইহা বুঝিতে হইলে সূক্ষ্মতম বুদ্ধি এবং ভয়শূন্য অনুভব-শক্তির প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ইহা অধিকাংশ মানবের পক্ষে উপযোগী নহে। কাজেই এই তিনটি পৃথক্ স্তরের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথম স্তর হইতে আরম্ভ করিলে মনন এবং নিদিধ্যাসনের ফলে দ্বিতীয়টি আপনিই উদ্ঘাটিত হইবে। ব্যক্তিকেও জাতিরই ন্যায় স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইবে। যে-সকল স্তরের মাধ্যমে মানবজাতি উচ্চতম ধর্মচিন্তায় উপনীত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। তবে একটি স্তর হইতে অপর স্তরে উঠিতে যেখানে মানবজাতিকে হাজার হাজার বৎসর কাটাইতে হইয়াছে, প্রতি ব্যক্তি মানবজাতির সেই জীবনেতিহাস তদপেক্ষা অতি অল্প সময় মধ্যে উদ্যাপিত করিতে পারে। তবু আমাদের প্রত্যেককেই এই প্রত্যেকটি স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আপনারা যাহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা নিজেদের জীবনের সেই সময় স্মরণ করুন, যখন আপনারা ঘোর দ্বৈতবাদী ছিলেন। যে মুহূর্তে আপনি নিজেকে দেহ ও মন রূপে চিন্তা করিবেন, সেই মুহূর্তে এই সমগ্র স্বপ্ন আপনাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহার অংশ মাত্রকেও স্বীকার করিলে সমগ্রটিকেও স্বীকার করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে। যে বলে যে, এই বিশ্ব আছে অথচ তাহার নিয়ামক ঈশ্বর নাই, সে নির্বোধ; কারণ জগৎ থাকিলে তাহার কারণও থাকা আবশ্যক এবং সেই কারণকেই আমরা

ঈশ্বর বলিয়া মানি। কারণের অস্তিত্ব মানিয়া কোনও কার্যকে স্বীকার করা অসম্ভব। ভগবানের অস্তিত্ব শুধু তখনই লোপ পাইতে পারে, যখন জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন আপনি অখণ্ড ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইবেন এবং জগৎ আপনার নিকট মিথ্যা হইয়া যাইবে। যতক্ষণ এই মিথ্যা বোধ থাকিবে, আপনি একটি দেহের সহিত অভিন্ন, ততক্ষণ আপনাকে নিজের জন্মমৃত্যু মানিতেই হইবে। কিন্তু যখন এই স্বপ্ন দূর হইবে, তখনই জন্ম-মৃত্যুর স্বপ্নও বিলীন হইবে এবং বিশ্বের অস্তিত্বের স্বপ্নও ভঙ্গ হইবে। যে বস্তুকে আমরা বর্তমানে বিশ্বরূপে দেখিতেছি, তাহাই তখন পরমাত্মা-রূপে প্রতিভাত হইবে, এবং যে ঈশ্বরকে এতক্ষণ বাহিরে দেখিতেছিলাম, তাঁহাকেই এইবার নিজ হৃদয়ে স্বীয় আত্মা-রূপে দেখিতে পাইবে।

বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত

বৌদ্ধধর্মের ও ভারতের অন্যান্য সকল ধর্মমতের ভিত্তি বেদান্ত। কিন্তু যাহাকে আমরা আধুনিক কালের অদ্বৈত দর্শন বলি, উহার অনেকগুলি সিদ্ধান্ত বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুরা অর্থাৎ সনাতন-পন্থী হিন্দুরা অবশ্য ইহা স্বীকার করিবে না। তাহাদের নিকট বৌদ্ধেরা বিরুদ্ধবাদী পাষণ্ড। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধগণকেও অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সমগ্র মতবাদটি প্রসারিত করার একটি সজ্ঞান প্রয়াস রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের সহিত বেদান্তের কোন বিবাদ নাই। বেদান্তের উদ্দেশ্য সকল মতের সমন্বয় করা। মহাযানী বৌদ্ধদের সহিত আমাদের কোন কলহ নাই, কিন্তু বর্মী, শ্যামদেশীয় ও সমস্ত হীনযানীরা বলে যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি আছে, এবং জিজ্ঞাসা করে: এই দৃশ্যজগতের পশ্চাতে একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ সৃষ্টি করিবার কি অধিকার আমাদের আছে? বেদান্তের উত্তর: এই উক্তি মিথ্যা। বেদান্ত কখনও স্বীকার করে না যে, একটি দৃশ্য জগৎ ও একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে; একটি মাত্র জগৎ আছে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখিলে উহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা সব সময়েই ইন্দ্রিয়াতীত। যে রজ্জু দেখে, সে সর্প দেখে না। উহা হয় রজ্জু, না হয় সর্প; কিন্তু একসঙ্গে কখনও দুইটি নয়। সুতরাং বৌদ্ধেরা যে বলে, আমরা হিন্দুরা দুইটি জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, উহা সর্বৈব ভুল। ইচ্ছা করিলে জগৎকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিবার অধিকার তাহাদের আছে, কিন্তু ইহাকে ইন্দ্রিয়াতীত বলিবার কোন অধিকার অপরের নাই—এ-কথা বলিয়া বিবাদ করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই।

বৌদ্ধধর্ম দৃশ্য জগৎ ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করিতে চায় না। একমাত্র দৃশ্যজগতেই তৃষ্ণা আছে। তৃষ্ণাই এই সব কিছু সৃষ্টি করিতেছে। আধুনিক বৈদান্তিকেরা কিন্তু এই মত আদৌ গ্রহণ করে না। আমরা বলি, একটা কিছু আছে, যাহা ইচ্ছায় পরিণত হইয়াছে। ইচ্ছা একটি উৎপন্ন বস্তু—যৌগিক পদার্থ, 'মৌলিক' নয়। একটি বাহ্যবস্তু না থাকিলে কোন ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছা হইতে জগতের সৃষ্টি এই সিদ্ধান্তের অসম্ভাব্যতা আমরা সহজেই দেখিতে পাই। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? বাহিরের প্রেরণা ছাড়া ইচ্ছার উৎপত্তি

হইতে কখনও দেখিয়াছ কি ? উত্তেজনা ব্যতীত, অথবা আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় স্নায়বিক উত্তেজনা ব্যতীত বাসনা উঠিতে পারে না। ইচ্ছা মস্তিষ্কের একপ্রকার প্রতিক্রিয়া-বিশেষ, সাংখ্যবাদীরা ইহাকে বলে 'বুদ্ধি'। এই প্রতিক্রিয়ার পূর্বে ক্রিয়া থাকিবেই, এবং ক্রিয়া থাকিলেই একটি বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যখন স্থূল জগৎ থাকে না, তখন স্বভাবতই ইচ্ছাও থাকিবে না; তথাপি. তোমাদের মতে ইচ্ছাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। ইচ্ছা সৃষ্টি করে কে ? ইচ্ছা জগতের সহিত সহাবস্থিত। যে উত্তেজনা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, উহাই ইচ্ছা নামক পদার্থও সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু দর্শন নিশ্চয়ই এখানে থামিবে না। ইচ্ছা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত; সুতরাং জার্মান দার্শনিক শোপেনহারের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা একটি যৌগিক পদার্থ—বাহিরের ও ভিতরের মিশ্রণ। মনে কর, একটি মানুষ কোন ইন্দ্রিয় ছাড়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে লোকটির আদৌ ইচ্ছা থাকিবে না। ইচ্ছার জন্য প্রয়োজন কোন বাহ্য বিষয়ের এবং মস্তিষ্ক ভিতর হইতে কিছু শক্তি লাভ করে। কাজেই দেয়াল বা অন্য যে-কোন বস্তু যতখানি যৌগিক পদার্থ, ইচ্ছাও ঠিক ততখানি যৌগিক পদার্থ। জার্মান দার্শনিকদের ইচ্ছাশক্তি-বিষয়ক মতবাদের সহিত আমরা মোটেই একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা নিজেই দৃশ্য পদার্থ, কাজেই উহা পরম সত্তা হইতে পারে না। ইহা বহু অভিক্ষেপের অন্যতম। এমন কিছু আছে, যাহা ইচ্ছা নয়, কিন্তু ইচ্ছারূপে প্রকাশিত হইতেছে—এ-কথা আমি বুঝিতে পারি; কিন্তু ইচ্ছা নিজেই প্রত্যেক বস্তুরূপে প্রকাশিত হইতেছে—এ-কথা বুঝিতে পারি না; কারণ আমরা দেখিতেছি যে, জগৎ হইতে স্বতন্ত্ররূপে ইচ্ছার কোন ধারণাই আমাদের থাকিতে পারে না। যখন সেই মুক্তিস্বরূপ সত্তা ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়, তখন দেশ কাল ও নিমিত্ত দ্বারা সেই রূপান্তর ঘটে। ক্যাণ্টের বিশ্লেষণ ধর। ইচ্ছা—দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্যে আবদ্ধ। তাহা হইলে ইহা কি করিয়া পরম সত্তা হইবে ? কালের মধ্যে থাকিয়া ইচ্ছা না করিলে কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না।

সমস্ত চিন্তা রুদ্ধ করিতে পারিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা চিন্তার অতীত। নেতি নেতি বিচার করিয়া যখন সব দৃশ্যজগৎকে অস্বীকার করা হয়, তখন যাহা কিছু থাকে, তাহাই এই পরম সত্তা। ইহাকে প্রকাশ করা যায় না, ইহা অভিব্যক্ত হয় না; কারণ অভিব্যক্তি পুনরায় ইচ্ছায় পরিণত হইবে।

বেদান্তদর্শন এবং খ্রীষ্টধর্ম

১৯০০ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুআরি ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত ওকল্যাণ্ডের ইউনিটেরিয়ান চার্চে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

পৃথিবীর সব বড় বড় ধর্মের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যগুলি এতই চমকপ্রদ যে, সময়ে সময়ে মনে হয় বিভিন্ন ধর্মগুলি অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে বুঝি বা একে অন্যকে অনুকরণ করিয়াছে।

এই অনুকরণের কার্যটি বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রেই বর্তমান। কিন্তু এইরূপ একটি দোষারোপ যে ভাসাভাসা ও বাস্তবানুগ নয়, তাহা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে পরিস্ফুট হইবে:

ধর্ম মানুষের অন্তরের অপরিহার্য অঙ্গ এবং যেহেতু জীবন-মাত্রই অন্তর্জীবনেরই বিবর্তন। ধর্ম প্রয়োজনবশতই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং জাতিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়।

আত্মার ভাষা এক, কিন্তু বিভিন্ন জাতির ভাষা বিভিন্ন; তাহাদের রীতি-নীতি এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতির মধ্যেও প্রভেদ অনেক। ধর্ম অন্তরের অভিব্যক্তি এবং ইহা বিভিন্ন জাতি, ভাষা এবং রীতি-নীতির মধ্য দিয়া প্রকাশমান। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রতীত হয় যে, জগতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কেবল প্রকাশগত, ভাবগত নয়। যেমন আত্মার ভাষা ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক বিভেদ সত্ত্বেও একই হইয়া থাকে, তেমনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য এবং একত্ব আত্মারই অন্তর্গত এবং সহজাত। বিভিন্ন যন্ত্রে যেমন ঐকতান আছে, তেমনই ধর্মগুলির মধ্যেও সেই একই মিলনের সুর স্পন্দিত।

সব বড় বড় ধর্মের মধ্যেই একটি প্রথম সাদৃশ্য দেখা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একখানা করিয়া প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ আছে।

যে-সব ধর্মের এইরূপ কোন গ্রন্থ নাই, তাহারা কালে লোপ পায়। মিশর-দেশীয় ধর্মমতগুলির পরিণাম এইরূপই হইয়াছিল। প্রত্যেক বড় ধর্মমতেরই প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ যেন উহার ভিত্তিপ্রস্তর, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সেই মতাবলম্বিগণ সমবেত হয় এবং যাহা হইতে ঐ ধর্মের শক্তি এবং জীবন বিকীর্ণ হয়।

আবার প্রতিটি ধর্মই দাবি করে যে, তাহার নিজস্ব শাস্ত্রগ্রন্থই ভগবানের একমাত্র বাণী এবং অন্যান্য শাস্ত্র মিথ্যা ও মানুষের সহজ বিশ্বাসপ্রবণতার উপর বোঝা চাপানো এবং অন্য ধর্ম অনুসরণ করা মূর্খতা ও ধর্মান্ধতা।

সকল ধর্মের রক্ষণশীল অংশের বৈশিষ্ট্যই হইল এইপ্রকার গোঁড়ামি। উদাহরণস্বরূপ—বেদের যাহারা গোঁড়া সমর্থক, তাহারা দাবি করে যে, পৃথিবীতে বেদই একমাত্র প্রামাণ্য ঈশ্বরের বাণী এবং ঈশ্বর বেদের মধ্য দিয়াই জগতে তাঁহার বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন; শুধু তাই নয়, বেদের জন্যই এই জগতের অস্তিত্ব। জগৎ সৃষ্ট হইবার পূর্ব হইতেই বেদ ছিল, জগতের সবকিছুর অস্তিত্ব বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদে গরুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই গরুর অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে; অর্থাৎ যে জন্তুকে আমরা গরু বলিয়া জানি, তাহা বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদের ভাষাই ঈশ্বরের আদিম ভাষা; অন্যান্য সব ভাষা আঞ্চলিক বাচন মাত্র, ঈশ্বরের নয়। বেদের প্রতি শব্দ ও বাক্যাংশ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। প্রতি উচ্চারণ-ধ্বনি যথাযথ স্পন্দিত হইবে, এবং এই সুকঠোর যাথার্থ্য হইতে এতটুকু বিচ্যুতিও ঘোরতর পাপ ও ক্ষমার অযোগ্য।

ঠিক এই প্রকার গোঁড়ামি সব ধর্মের রক্ষণশীল অংশেই বর্তমান। কিন্তু আক্ষরিক অর্থ লইয়া এই ধরনের মারামারি যাহারা প্রশ্রয় দেয়, তাহারা মূর্খ এবং ধর্মান্ধ। যাঁহারা যথার্থ ধর্মভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন ধর্মের বহিঃপ্রকাশ লইয়া কখনও বিবাদ করেন না। তাঁহারা জানেন, সব ধর্মের তাৎপর্য এক, সুতরাং কেহ একই ভাষায় কথা না বলিলেও তাঁহারা পরস্পর কোন প্রকার বিবাদ করেন না।

বেদসমূহ বস্তুতই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কেহই জানে না, কোন্ কালে কাহার দ্বারা এগুলি লিখিত হইয়াছে। বেদসমূহ বিভিন্ন খণ্ডে সংরক্ষিত এবং আমার সন্দেহ হয়, কেহ কখনও এইগুলি সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিয়াছে কি-না।

বেদের ধর্মই হিন্দুদিগের ধর্ম এবং সব প্রাচ্যদেশীয় ধর্মের ভিত্তিভূমি; অর্থাৎ অন্যান্য প্রাচ্যধর্মগুলি বেদেরই শাখা-প্রশাখা। প্রাচ্যদেশের সব ধর্মমত বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করে।

যীশুখ্রীষ্টের বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাণীগুলির অধিকাংশেরই কোন প্রয়োগ বর্তমানকালে নাই—এরূপ মত পোষণ করা

অযৌক্তিক। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, বিশ্বাসীদের শক্তিলাভ হইবে—খ্রীষ্টের বাণীতে যাহারা বিশ্বাসবান্, তাহাদের কেন শক্তিলাভ হয় না? তাহার কারণস্বরূপ যদি বলো যে, বিশ্বাস এবং পবিত্রতা যথেষ্ট পরিমাণে নাই, তবে তাহা ঠিকই। কিন্তু বর্তমানকালে ঐগুলির কোন প্রয়োগ নাই—এইরূপ বলা হাস্যোদ্দীপক।

আমি কখনও এইরূপ কোন ব্যক্তি দেখি নাই, যে অন্ততঃ আমার সমান নয়। আমি সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণ করিয়াছি, নিকৃষ্ট লোকের—নরমাংস-ভোজীদের মধ্যেও বাস করিয়াছি এবং আমি কখনও এমন একজনকেও দেখি নাই, যে অন্ততঃ আমার সমান নয়। তাহারা যাহা করে, আমি যখন নির্বোধ ছিলাম, আমিও তাহা করিয়াছি। তখন আমি ইহাদের অপেক্ষা উন্নত কিছুই জানিতাম না, এখন আমি বুঝিতেছি। এখন তাহারা ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু জানে না, কিছুকাল পরে তাহারাও জানিতে পারিবে। প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে। আমরা সকলেই উন্নতির পথেই চলিয়াছি। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, একজন অপর ব্যক্তি অপেক্ষা উন্নততর নয়।

বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম ?

১৯০০, ৮ই এপ্রিল স্যান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত।

আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা গত এক মাস যাবৎ আমার প্রদত্ত বক্তৃতাবলী শুনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বেদান্ত-দর্শনে নিহিত ভাবগুলির সহিত পরিচিত হইয়াছেন।

বেদান্তই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম, তবে ইহা কখনও লোকপ্রিয় হইয়াছে—এমন কথা বলা যায় না। অতএব 'বেদান্ত কি ভবিষ্যতের ধর্ম হইতে চলিয়াছে ?'—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

প্রারম্ভেই আমি বলিতে চাই যে, বেদান্ত জনগণের অধিকাংশের ধর্ম কখনও হইয়া উঠিবে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারিব না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের ন্যায় কোন একটি জাতির সকলকে এই ধর্ম আপন কুক্ষিতে আনিতে কখনও কি সক্ষম হইবে ? সম্ভবতঃ ইহা হইতে পারে। যাহাই হউক, আজ বিকালে আমরা এই প্রশ্ন লইয়াই আলোচনা করিতে চাই।

প্রথমেই বলি, বেদান্ত কি নয়; পরে বলিব, বেদান্ত কি। নৈর্ব্যক্তিক ভাবের উপর জোর দিলেও বেদান্ত কোন কিছুর বিরোধী নয়—যদিও বেদান্ত কাহারও সহিত কোন আপস করে না, বা নিজস্ব মৌলিক সত্য ত্যাগ করে না।

প্রত্যেক ধর্মেই কতকগুলি জিনিস একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম একখানি গ্রন্থ। অদ্ভুত তাহার শক্তি! গ্রন্থখানি যাহাই হউক না কেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের সংহতি। গ্রন্থ নাই—এমন কোন ধর্ম আজ টিকিয়া নাই। যুক্তিবাদের বড় বড় কথা সত্ত্বেও মানুষ গ্রন্থ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।

আপনাদের দেশে গ্রন্থবিহীন ধর্ম-স্থাপনের প্রতিটি চেষ্টাই অকৃতকার্য হইয়াছে। ভারতবর্ষে সম্প্রদায়সকল প্রবল সাফল্যের সহিত গড়িয়া উঠে—কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে সেগুলি লোপ পায়, কারণ তাহাদের কোন গ্রন্থ নাই। অন্যান্য দেশেও এইরূপই হয়।

ইউনিটেরিয়ান ধর্মান্দোলনের উত্থান ও পতন আলোচনা করুন। এই ধর্ম আপনাদের জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি উপস্থাপিত করিয়াছে। মেথডিস্ট,

ব্যাপ্টিস্ট এবং অন্যান্য খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মতো এই সম্প্রদায় কেন এত প্রচারিত হয় নাই ? কারণ উহার কোন গ্রন্থ ছিল না। অপরপক্ষে ইহুদীদিগের কথা ভাবুন। মুষ্টিমেয় লোকসংখ্যা—এক দেশ হইতে অন্যদেশে বিতাড়িত হইয়াছে—তথাপি নিজেদের গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, কারণ তাহাদের গ্রন্থ আছে। পার্শীদিগের কথা ভাবুন—পৃথিবীতে সংখ্যায় মাত্র একলক্ষ। ভারতে জৈনদিগের দশ লক্ষ অবশিষ্ট আছে। আর আপনারা কি জানেন যে, এই মুষ্টিমেয় পার্শী ও জৈনগণ এখনও টিকিয়া আছে, কেবল তাহাদের গ্রন্থের জোরে। বর্তমান সময়ের জীবন্ত ধর্মগুলির প্রত্যেকেরই একটি গ্রন্থ আছে।

ধর্মের দ্বিতীয় প্রয়োজন—একটি ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। সেই ব্যক্তি হয় জগতের ঈশ্বররূপে বা মহান্ আচার্যরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন। মানুষ একজন মানুষকে পূজা করিবেই। তাহার চাই—একজন অবতার, প্রেরিত পুরুষ বা মহান্ নেতা। সকল ধর্মেই ইহা লক্ষণীয়।

হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের অবতার আছেন; বৌদ্ধ, মুসলমান ও ইহুদীদের প্রেরিত পুরুষ আছেন। কিন্তু সব ধর্মেই এক ব্যাপার—তাহাদের শ্রদ্ধা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করিয়া নিবিষ্ট।

ধর্মের তৃতীয় প্রয়োজন—নিজেকে শক্ত ও নিরাপদ করিবার জন্য এমন এক বিশ্বাস যে, সেই ধর্মই একমাত্র সত্য; নতুবা ইহা জনসমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

উদারতা শুষ্ক বলিয়া মরিয়া যায়; ইহা মানুষের মনে ধর্মোন্মত্ততা জাগাইতে পারে না—সকলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াইতে পারে না। তাই উদার ধর্মের বারংবার পতন ঘটিয়াছে; মাত্র কয়েকজনের উপরই ইহার প্রভাব। কারণ নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। উদারতা আমাদের নিঃস্বার্থ হইতে বলে, আমরা তাহা চাই না—কারণ তাহাতে সাক্ষাৎভাবে কোন লাভ নাই; স্বার্থদ্বারাই আমাদের বেশী লাভ। যতক্ষণ আমাদের কিছু নাই, ততক্ষণই আমরা উদার। অর্থ ও শক্তি সঞ্চিত হইলেই আমরা রক্ষণশীল। দরিদ্রই গণতান্ত্রিক, সেই আবার ধনী হইলে অভিজাত হয়। ধর্ম-জগতেও মনুষ্য-স্বভাব একইভাবে কাজ করে।

নবী আসিলেন—যাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিল, তাহাদিগকে তিনি কোন প্রকারের ফললাভের প্রতিশ্রুতি দিলেন—আর যাহারা অনুসরণ

করিল না, তাহাদের জন্য রহিল অনন্ত দুর্গতি। এইভাবে তিনি তাঁহার ভাব প্রচার করেন। প্রচারশীল আধুনিক ধর্মগুলি ভয়ঙ্করভাবে গোঁড়া। যে সম্প্রদায় যত বেশি অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে, তাহার তত বেশি সাফল্য এবং ততই অধিকসংখ্যক মানুষ তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করিবার পর এবং বহুজাতির সহিত বসবাস করিয়া এবং বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিবার পর আমার সিদ্ধান্ত—বিশ্বভ্রাতৃত্বের বহু বাগ্‌বিস্তার সত্ত্বেও বর্তমান পরিস্থিতিই চলিতে থাকিবে।

বেদান্ত এই-সকল শিক্ষার একটিতেও বিশ্বাস করে না। প্রথমতঃ ইহা কোনও পুস্তকে বিশ্বাস করে না। প্রবর্তকের পক্ষে ইহা খুবই কঠিন অন্যান্য পুস্তকের উপর একখানি পুস্তকের প্রামাণ্য বা কর্তৃত্ব বেদান্ত মানে না। বেদান্ত জোরের সহিত অস্বীকার করে যে, একখানি পুস্তকেই ঈশ্বর, আত্মা ও পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল সত্য আবদ্ধ থাকিবে। যাঁহারা উপনিষদ্‌-পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে উপনিষদ্‌ই বারংবার বলিতেছে, 'শুধু পড়িয়া শুনিয়া কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না'। দ্বিতীয়তঃ একজন বিশেষ ব্যক্তিকে (শ্রেষ্ঠ) ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করা—বেদান্ত-মতে আরও কঠিন। বেদান্ত বলিতে উপনিষদ্‌ই বুঝায়; একমাত্র উপনিষদ্‌ই কোন ব্যক্তিবিশেষে আসক্ত নয়।

কোন একজন পুরুষ বা নারী কখনই বেদান্তবাদীর কাছে পূজার্হ হইয়া উঠেন নাই, তাহা হইতে পারে না। একজন মানুষ একটি পাখি বা কীট অপেক্ষা বেশী পূজার যোগ্য নয়। আমরা সকলেই ভাই, পার্থক্য কেবল মাত্রায়। আমি যা, নিম্নতম কীটও তো তাই। বুঝিয়া দেখুন, কোন মানুষ আমাদিগের অনেক ঊর্ধ্বে উঠিবেন, আর আমরা গিয়া তাঁহাকে পূজা করিব—তিনি আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবেন—আর আমরা তাঁহার কৃপায় উদ্ধার পাইব—এই-সকল ভাবের স্থান বেদান্তে খুবই কম। বেদান্ত এরূপ শিখায় না—না গ্রন্থ, না কোন মানুষকে পূজা করিতে; না, এই-সকল কিছুই শিখায় না।

আপনারা এই দেশে সাধারণতন্ত্র চান। বেদান্ত সাধারণতন্ত্রী ঈশ্বরকেই প্রচার করে।

দেশে সরকার আছে—সরকার একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। আপনাদের সরকার স্বৈরাচারতন্ত্রী নয়, তথাপি পৃথিবীর যে কোন রাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। মনে হয়, কেহই এই কথাটি বুঝিতে পারে না যে, সত্যিকারের শক্তি, সত্যিকারের জীবন, সত্যিকারের ক্ষমতা অদৃশ্য, নিরাকার, নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় নিহিত। ব্যক্তি হিসাবে—অন্য সবকিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে মানুষ নগণ্যমাত্র, কিন্তু জাতির নৈর্ব্যক্তিক সত্তার একক হিসাবে যাহা নিজেকে শাসিত করে—তাহা মানুষকে করে অপ্রতিরোধ্য। সে সরকারের সহিত এক—সে এক ভীষণ শক্তি। কিন্তু বস্তুতঃ শক্তিটি কোথায় নিহিত? প্রত্যেক মানবই শক্তি। রাজা নাই। আমি সকল মানুষকে সমভাবে একই দেখি। আমাকে টুপি খুলিতে বা নত হইতে হইবে না। তথাপি প্রতি মানুষের মধ্যেই এই ভীষণ শক্তি। বেদান্ত ঠিক এইরূপ।

আরও কঠিন ব্যাপার ঈশ্বরকে লইয়া। বেদান্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্ এক জগতে সিংহাসনে সমাসীন সম্রাট্ নন! অনেকে আছে, তাহাদের ঐরূপ একজন ঈশ্বর চাই, যাহাকে তাহারা ভয় করিবে, যাহাকে তাহারা সন্তুষ্ট করিবে। তাহারা প্রদীপ জ্বালাইবে এবং তাহার সম্মুখে ধূলায় গড়াগড়ি যাইবে। তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য তাহাদের একজন রাজা চাই, স্বর্গেও তাহাদের সকলের উপর শাসন করিবার জন্য রাজা চাই। অবশেষে এই দেশ হইতে রাজা বিদায় হইয়াছেন। স্বর্গস্থ রাজা আজ কোথায়? মর্ত্যের রাজারা যেখানে, সেইখানে। গণতান্ত্রিক দেশে রাজা প্রত্যেক প্রজার অন্তরে। এই দেশে আপনারা সকলেই রাজা। বেদান্ত ধর্মেও তাই ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরে। বেদান্ত বলে, জীব ব্রহ্মই। এইজন্য বেদান্ত খুব কঠিন। বেদান্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা আদৌ শিক্ষা দেয় না। মেঘের ওপারে অবস্থিত স্বেচ্ছাচারী, শূন্য হইতে খুশিমত সৃষ্টিকারী, মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাদায়ক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদান্ত শিক্ষা দেয়—ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্যামী, ঈশ্বর সর্বরূপে—সর্বভূতে। এই দেশ হইতে মহিমান্বিত রাজা বিদায় লইয়াছেন, স্বর্গস্থ রাজ্যপাট বেদান্ত হইতে শত শত বৎসর পূর্বেই লোপ পাইয়াছে।

ভারত মহিমান্বিত একজন রাজাকে চায়, ঐভাব ত্যাগ করিতে পারিতেছে না—এই কারণেই বেদান্ত ভারতের ধর্ম হইতে পারে না। বেদান্ত

আপনাদের দেশের ধর্ম হইতে পারে—সে সম্ভাবনা আছে, কারণ ইহা সাধারণতন্ত্র। কিন্তু তাহা হইতে পারে কেবলমাত্র তখনই, যদি আপনারা পরিষ্কারভাবে বেদান্ত বুঝিয়া লইতে পারেন; যদি আপনারা সত্যিকারের নর-নারী হইতে পারেন, অর্ধজীর্ণ ভাবধারা-সম্পন্ন ও কুসংস্কারপূর্ণ বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষ না হন, যদি আপনারা সত্যিকারের ধার্মিক হইতে চান—তবেই সম্ভব, কারণ বেদান্ত কেবল আধ্যাত্মিকভাবের সহিতই সংশ্লিষ্ট।

স্বর্গস্থ ঈশ্বরের ধারণা কি রকম? নিছক জড়বাদ! বেদান্তের ধারণা—ঈশ্বরের অনন্তভাব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রূপায়িত।…মেঘের উপরে ঈশ্বর বসিয়া আছেন! কি অধর্মের কথা! ইহাই জড়বাদ, জঘন্য জড়বাদ! শিশুরা যখন এই প্রকার ভাবে, তখন ইহা ঠিক হইতে পারে; কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা যখন এই প্রকার শিক্ষা দেয়, তখন ইহা দারুণ বিরক্তিকর। এই ধারণা—জড় হইতে, দেহভাব হইতে, ইন্দ্রিয়ভাব হইতে উদ্ভূত। ইহা কি ধর্ম? ইহা আফ্রিকার 'মাম্বো ফাম্বো' ধর্ম অপেক্ষা উন্নত নয়! ঈশ্বর আত্মা; তিনি সত্যস্বরূপে উপাস্য। আত্মা কি শুধু স্বর্গেই থাকে? আত্মা কি? আমরাই আত্মা, আমরা তাহা অনুভব করি না কেন? দেহ-বোধ হইতেই বিভেদ ভাব; দেহভাব ভুলিলেই সর্বত্র আত্মভাব অনুভূত হয়।

বেদান্ত এই-সব মতবাদ প্রচার করে নাই। কোন পুস্তক নয়; বেদান্ত মনুষ্যসমাজ হইতে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া বাছিয়া লয় নাই;—'তোমরা কীট, আর আমরা ঈশ্বর—প্রভু!'—না, ইহাদের কোনটিই বেদান্ত নয়। যদি তুমি ঈশ্বর, তবে আমিও ঈশ্বর। সুতরাং বেদান্ত পাপকে স্বীকার করে না। ভ্রম আছে, পাপ নাই; কালক্রমে সকলেই সত্যে উপনীত হইবে। শয়তান নাই—এই ধরনের কল্পনামূলক গল্পের কোনটির অস্তিত্ব নাই। বেদান্ত কেবল একটি পাপকে—জগতের মধ্যে কেবল একটিকেই স্বীকার করে, তাহা এই: 'অপরকে বা নিজেকে পাপী ভাবাই পাপ'। এই ধারণা হইতে অপরাপর ভ্রম-প্রমাদ যাহাকে সাধারণতঃ পাপ বলা হয়, তাহা ঘটিয়া থাকে। আমাদের জীবনে অনেক ত্রুটি ঘটিয়াছে, কিন্তু আমরা অগ্রসর হইতেছি। আমাদিগের মঙ্গল হউক, যেহেতু আমরা অনেক ভুল করিয়াছি। দূরদৃষ্টিতে অতীতের দিকে চাহিয়া দেখুন। যদি বর্তমান অবস্থা মঙ্গলজনক হইয়া থাকে,

তবে তাহা অতীতের সকল বিফলতা ও সাফল্যের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। সাফল্যের জয় হউক! ব্যর্থতারও জয় হউক! যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া তাকাইও না। অগ্রসর হও!

দেখা যাইতেছে, বেদান্ত পাপ বা পাপী কল্পনা করে না। ভয় করিতে হইবে—এমন ঈশ্বর এখানে নাই। ঈশ্বরকে আমরা কখনও ভয় করিতে পারি না, কারণ তিনি আমাদের আত্মাস্বরূপ। তাহা হইলে যাহার ঈশ্বরের ভয় আছে, তিনিই কি সর্বাপেক্ষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি নন? এমন লোকও থাকিতে পারেন, যিনি আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পান, কিন্তু নিজেকে ভয় পান না। মানুষের নিজের আত্মাই ভগবান্। তিনিই একমাত্র সত্তা, যাহাকে সম্ভবতঃ কখনই ভয় করা যায় না। কি বাজে কথা যে, 'ঈশ্বরের ভয় তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে ভীত করিল', ইত্যাদি, ইত্যাদি—কি পাগলামি? ভগবান্ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন যেন আমাদের সকলকেই পাগলা-গারদে বাস করিতে না হয়। কিন্তু যদি আমাদিগের অধিকাংশই পাগল না হই, তবে 'ভগবানে ভয়' সম্পর্কে মিথ্যা রচনাগুলি কেন করি? ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, কম-বেশি সমগ্র মনুষ্যজাতিই পাগল। মনে হইতেছে, কথাটি সম্পূর্ণ সত্য।

কোন গ্রন্থ নয়, ব্যক্তি নয়, ব্যক্তি-ঈশ্বর নয়। এইগুলি দূর করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়চেতনাও দূর হইবে। আমরা ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারি না। হিমবাহে তুহিন-স্পর্শে মুমূর্ষু ব্যক্তির মতো এখন আমরা আবদ্ধ হইয়া আছি। শীতে অবসন্ন পথিক নিদ্রাভিভূত হইবার একপ্রকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বোধ করে এবং তাহাদের বন্ধুগণ যখন তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকে মৃত্যু সম্পর্কে সাবধান করে, তখন সে যেমন বলিয়া থাকে, 'আমাকে মরতে দাও, আমি ঘুমুতে চাই'—তেমনি আমরা সকলেই ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় আঁকড়াইয়া আছি, এমন কি যদি আমরা ইহার্তে বিনষ্ট হইয়া গেলেও আঁকড়াইয়া থাকি—আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইহা অপেক্ষাও মহত্তর ভাব আছে।

হিন্দুদিগের পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ একবার মর্ত্যে শূকররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শূকরীর গর্ভে কালক্রমে তাঁহার অনেকগুলি ছোট ছোট শাবক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই পরিবারটিতেই

খুব সুখী; তাঁহার স্বর্গীয় মহিমা ও ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া গিয়া এই পরিবারের সহিত কাদায় মহানন্দে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ মহাচিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং মর্ত্যে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, যাহাতে তিনি শূকর-শরীর ছাড়িয়া স্বর্গে গমন করেন। কিন্তু ভগবান্ ঐসকল কিছুই করিলেন না—তিনি দেবগণকে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি খুব সুখে আছেন এবং ইহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইতে চাহেন না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া দেবগণ ঈশ্বরের শূকর-শরীরটি ধ্বংস করিয়া দিতেই তিনি তাঁহার স্বর্গীয় মহিমা ফিরিয়া পাইলেন এবং শূকর-যোনিতেও যে তিনি এত আনন্দ পাইতে পারেন—ইহা ভাবিয়া পরমাশ্চর্য হইলেন।

ইহাই মানুষের স্বভাব। যখনই তাহারা নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের কথা শোনে, তাহারা ভাবে, 'আমার ব্যক্তিত্বের কী হইবে?—আমার ব্যক্তিত্ব কি নষ্ট হইবে!' পরমূহূর্তেই ঐ চিন্তা আসে—শূকরটিকে মনে করুন—আর তখন যে কী অসীম সুখের খনিই না আপনাদের প্রত্যেকের জন্য রহিয়াছে। বর্তমান অবস্থাতে আপনি কতই না সুখী! কিন্তু যখন মানুষ সত্যস্বরূপ জানিতে পারে, তখন সে এই ভাবিয়া অবাক্ হয় যে, সে এই ইন্দ্রিয়পর জীবন ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। ব্যক্তিত্বে কী আছে? ইহা কি শূকর-জীবন হইতে ভাল কিছু? আর তাহাই ছাড়িতে চায় না! ভগবান্ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

বেদান্ত আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? প্রথমতঃ বেদান্ত শেখায় যে, সত্য জানিতে হইলে মানুষকে নিজের বাহিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ সব বর্তমানেই নিহিত। কোন মানুষই কখনও অতীতকে দেখে নাই। আপনাদের কেহ কি অতীতকে দেখিয়াছেন? যখন কেহ অতীতকে বোধ করিতেছি বলিয়া চিন্তা করে, তখন সে বর্তমান মুহূর্তমধ্যে অতীতের কল্পনা করে মাত্র। ভবিষ্যৎ দেখিতে গেলে বর্তমানের মধ্যেই তাহাকে আনিতে হইবে, বর্তমানই একমাত্র সত্য—বাকী সব কল্পনা। এই বর্তমান, ইহাই সব। কেবল একই বর্তমান। যাহা কিছু বর্তমানে অবস্থিত, তাহাই সত্য। অনন্তকালের মধ্যে একটি ক্ষণ—অন্যান্য প্রত্যেক ক্ষণের মতোই সম্পূর্ণ ও সর্বগ্রাহী। যাহা কিছু আছে, ছিল ও থাকিবে তাহা

সবই বর্তমানে অবস্থিত। যদি কেহ ইহার বাহিরে কোন কিছুর কল্পনা করিতে চান, করুন—কিন্তু কখনই সফলকাম হইবেন না।

এই পৃথিবীর সাদৃশ্য বাদ দিয়া স্বর্গ-চিত্রের বর্ণনা কোন্ ধর্ম দিতে পারিয়াছে? আর সবই তো চিত্র—কেবল এই জগৎ-চিত্রটি আমাদিগের নিকট ধীরে ধীরে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা জগৎকে স্থূল, এবং বর্ণ, আকৃতি, শব্দ ইত্যাদি -সম্পন্ন আছে বলিয়া দেখিতেছি। মনে করুন, আমার একটি বৈদ্যুতিক ইন্দ্রিয় হইল—সব পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। মনে করুন, আমার ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্মতর হইয়া গেল—আপনারা সকলেই অন্যরূপে প্রতিভাত হইবেন। যদি আমি পরিবর্তিত হই, তবে আপনারা পরিবর্তিত হইয়া যান। যদি আমি ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে চলিয়া যাই, আপনারা আত্মারূপে—ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইবেন। বস্তুগুলিকে যেমন দেখা যাইতেছে, তাহারা ঠিক তেমনটি নয়।

ক্রমে ক্রমে যখন এইগুলি আমরা বুঝিব, তখন ধারণা হইবে: এই-সব স্বর্গাদি লোক—সবকিছু—সব এইখানে, এইক্ষণেই অবস্থিত; আর এইগুলি সত্য সত্য ঈশ্বরাস্তিত্বের উপর আরোপিত বা অধ্যস্ত সত্তা ব্যতীত কিছুই নয়। এই অস্তিত্ব স্বর্গ-মর্ত্যাদি অপেক্ষা মহত্তর। মানুষ ভাবে, মর্ত্যলোক পাপময় এবং স্বর্গ অন্য কোথাও অবস্থিত। মর্ত্যলোক খারাপ নয়। জানিতে পারিলে দেখা যায় যে, ইহাও ভগবান্ স্বয়ং। বিশ্বাস করা অপেক্ষা এই তত্ত্বকে বোঝা অনেক বেশি দুরূহ। আততায়ী, যে আগামীকাল ফাঁসিতে ঝুলিবে সে-ও ভগবান্, সাক্ষাৎ ভগবান্। নিশ্চিতভাবে এই তত্ত্বকে ধারণা করা খুবই কঠিন—কিন্তু ইহাকে উপলব্ধি করা যায়।

এইজন্য বেদান্তের সিদ্ধান্ত—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব নয়, বিশ্বাত্মৈক্য। আমি অপরাপর মানুষ, জন্তু—ভাল, মন্দ—যে-কোন জিনিসের মতই একজন। সর্বত্র এক শরীর, এক মন ও একটি আত্মা বিরাজিত। আত্মা কখনও মরে না। মৃত্যু বলিয়া কোথাও কিছু নাই—দেহের ক্ষেত্রেও মরণ নাই, মনও মরে না। কিভাবে শরীরের মৃত্যু ঘটিতে পারে? একটি পাতা খসিয়া পড়িল—ইহাতে কি গাছের মৃত্যু ঘটে? এই বিশ্ব আমার শরীর। দেখুন, কিভাবে এই চেতনা অগ্রসর হইতেছে। সকল মনই আমার। সকল পায়ে আমি পরিভ্রমণ করি—সকল মুখে আমিই কথা বলি—সর্বশরীরে আমিই অধিষ্ঠিত।

কেন আমি ইহাকে অনুভব করিতে পারি না? কারণ আমার ব্যক্তিত্ব—ঐ শূকরত্ব। মানুষ নিজেকে এই মনের সহিত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, এইজন্য কেবল এইখানেই থাকিতে পারে—দূরে নয়। অমরত্ব কি? সামান্য কয়েকজন মাত্র জবাবটি এইভাবে দেয়, 'ইহা যে আমাদেরই অস্তিত্ব!' বেশির ভাগ লোকই ভাবে, এই-সবই মরণশীল বা মৃত—ভগবান্ এইখানে নাই, তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া অমর হইবে। তাহারা কল্পনা করে যে, মৃত্যুর পর তাহারা ভগবানের দর্শন পাইবে। কিন্তু যদি তাহারা তাঁহাকে এই লোকে এইক্ষণে দেখিতে না পায়—তবে মৃত্যুর পরও তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। যদিও তাহারা সকলেই অমরত্বে বিশ্বাসী, তথাপি তাহারা জানে না—মরিবার পর স্বর্গে গিয়া অমরত্ব লাভ করা যায় না, পরন্তু আমাদের শূকরসুলভ ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিয়া—একটি ক্ষুদ্র শরীরের সহিত নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়াই আমরা অমরত্ব লাভ করিতে পারি। নিজেকে সকলের সহিত এক বলিয়া জানা—সকল দেহের মধ্যেই আপনার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করা—সকল মনের মধ্য দিয়া অনুভব করাই অমরত্ব। এই শরীর ছাড়া অপর শরীরের মধ্য দিয়া আমরা অনুভূতি লাভ করিতে পারি। আমরা নিশ্চয়ই অপর শরীরের মধ্য দিয়া অনুভূতি লাভ করিব। সমবেদনার অর্থ কি? সমবেদনার—আমাদের শরীরের অনুভূতির—কি কোন সীমা আছে? ইহাও সম্পূর্ণরূপে সম্ভব যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন সমগ্র বিশ্বের মধ্য দিয়া আমি অনুভব করিব।

ইহাতে লাভ কি? এই শূকর-শরীর ত্যাগ করা কঠিন; আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শূকর-শরীরের আনন্দ ত্যাগ করিতে দুঃখবোধ করিয়া থাকি। বেদান্ত ইহা ত্যাগ করিতে বলে না, বলে, 'ইহার পারে যাও'। কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন নাই—দুইটি শরীরে অনুভূত সুখলাভ অধিকতর ভাল—তিনটিতে আরও বেশী ভাল। একটির বদলে বহুশরীরে বাস! যখন আমি বিশ্বের মাধ্যমে সুখলাভ করিতে পারিব, তখন সমগ্র বিশ্বই আমার শরীর হইবে।

অনেকে আছেন, যাঁহারা এই-সকল তত্ত্ব শুনিয়া ভীত হন। তাঁহারা যে পক্ষপাতী অত্যাচারী কোন ঈশ্বর, ক্ষুদ্র শূকররূপ শরীরধারী নন—এই কথা শুনিতে তাঁহারা রাজী নন। আমি তাঁহাদিগকে বলি, 'অগ্রসর

হউন !' তাঁহারা বলেন—তাঁহারা পাপের পঙ্কে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কাহারও কৃপা ব্যতীত তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন না। আমি বলি, 'তোমরাই ঈশ্বর !' তাঁহারা জবাবে বলেন, 'ওহে ঈশ্বরদ্বেষী ! তুমি কোন্ সাহসে এই কথা বলো ? কিভাবে একটি দীন প্রাণী (জীব) ঈশ্বর হয় ? আমরা পাপী !' আপনারা জানেন, সময়ে সময়ে আমি বড় হতোদ্যম হইয়া পড়ি। শত শত পুরুষ ও মহিলা আমাকে বলিয়াছেন, 'যদি নরকই নাই, তবে ধর্ম কিভাবে থাকে ?' যদি এই-সব মানুষ স্বেচ্ছায় নরকে যায়, তবে কে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারে ?

মানুষ যাহা কিছুর স্বপ্ন দেখে বা ভাবে—সবই তাহার সৃষ্টি। যদি নরকের চিন্তা করিয়া মরে, তবে নরকই দেখিবে। যদি মন্দ এবং শয়তানের চিন্তা করে, তবে শয়তানকেই পাইবে—ভূত ভাবিলে ভূত পাইবে। যাহা কিছু ভাবনা করিবেন, তাহাই হইবেন, এইজন্য সৎ ও মহৎ ভাবনা অবশ্যই ভাবিতে হইবে। ইহার দ্বারাই নিরূপিত হয় যে, মানুষ একটি ক্ষীণ ক্ষুদ্র কীটমাত্র। আমরা দুর্বল—এই কথা উচ্চারণ করিয়াই আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, ইহা অপেক্ষা বেশী ভাল কিছু হইতে পারি না। মনে কর, আমরা নিজেরাই আলো নিভাইয়া, জানালা বন্ধ করিয়া চীৎকার করি—ঘরটি অন্ধকার। ঐসকল বাজে গল্পকথাগুলি একবার ভাবুন ! 'আমি পাপী'—এই কথা বলিলে আমার কী উপকার হইবে ? যদি আমি অন্ধকারেই থাকি, তবে আমাকে একটি প্রদীপ জ্বালিতে দাও ; তাহা হইলে সকল অন্ধকার চলিয়া যাইবে। আর মানুষের স্বভাব কি আশ্চর্যজনক। যদিও তাহারা সর্বদাই সচেতন যে, তাহাদের জীবনের পিছনে বিশ্বাত্মা বিরাজিত, তথাপি তাহারা বেশী করিয়া শয়তানের কথা—অন্ধকার ও মিথ্যার কথা ভাবিয়া থাকে। তাহাদের সত্যস্বরূপের কথা বলুন—তাহারা বুঝিতে পারিবে না ; তাহারা অন্ধকারকে বেশী ভালবাসে।

ইহা হইতেই বেদান্তে একটি মহৎ প্রশ্নের সৃষ্টি হইয়াছে : জীব এত ভীত কেন ? ইহার উত্তর এই যে, জীবগণ নিজেদের অসহায় ও অপরের উপর নির্ভরশীল করিয়াছে বলিয়া। আমরা এত অলস যে, নিজেরা কিছুই করিতে চাই না। আমরা একটি ইষ্ট, একজন পরিত্রাতা, অথবা একজন প্রেরিত পুরুষ চাই, যিনি আমাদের জন্য সবকিছু করিয়া দিবেন। অতিরিক্ত ধনী

কখনও হাঁটেন না—সর্বদাই গাড়িতে চলেন; বহু বৎসর বাদে তিনি হঠাৎ একদিন জাগিলেন, কিন্তু তখন তিনি অথর্ব হইয়া গিয়াছেন। তখন তিনি বোধ করিতে আরম্ভ করেন, যেভাবে তিনি সারা জীবন কাটাইয়াছেন, তাহা মোটের উপর ভাল নয়, কোন মানুষই আমার হইয়া হাঁটিতে পারে না। আমার হইয়া যদি কেহ প্রতিটি কাজ করে, তবে প্রতিবারেই সে আমাকে পঙ্গু করিবে। যদি সব কাজই অপরে করিয়া দিতে থাকে, তবে সে অঙ্গচালনার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিবে। যাহা কিছু আমরা স্বয়ং করি, তাহাই একমাত্র কাজ যাহা আমাদিগের নিজস্ব। যাহা কিছু আমাদের জন্য অপরের দ্বারা কৃত হয়, তাহা কখনই আমাদের হয় না। তোমরা আমার বক্তৃতা শুনিয়া আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতে পার না। যদি তোমরা কিছুমাত্র শিখিয়া থাকো, তবে আমি সেই স্ফুলিঙ্গ-মাত্র, যাহা তোমাদের ভিতরকার অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। অবতার পুরুষ বা গুরু কেবল ইহাই করিতে পারেন। সাহায্যের জন্য ছুটাছুটি মূর্খতা।

ভারতে বলদ-বাহিত শকটের কথা আপনারা জানেন। সাধারণতঃ দুইটি বলদকে গাড়ির সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়, আর কখনও কখন এক আঁটি খড় একটি বাঁশের মাথায় বাঁধিয়া পশুদুইটির সামনে কিঞ্চিৎ দূরে—কিন্তু উহাদের নাগালের বাহিরে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বলদ দুইটি ক্রমাগত খড় খাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু কখনও কৃতকার্য হইতে পারে না। ঠিক এইভাবেই আমরা সাহায্য লাভ করি। আমরা মনে করি—আমরা নিরাপত্তা, শক্তি, জ্ঞান, শান্তি বাহির হইতে পাইব। আমরা সর্বদাই এইরূপ আশা করি, কিন্তু কখনও আশা পূর্ণ করিতে পারি না। বাহির হইতে কোন সাহায্য কখনও আসে না।

মানুষের কোন সহায়ক নাই। কেহ কোন কালে ছিল না, নাই এবং থাকিবেও না। কেনই বা থাকিবে? আপনারা কি মানব ও মানবী নন? এই পৃথিবীর প্রভুগণ কি অপরের কৃত সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইবে? ইহাতে কি আপনারা লজ্জিত নন? যখন আপনারা ধূলায় মিশিয়া যাইবেন, তখনই অপরের সহায়তা লাভ করিবেন। কিন্তু মানুষ আত্মস্বরূপ। নিজেদের বিপদ হইতে টানিয়া তোল! 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'। ইহা ছাড়া অন্য কোন সাহায্য নাই—কোনকালে ছিলও না। সাহায্যক আছে, এরূপ ভাবনা

সুমধুর ভ্রান্তিমাত্র। ইহার দ্বারা কোন মঙ্গল হইবে না। একদিন একজন খ্রীষ্টান আমার কাছে আসিয়া বলে, 'আপনি একজন ভয়ঙ্কর পাপী।' উত্তরে বলিলাম—'হ্যা তাই, তারপর।' সে একজন ধর্ম-প্রচারক। লোকটি আমাকে ছাড়িতে চাহিত না। তাহাকে আসিতে দেখিলেই আমি পলায়ন করিতাম। সে বলিত, 'তোমার জন্য আমার অনেক ভাল ভাল জিনিস আছে। তুমি একটি পাপী, আর তুমি নরকে যাবে।' আমি জবাবে বলিতাম, 'খুব ভাল—আর কিছু ?' আমি প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি যাবেন কোথায় ?'—'আমি স্বর্গে যাব'। আমি বলিলাম, 'আমি তাহলে নিশ্চয় নরকেই যাব।' সেই দিন হইতে সে আমাকে নিষ্কৃতি দেয়।

এইখানে এক খ্রীষ্টান আসিলে বলিবে, 'তোমরা সকলেই মরিতে বসিয়াছ। কিন্তু যদি তোমরা আমাদের মতবাদে বিশ্বাস কর, তবে খ্রীষ্ট তোমাদের মুক্ত করিবেন।' যদি ইহা সত্য হইত—কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই কুসংস্কার ভিন্ন অন্য কিছুই নয়—তাহা হইলে খ্রীষ্টান দেশগুলিতে কোন অন্যায় থাকিত না। 'এস, আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করি, বিশ্বাস করিতে কোনও খরচ লাগে না।' কিন্তু কেন ? ইহাতে কোন লাভও হয় না ! যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, 'এখানে এত অধিক লোক দুষ্ট কেন ?' তাঁহারা বলেন, 'আমাদিগকে আরও অধিক কাজ করিতে হইবে।' ভগবানে বিশ্বাস রাখো, কিন্তু বারুদ শুষ্ক রাখিও ! ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর এবং ভগবান্ আসিয়া সাহায্য করিবেন। কিন্তু আমিই তো সংগ্রাম, প্রার্থনা এবং পূজা করিতেছি ; আমিই তো আমার সমস্যাসকল মিটাইয়া লইতেছি—আর ভগবান্ তাহার কৃতিত্বটুকু লইবেন। ইহা তো ভাল নয়। আমি কখনও তাহা করি না।

একবার আমি এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। গৃহকর্ত্রী আমাকে প্রার্থনা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, 'আমি অবশ্যই আপনার কল্যাণ কামনা ক'রব, মহাশয়া।—আপনি আমার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানুন।' আমি যখন কাজ করি, আমি আমার প্রতিই কর্তব্য করি, যেহেতু আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি, এবং বর্তমানে যাহা আমার আছে, তাহা সবই উপার্জন করিয়াছি—সেহেতু আমি ধন্য।

সর্বদা কঠোর পরিশ্রম করিবে এবং অপরকেও ধন্যবাদ জানাইবে, কারণ তুমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তুমি ভীত। এই-সকল কুসংস্কার সহস্র বৎসর

ধরিয়া কোন ফল প্রসব করে নাই! ধার্মিক হওয়া একটু কঠোর সাধনা-সাপেক্ষ। সকল কুসংস্কারই বস্তুতান্ত্রিকতা, কারণ সেইগুলি কেবল দেহজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আত্মার কোনও সংস্কার নাই—ইহা শরীরের বৃথা বাসনা হইতে বহু উর্ধ্বে।

কিন্তু এই-সকল বৃথা বাসনাগুলি এখানে সেখানে—এমন কি অধ্যাত্ম-রাজ্যেও প্রতিভাত। আমি কতকগুলি প্রেততত্ত্বের সভায় যোগদান করিয়াছি। একটিতে নায়িকা ছিলেন একজন মহিলা। তিনি আমাকে বলিলেন, 'আপনার মা ও ঠাকুরদা আমার কাছে আসেন।' তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহিলাটিকে নমস্কার জানাইয়াছেন ও তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছেন। কিন্তু আমার মা এখনও জীবিত! মানুষ এই কথা ভাবিতে ভালবাসে যে, মৃত্যুর পরেও তাহাদের আত্মীয়পরিজন এই দেহের আকারেই বর্তমান থাকে, আর প্রেততাত্ত্বিকগণ তাহাদের কুসংস্কারগুলিকে লইয়া খেলায়। এই কথা জানিলে আমি দুঃখিতই হইব যে, আমার মৃত পিতা এখনও তাঁহার নোংরা দেহটি পরিধান করিয়া আছেন। পিতৃপুরুষগণ এখনও জড়বস্তুতে আবদ্ধ আছেন, এই কথা জানিতে পারিলে সাধারণ মানুষ সান্ত্বনা পায়। অপর একস্থলে যীশুকে আমার সামনে আনা হইয়াছিল। আমি বলিলাম, 'ভগবান্, আপনি কিরূপ আছেন?' এই-সবে আমি হতাশ বোধ করি। যদি সেই মহান্ ঋষিপুরুষ অদ্যাপি ঐ শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের—দীন প্রাণীদের ভাগ্যে না জানি কী আছে? প্রেত-তাত্ত্বিকগণ আমাকে ঐসকল পুরুষদের কাহাকেও স্পর্শ করিবার অনুমতি দেন নাই। যদি এই-সব সত্যও হয়—তবু আমি ঐ-সকল চাহি না। আমি ভাবি: সাধারণ মানুষ সত্যি নাস্তিক!—কেবল পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ভোগস্পৃহা! বর্তমানে যাহা আছে, তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া মৃত্যুর পরও তাহারা এই জিনিসই বেশী করিয়া চায়!'

বেদান্তের ঈশ্বর কি? তিনি একটি ভাবস্বরূপ, ব্যক্তি নন। তুমি, আমি সকলেই ব্যক্তি-ঈশ্বর। এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা যে পরম-ঈশ্বর, তিনি একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। তুমি এবং আমি, বেড়াল, ইঁদুর, শয়তান, ভূত—এই-সবই তাঁহার ব্যষ্টি-সত্তা—সকলেই ব্যক্তি-ঈশ্বর। তুমি ব্যক্তি-ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাও এবং তা তোমার স্বরূপকেই পূজা

কর। যদি তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ কর, তবে কখনও কোন গির্জায় যাইও না। বাহিরে এস, যাও নিজেকে ধৌত কর। যুগ যুগ ধরিয়া যে কুসংস্কার তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, যতক্ষণ না তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে, ততক্ষণ বারে বারে নিজেকে ধৌত কর। অথবা সম্ভবতঃ তোমরা তাহা করিতে চাও না—কারণ এদেশে তোমরা ঘন ঘন স্নান কর না—ঘন ঘন স্নান করা ভারতীয় প্রথা, ইহা তোমাদের সমাজে প্রচলিত নয়।

আমি বহুবার জিজ্ঞাসিত হইয়াছি : 'তুমি এত হাসো কেন, ও এত ঠাট্টা বিদ্রূপ কর কেন ?' মাঝে মধ্যে আমি খুব গম্ভীর হই—যখন আমার খুব পেট-বেদনা হয়! ভগবান্ আনন্দময়। তিনি সকল অস্তিত্বের পিছনে। তিনিই সকল বস্তুর মঙ্গলময় সত্তাস্বরূপ। তোমরা তাঁহার অবতার। ইহাই তো গৌরবময়। যত তুমি তাঁহার সমীপবর্তী হইবে, তোমার শোক বা দুঃখজনক অবস্থা তত কম আসিবে। তাঁহার কাছ হইতে যতদূরে যাইবে ততই দুঃখে তোমার মুখ বিশুষ্ক হইবে। তাঁহাকে আমরা যত অধিক জানিতে পারি, তত ক্লেশ অন্তর্হিত হয়। যদি ঈশ্বরময় হইয়াও কেহ শোকগ্রস্ত হয়, তবে সেইরূপ পরিস্থিতির প্রয়োজন কি ? এইরূপ ঈশ্বরেরই বা প্রয়োজন কি ? তাঁহাকে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও! আমরা তাঁহাকে চাই না।

কিন্তু ভগবান্ অনাদি নিরাকার সত্তা—ত্রিকালে অবাধিত সত্য, অব্যয়, শাশ্বত, অভয়; আর তোমরা তাঁহার অবতার, তাঁহার রূপায়ণ। ইহাই বেদান্তের ঈশ্বর, আর তাঁহার স্বর্গ সর্বত্র অবস্থিত। এই স্বর্গে যে-সকল ব্যক্তি দেবগণ বাস করেন, তাহা তুমি নিজেই স্বয়ং। এই-সব মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দাও। প্রার্থনা করিয়া বাহিরে এস!

কিসের জন্য প্রার্থনা কর ? স্বর্গে যাইবার জন্য, কোন বস্তু লাভের আশায় আর অপর কেহ বঞ্চিত থাকো—এইজন্য। 'প্রভু, আমি আরো খাদ্য চাই! অপরে ক্ষুধার্ত থাক!' ঈশ্বর—যিনি সত্যস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, সদা আনন্দময় সত্তা, যাহাতে কোন খণ্ড নাই, চ্যুতি নাই, যিনি সদামুক্ত, সদাপূত, সদাপূর্ণ—তাঁহার সম্বন্ধে কি ধারণা! আমরা আমাদের যত মানবীয় বৈশিষ্ট্য বৃত্তি ও সঙ্কীর্ণতা তাঁহাতে আরোপিত করিয়াছি। তিনি অবশ্যই আমাদের খাদ্য ও বসন জোগাইবেন। বস্তুতঃ এই-সব আমাদের নিজেদের করিয়া লইতে হইবে আর

কেহ কখনও এইগুলি আমাদের জন্য করিয়া দেয় নাই। এই তো সাদা সত্য কথা।

কিন্তু তোমরা এই-বিষয়ে খুব কমই ভাব। তোমরা ভাবো, ভগবান আছেন যাঁহার নিকট তোমরা বিশেষ প্রিয়পাত্র, যিনি তোমাদের প্রার্থনা-মাত্রই তোমার জন্য কাজ করিয়া দেন; আর তোমরা তাঁহার নিকট সকল মানুষ সকল প্রাণীর জন্য করুণা প্রার্থনা কর না—কর কেবল নিজের জন্য, তোমার নিজস্ব পরিবারের জন্য, তোমাদের জাতির জন্য। যখন হিন্দুগণ খাইতে পায় না—তোমরা তখন গ্রাহ্যই কর না; সে-সময় তোমরা কল্পনাও কর না যে, খ্রীষ্টানদের যিনি ঈশ্বর, তিনি হিন্দুদিগেরও ঈশ্বর। আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা, আমাদের প্রার্থনা, আমাদের পূজা সবই অবিদ্যা-প্রভাবে আমাদের নিজেদের 'দেহ' ভাবনা করা রূপ মূর্খতার দ্বারা বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমাদের ভাল না-ও লাগিতে পারে। আজ তোমরা আমাকে অভিশাপ দিতে পার, কিন্তু কাল তোমরা আমাকে অভিনন্দিত করিবে।

আমরা অবশ্যই চিন্তাশীল হইব। প্রত্যেক জন্মই বেদনাদায়ক; আমাদিগকে অবশ্যই জড়বাদ হইতে বাহিরে আসিতে হইবে। জগন্মাতা হয়তো আমাদের তাঁহার গণ্ডির বাহিরে আসিতে দিবেন না; তাহা হউক আমরা নিশ্চিত চেষ্টা করিব। এই সংগ্রামই তো সকল প্রকারের পূজা, আর বাকী যাহা কিছু সব ছায়ামাত্র। তুমিই তো ব্যষ্টিদেবতা। এখনই আমি তোমার পূজা করিতেছি। এই তো সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনা। সমগ্র জগতের পূজা করা অর্থাৎ এইভাবে জগতের সেবা করা। আমি জানি, ইহা একটি উচ্চ ভাবভূমিতে দাঁড়ানো—ইহাকে ঠিক উপাসনার মতো মনে হয় না; কিন্তু ইহাই সেবা, ইহাই পূজা।

অসীম জ্ঞান কর্মসাধ্য নয়। জ্ঞান সর্বকালে এইখানেই, অজর ও অজাত। তিনি, জগদীশ্বর জগতের প্রভু—সকলের মধ্যে বিরাজিত। এই শরীরই তাঁহার একমাত্র মন্দির। এই একটি মন্দিরই চিরকাল ছিল। এই আয়তনে —শরীরে তিনি অধিষ্ঠিত,—তিনি আত্মারও আত্মা—রাজারও রাজা। আমরা এই কথা বুঝিতে পারি না, আমরা তাঁহার প্রস্তর-মূর্তি বা প্রতিমা গড়ি এবং তাহার উপর মন্দির নির্মাণ করি। ভারতে এই বেদান্তের

সর্বকালে আছে, কিন্তু ভারত এই-সব মন্দিরে পরিপূর্ণ। আবার কেবল মন্দিরই নয়—অনেক গুহা আছে, যাহার মধ্যে বহু খোদিত মূর্তি রহিয়াছে। 'মূর্খ গঙ্গার তীরে বাস করিয়া জলের নিমিত্ত কূপ খনন করে!' আমরা তো এইরূপই! ঈশ্বরের মধ্যে বাস করিয়াও আমরা প্রতিমা গড়ি। আমরা তাঁহাকে মূর্তিতে প্রতিফলিত দেখিতে চাই—যদিও সর্বদা তিনি আমাদের শরীরের মন্দিরেই অবস্থান করিতেছেন। আমরা সকলেই উন্মাদ—আর ইহাই বিরাট ভ্রম।

সব জিনিসকে ভগবান্ বলিয়া পূজা কর—প্রত্যেকটি আকৃতিই তাঁহার মন্দির। বাদ-বাকী সব প্রতারণা—ভ্রম। সর্বদা অন্তর্মুখী হও, কখন বহির্মুখী হইও না। এইরূপ ঈশ্বরের কথাই বেদান্ত প্রচার করে—আর এই তাঁহার পূজা। স্বভাবতই বেদান্তে কোন সম্প্রদায়, ধর্ম বা জাতিবিচার নাই। কিভাবে এই ধর্ম ভারতের জাতীয় ধর্ম হইতে পারে?

শত শত জাতিবিভাগ! যদি কেহ অপরের খাদ্য স্পর্শ করে, তবে চীৎকার করিয়া উঠিবে—'প্রভু, আমাকে রক্ষা কর—আমি অপবিত্র হইলাম!' পাশ্চাত্য পরিদর্শন করিয়া আমি যখন ভারতে ফিরিয়া গেলাম, তখন পাশ্চাত্যদের সহিত আমার মেলামেশা ও আমি যে গোঁড়ামির নিয়মাবলী ভঙ্গ করিয়াছি, ইহা লইয়া কয়েকজন প্রাচীনপন্থী খুব আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার—বেদের তত্ত্বসকল পাশ্চাত্যে প্রচারকেরা সমর্থন করিতে পারেন নাই।

আমরা যদি সকলেই আত্মস্বরূপ ও এক, তবে কেমন করিয়া ধনী দরিদ্রের প্রতি, বিজ্ঞজন অজ্ঞের প্রতি মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যাইতে পারে? বেদান্তের ভাবে পরিবর্তিত না হইলে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা কি করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে? অধিকসংখ্যক যথার্থ বিজ্ঞ লোক পাইতে সহস্র সহস্র বৎসর সময় লাগিবে। মানুষকে নূতন পথ দেখানো—মহৎ ভাব দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। পুরানো কুসংস্কারগুলি তাড়ানো আরও কঠিন কাজ—খুবই কঠিন কাজ, সেগুলি সহজে লোপ পায় না। এত শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিতগণ অন্ধকার দেখিয়া ভয় পান—শিশুকালের গল্পগুলি তাঁহাদের মনে আসিতে থাকে এবং তাঁহারা ভূত দেখেন।

'বেদ' এই শব্দটির অর্থ জ্ঞান এবং ইহা হইতে 'বেদান্ত' শব্দটি আসিয়াছে। সব জ্ঞানই বেদ, ইহা অনন্ত ঈশ্বরের ন্যায় অনন্ত। জ্ঞান কেহই সৃষ্টি করিতে পারে না। তোমরা কি কখনও জ্ঞানকে সৃষ্ট হইতে দেখিয়াছ? ইহাকে আবিষ্কার করা যায়—যাহা আবৃত ছিল, তাহাকে অনাবৃত করা যায়। জ্ঞান সর্বদা এইখানেই অবস্থিত, কারণ জ্ঞানই স্বয়ং ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের জ্ঞান সবই আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। তাহাকে আমরা আবিষ্কার করি—এই পর্যন্ত। এই-সব জ্ঞানই সাক্ষাৎ ভগবান্। বেদ এক মহদায়তন সংস্কৃত গ্রন্থ। আমাদের দেশে যিনি বেদপাঠ করেন, তাঁহার সম্মুখে আমরা নতজানু হই। আর যে ব্যক্তি পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাকে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। এটা কুসংস্কার—মোটেই বেদান্ত-মত নয়—এও জঘন্য জড়বাদ। ঈশ্বরের নিকট সকল জ্ঞানই পবিত্র। জ্ঞানই ঈশ্বর। অনন্ত জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে সকল মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে। যদিও তোমাদিগকে অজ্ঞের ন্যায় দেখায়, কিন্তু তোমরা সত্য-সত্যই অজ্ঞ নও। তোমরা ভগবানের শরীর—তোমরা সকলেই। তোমরা সর্বশক্তিমান্, সর্বত্রাবস্থিত, দেবসত্তার অবতার। তোমরা আমাকে উপহাস করিতে পারো, কিন্তু একদিন সময় আসিবে, যখন তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে, অবশ্যই বুঝিবে—কেহই বাকী থাকিবে না।

লক্ষ্য কি? যাহা আমি বলিয়াছি—বেদান্ত, ইহা কোন নূতন ধর্ম নয়। খুব পুরাতন—ভগবানের মতো পুরাতন। এই ধর্ম স্থান বা কালে সীমিত নয়—ইহা সর্বত্র বিরাজিত। এই সত্য সকলেই জানে। আমরা সকলেই এই সত্য অন্বেষণ করিতেছি। সমগ্র বিশ্বেরও ঐ একই গতি। ইহা এমন কি বহিঃপ্রকৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রত্যেকটি পরমাণু ঐ লক্ষ্যের দিকে প্রচণ্ডগতিতে ছুটিতেছে। আর তুমি কি মনে কর যে, অনন্ত শুদ্ধ এই জীবগণের কেহ কি পরম সত্য লাভ না করিয়া পড়িয়া থাকিবে? সকলেই পাইবে—সকলেই একই লক্ষ্যপানে অন্তর্নিহিত দেবত্বের আবিষ্কার করিতে চলিয়াছে। পাগল, খুনী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ—যে-মানুষ বিচারের প্রহসনে এ দেশে শাস্তি পায়, এ সকলেই একই সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেবলমাত্র যাহা আমরা অজ্ঞানে করিতেছিলাম, তাহা সজ্ঞানে ও ভালভাবে আমাদের করা কর্তব্য।

সকল সত্তার ঐক্যবোধ তোমাদের সকলের মধ্যে পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। কেহ এ-পর্যন্ত ইহা না লইয়া জন্মায় নাই। যতই তোমরা তাহা অস্বীকার করো না কেন, ইহা ক্রমাগত নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। মানবীয় প্রেম কি? ইহা কমবেশি এই ঐক্যবোধেরই স্বীকৃতি। 'আমি তোমাদের সহিত এক—আমার স্ত্রী, আমার পুত্র ও কন্যা, আমার বন্ধু।' কেবল তোমরা না জানিয়া এই ঐক্য সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বলিতেছে 'কেহ পতির জন্য পতিকে কখনই ভালবাসে নাই, পতির অন্তরস্থ আত্মার জন্যই পতিকে ভালবাসিয়াছে।' পত্নী এইখানেই ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছেন। পতি পত্নীর মধ্যে নিজেকে দেখিতে পান—স্বভাবতই দেখিতে পান, কিন্তু তা তিনি জ্ঞানতঃ—সচেতনভাবে পান না।

সমগ্র বিশ্বই একটি অস্তিত্বে গ্রথিত। এ ছাড়া অন্য আর কিছুই হইতে পারে না। বিভিন্নতা হইতে আমরা সকলে একটি বিশ্বাস্তিত্বের দিকে চলিয়াছি। পরিবারগুলি গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠীগুলি উপজাতিতে, উপজাতিগুলি জাতিতে, জাতিগুলি মানবত্বে, কত বিভিন্ন মত—একত্বের দিকে চলিয়াছে। এই একত্বের অনুভূতিই জ্ঞান—বিজ্ঞান।

ঐক্যই জ্ঞান—নানাই অজ্ঞান। এই জ্ঞানে তোমাদের জন্মগত অধিকার। তোমাদিগকে এই তত্ত্ব শিখাইতে হইবে না। বিভিন্ন ধর্ম এই জগতে কখনই ছিল না। আমরা মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করি বা না করি, মুক্তি আমরা লাভ করিবই—এ আমাদের নিয়তি। যেহেতু তোমরা মুক্তস্বভাব, এই অবস্থা তোমাদিগকে লাভ করিতেই হইবে এবং তোমরা মুক্ত হইয়া যাইবে। আমরা মুক্তই আছি, কেবল ইহা আমরা জানি না, আর আমরা এ পর্যন্ত কি করিতেছি, তাহাও আমরা জানি না। সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ে ও আদর্শে একই নীতিকথা বর্তমান; কেবল একটি কথাই প্রচারিত হইয়াছে—'নিঃস্বার্থ হও, অপরকে ভালবাসো।' কেহ বলিতেছে, 'কারণ জিহোভা আদেশ করিয়াছেন।' 'আল্লাই'—মুসলিম বলিবেন। অপরে বলিবেন—'যীশু।' যদি ইহা কেবল জিহোভারই আদেশ, তবে যাহারা জিহোভাকে জানে না, তাহাদের নিকট ইহা কিভাবে আসিল? যদি যীশুই কেবল এই আদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে-ব্যক্তি যীশুকে কখনও জানে না, সে কি করিয়া ইহা পাইল? যদি বিষ্ণুই কেবল এই আদেশ দিয়া থাকেন, তবে ইহুদীগণ,

যাহারা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কখনই পরিচিত নয়, কিভাবে তাহা পাইল? এই-সব হইতে মহত্তর আর একটি উৎস আছে। কোথায় সেইটি? তাহা ভগবানের সনাতন মন্দিরে—নিম্নতম হইতে উচ্চতম সকল প্রাণীর অন্তরাত্মায় এই তত্ত্ব নিহিত। সেই অনন্ত নিঃস্বার্থতা, সেই অনন্ত আত্মোৎসর্গ, ঐক্যের দিকে ফিরিবার সেই অনন্ত বাধ্যবাধকতা—এ-সবই সেইখানে রহিয়াছে।

অবিদ্যার অজ্ঞানের জন্য আমরা খণ্ডিত, সীমিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি, এবং আমরা তাই ক্ষুদ্র, শ্রীমতী অমুক ও শ্রীঅমুক হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু গোটা প্রকৃতি প্রতি পলকে এই ভ্রম—এই মিথ্যা প্রতীতি জন্মাইতেছে। আমি কখনও অন্যসকল হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র পুরুষ বা ক্ষুদ্র নারী নহি, আমি এক বিশ্বব্যাপী অস্তিত্ব। আত্মা প্রতি মুহূর্তে আপন মহিমায় উন্নীত হইতেছে ও ইহার অন্তর্নিহিত দেবত্বকে ঘোষণা করিতেছে।

বেদান্ত সর্বত্রই বিদ্যমান, কেবল তোমাদিগকে সচেতন হইতে হইবে। পুঞ্জীকৃত অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারগুলিই আমাদের অগ্রগতির বাধাস্বরূপ। যদি আমরা সক্ষম হই, তবে আইস, আমরা ঐ-সবগুলিকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলি এবং ধারণা করিতে শিখি যে, ঈশ্বর চেতনাস্বরূপ এবং তাঁহার পূজা জ্ঞান ও সত্যের মধ্য দিয়া করিতে হয়। জড়বাদী হইতে কখনও সচেষ্ট হইও না। সকল জড়কে ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও। ঈশ্বরের কল্পনা অবশ্যই যথার্থ আধ্যাত্মিক হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণাগুলি কমবেশি জড়বাদ-ঘেঁষা—এইগুলিকে দূর করিতে হইবে। মানুষ যত বেশি আধ্যাত্মিক হইতে থাকে, তত সে এই-সকল ভাবগুলিকে পরিত্যাগ করে ও এইগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া যায়। বস্তুতঃ সকল দেশেই এমন কয়েকজন লোক সর্বকালে আসিয়াছেন, যাঁহারা এই-সব জড়বাদ ছুঁড়িয়া ফেলিবার শক্তি রাখেন এবং প্রখর দিবালোকে দণ্ডায়মান হইয়া জ্ঞানস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারাই উপাসনা করিয়া গিয়াছেন।

সবই এক আত্মা—বেদান্তের এই জ্ঞান যদি প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজই অধ্যাত্ম-ভাবে ভাবিত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? আমি জানি না। সহস্র বৎসরের মধ্যেও তাহা হইবে না। পুরানো সংস্কারগুলি সব দূরীভূত হইবে। তোমরা সকলেই পুরাতন সংস্কারগুলিকে কিভাবে চিরন্তন করা যায়, তাহাতেই উৎসাহিত। আবার

পারিবারিক ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠীগত ভ্রাতৃত্ব, জাতিগত সৌভ্রাত্র্য—এই-সকল ভাব-গুলিও বিদ্যমান। এইসকলই বেদান্ত উপলব্ধির বাধাস্বরূপ। ধর্ম অতি সামান্য কয়েকজনের নিকটই ঠিক ঠিক ধর্ম।

গোটা পৃথিবীতে ধর্মের ক্ষেত্রে যাঁহারা কর্ম করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক কর্মী। ইহাই মানুষের ইতিহাস। তাঁহারা কদাচিৎ সত্যের সহিত মিলাইয়া জীবনধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা সর্বদাই সমাজ-নামক ঈশ্বরের পূজক ছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসাধারণের বিশ্বাস—তাহাদের কুসংস্কার, তাহাদের দুর্বলতাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতিকে জয় করিতে চেষ্টা করেন নাই, নিজদিগকে প্রকৃতির অনুকূল করিয়াছেন—ইহার বেশি কিছু নয়। ভারতে গিয়া নূতন ধর্মমত প্রচার কর—কেহ তোমার কথা শুনিবে না। কিন্তু যদি বলো যে, বেদ হইতে ঐ মত প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহারা বলিবে—'ভাল কথা'। এইখানে আমি এই মতবাদ প্রচার করিতে পারি, কিন্তু তোমরা—তোমাদের কয়জন আমার কথা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিবে? কিন্তু সমগ্র সত্য এইখানেই বর্তমান এবং আমি তোমাদিগকে সত্য কথাই বলিব।

এই প্রশ্নের অপর একটি দিকও আছে। সকলেই বলেন, চরম বিশুদ্ধ সত্যের উপলব্ধি হঠাৎ আসিতে পারে না এবং পূজা প্রার্থনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধর্মীয় সাধনার পথে মানুষকে ধীরে ধীরে আগাইয়া যাইতে হইবে। এইটি ঠিক পথ কি-না, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না। ভারতে আমি উভয় পথ ধরিয়াই কাজ করি।

কলিকাতায় আমাদের এই-সব প্রতিমা ও মন্দির রহিয়াছে—ঈশ্বরের ও বেদের নামে—বাইবেল এবং যীশু ও বুদ্ধের নামে। চেষ্টা চলুক। কিন্তু হিমালয়ের উপরে আমার একটি স্থান আছে, যেখানে বিশুদ্ধ সত্য ব্যতীত আর কিছুরই প্রবেশাধিকার থাকিবে না—এরূপ মনঃস্থ করিয়াছি। সেইখানে তোমাদিগকে আজ আমি যেভাবের কথা বলিলাম, তাহা কার্যে পরিণত করিতে চাই। একটি ইংরেজ-দম্পতী ঐ স্থানের দায়িত্বে রহিয়াছেন। উদ্দেশ্য—সত্যানুসন্ধিৎসুদের শিক্ষিত করা এবং বালকবালিকাদিগকে ভয়হীন ও কুসংস্কার-হীনভাবে গড়িয়া তোলা। তাহারা যীশু, বুদ্ধ, শিব, বিষ্ণু—ইত্যাদি কাহারও বিষয় শুনিবে না। তাহারা প্রথম হইতেই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিবে।

তাহারা বাল্যকাল হইতেই শিখিবে যে, ঈশ্বরই চেতনা এবং তাঁহার পূজা সত্য ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া করিতে হয়। সকলকেই চেতনরূপে দেখিতে হয়—ইহাই আদর্শ। আমি জানি না, ইহাতে কি ফল হইবে। আজ আমার যাহা মনে হইতেছে, তাহাই প্রচার করিতেছি। আমার মনে হইতেছে—যেন দ্বৈত সংস্কার বাদ দিয়াই আমি সম্পূর্ণ এইভাবেই শিক্ষিত হইয়াছিলাম। দ্বৈতবাদে যে কিছু ভাল হইতে পারে—তাহাতে যে আমি মাঝে-মাঝে সম্মতি জানাই, তাহার কারণ ইহা দুর্বল ব্যক্তিকে সাহায্য করে। যদি তোমাকে কেহ ধ্রুবতারা দেখাইয়া দিতে বলে, তবে প্রথমে তুমি তাহাকে ধ্রুবতারার নিকটবর্তী কোন উজ্জ্বল তারকা দেখাও, তারপর একটি অনতি-উজ্জ্বল তারকা, তারপর একটি ক্ষীণপ্রভ তারকা, পরিশেষে ধ্রুবতারা দেখাও। এই পদ্ধতিতে তাহার পক্ষে ধ্রুবতারা দেখা সহজ হয়। এই-সব বিভিন্ন উপাসনা ও সাধনা, বাইবেল জাতীয় গ্রন্থ ও দেবসকল ধর্মের প্রাথমিক সোপান ধর্মের কিণ্ডারগার্টেন মাত্র।

কিন্তু তারপর আমি ইহার অপর দিকটির কথা ভাবি। যদি এই মন্থর ও ক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ কর, তবে জগতের এই সত্যে পৌঁছাইতে কত দিন লাগিবে? কত দিন? আর ইহা যে প্রশংসনীয় মানে আসিয়া উপনীত হইবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? এই পর্যন্ত তাহা হয় নাই। দুর্বলদের পক্ষে ক্রমিক অথবা অক্রমিক, সহজ অথবা কঠিন যাহাই হউক না কেন—দ্বৈতবাদসম্মত সাধন কি মিথ্যাভিত্তিক নয়? প্রচলিত ধর্মীয় সাধনগুলি মানুষকে দুর্বল করিতেছে, সুতরাং সেগুলি কি ভুল নয়? ঐগুলি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত—মানুষের ভুল দৃষ্টিভঙ্গী। দুটি ভুল কি একটি সত্য সৃষ্টি করিতে পারে? মিথ্যা কি সত্য হয়? অন্ধকার কি আলোকে পরিণত হয়?

আমি একজন মহামানবের ক্রীতদাস—তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহার বার্তাবহ; আমি পরীক্ষা করিতে চাই। বেদান্তে যে সত্যগুলি তোমাদিগকে বলিলাম, তাহা লইয়া ইতিপূর্বে কেহ সত্যিকারের গবেষণা করে নাই। যদিও বেদান্ত পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শন—ইহা সর্বদাই কুসংস্কার ও অন্যান্য জিনিসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ছিল।

যীশু বলিয়াছিলেন, 'আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা এক', এবং তোমরা তাহার পুনরাবৃত্তি কর। তথাপি ইহা মানবসমাজকে সাহায্য করে নাই।

উনিশ শত বৎসর ধরিয়া মানুষ এই বাণী বোঝে নাই। তাহারা যীশুকে মানবের পরিত্রাতা করিয়াছে। তিনি ঈশ্বর, আর আমরা কীট! ঠিক এইরূপ ভারতবর্ষে—প্রত্যেক দেশে এই ধরনের বিশ্বাসই সম্প্রদায়বিশেষের মেরুদণ্ড।

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শেখানো হইয়াছে—জগৎপ্রভু অবতার, পরিত্রাতা ও প্রেরিত পুরুষগণকে পূজা করিতে হইবে; শেখানো হইয়াছে—তাহারা নিজেরা অসহায় হতভাগ্য জীব, মুক্তির জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাসে নিশ্চয় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পারে। তথাপি সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় এই প্রকার বিশ্বাস ধর্মের কিণ্ডারগার্টেন, এইগুলি মানুষকে অতি অল্পই সাহায্য করিয়াছে বা কিছুই করে নাই। মানুষ এখনও অধঃপাতের গহ্বরে মোহাবিষ্ট হইয়াই পড়িয়া রহিয়াছে। অবশ্য কয়েকজন শক্তিশালী মানুষ এই মায়ার ভ্রম অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন!

সময় আসিতেছে—যখন মহান্ মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন; এবং ধর্মের এই শিশুশিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মা দ্বারা আত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।

যোগ ও মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব

পাশ্চাত্যে মনোবিজ্ঞানের ধারণা অতি নিম্নস্তরের। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান; কিন্তু পাশ্চাত্যে ইহাকে অন্যান্য বিজ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে—অর্থাৎ অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো ইহাকেও উপযোগিতার মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। কার্যতঃ মানবসমাজের উপকার ইহার সাহায্যে কতটা সাধিত হইবে? আমাদের ক্রমবর্ধমান সুখ ইহার মাধ্যমে কতদূর বর্ধিত হইবে? যে-সকল দুঃখ-বেদনায় আমরা নিয়ত পীড়িত হইতেছি, সেগুলি ইহা দ্বারা কতদূর প্রশমিত হইবে?—পাশ্চাত্যে সব কিছুই এই মাপকাঠিতে বিচার করা হয়।

মানুষ সম্ভবতঃ ভুলিয়া যায় যে, আমাদের জ্ঞানের শতকরা নব্বই ভাগ স্বভাবতই মানুষের পার্থিব সুখদুঃখের হ্রাসবৃদ্ধির উপর কোন কার্যকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অতি সামান্য অংশই দৈনন্দিন জীবনে কার্যতঃ প্রযুক্ত হয়। ইহার কারণ এই যে, আমাদের চেতনমনের অতি সামান্য অংশই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বিচরণ করে এবং ঐ সামান্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকেই জীবন ও মনের সব কিছু বলিয়া আমরা কল্পনা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের অবচেতন মনের বিশাল সমুদ্রে উহা একটি সামান্য বিন্দুমাত্র। যদি আমাদের অস্তিত্ব শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে আমরা যে-সব জ্ঞান অর্জন করি, সেগুলি শুধু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্যই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা হয় না। পশুস্তর হইতে যতই আমরা উপরে উঠিতে থাকি, আমাদের ইন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা ততই হ্রাস পাইতে থাকে এবং বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক বোধের সহিত আমাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা সূক্ষ্মতর হইতে থাকে এবং 'জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের অনুশীলন'—এই ভাবটি ইন্দ্রিয়-সুখ-নিরপেক্ষ হইয়া মনের পরম আনন্দের বিষয় হইয়া উঠে।

পাশ্চাত্যের পার্থিব লাভের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, মনোবিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানের সেরা। কেন? আমরা সকলেই ইন্দ্রিয়ের দাস, নিজেদের চেতন ও অবচেতন মনের দাস। কোন অপরাধী যে স্বেচ্ছায়

কোন অপরাধ করে—তাহা নয়, শুধু নিজের মন তাহার আয়ত্তে না থাকাতেই সে ঐরূপ করিয়া থাকে, এবং এইজন্য সে তাহার চেতন ও অবচেতন মনের, এমন কি প্রত্যেকের মনেরও দাস হয়। সে নিজ-মনের প্রবলতম সংস্কারবশেই চালিত হয়। সে নিরুপায়। সে নিজমনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—বিবেকের কল্যাণকর নির্দেশ এবং নিজের সৎস্বভাবের বিরুদ্ধে চলিতে থাকে। সে তাহার মনের প্রবল নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়। বেচারী মানুষ নিতান্তই অসহায়।

প্রতিনিয়ত ইহা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অন্তরের শুভনির্দেশ আমরা প্রতিনিয়ত অগ্রাহ্য করিতেছি এবং পরে ঐজন্য নিজেরাই নিজেদের ধিক্কার দিতেছি। আমরা বিস্মিত হই—কিভাবে ঐরূপ জঘন্য চিন্তা করিয়াছিলাম এবং কিভাবেই বা ঐ প্রকার হীনকার্য আমাদের দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। অথচ আমরা পুনঃপুনঃ ইহা করিয়া থাকি এবং পুনঃপুনঃ ইহার জন্য দুঃখ ও আত্মগ্লানি ভোগ করি। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আমাদের মনে হয় যে, ঐ কর্ম করিতে আমরা ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু তাহা নয়, আমরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া ইহা করিয়াছিলাম। আসলে আমরা নিরুপায়! আমরা সকলেই নিজেদের মনের গোলাম এবং অপরের মনেরও। ভালমন্দের তারতম্য এক্ষেত্রে প্রায় অর্থহীন। অসহায়ের ন্যায় আমরা ইতস্ততঃ চালিত হইতেছি। আমরা মুখেই বলি, আমরা নিজেরা করিতেছি ইত্যাদি; কিন্তু আসলে তাহা নয়।

চিন্তা করিতে এবং কাজ করিতে বাধ্য হই বলিয়া আমরা চিন্তা এবং কাজ করিয়া থাকি। আমরা নিজেদের এবং অপরের দাস। আমাদের অবচেতন মনের অতি গভীরে অতীতের চিন্তা ও কর্মের যাবতীয় সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—শুধু এ-জীবনের নয়, পূর্ব পূর্ব জীবনেরও। এই অবচেতন মনের অসীম সমুদ্র অতীতের চিন্তা ও কর্মরাশিতে পরিপূর্ণ। এই-সকল চিন্তা ও কর্মের প্রত্যেকটি স্বীকৃতিলাভের চেষ্টা করিতেছে, নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, একটি অপরটিকে অতিক্রম করিয়া চেতন-মানসে রূপ পরিগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইতেছে—তরঙ্গের পর তরঙ্গের আকারে, উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাসে তাহাদের প্রবাহ। এই-সকল চিন্তাও পুঞ্জীভূত শক্তিকেই আমরা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, প্রতিভা প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করি, কারণ উহাদের যথার্থ উৎপত্তিস্থল আমরা উপলব্ধি করি না।

অন্ধের মতো বিনা প্রতিবাদে উহাদের নির্দেশ আমরা পালন করি। ফলে দাসত্ব—চরম অসহায় দাসত্ব আমাদিগকে চাপিয়া ধরে, অথচ নিজেদের 'মুক্ত' বলিয়া আমরা প্রচার করি। হায়, আমরা নিজেদের মনকে নিমেষের জন্য সংযত করিতে পারি না, বস্তু-বিশেষে উহাকে নিবদ্ধ রাখিতে পারি না, বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া মুহূর্তের জন্য একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে পারি না! অথচ আমরাই নিজেদের মুক্ত বলি। ব্যাপারটা চিন্তা করিয়া দেখ। যেভাবে করা উচিত বলিয়া আমরা জানি, অতি অল্প সময়ের জন্যও আমরা সেভাবে করিতে পারি না। মুহূর্তে কোন ইন্দ্রিয়-বাসনা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে এবং তৎক্ষণাৎ আমরা উহার আজ্ঞাবহ হইয়া পড়ি। এরূপ দুর্বলতার জন্য আমরা বিবেক-দংশন ভোগ করি, কিন্তু পুনঃপুনঃ আমরা এইরূপই করিয়া থাকি এবং সর্বদাই ইহা করিতেছি। যত চেষ্টাই করি না কেন, একটি উচ্চমানের জীবন আমরা যাপন করিতে পারি না। অতীত জীবন এবং অতীত চিন্তাগুলির ভূত যেন আমাদিগকে দাবাইয়া রাখে। ইন্দ্রিয়গুলির এই দাসত্ব জগতের সকল দুঃখের মূল। জড়দেহের ঊর্ধ্বে উঠিবার অসামর্থ্য—পার্থিব সুখের জন্য চেষ্টা আমাদের সকল দুর্দশা ও ভয়াবহতার হেতু।

মনের এই উচ্ছৃঙ্খল নিম্নগতিকে কিভাবে দমন করা যায়, কিরূপে উহাকে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্ত করা যায়, এবং উহার দোর্দণ্ড প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, মনোবিজ্ঞান তাহারই শিক্ষা দেয়। অতএব মনোবিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ; উহাকে বাদ দিলে অন্যান্য বিজ্ঞান ও জ্ঞান মূল্যহীন।

অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল মন আমাদিগকে নিয়ত নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে লইয়া যাইবে এবং চরমে আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিবে, ধ্বংস করিবে। আর সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত মন আমাদিগকে রক্ষা করিবে, মুক্তিদান করিবে। সুতরাং মনকে অবশ্য সংযত করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞান আমাদিগকে মনঃসংযমের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়।

যে-কোন জড়বিজ্ঞান অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করিবার জন্য প্রচুর তথ্য ও উপাদান পাওয়া যায়। ঐ-সকল তথ্য ও উপাদানের বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষার ফলে ঐ বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু মনের অনুশীলন ও বিশ্লেষণে সকলের সমভাবে আয়ত্তাধীন কোন তথ্য ও বাহির হইতে সংগৃহীত উপাদান পাওয়া যায় না—মন নিজের দ্বারাই বিশ্লেষিত হয়। সুতরাং

মনোবিজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলিয়া ধরা যায়। পাশ্চাত্যে মানসিক শক্তিকে, বিশেষতঃ অসাধারণ মানসিক শক্তিকে, অনেকটা যাদুবিদ্যা ও গূঢ় যৌগিক-ক্রিয়ার সামিল বলিয়া গণ্য করা হয়। বস্তুতঃ সেই দেশে তথাকথিত অলৌকিক ঘটনাবলীর সহিত মিশাইয়া ফেলিবার ফলে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চপর্যায়ের অনুশীলন ব্যাহত হইয়াছে, যেমন হইয়াছে সেই-সকল সাধু-ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে, যাঁহারা সিদ্ধাই-জাতীয় ব্যাপারে অনুরক্ত।

পৃথিবীর সর্বত্র পদার্থবিদ্‌গণ একই ফললাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাধারণ সত্যসমূহ এবং সেগুলি হইতে প্রাপ্ত ফল সম্বন্ধে একই মত পোষণ করেন। তাহার কারণ পদার্থবিজ্ঞানের উপাত্তগুলি (data) সর্বজনলভ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য এবং সিদ্ধান্তগুলিও ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রের মতোই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু মনোজগতের ব্যাপার অন্যরূপ। এখানে এমন কোন তথ্য নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ব্যাপার নাই, এমন কোন সর্বজনগ্রাহ্য উপাদান এখানে নাই, যাহা হইতে মনোবিজ্ঞানীরা একই প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া একটি পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে পারেন।

মনের অতি-গভীর প্রদেশে বিরাজ করেন আত্মা, মানুষের প্রকৃত সত্তা। মনকে অন্তর্মুখী কর, আত্মার সহিত সংযুক্ত কর; এবং স্থিতাবস্থার সেই দৃষ্টিকোণ হইতে মনের আবর্তনগুলি লক্ষ্য কর, সেগুলি প্রায় সব মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ঐ-সকল তথ্য বা উপাত্ত ও ঘটনা কেবল তাঁহাদেরই অনুভূতিগম্য, যাঁহারা ধ্যানের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন। জগতের অধিকাংশ তথাকথিত আধ্যাত্মবাদীদের মধ্যেই মনের গতি, প্রকৃতি, শক্তি প্রভৃতি লইয়া প্রভূত মতভেদ দেখা যায়। ইহার কারণ, তাঁহারা মনোজগতের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজেদের এবং অন্যান্যের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সামান্য কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন এবং ঐগুলিকেই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এবং যে ঐ-সকল একান্ত বাহ্য ও ভাসা-ভাসা অভিব্যক্তির যথার্থ প্রকৃতি না জানিয়া প্রত্যেক ধর্মেই ছিটগ্রস্ত একদল লোক থাকেন, যাঁহারা ঐ-সকল উপাদান তথ্য প্রভৃতিকে মৌলিক গবেষণার জন্য নির্ভরযোগ্য বিচারের মান বলিয়া দাবি করেন। কিন্তু সেগুলি তাঁহাদের মস্তিষ্কের উদ্ভট খেয়াল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যদি মনের রহস্য অবগত হওয়াই তোমার অভীপ্সিত হয়, তবে তোমাকে নিয়মানুগ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তুমি এমন একটি চেতন স্তরে উঠিতে চাও, যেখান হইতে মনকে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে এবং মনের উচ্ছৃঙ্খল আবর্তনে কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না, তবে মনকে সংযত করিতে অভ্যাস কর। নতুবা তোমার পরিদৃষ্ট ঘটনাগুলি নির্ভরযোগ্য হইবে না, সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং মোটেই যথার্থ উপাদান ও তথ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে না।

যে-সকল মানুষ মনের প্রকৃতি লইয়া গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছে, দেশ বা মত-নির্বিশেষে তাহাদের উপলব্ধি চিরদিন একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। বস্তুতঃ মনের গভীরতম প্রদেশে যাহারা প্রবেশ করে, তাহাদের উপলব্ধি কখনও ভিন্ন হয় না।

অনুভূতি ও আবেগপ্রবণতা হইতেই মানুষের মন ক্রিয়াশীল হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আলোর রশ্মি আমার চক্ষুতে প্রবেশ করে, এবং স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়, তথাপি আমি আলো দেখিতে পাই না। তারপর মস্তিষ্ক ঐ আবেগকে মনে বহন করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু তথাপি আমি আলো দেখি না; মনে তাহার প্রতিক্রিয়া জন্মে, তখনই মনে আলোর অনুভূতি হয়। মনের প্রতিক্রিয়াই অনুপ্রেরণা এবং তাহারই ফলে চক্ষু প্রত্যক্ষ দর্শন করে।

মনকে বশীভূত করিতে হইলে তাহার অবচেতন স্তরের গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে, সেখানে যে-সকল চিন্তা ও সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করিতে হইবে, সাজাইতে হইবে এবং সংযত করিতে হইবে। ইহাই প্রথম সোপান। অবচেতন-মনকে সংযত করিতে পারিলেই চেতন-মনও বশীভূত হইবে।

মনের শক্তি

[লস্ এঞ্জেলেস্, ক্যালিফোর্নিয়া, ৮ই জানুআরি ১৯০০ খৃঃ]

সর্ব যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। অসাধারণ ঘটনার কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি, এ-বিষয়ে আমাদের অনেকের নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতাও আছে। বিষয়টির প্রস্তাবনারূপে আমি বরং তোমাদের নিকট প্রথমে আমার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি ঘটনারই উল্লেখ করিব। একবার এক ব্যক্তির কথা শুনিয়াছিলাম; মনে মনে কোন প্রশ্ন ভাবিয়া তাঁহার কাছে যাওয়ামাত্রই তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিতেন; আরও শুনিয়াছিলাম, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেন। মনে কৌতূহল জাগিল; তাই কয়েকজন বন্ধুসঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যেকেই মনে মনে কোন না কোন প্রশ্ন ঠিক করিয়া রাখিলাম এবং পাছে ভুল হয়, সেজন্য প্রশ্নগুলি এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া নিজ নিজ জামার পকেটে রাখিয়া দিলাম। আমাদের এক একজনের সঙ্গে তাঁহার যেমনি দেখা হইতে লাগিল, অমনি তিনি তাহার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া উত্তর বলিয়া দিতে লাগিলেন। পরে একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া কাগজটি ভাঁজ করিয়া আমার হাতে দিলেন, এবং তাহার অপর পিঠে আমাকে নাম স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'এটি দেখিবেন না, পকেটে রাখিয়া দিন; যখন বলিব, তখন বাহির করিবেন।' আমাদের সকলের সঙ্গেই এই রকম করিলেন। তারপর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে ঘটিবে, এমন কয়েকটি ঘটনার কথা বলিলেন। অবশেষে বলিলেন, 'আপনাদের যে ভাষায় খুশি, কোন শব্দ বা বাক্য চিন্তা করুন। আমি সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রকাণ্ড বাক্য মনে মনে আওড়াইলাম; সংস্কৃতের বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানিতেন না। তিনি বলিলেন, 'পকেট হইতে কাগজটি বাহির করুন তো!' দেখি, তাহাতে সেই সংস্কৃত বাক্যটিই লেখা রহিয়াছে! একঘণ্টা আগে তিনি এটি লিখিয়াছিলেন, আর নীচে মন্তব্য দিয়াছিলেন, 'যাহা লিখিয়া রাখিলাম, ইনি পরে সেই বাক্যটিই ভাবিবেন'—ঠিক তাহাই হইল। আমাদের অন্য একজন বন্ধুকেও অনুরূপ একখানি কাগজ দিয়াছিলেন, এবং তিনিও তাহা স্বাক্ষর করিয়া পকেটে

রাখিয়াছিলেন। এখন বন্ধুটিকেও একটি বাক্য চিন্তা করিতে বলিলে তিনি কোরানের একাংশ হইতে আরবী ভাষায় একটি বাক্য ভাবিলেন। ঐ ব্যক্তির সে ভাষা জানিবার সম্ভাবনা ছিল আরও কম। বন্ধুটি দেখিলেন, সেই বাক্যটিই কাগজে লেখা আছে।

সঙ্গীদের মধ্যে আর একজন ছিলেন ডাক্তার। তিনি জার্মান ভাষায় লিখিত কোন ডাক্তারি পুস্তক হইতে একটি বাক্য ভাবিলেন। তাঁহার কাগজে তাহাই পাওয়া গেল।

সেদিন হয়তো কোনরূপে প্রতারিত হইয়াছি ভাবিয়া কিছুদিন পরে আমি আবার সেই ব্যক্তির নিকট গেলাম। সেদিন আমার সঙ্গে নূতন আর একদল বন্ধু ছিলেন। সেদিনও তিনি অদ্ভুত সাফল্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

আর একবার—ভারতে হায়দ্রাবাদ শহরে থাকার সময় শুনিলাম যে, সেখানে একজন ব্রাহ্মণ আছেন; তিনি হরেক রকমের জিনিস বাহির করিয়া দিতে পারেন। কোথা হইতে যে আসে সেগুলি, কেহই জানে না। তিনি একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। আমি তাঁহার কৌশল দেখিতে চাহিলাম। ঘটনাচক্রে তখন তাঁহার জ্বর। ভারতে একটি সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কোন সাধু ব্যক্তি অসুস্থ লোকের মাথায় হাত বুলাইয়া দিলে তাহার অসুখ সারিয়া যায়। ব্রাহ্মণটি সেজন্য আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, মাথায় হাত বুলাইয়া আমার জ্বর সারাইয়া দিন।' আমি বলিলাম, 'ভাল কথা; তবে আমাকে আপনার কৌশল দেখাইতে হইবে।' তিনি রাজী হইলেন। তাঁহার ইচ্ছামত আমি তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলাম; তিনিও তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বাহিরে আসিলেন। তাঁহার কটিদেশে জড়ানো একফালি কাপড় ছাড়া আমরা তাঁহার দেহ হইতে আর সব পোশাকই খুলিয়া লইলাম। বেশ শীত পড়িয়াছিল, সেজন্য আমার কম্বলখানি তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিলাম; ঘরের এককোণে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল, আর পঁচিশ জোড়া চোখ চাহিয়া রহিল তাঁহার দিকে। তিনি বলিলেন, 'যে যাহা চান, কাগজে তাহা লিখিয়া ফেলুন।' সে অঞ্চলে কখনও জন্মে না, এমন সব ফলের নাম আমরা লিখিলাম—আঙুর, কমলালেবু, এই-সব ফল। লেখার পর কাগজগুলি তাঁহাকে দিলাম। তারপর কম্বলের ভিতর হইতে আঙুরের থোলো, কমলালেবু ইত্যাদি সবই বাহির হইল। এত

ফল জমিয়া গেল যে, ওজন করিলে সব মিলিয়া তাঁহার দেহের ওজনের দ্বিগুণ হইয়া যাইত। সে-সব ফল আমাদের খাইতে বলিলেন। আমাদের ভিতর কেহ কেহ আপত্তি জানাইলেন, ভাবিলেন ইহাতে সম্মোহনের ব্যাপার আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজেই খাইতে শুরু করিলেন দেখিয়া আমরাও সবাই উহা খাইলাম। আসল ফলই ছিল সেগুলি।

সব শেষে তিনি একরাশি গোলাপফুল বাহির করিলেন। প্রত্যেকটি ফুলই নিখুঁত—শিশিরবিন্দু পর্যন্ত রহিয়াছে পাপড়ির উপর; একটিও থেঁতলানো নয়, একটিও নষ্ট হয় নাই। আর একটি দুটি তো নয়, রাশি রাশি ফুল! কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল—জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, 'সবই হাত-সাফাই এর ব্যাপার।'

তা যেভাবেই ঘটুক, এটি বেশ বোঝা গেল যে, শুধু হাত-সাফাই-এর দ্বারা এরূপ ঘটানো অসম্ভব। এত বিপুল পরিমাণ জিনিস তিনি আনিলেন কোথা হইতে?

যাহাই হউক, এরূপ বহু ঘটনা আমি দেখিয়াছি। ভারতে ঘুরিলে বিভিন্ন স্থানে এরূপ শত শত ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দেশেই এ-সব আছে। এমন কি এদেশেও এ ধরনের অদ্ভুত ঘটনা কিছু কিছু চোখে পড়ে। অবশ্য ভণ্ডামিও বেশ কিছু আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দেখ—ভণ্ডামি দেখিলেই এ-কথাও তো বলিতে হইবে যে উহা কোন কিছু সত্য ঘটনার অনুকরণ। কোথাও না কোথাও সত্য নিশ্চয়ই আছে, যাহার অনুকরণ করা হইতেছে। শূন্য-পদার্থের তো আর অনুকরণ হয় না। অনুকরণ করিতে হইলে অনুকরণ করিবার মতো যথার্থ সত্য বস্তু একটি থাকা চাই-ই।

অতি প্রাচীন কালে হাজার হাজার বছর আগে, ভারতে আজকালকার চেয়ে অনেক বেশী করিয়াই এই-সব ঘটনা ঘটিত। আমার মনে হয়, যখন কোন দেশে লোকবসতি খুব বেশী ঘন হয়, তখন যেন মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি হ্রাস পায়। আবার কোন বিস্তৃত দেশে যদি লোকবসতি খুব পাতলা হয়, তাহা হইলে সেখানে বোধ হয় আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকতর বিকাশ ঘটে।

হিন্দুদের ধাত খুব বিচারপ্রবণ বলিয়া এই-সব ঘটনার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল; ইহা লইয়া তাঁহারা গবেষণা করিয়াছিলেন এবং

কতকগুলি বিশেষ সিদ্ধান্তেও পৌঁছিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইহা লইয়া তাঁহারা একটি বিজ্ঞানই গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, এ-সব ঘটনা অসাধারণ হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘটিত হয়; অতি-প্রাকৃতিক বলিয়া কিছুই নাই। জড়জগতের অন্য যে-কোন ঘটনার মতোই এগুলিও নিয়মাধীন। কেহ এইরূপ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিলে উহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলার কোন কারণ নাই; কেন-না এই সিদ্ধান্তগুলি লইয়া যথারীতি গবেষণা ও সাধন করা যায়, এবং এগুলি অর্জন করা যায়। তাঁহারা এই বিদ্যার নাম দিয়াছিলেন 'রাজযোগ'। ভারতে হাজার হাজার লোক এই বিদ্যার চর্চা করে; ইহা সে জাতির নিত্য-উপাসনার একটি অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে, মানুষের মনের মধ্যেই এই-সব অসাধারণ শক্তি নিহিত আছে। আমাদের মন বিশ্বব্যাপী বিরাট মনেরই অংশমাত্র। প্রত্যেক মনের সঙ্গেই অপরাপর সব মনের সংযোগ রহিয়াছে। একটি মন যেখানেই থাকুক না কেন, গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাহার সত্যিকারের যোগাযোগ রহিয়াছে।

দূরদেশে চিন্তা প্রেরণ করা-রূপ যে একজাতীয় ঘটনা আছে, তাহা কখনও লক্ষ্য করিয়াছ কি? এখানে কেহ কিছু চিন্তা করিল; হয়তো ঐ চিন্তাটি অন্য কোথাও অন্য কাহারও মনে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল। হঠাৎ যে এমন হয়, তাহা নয়। উপযুক্ত প্রস্তুতির পরে—কেহ হয়তো দূরবর্তী কাহারও মনে কোন চিন্তা পাঠাইবার ইচ্ছা করে; আর যাহার কাছে পাঠানো হয়, সেও টের পায় যে, চিন্তাটি আসিতেছে; এবং যেভাবে পাঠানো হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবেই উহা গ্রহণ করে,—দূরত্বে কিছু যায় আসে না। চিন্তাটি লোকটির কাছে ঠিক পৌঁছায়, এবং সে সেটি বুঝিতে পারে। তোমার মন যদি একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে এখানে থাকে, আর আমার মন অন্য একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে ওখানে থাকে এবং এ দুই-এর মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকে, তাহা হইলে আমার মনের চিন্তা তোমার কাছে পৌঁছায় কিরূপে? সাধারণ ক্ষেত্রে আমার চিন্তাগুলি যে তোমার কাছে সোজাসুজি পৌঁছায়, তাহা নয়; আমার চিন্তাগুলিকে 'ইথারে'র তরঙ্গে পরিণত করিতে হয়, সে ইথার-তরঙ্গগুলি তোমার মস্তিষ্কে পৌঁছিলে সেগুলিকে আবার তোমার নিজের মনের চিন্তায়

রূপায়িত করিতে হয়। চিন্তাকে এখানে রূপান্তরিত করা হইতেছে, আর সেখানে আবার উহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। প্রক্রিয়াটি এক পরোক্ষ জটিল পথে চলে। কিন্তু টেলিপ্যাথিতে (ইচ্ছাসহায়ে দূরদেশে চিন্তা প্রেরণের ব্যাপারে) তাহা করিতে হয় না; এটি প্রত্যক্ষ সোজাসুজি ব্যাপার।

ইহা হইতেই বোঝা যায়, যোগীরা যেরূপ বলিয়া থাকেন, মনটি সেরূপ নিরবচ্ছিন্নই বটে। মন বিশ্বব্যাপী। তোমার মন, আমার মন, ছোট ছোট এই-সব মনই সেই এক বিরাট মনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, একই মানস-সমুদ্রের কয়েকটি ছোট ছোট তরঙ্গ; আর মনের এই নিরবচ্ছিন্নতার জন্যই আমরা একজন আর একজনের কাছে প্রত্যক্ষভাবে চিন্তা পাঠাইতে পারি।

আমাদের চারিদিকে কি ঘটিতেছে—দেখ না। জগৎ জুড়িয়া যেন একটা প্রভাব-প্রসারের ব্যাপার চলিতেছে। নিজ শরীর-রক্ষার কাজে আমাদের শক্তির একটা অংশ ব্যয়িত হয়, বাকী শক্তির প্রতিটি বিন্দুই দিনরাত ব্যয়িত হইতেছে অপরকে প্রভাবান্বিত করার কাজে। আমাদের শরীর, আমাদের গুণ, আমাদের বুদ্ধি এবং আমাদের আধ্যাত্মিকতা—এ-সবই সর্বক্ষণ অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। অপর দিকে আবার ঠিক এইভাবেই আমরাও অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছি। আমাদের চারিদিকেই এই কাণ্ড ঘটিতেছে। একটি স্থূল উদাহরণ দিতেছি। কেহ হয়তো আসিলেন, যাঁহাকে তুমি সুপণ্ডিত বলিয়া জানো এবং যাঁহার ভাষা মনোরম; ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলিলেন। কিন্তু তিনি তোমার মনে কোন রেখাপাত করিতে পারিলেন না। আর একজন আসিয়া কয়েকটি মাত্র কথা বলিলেন, তাও সুসংবদ্ধ ভাষায় নয়, হয়তো বা ব্যাকরণের ভুলও রহিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তোমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিলেন। তোমরা অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছ। কাজেই বেশ বোঝা যাইতেছে যে, শুধু কথা সব সময় মনে দাগ কাটিতে পারে না; লোকের মনে ছাপ দিবার কাজে ভাষা—এমনকি চিন্তা পর্যন্ত কাজ করে তিনভাগের একভাগ মাত্র, বাকী দুইভাগ কাজ করে ব্যক্তিটি। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই বাহিরে গিয়া তোমাকে প্রভাবিত করে।

আমাদের সব পরিবারেই একজন কর্তা আছেন; দেখা যায়—তাঁহাদের ভিতর কয়েকজন এ-কাজে সফলকাম হন, কয়েকজন হন না। কেন? আমাদের সফলতার জন্য আমরা দোষ চাপাই পরিবারের অন্য লোকদের উপর। অকৃতকার্য হইলেই বলি, এই অমুকের দোষে এরূপ হইল। বিফলতার সময় নিজের দোষ বা দুর্বলতা কেহ স্বীকার করিতে চায় না। নিজেকে নির্দোষ দেখাইতে চায় সকলেই, আর দোষ চাপায় অপর কাহারও বা অপর কিছুর ঘাড়ে, না হয়তো দুর্ভাগ্যের ঘাড়ে। গৃহকর্তারা যখন অকৃতকার্য হন, তখন তাঁহাদের নিজেদের মনেই প্রশ্ন তোলা উচিত যে, কেহ কেহ তো বেশ ভালভাবেই সংসার চালায়, আবার কেহ কেহ তাহা পারে না কেন? দেখা যাইবে যে, সব নির্ভর করিতেছে ব্যক্তিটির উপর; পার্থক্য সৃষ্টির কারণ হয় লোকটি নিজে, তাহার উপস্থিতি বা তাহার ব্যক্তিত্ব।

মানবজাতির বড় বড় নেতাদের কথা ভাবিতে গেলে আমরা সর্বদা দেখিব, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের জন্যই তাঁহারা নেতা হইতে পারিয়াছিলেন। অতীতের বড় বড় সব গ্রন্থকারদের, বড় বড় সব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কথা ধর। খাঁটি কথা বলিতে গেলে কয়টি চিন্তাই বা তাঁহারা করিয়াছেন? মানবজাতির পুরাতন নেতারা যাহা কিছু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সবটার কথাই ভাবো; তাঁহাদের প্রত্যেকখানি পুস্তক লইয়া উহার মূল্য নির্ধারণ কর। জগতে আজ পর্যন্ত যে-সব যথার্থ চিন্তার, নূতন ও খাঁটি চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে, সেগুলির পরিমাণ মুষ্টিমেয়। আমাদের জন্য যে-সব চিন্তা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি পড়িয়া দেখ। গ্রন্থকারেরা যে মহামানব ছিলেন, তাহা তো মনে হয় না, অথচ জীবৎকালে তাঁহারা যে মহামানবই ছিলেন, তাহা সুবিদিত। তাঁহারা এত বড় হইয়াছিলেন কিভাবে? শুধু তাঁহাদের চিন্তা, তাঁহাদের লেখা গ্রন্থ বা তাঁহাদের বক্তৃতার জন্য তাঁহারা বড় হন নাই; এ-সব ছাড়া আরও কিছু ছিল, যাহা এখন আর নাই; সেটি তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব। আগেই বলিয়াছি, এ ব্যাপারে মানুষটির ব্যক্তিত্বের প্রভাব তিনভাগের দুইভাগ, আর তাঁহার বুদ্ধির, তাহার ভাষার প্রভাব তিনভাগের একভাগ। প্রত্যেকের ভিতরই আমাদের আসল মানুষটি, আসল ব্যক্তিত্বটি প্রকৃত কাজ করে; আমাদের ক্রিয়াগুলি তো শুধু উহার বহিঃপ্রকাশ। মানুষটি থাকিলে কাজ হইবেই; কার্য কারণকে অনুসরণ করিতে বাধ্য।

সর্ববিধ জ্ঞানদানের, সর্ববিধ শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত মানুষটিকে গড়িয়া তোলা। কিন্তু তাহার বদলে আমরা সবসময় বাহিরটি মাজিয়া ঘষিয়া চাকচিক্যময় করিতেই ব্যস্ত। ভিতর বলিয়া যদি কিছু নাই রহিল, তবে শুধু বাহিরের চাকচিক্য বাড়াইয়া লাভ কি? মানুষকে উন্নত করাই সর্ববিধ শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। যে ব্যক্তি অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তিনি সমজাতীয় ব্যক্তিদের উপর যেন যাদুমন্ত্র ছড়াইতে পারেন, তিনি যেন শক্তির একটা আধার-বিশেষ। ঐরূপ মানুষ তৈরী হইয়া গেলে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ হন; এরূপ ব্যক্তিত্ব যে-বিষয়ে নিয়োজিত হইবে, তাহাই সফল করিয়া তুলিবে।

এখন কথা হইতেছে, ইহা সত্য হইলেও আমাদের পরিচিত কোন প্রাকৃতিক নিয়মসমূহায়ে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না। রসায়নের বা পদার্থবিদ্যার জ্ঞানসহায়ে ইহা বুঝানো যাইবে কিরূপে? কতখানি 'অক্সিজেন,' কতখানি 'হাইড্রোজেন,' কতখানি 'কার্বন' ইহাতে আছে, কতগুলি অণু কিভাবে সাজানো আছে, কতগুলি কোষ লইয়াই বা ইহা গঠিত হইয়াছে—ইত্যাদির খোঁজ করিয়া এই রহস্যময় ব্যক্তিত্বের কি বুঝিব আমরা? তবু দেখা যাইতেছে, ইহা বাস্তব সত্য; শুধু তাই নয়, এই ব্যক্তিত্বটিই আসল মানুষ; এই মানুষটিই বাঁচিয়া থাকে, চলাফেরা করে, কাজ করে; এই মানুষটিই সঙ্গীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের পরিচালিত করে, আর শেষে চলিয়া যায়; তাহার বুদ্ধি, তাহার গ্রন্থ, তাহার কাজ—এগুলি তাহার পশ্চাতে রাখিয়া যাওয়া নিদর্শন মাত্র। বিষয়টি ভাবিয়া দেখ। বড় বড় ধর্মাচার্যদের সঙ্গে বড় বড় দার্শনিকদের তুলনা করিয়া দেখ। দার্শনিকেরা কচিৎ কখন কাহারও ভিতরের মানুষটিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন, অথচ লিখিয়া গিয়াছেন অতি অপূর্ব সব গ্রন্থ। অপরদিকে ধর্মাচার্যেরা জীবৎকালে বহু দেশের লোকের মনে সাড়া জাগাইয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিত্বই এই পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। দার্শনিকদের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিবার মতো ব্যক্তিত্ব অতি ক্ষীণ। বড় বড় ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তিদের বেলা উহা অতি প্রবল। দার্শনিকদের ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিবৃত্তিকে স্পর্শ করে, আর ধর্মাচার্যদের ব্যক্তিত্ব স্পর্শ করে জীবনকে। একটি হইতেছে যেন শুধু রাসায়নিক পদ্ধতি—কতকগুলি রাসায়নিক উপাদান একত্র করিয়া রাখা

হইয়াছে, উপযুক্ত পরিবেশে সেগুলি ধীরে ধীরে মিশ্রিত হইয়া একটি আলোর ঝলক সৃষ্টি করিতে পারে, নাও করিতে পারে। অপরটি যেন একটি আলোকবর্তিকা—ক্ষিপ্রবেগে চারিদিকে ঘুরিয়া অপর জীবন-দীপগুলি অচিরে প্রজ্বলিত করে।

যোগ-বিজ্ঞান দাবি করে যে, এই ব্যক্তিত্বকে ক্রমবর্ধিত করিবার প্রক্রিয়া সে আবিষ্কার করিয়াছে; সে-সব রীতি ও প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মানিয়া চলিলে প্রত্যেকেই নিজ ব্যক্তিত্বকে বাড়াইয়া অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবহারিক বিষয়গুলির মধ্যে ইহা অন্যতম, এবং সর্ববিধ শিক্ষার রহস্যও ইহাই। সকলেরই পক্ষে ইহা প্রযোজ্য। গৃহস্থের জীবনে, ধনী দরিদ্র ব্যবসায়ীর জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে, সকলেরই জীবনে এই ব্যক্তিত্বকে বাড়াইয়া তোলার মূল্য অনেক। প্রাকৃতিক যে-সব নিয়ম আমাদের জানা আছে, সেগুলিরও পিছনে অতি সূক্ষ্ম সব নিয়ম রহিয়াছে। অর্থাৎ স্থূলজগতের সত্তা, মনোজগতের সত্তা, অধ্যাত্মজগতের সত্তা প্রভৃতি বলিয়া আলাদা আলাদা কোন সত্তা নাই। সত্তা বলিতে যাহা আছে, তাহা একটি-ই। বলা যায়, ইহা যেন একটি ক্রমঃসূক্ষ্ম অস্তিত্ব; ইহার স্থূলতম অংশটি এখানে রহিয়াছে; (একবিন্দু অভিমুখে) এটি যতই সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া চলিয়াছে; আমরা যাহাকে আত্মা বলি, তাহাই সূক্ষ্মতম, আমাদের দেহ স্থূলতম। আর মনুষ্যরূপ এই ক্ষুদ্র জগতেও যাহা আছে, ব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তাহাই আছে। আমাদের এই বিশ্বটিও ঠিক এইরূপই; জগৎ তাহার স্থূলতম বাহ্যপ্রকাশ, আর ক্রমশঃ একবিন্দু-অভিমুখী হইয়া চলিয়া তাহা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর হইতে হইতে শেষে ঈশ্বরে পর্যবসিত হইয়াছে।

তাছাড়া আমরা জানি যে, সূক্ষ্মের মধ্যেই প্রচণ্ডতম শক্তি নিহিত থাকে; স্থূলের মধ্যে নয়। কোন লোককে হয়তো বিপুল ভার উত্তোলন করিতে দেখা যায়; তখন তাহার মাংসপেশীগুলি ফুলিয়া উঠে, তাহার সারা অঙ্গে শ্রমের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। এ-সব দেখিয়া আমরা ভাবি, মাংসপেশীর কি শক্তি! কিন্তু মাংসপেশীতে শক্তি জোগায় সুতার মতো সরু স্নায়ুগুলিই; মাংসপেশীর সঙ্গে একটিমাত্রও স্নায়ুর সংযোগ ছিন্ন হইবামাত্র মাংসপেশী কোন কাজই আর করিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র স্নায়ুগুলি আবার শক্তি আহরণ করে আরও সূক্ষ্ম বস্তু হইতে, সেই সূক্ষ্ম বস্তুটি আবার শক্তি পায় চিন্তা-নামক সূক্ষ্মতর বস্তুর

নিকট হইতে; ক্রমে আরও সূক্ষ্ম, আরও সূক্ষ্ম আসিয়া পড়ে। কাজেই সূক্ষ্মই শক্তির যথার্থ আধার। অবশ্য স্থূল স্তরের গতিগুলিই আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্তরে যে গতি হয়, তাহা দেখিতে পাই না। যখন কোন স্থূল বস্তু নড়ে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি, সেজন্য স্বভাবতই গতির সঙ্গে স্থূলের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য মনে করি। কিন্তু সব শক্তিরই যথার্থ আধার সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মে কোন গতি আমরা দেখি না, সে গতি অতি তীব্র বলিয়াই বোধ হয়, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু কোন বিজ্ঞানের সহায়তায়, কোন গবেষণার সহায়তায় যদি বাহ্যপ্রকাশের কারণ-রূপ শক্তিগুলি ধরিতে পারি, তাহা হইলে শক্তির প্রকাশগুলিও আমাদের আয়ত্তে আসিবে। কোন হ্রদের তলদেশ হইতে একটি বুদ্বুদ উঠিতেছে; যখন হ্রদের উপরে উঠিয়া উহা ফাটিয়া যায়, তখনই মাত্র উহা আমাদের নজরে পড়ে, তলদেশ হইতে উপরে উঠিয়া আসিবার মধ্যে কোন সময়ই সেটিকে দেখিতে পাই না। চিন্তার বেলা ও চিন্তাটি অনেকখানি পরিণতি লাভ করিবার পর, বা কর্মে পরিণত হইবার পর উহা আমাদের অনুভবে আসে। আমরা ক্রমাগত অভিযোগ করি যে, আমাদের চিন্তা—আমাদের কর্ম আমাদের বশে থাকে না। কিন্তু থাকিবে কি করিয়া? যদি সূক্ষ্মগতিগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, চিন্তারূপে কর্মরূপে পরিণত হইবার পূর্বেই যদি চিন্তাকে আরও সূক্ষ্মাবস্থায় তাহার মূলাবস্থায় ধরিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের পক্ষে সবটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এখন এমন কোন প্রক্রিয়া যদি থাকে, যাহা অবলম্বনে এই-সব সূক্ষ্মশক্তি ও সূক্ষ্ম কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করা, অনুসন্ধান করা, ধারণা করা এবং পরিশেষে এগুলিকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, শুধু তাহা হইলেই আমরা নিজেকে নিজের বশে আনিতে পারিব। আর নিজের মনকে যে বশে আনিতে পারে, অপরাপর ব্যক্তির মনও তাহার বশে আসিবে নিশ্চিত। এইজন্যই সর্বকালে পবিত্রতা ও নীতিপরায়ণতা ধর্মের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। পবিত্র ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি নিজেকে নিজের বশে রাখিতে পারে। সব মন একই মনের বিভিন্ন অংশ মাত্র। একটি মৃৎখণ্ডের জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার নিকট বিশ্বের সমুদয় মৃত্তিকাই জানা হইয়া গিয়াছে। নিজের মন সম্বন্ধে জ্ঞান যাহার হইয়াছে, নিজের মনকে যে আয়ত্তে আনিয়াছে, সব মনের রহস্যই সে জানে, সব মনের উপরই তাহার প্রভাব আছে।

এখন সূক্ষ্মাংশগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে আমরা বহু শারীরিক দুর্ভোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি; সেইরূপ সূক্ষ্মগতিগুলি আয়ত্তে আনিতে পারিলে আমরা বহু দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি; এ-সব সূক্ষ্মশক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতালাভ করিলে বহু বিফলতা এড়াইয়া চলা যায়। এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা ইহার উপযোগিতার কথা। তারপর আরও উঁচু কথা আছে।

এখন এমন একটি মতের কথা তুলিতেছি, যাহা লইয়া সম্প্রতি কোন বিচার করিব না, শুধু সিদ্ধান্তটি বলিয়া যাইব। কোন জাতি যে-সব অবস্থার ভিতর দিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে, সেই জাতিকেই শৈশব অবস্থায় দ্রুতগতিতে ঐসব অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়; যে-সব অবস্থা পার হইয়া আসিতে একটা জাতির হাজার হাজার বছরের প্রয়োজন হইয়াছে, সে-সব পার হইতে শিশুটির প্রয়োজন হয় মাত্র কয়েক বছরের—এইটুকু যা প্রভেদ। শিশুটি প্রথমে আদিম অসভ্য মানুষেরই মতো থাকে —সে পায়ের তলায় প্রজাপতি দলিয়া চলে। প্রথমাবস্থায় শিশুটি স্বজাতির পূর্বপুরুষেরই মতো। যত বড় হইতে থাকে, বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে শেষে জাতির পরিণত অবস্থায় আসিয়া পৌছায়। তবে সে ইহা খুব ক্ষিপ্রবেগে ও অল্পসময়ে করিয়া ফেলে। এখন সব মানুষকে একটি জাতি বলিয়া ধর, অথবা সমগ্র প্রাণিজগৎকে—মানুষ ও নিম্নতর প্রাণিগণকে—একটি সমগ্র সত্তা বলিয়া ভাবো। এমন একটি লক্ষ্য আছে, যাহার দিকে এই জীব-সমষ্টি অগ্রসর হইতেছে। এই লক্ষ্যকে পূর্ণতা বলা যাক। এমন অনেক নরনারী জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহাদের জীবনে মানবজাতির সম্পূর্ণ উন্নতির পূর্বাভাস সূচিত হয়। সমগ্র মানবজাতি যতদিন না পূর্ণতা লাভ করে, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, যুগ যুগ ধরিয়া বারে বারে জন্ম এবং পুনর্জন্ম বরণ না করিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের স্বল্প কয়েক বছরের মধ্যেই যেন ক্ষিপ্রগতিতে সেই যুগ-যুগান্তর পার হইয়া যান। আর ইহাও আমাদের জানা আছে যে, আন্তরিকতা থাকিলে প্রগতির এই প্রণালীগুলিকে খুবই ত্বরান্বিত করা সম্ভব। শুধু জীবনধারণের উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দিয়া কয়েকটি সংস্কৃতিহীন লোককে যদি কোন দ্বীপে বাস করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও তাহারা ধীরে ধীরে উচ্চ, উচ্চতর সভ্যতা

উদ্ভাবন করিতে থাকিবে। ইহাও আমাদের অজানা নয় যে, কিছু অতিরিক্ত সাহায্য পাইলে এই উন্নতি আরও ত্বরান্বিত হয়। আমরা গাছপালার বৃদ্ধির সহায়তা করি; করি না কি? প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিলেও গাছগুলি বাড়িয়া উঠিত, তবে দেরী হইত; বিনা সাহায্যে যতদিনে বাড়িত, তদপেক্ষা অল্প সময়ে বাড়িবার জন্য আমরা তাহাদিগকে সাহায্য করি। এ-কাজ আমরা সর্বদাই করিতেছি, আমরা কৃত্রিম উপায়ে বস্তুর বৃদ্ধির গতি দ্রুততর করিয়া তুলিতেছি। মানুষের উন্নতিই বা দ্রুততর করিতে পারিব না কেন? জাতি হিসাবে আমরা তাহা করিতে পারি। অপর দেশে প্রচারক পাঠানো হয় কেন? কারণ এই উপায়ে অপর জাতিগুলিকে তাড়াতাড়ি উন্নত করিতে পারা যায়। তাহা হইলে ব্যক্তির উন্নতিও কি আমরা দ্রুততর করিতে পারি না? পারি বইকি। এই উন্নতির দ্রুততর কোন সীমা কি নির্দেশ করা যায়? এক জীবনে মানুষ কতদূর উন্নত হইবে, কেহ তাহা বলিতে পারে না। কোন মানুষ এইটুকুমাত্র উন্নত হইতে পারে, তাহার বেশী নয়, এ-কথা বলার পিছনে কোনই যুক্তি নাই। পরিবেশ অদ্ভুতভাবে তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিতে পারে। কাজেই পূর্ণতালাভের পূর্ব পর্যন্ত কোন সীমা টানা যায় কি? ইহাতে কি বোঝা যায়? বোঝা যায় যে, আজ হইতে হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর পরে গোটা জাতিটি-ই যে ধরনের মানুষে ভরিয়া যাইবে, সেইরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত একজন মানুষ আজই অবতীর্ণ হইতে পারেন। যোগীরা এই কথাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বড় বড় অবতারপুরুষ ও আচার্যেরা এই ধরনেরই মানুষ; তাঁহারা এই এক-জীবনেই পূর্ণতালাভ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বযুগে, সর্বকালেই আমরা এরূপ মানবের দর্শন পাইয়াছি। সম্প্রতি—এই সেদিনকার কথা—এরূপ একজন মানব আসিয়াছিলেন, যিনি এই জন্মেই সমগ্র মানবজাতির জীবনের সবটুকু পথ অতিক্রম করিয়া চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন। উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করার এই কার্যটিকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বনে পরিচালিত করিতে হইবে। এই নিয়মগুলি আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, এগুলির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি এবং নিজ প্রয়োজনে এগুলিকে লাগাইতে পারি। এরূপ করিতে পারা মানেই উন্নত হওয়া। এই উন্নতির বেগ দ্রুততর করিয়া, ক্ষিপ্রগতিতে নিজেকে বিকশিত করিয়া এই জীবনেই আমরা পূর্ণতা লাভ করিতে পারি।

ইহাই আমাদের জীবনের উচ্চতর দিক; এবং যে বিজ্ঞানসহায়ে মন ও তাহার শক্তির অনুশীলন করা হয়, তাহার যথার্থ লক্ষ্য এই পূর্ণতালাভ। অর্থ ও অন্যান্য জাগতিক বস্তু দান করিয়া অপরকে সাহায্য করা, বা দৈনন্দিন জীবনে কি ভাবে নির্বঞ্ঝাটে চলা যায়, তাহা শিক্ষা দেওয়া—এ-সব নিতান্তই তুচ্ছ আনুষঙ্গিক কার্য মাত্র।

তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় বাহ্যপ্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তলিকারূপে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষকে অপেক্ষা করিতে না দিয়া তাহার পূর্ণত্বকে প্রকট করিয়া দেওয়াই এই বিজ্ঞানের উপযোগিতা। এই বিজ্ঞান চায় তুমি সবল হও, প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া কাজটি তুমি নিজের হাতে তুলিয়া লও এবং এই ক্ষুদ্র জীবনের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাও। ইহাই তাহার মহান্ উদ্দেশ্য।

জ্ঞানে, শক্তিতে, সুখ-সমৃদ্ধিতে মানুষ বাড়িয়াই চলিয়াছে। জাতি হিসাবে আমরা ক্রমাগত উন্নত হইয়া চলিয়াছি। ইহা যে সত্য, ধ্রুব সত্য, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও কি তাহা সত্য? হাঁ, কিছুটা তো বটেই। কিন্তু তবু এ প্রশ্ন আসে: ইহার সীমা-নির্ধারণ হইবে কোথায়? আমার দৃষ্টিশক্তি কয়েক ফুট দূরে মাত্র প্রসারিত হয়। কিন্তু এমন লোক আমি দেখিয়াছি—যে পাশের ঘরে কি ঘটিতেছে, চোখ বন্ধ করিয়াও তাহা দেখিতে পায়। তোমার যদি ইহা বিশ্বাস না হয়, সে লোকটি হয়তো তিন সপ্তাহের মধ্যে তোমাকেই এভাবে দেখিতে শিখাইয়া দিবে। যে-কোন লোককে ইহা শিখানো যায়। কেহ কেহ পাঁচ মিনিটের শিক্ষায় অপরের মনে কি ঘটিতেছে, তাহা জানিবার ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। এই-সব হাতে-হাতে দেখাইয়া দেওয়া যায়।

ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা সীমারেখা টানিব কোথায়? এই ঘরের এককোণে বসিয়া অপরে কি চিন্তা করিতেছে, তাহা যদি কেহ জানিতে পারে, পাশের ঘরের লোকটির মনের খবরই বা সে পাইবে না কেন? যে-কোন জায়গায় লোকের চিন্তাই বা টের পাইবে না কেন? না পাইবার কোন কারণ আমরা দেখাইতে পারিব না। সাহস করিয়া বলিতে পারি না, ইহা অসম্ভব। আমরা শুধু বলিতে পারি, কিভাবে ইহা সম্ভব হয়—তাহা জানি না। এরূপ ঘটা অসম্ভব—এ-কথা বলিবার কোন অধিকার জড়বিজ্ঞানীদের নাই; তাঁহারা

শুধু এইটুকু বলিতে পারেন, 'আমরা জানি না।' বিজ্ঞানের কর্তব্য হইল তথ্য সংগ্রহ করা, সামান্যীকরণ করা, কতকগুলি মূলতত্ত্বে উপনীত হওয়া এবং সত্য প্রকাশ করা—এই পর্যন্ত। কিন্তু তথ্যকে অস্বীকার করিয়া চলিতে শুরু করিলে বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিবে কিরূপে?

একজন মানুষ কতখানি শক্তি অর্জন করিতে পারে, তাহার কোন সীমা নাই। ভারতীয় মনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন কিছুতে সে অনুরক্ত হইলে আর সব কিছু ভুলিয়া তাহাতে একেবারে তন্ময় হইয়া যায়। ভারত যে বহু বিজ্ঞানের জন্মভূমি, তাহা তোমরা জানো। গণিতের আরম্ভ সেখানে। আজ পর্যন্ত তোমরা সংস্কৃত গণনানুযায়ী ১, ২, ৩ হইতে ০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করিতেছ। সকলেই জানে বীজগণিতের উৎপত্তিও ভারতে। আর নিউটনের জন্মের হাজার বছর আগে ভারতবাসীরা মাধ্যাকর্ষণের কথা জানিত।

এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ভারতের ইতিহাসে এমন একটি যুগ ছিল, যখন শুধু মানুষ ও মানুষের মন—এই একটি বিষয়ে ভারতের সমগ্র মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতেই সে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। লক্ষ্য-লাভের সহজতম উপায় মনে হওয়ায় এ-বিষয়টি তাঁহাদের নিকট এত আকর্ষণীয় হইয়াছিল। যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করিলে মনের অসাধ্য কিছুই নাই—এই বিষয়ে ভারতীয় মনে এতখানি দৃঢ়বিশ্বাস আসিয়াছিল যে, মনঃশক্তির গবেষণাই তাহার মহান্ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের নিকট সম্মোহন, যাদু ও এইজাতীয় অন্যান্য শক্তিগুলির কোনটিই অলৌকিক মনে হয় নাই। ইতিপূর্বে ভারতীয়েরা যেভাবে যথানিয়মে জড়বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতেন, তখন তেমনি যথানিয়মে এই বিজ্ঞানটিও শিখাইতে লাগিলেন। এ-বিষয়ে জাতির এত বেশী দৃঢ়-প্রত্যয় আসিয়াছিল যে, তাহার ফলে জড়-বিজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল শুধু এই একটি লক্ষ্যে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগীরা বিবিধ পরীক্ষার কাজে লাগিয়া গেলেন। কেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন আলো লইয়া; বিভিন্ন বর্ণের আলোক কিভাবে শরীরে পরিবর্তন আনে, তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একটি বিশেষ বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিতেন, একটি বিশেষ বর্ণের ভিতর বাস করিতেন, এবং বিশেষ বর্ণের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেন।

এইরূপে কত রকমের পরীক্ষাই না চলিতে লাগিল। অপরে কান খুলিয়া রাখিয়া ও বন্ধ করিয়া, শব্দ লইয়া পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন। তাছাড়া আরও অনেকে গন্ধ এবং অন্যান্য বিষয় লইয়াও পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন।

সব কিছুরই লক্ষ্য ছিল মূলে উপস্থিত হওয়া, বিষয়ের সূক্ষ্মভাগগুলিতে গিয়া পৌছানো। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সত্যই অতি অদ্ভুত শক্তির পরিচয়ও দিয়াছেন। বাতাসের ভিতর ভাসিয়া থাকিবার জন্য, বাতাসের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেছিলেন। পাশ্চাত্যের একজন বড় পণ্ডিতের মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, সেটি বলিতেছি। সিংহলের গভর্নর স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখিয়া উহা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। কতকগুলি কাঠি আড়াআড়িভাবে একটি টুলের মতো সাজাইয়া ঐ টুলের উপর একটি বালিকাকে আসন করাইয়া বসানো হইল। বালিকাটি কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, যে-লোকটি খেলা দেখাইতেছিল সে একটি একটি করিয়া এই কাঠিগুলি সরাইয়া লইতে লাগিল; সব কাঠিগুলি সরাইয়া লইবার পর বালিকাটি শূন্যে ভাসিতে লাগিল। কিছু একটা গোপন কৌশল আছে ভাবিয়া গভর্নর তাঁহার তরবারি বাহির করিয়া বালিকাটির নীচের শূন্য স্থানে সজোরে চালাইয়া দিলেন। দেখিলেন, কিছুই নাই সেখানে। এখন ইহাকে কি বলিবে? কোনরূপ যাদু বা অলৌকিকত্ব ইহাতে ছিল না। এইটিই আশ্চর্য ব্যাপার। এ-জাতীয় ঘটনা অলীক, এমন কথা ভারতে কেহই বলিবে না। হিন্দুদের কাছে ইহা স্বাভাবিক ঘটনা। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করিবার পূর্বে হিন্দুদের প্রায়ই বলিতে শোনা যায়, 'আরে, আমাদের কোন যোগী আসিয়া সকলকে হটাইয়া দিবে।' এটি জাতির এক চরম বিশ্বাস। বাহুবল বা তরবারির বল আর কতটুকু? শক্তি তো সবই আত্মার।

ইহা সত্য হইলে ইহাতে মনের সব শক্তি নিয়োগ করিবার প্রলোভন খুবই বেশী হইবে। তবে অপরাপর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের সাফল্য অর্জন করা যেমন খুব কঠিন, এ-ক্ষেত্রেও তাই; তাই বা বলি কেন, ইহা তাহার চেয়ে আরও বেশী কঠিন। তবু বেশীর ভাগ লোকেরই ধারণা যে, এ-সব শক্তি অতি সহজেই অর্জন করা যায়। বিপুল সম্পদ গড়িয়া তুলিতে তোমার কত বছর লাগিয়াছে বলো দেখি? সে-কথা ভাবিয়া দেখ একবার!

প্রথমে বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়রিং বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেই তো বহু বছর গিয়াছে। তারপর তোমাকে বাকী জীবনটাই তো পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

তা-ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু গতিহীন, স্থির। চেয়ারটিকে আমরা বিশ্লেষণ করিতে পারি, চেয়ারটি আমাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবে না। কিন্তু এ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মন, যাহা সদা চঞ্চল। যখনই পর্যবেক্ষণ করিতে যাও, দেখিবে উহা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। মন এখন একটি ভাবে রহিয়াছে, পরমুহূর্তে হয়তো সে-ভাব পাল্টাইয়া গেল; একটার পর একটা ভাবের এই পরিবর্তন সব সময় লাগিয়াই আছে। এই-সব পরিবর্তনের মধ্যেই উহার অনুশীলন চালাইতে হইবে, উহাকে বুঝিতে হইবে, ধরিতে হইবে এবং আয়ত্তে আনিতে হইবে। কাজেই কত বেশী কঠিন এ বিজ্ঞান! এই বিষয়ে কঠোর শিক্ষার প্রয়োজন হয়। লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন কার্যকরী প্রক্রিয়া তাহাদিগকে শিখাই না কেন? এতো আর তামাসা নয়! এই মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া আমি তোমাদের বক্তৃতা শুনাইতেছি; বাড়ি ফিরিয়া দেখিলে—ইহাতে ফল কিছু হয় নাই; আমিও কোন ফল দেখিতে পাইলাম না! তারপর তুমি বলিলে, 'যত সব বাজে কথা!' এ-রকম যে হয়, তাহার কারণ—তুমি এটিকে বাজে জিনিস-রূপেই চাহিয়াছিলে। এ বিজ্ঞানের অতি অল্পই আমি জানি; কিন্তু যেটুকু জানি, সেটুকু শিখিতেই আমাকে জীবনের ত্রিশ বছর ধরিয়া খাটিতে হইয়াছে, আর তারপর যেটুকু শিখিয়াছি, ছয় বছর ধরিয়া লোকের কাছে তাহা বলিয়া বেড়াইতেছি। ইহা শিখিতেই আমার ত্রিশ বছর লাগিয়াছে—কঠোর পরিশ্রম সহকারে ত্রিশ বছর খাটিতে হইয়াছে। কখন কখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়িঘণ্টা খাটিয়াছি, কখন রাত্রে মাত্র একঘণ্টা ঘুমাইয়াছি, কখন বা সারারাতই পরিশ্রম করিয়াছি; কখন কখন এমন সব জায়গায় বাস করিয়াছি, যাহাকে প্রায় শব্দহীন, বায়ুহীন বলা চলে; কখন বা গুহায় বাস করিতে হইয়াছে। কথাগুলি ভাবিয়া দেখ। আর এ-সব সত্ত্বেও আমি অতি অল্পই জানি বা কিছুই জানি না; আমি যেন এ-বিজ্ঞানের বহির্বাসের প্রান্তটুকু মাত্র স্পর্শ করিয়াছি। কিন্তু আমি ধারণা করিতে পারি যে, এ-বিজ্ঞানটি সত্য, সুবিশাল ও অত্যাশ্চর্য।

এখন তোমাদের ভিতর কেহ যদি সত্য-সত্যই এ বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে চাও, তাহা হইলে জীবনের যে-কোন বিষয়কার্যের জন্য যতখানি দৃঢ়-সঙ্কল্প লইয়া উহাতে লাগিয়া পড়া প্রয়োজন হয়, ঠিক ততখানি বা তদপেক্ষা অধিক দৃঢ়-সঙ্কল্প লইয়া এ-বিষয়েও অগ্রসর হইতে হইবে।

বিষয়কর্মের জন্য কত মনোযোগই না দিতে হয়, আর কি কঠোর ভাবেই না উহা আমাদিগকে পরিচালিত করে! মাতা, পিতা, স্ত্রী বা সন্তান মরিয়া গেলেও বিষয়কর্ম বন্ধ থাকিতে পারে না! বুক যদি ফাটিয়াও যায়, তথাপি কর্মক্ষেত্রে আমাদের যাইতেই হইবে, প্রতিটি ঘণ্টা দারুণ যন্ত্রণাময় বলিয়া বোধ হইলেও কাজ করিতে হইবে। ইহারই নাম বিষয়কর্ম; আর আমরা ভাবি ইহা যুক্তিসঙ্গত, ইহা ন্যায়সঙ্গত।

যে-কোন বিষয়কর্মের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করা প্রয়োজন হয় এই বিজ্ঞানের জন্য। বিষয়কর্মে অনেকেই সফলতা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে সফল হন খুব কম লোক। কারণ—যিনি ইহার অনুশীলন করেন, তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। বিষয়কর্মের বেলা যেমন সকলেই প্রচুর সমৃদ্ধিলাভ করিতে না পারিলেও প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লাভ করেই, এই বিজ্ঞানের বেলাও ঠিক তাই; প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আভাস পায়-ই, যাহার ফলে ইহার সত্যতায় আস্থা আসে, এবং বিশ্বাস আসে যে, বহু লোক সত্য-সত্যই এ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত সব কিছুই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ইহাই হইল বিজ্ঞানটির মোটামুটি কথা। নিজের শক্তিতে এবং নিজের আলোকের উপর নির্ভর করিয়া এই বিজ্ঞান অন্য যে-কোন বিজ্ঞানের সঙ্গে তাহাকে তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য সগর্বে আমাদিগকে আহ্বান করে। প্রবঞ্চক, যাদুকর, শঠ—এ-সবও এক্ষেত্রে আছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহা থাকে, তাহা অপেক্ষা বরং বেশী-ই আছে। কি কারণে? কারণ তো একই—যে কাজে যত বেশী লাভ, ঠক-প্রবঞ্চকের সংখ্যাও তাহাতে তত বেশী। কিন্তু তাই বলিয়া কাজটি যে ভাল হইবে না, ইহা তো আর কোন যুক্তি নয়। আর একটি কথা আছে; সমস্ত যুক্তি-বিচার মন দিয়া শুনা বুদ্ধিবৃত্তির একটি ভাল ব্যায়াম হইতে পারে, মনোযোগ সহকারে অদ্ভুত বিষয়ের কথা শুনিলে বুদ্ধির পরিতৃপ্তিও ঘটিতে পারে। কিন্তু কেহ যদি তাহারও পরের কথা

জানিতে চাও, তবে শুধু বক্তৃতা শুনিলে হইবে না। বক্তৃতায় ইহা শিখানো যায় না, কারণ ইহা জীবন-গঠনের কথা। আর জীবনই অপরের ভিতর জীবন সঞ্চার করিতে পারে। তোমাদের ভিতর যদি কেহ ইহা শিখিতে সত্যই কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকো, তাহা হইলে পরম আনন্দের সহিত আমি তাহাকে সাহায্য করিব।

আত্মানুসন্ধান বা আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিত্তি

পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দ কদাচিৎ বিতর্কমূলক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে একবার ঐরূপ এক আলোচনায় তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিচার্য বিষয় ছিল—'আত্ম-বস্তু কি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের যোগ্য?' বিতর্কের প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি মন্তব্য শুনিয়াছিলেন, যাহা পাশ্চাত্যখণ্ডে সেই প্রথমই তিনি শ্রবণ করেন নাই; প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন:

একটি প্রসঙ্গে আমি মন্তব্য করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মুসলমানধর্মাবলম্বিগণ স্ত্রীজাতির কোন আত্মা আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন না—এইপ্রকার যে উক্তি এখানে আমাদের নিকট করা হইয়াছে, তাহা ভ্রান্ত। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই ভ্রান্তি বহু দিনের এবং তাঁহারা এই ভ্রমটি ধরিয়া রাখিতে পছন্দ করেন বলিয়া মনে হয়। মানুষের প্রকৃতির ইহা একটি অদ্ভুত ধারা যে, সে যাহাদিগকে পছন্দ করে না, তাহাদের সম্বন্ধে এমন কিছু প্রচার করিতে চায়, যাহা খুবই খারাপ। কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, আমি মুসলমান নই, কিন্তু উক্ত ধর্ম সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল এবং আমি দেখিয়াছি, কোরানে এমন একটিও উক্তি নাই, যাহার অর্থ নারীর আত্মা নাই; বস্তুতঃ কোরান বলে, নারীর আত্মা আছে।

আত্মা সম্বন্ধে যে-সকল বিষয় আজ আলোচিত হইল, সে-সম্পর্কে আমার এখানে বলিবার মতো বিশেষ কিছু নাই, কারণ প্রথমেই প্রশ্ন উঠে—আত্মিক বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া চলে কি না। আপনারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিতে কি বুঝেন? প্রথমতঃ প্রত্যেক বিষয়কে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয় দিক হইতে দেখা আবশ্যক। যে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের সহিত আমরা খুবই পরিচিত, এবং আমরা যেগুলি খুবই পড়িয়াছি, ঐগুলির কথাই ধরা যাক। ঐগুলি সম্বন্ধেও কি ইহা সত্য যে, ঐ দুই বিদ্যার অতি সাধারণ বিষয়গুলির পরীক্ষণও জগতের যে-কোন ব্যক্তি অনুধাবন করিতে

পারে? একটি মূর্খ চাষাকে ধরিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ প্রদর্শন করুন; সে উহার কি বুঝিবে? কিছুই না। কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ বুঝিবার মতো অবস্থায় উপনীত হইবার আগে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তাহার পূর্বে সে এই-সব কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ইহা এই ব্যাপারে একটি প্রচণ্ড অসুবিধা। যদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ অর্থে ইহাই বুঝিতে হয় যে, কতগুলি তথ্যকে এমন সাধারণ স্তরে নামাইয়া আনা হইবে যে, ঐগুলি সকল মানুষের পক্ষে সমভাবে গ্রহণীয় হইবে, ঐগুলির অনুভব বিশ্বজনীন হইবে, তাহা হইলে কোনও বিষয়ে এইরূপ কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ সম্ভব,—আমি ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। তাহাই যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের যত বিশ্ববিদ্যালয় এবং যত শিক্ষাব্যবস্থা আছে, সবই বৃথা হইত। যদি শুধু মানুষজন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া বৈজ্ঞানিক সকল বিষয়ই আমরা বুঝিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি কেন? এত অধ্যয়ন-অনুশীলনই বা কেন? এ-সকলের তো কোন মূল্যই নাই। সুতরাং আমরা বর্তমানে যে স্তরে আছি, জটিল বিষয়সমূহ সেখানে নামাইয়া আনাকেই যদি বিজ্ঞানসম্মত প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়, তবে এ-কথা শ্রবণমাত্র নির্বিচারে বলা চলে যে, তাহা এক অসম্ভব ব্যাপার। অতঃপর আমরা যে অর্থ ধরিতেছি, তাহাই নির্ভুল হওয়া উচিত। তাহা হইল এই যে, কতগুলি জটিলতর তত্ত্ব প্রমাণের জন্য অপর কতগুলি জটিল তত্ত্বের অবতারণা আবশ্যক। এ জগতে কতগুলি অধিকতর জটিল, দুরূহ বিষয় আছে, যেগুলি আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প জটিল বিষয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকি এবং হয়তো এই উপায়ে উক্ত বিষয়সমূহের নিকটতর জ্ঞান লাভ করি; এইরূপে ক্রমে এগুলিকে আমাদের বর্তমান সাধারণ জ্ঞানের স্তরে নামাইয়া আনা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিও অত্যন্ত জটিল ও যত্নসাপেক্ষ এবং ইহার জন্যও বিশেষ অনুশীলন প্রয়োজন, প্রভূত পরিমাণ শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং এ-সম্পর্কে আমি এইটুকুই বলিতে চাই যে, আধ্যাত্মিক বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাইতে হইলে শুধু যে বিষয়ের দিক হইতেই সম্পূর্ণ তথ্য-প্রমাণাদির প্রয়োজন আছে, তাহা নয়; যাহারা এ প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের দিক হইতেও যথেষ্ট সাধনার প্রয়োজন। এই-সব শর্ত পূর্ণ হইলেই কোন ঘটনাবিশেষ সম্বন্ধে আমাদের সম্মুখে যখন প্রমাণ বা অপ্রমাণ উপস্থাপিত হইবে, তখন আমরা হাঁ বা না বলিতে পারিব। কিন্তু

তৎপূর্বে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী অথবা যে-সকল ঘটনার বিবরণ ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও প্রমাণ করা অতি দুরূহ বলিয়াই মনে হয়।

অতঃপর স্বপ্ন হইতে ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে, এই জাতীয় যে-সকল ব্যাখ্যা অতি অল্প চিন্তার ফলে প্রসূত হইয়াছে, সেগুলির প্রসঙ্গে আসিতেছি। যাঁহারা এই-সকল ব্যাখ্যা অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিবেন—এই ধরনের অভিমত কেবল অসার কল্পনামাত্র। ধর্ম স্বপ্ন হইতে উদ্ভূত—এই মত যদিও অতি সহজভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তথাপি এইরূপ কল্পনা করার কোন হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না। ঐরূপ হইলে অতি সহজেই অজ্ঞেয়বাদীর মত গ্রহণ করা চলিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ-বিষয়টির অত সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এমন কি আধুনিককালেও নিত্য নূতন অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। এইগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে হইবে, কেবল হইবে কেন, এ পর্যন্ত অনেক অনুসন্ধান হইয়া আসিতেছে। অন্ধ বলে—সূর্য নাই। তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, সূর্য সত্যই নাই। বহু বৎসর পূর্বেই এই-সব ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে। কত কত জাতি সমগ্রভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া নিজেদিগকে স্নায়ুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্যকলাপ আবিষ্কারের উপযুক্ত যন্ত্র করিয়া তুলিবার সাধনায় নিযুক্ত রাখিয়াছে। তাহাদের আবিষ্কৃত তথ্য-প্রমাণাদি বহু যুগ পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, এ-সকল বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য কত মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সে-সকল দেশে এমন অনেক নরনারী আজও বর্তমান আছেন, যাঁহারা এই ঘটনারাশির জীবন্ত প্রমাণ। অবশ্য আমি স্বীকার করি, এক্ষেত্রে প্রচুর ভণ্ডামি আছে এবং ইহার মধ্যে প্রতারণা ও মিথ্যা অনেক পরিমাণে বর্তমান। কিন্তু এ-সব কোন্ ক্ষেত্রে নাই? যে-কোন একটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ই ধরা যাক না কেন; সন্দেহাতীত সত্য বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কিংবা সাধারণে বিশ্বাস করিতে পারেন, এইপ্রকার তত্ত্ব মাত্র দুই-তিনটিই আছে, অবশিষ্ট সবই শূন্যগর্ভ কল্পনা। অজ্ঞেয়বাদী নিজের অবিশ্বাস্য বিষয়ের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা প্রয়োগ করিতে চান, নিজের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাহাই প্রয়োগ করিয়া দেখুন না। দেখিবেন—তাহার অর্ধেক

ভিত্তিমূলসহ ধসিয়া পড়িবে। আমরা অনুমান-কল্পনার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। আমরা যে অবস্থায় আছি, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, মানবাত্মার ইহাই স্বাভাবিক প্রগতি। একদিকে অজ্ঞেয়বাদী, অপরদিকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসু অনুসন্ধানী—এ উভয়বৃত্তি-সম্পন্ন হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এই উভয়ের মধ্যে একটিকে আমাদের নির্বাচন করিয়া লইতে হয়। এইজন্য আমাদের নিজ সীমার ঊর্ধ্বে যাওয়া প্রয়োজন, যাহা অজ্ঞাত বলিয়া প্রতিভাত; তাহা জানিবার জন্য কঠিন প্রয়াস করিতে হইবে, এবং এ সংগ্রাম অপ্রতিহতভাবে চলা চাই।

অতএব আমি—বক্তা অপেক্ষা এক পদ অগ্রসর হইয়া এই মত উপস্থাপিত করিতেছি যে, প্রেতাত্মাদের নিকট হইতে শব্দ অবলম্বনে সাড়া পাওয়া, কিংবা টেবিলে আঘাতের শব্দ শোনা প্রভৃতি যে-সব ঘটনাকে ছেলেখেলা বলে, অথবা অপরের চিন্তা জানিতে পারা প্রভৃতি যে-সব শক্তি আমি বালকদের মধ্যেও দেখিয়াছি, কেবল এই-সকল সামান্য সামান্য ব্যাপারই নয়, পরন্তু যে-সকল ঘটনাকে পূর্ববর্তী বক্তা উচ্চতর অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—কিন্তু যাহাকে আমি মনেরই অতি-চেতন অভিজ্ঞতা বলিতে চাহিতেছি—সেই-সকলের অধিকাংশই হইতেছে প্রকৃত মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার প্রথম সোপান মাত্র। প্রথমেই আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত—মন সত্যই সেই ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে কিনা। আমার ব্যাখ্যা অবশ্য উক্ত বক্তার ব্যাখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইবে; তথাপি পরস্পরের ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ ঠিক করিয়া লইলে হয়তো আমরা উভয়েই একমত হইতে পারিব। আমাদের সম্মুখে যে ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান, তাহা সম্পূর্ণরূপে মানবানুভূতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুর পরেও সম্প্রতি যে প্রকার চেতনা আছে, তাহা থাকে কিনা—এ প্রশ্নের উপর খুব বেশী কিছু নির্ভর করে না। সত্তার সহিত অনুভূতি যে সব সময় থাকিবেই—এমন কোন কথা নাই। আমার নিজের এবং আমাদের সকলেরই শরীর সম্পর্কে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহার খুব অল্প অংশেরই সম্বন্ধে আমরা সচেতন এবং ইহার অধিকাংশ সম্পর্কেই আমরা অচেতন। তবু শরীরের অস্তিত্ব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নিজ মস্তিষ্ক সম্পর্কে কেহই সচেতন নয়। আমি আমার মস্তিষ্ক কখনই দেখি নাই, এবং ইহার সম্পর্কে

আমি কোন সময়েই সচেতন নই। তথাপি আমি জানি, মস্তিষ্ক আছে। অতএব এইরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা অনুভূতির জন্য লালায়িত; বস্তুতঃ আমরা এমন কিছুরই অস্তিত্বের জন্য আগ্রহান্বিত, যাহা এই স্থূল জড়বস্তু হইতে ভিন্ন এবং ইহা অতি সত্য যে, এই জ্ঞান আমরা এই জীবনেই লাভ করিতে পারি, এই জ্ঞান ইতিপূর্বে অনেকেই লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহারা ইহার সত্যতা ঠিক তেমনিভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যেভাবে কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

এ-সকল বিষয় আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে। উপস্থিত সকলকে আমি আর একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এ-কথা মনে রাখা ভাল যে, আমরা প্রায়ই এ-সকল ব্যাপারে প্রতারিত হই। কোন ব্যক্তি হয়তো আমাদের সম্মুখে এমন একটি ব্যাপারের প্রমাণ উপস্থিত করিলেন, যাহা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অসাধারণ, কিন্তু আমরা তাহা এই যুক্তি অবলম্বনে অস্বীকার করিলাম যে, আমরা উহা সত্য বলিয়া অনুধাবন করিতে পারিতেছি না। অনেক ক্ষেত্রেই উপস্থাপিত বিষয় সত্য নাও হইতে পারে, কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা সেই-সকল প্রমাণ অনুধাবন করিবার উপযুক্ত কি না এবং আমরা আমাদের দেহমনকে ঐ-সকল আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কারের উপযুক্ত আধাররূপে প্রস্তুত করিয়াছি কি না, তাহা বিবেচনা করিতে ভুলিয়া যাই।

রাজযোগের লক্ষ্য

ধর্মের ধ্যান-ধারণার দিকটিই যোগের লক্ষ্য, নৈতিক দিকটি নয়, যদিও কার্যকালে নীতিবিষয়ক আলোচনা কিছুটা আসিয়াই পড়ে। ভগবানের বাণী বলিয়া যাহা পরিচিত, শুধু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া জগতের নরনারীর মন সত্য সম্বন্ধে আরও অধিক অনুসন্ধানপরায়ণ হয়। তাহারা নিজে কিছু সত্য উপলব্ধি করতে চায়। ধর্মের বাস্তবতা নির্ভর করে একমাত্র উপলব্ধির উপর। মনের অতিচেতন ভূমি হইতেই অধিকাংশ আধ্যাত্মিক সত্য আহরণ করিতে হয়। বিশেষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা দাবি করেন, তাঁহারা যে ভূমিতে উঠিয়াছিলেন, সেই ভূমিতে আমাদেরও উঠিতে হইবে; সেখানে উঠিয়া আমরা যদি একই ধরনের অনুভূতি লাভ করি, তাহা হইলেই আমাদের কাছে সেগুলি সত্য হইয়া দাঁড়াইল। অপরে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সবই আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি; যাহা একবার ঘটিয়াছে, পুনর্বার তাহা ঘটিতে পারে; ঘটিতে পারে নয়, একই পরিবেশে আবার তাহা ঘটিতে বাধ্য। এই অতিচেতন অবস্থায় কিভাবে পৌঁছাইতে হয়, রাজযোগ তাহা শিক্ষা দেয়। সব বড় বড় ধর্মই কোন না কোন ভাবে এই অতিচেতন অবস্থাকে স্বীকার করে; কিন্তু ভারতে ধর্মের এই দিকটির উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। প্রথমাবস্থায় কয়েকটি বাহ্য প্রক্রিয়া এ অবস্থা-লাভের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে; কিন্তু শুধু এই ধরনের বাহ্য প্রক্রিয়া অবলম্বনে কখনও বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। নির্দিষ্ট আসন, নির্দিষ্ট প্রণালীতে শ্বাস-ক্রিয়া ইত্যাদির সাহায্যে মন শান্ত ও একাগ্র হয়; কিন্তু এগুলির অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতা এবং ভগবান্-লাভের বা সত্যোপলব্ধির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই-ই। স্থির হইয়া বসিয়া একটি ভাবের উপর মন নিবিষ্ট করিবার ও মনকে সেখানে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে গেলেই অধিকাংশ লোক অনুভব করিবে যে, উহাতে সফল হইবার জন্য বাহিরের কিছু সহায়তার প্রয়োজন আছে। মনকে ধীরে ধীরে এবং যথানিয়মে বশে আনিতে হয়। ধীর, নিরবচ্ছিন্ন এবং অধ্যবসায়যুক্ত সাধনসহায়ে ইচ্ছাশক্তিকে পরিপুষ্ট করিতে হয়। ইহা ছেলেখেলা নয়, একদিন চেষ্টা করিয়া পরদিন

ছাড়িয়া দিবার মতো খেয়ালও নয়। সারা জীবনের কাজ এটি; আর যে লক্ষ্য-লাভের জন্য এ প্রচেষ্টা, তাহা পাইবার জন্য যত মূল্যই আমাদিগকে দিতে হউক না কেন, সে মূল্য উহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; কারণ আমাদের লক্ষ্য হইল ভগবৎসত্তার সঙ্গে পূর্ণ একত্বানুভূতি। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি থাকিলে, এবং ঐ লক্ষ্যে আমরা পৌঁছিতে পারি—এ বোধ থাকিলে তাহা লাভের জন্য কোন মূল্যকেই আর অত্যধিক বলিয়া মনে হইতে পারে না।

একাগ্রতা

১৯০০ খৃঃ ১৬ই মার্চ স্যান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে ওয়াশিংটন হলে প্রদত্ত। সাঙ্কেতিক লিপিকার ও অনুলেখিকা আইডা আনসেল যেখানে স্বামীজীর কথা ধরিতে পারেন নাই, সেখানে কয়েকটি বিন্দুচিহ্ন ··· দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বন্ধনীর ( ) মধ্যকার শব্দ বা বাক্যগুলি স্বামীজীর নিজের নয়, ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য অনুলেখিকা কর্তৃক নিবদ্ধ। মূল ইংরেজী বক্তৃতাটি হলিউড বেদান্ত কেন্দ্রের মুখপত্র 'Vedanta and the West' পত্রিকার ১১১তম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

বহির্জগতের অথবা অন্তর্জগতের যাবতীয় জ্ঞানই আমরা একটি মাত্র উপায়ে লাভ করি—উহা মনঃসংযোগ। কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যই জানা সম্ভবপর হয় না, যদি সেই বিষয়ে আমরা মন একাগ্র করিতে না পারি। জ্যোতির্বিদ্ দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে মনঃসংযোগ করেন,···এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। মনের রহস্য জানিতে হইলেও এই একই উপায় অবলম্বনীয়। মন একাগ্র করিয়া উহাকে নিজেরই উপর ঘুরাইয়া ধরিতে হইবে। এই জগতে এক মনের সঙ্গে অপর মনের পার্থক্য শুধু একাগ্রতার তারতম্যেই। দুইজনের মধ্যে যাহার একাগ্রতা বেশী, সেই অধিক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ।

অতীত ও বর্তমান সকল মহাপুরুষের জীবনেই একাগ্রতার এই বিপুল প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগকেই 'প্রতিভাশালী' বলা হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রের মতে দৃঢ় প্রচেষ্টা থাকিলে আমরা সকলেই প্রতিভাবান্ হইতে পারি। কেহ কেহ হয়তো অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়া এই পৃথিবীতে আসেন এবং হয়তো জীবনের কর্তব্যগুলি কিছু দ্রুতগতিতেই সম্পন্ন করেন। ইহা আমরা সকলেই করিতে পারি। ঐ শক্তি সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। মনকে জানিবার জন্য উহাকে কিভাবে একাগ্র করা যায়, তাহাই বর্তমান বক্তৃতার বিষয়বস্তু। যোগিগণ মনঃসংযমের যে-সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আজ রাত্রে ঐগুলির কয়েকটির কিছু পরিচয় দিতেছি।

অবশ্য—মনের একাগ্রতা নানাভাবে আসিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে একাগ্রতা আসিতে পারে। সুমধুর সঙ্গীতশ্রবণে কাহারও কাহারও মন শান্ত হইয়া যায়; কেহ কেহ আবার একাগ্র হয় কোন সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া।···এরূপ লোকও আছে, যাহারা তীক্ষ্ণ লোহার কাঁটার আসনে শুইয়া

বা ধারাল ছুড়িগুলির উপর বসিয়া মনের একাগ্রতা আনিয়া থাকে। এগুলি সাধারণ নিয়ম নয়, এই প্রণালী খুবই অবৈজ্ঞানিক। মনকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত করাই বিজ্ঞান-সম্মত উপায়।

কেহ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া মন একমুখী করে। শারীরিক ক্লেশই তাহাকে ঈপ্সিত একাগ্রতা লাভ করাইতেছে। কিন্তু এ-সবই অস্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক কর্তৃক এ-সম্বন্ধে কতকগুলি সর্বজনীন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শরীর আমাদের জন্য যে গণ্ডি সৃষ্টি করিয়াছে, উহা অতিক্রম করিয়া মনের অতিচেতন অবস্থায় পৌঁছানোই আমাদের লক্ষ্য। চিত্তশুদ্ধির সহায়ক বলিয়াই যোগীর নিকট নীতিশাস্ত্রের মূল্য। মন যত পবিত্র হইবে, উহা সংযত করাও তত সহজ হইবে। মনে যে-কোন চিন্তা উঠুক না কেন, মন উহা ধারণ বা গ্রহণ করিয়া বাহিরের কর্মে রূপায়িত করে। যে-মন যত স্থূল, উহাকে বশ করা ততই কঠিন। কোন ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র কলুষিত হইলে তাহার পক্ষে মন স্থির করিয়া মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন করা কখনও সম্ভব নয়। প্রথম প্রথম হয়তো সে কিছু মনঃসংযম করিতে পারিল, কিছু সফলতাও আসিতে পারে, হয়তো বা একটু দূরশ্রবণশক্তি লাভ হইল…কিন্তু এই শক্তিগুলিও তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। মুশকিল এই যে, অনেক ক্ষেত্রে যে-সকল অসাধারণ শক্তি তাহার আয়ত্তে আসিয়াছিল, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ঐগুলি কোন নিয়মিত বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-প্রণালীর মাধ্যমে অর্জিত হয় নাই। যাহারা যাদুবলে সর্প বশীভূত করে, তাহাদের প্রাণ যায় সর্পাঘাতেই।…কেহ যদি কোন অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকে তো সে পরিণামে ঐ শক্তির কবলে পড়িয়াই বিনষ্ট হইবে। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক নানাবিধ উপায়ে অলৌকিক শক্তি লাভ করে। তাহাদের অধিকাংশ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে আবার অপ্রকৃতিস্থ হইয়া আত্মহত্যা করে।

মনঃসংযমের অনুশীলন—বিজ্ঞানসম্মত, ধীর, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ ভাবে শিক্ষা করা উচিত। প্রথম প্রয়োজন সুনীতিপরায়ণ হওয়া। এইরূপ ব্যক্তি দেবতাদের নামাইয়া আনিতে চান, এবং দেবতারাও মর্ত্যধামে নামিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করেন। আমাদের মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের সারকথা হইল সম্পূর্ণভাবে সুনীতিপরায়ণ হওয়া। একটু ভাবিয়া দেখ দেখি—ইহার

অর্থ কি? কাহারও কোন অনিষ্ট না করা, পূর্ণ পবিত্রতা, ও কঠোরতা এইগুলি একান্ত আবশ্যক। একবার ভাবিয়া দেখ—কাহারও মধ্যে যদি এই-সব গুণের পূর্ণ সমাবেশ হয় তো ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি চাই, বলো দেখি? যদি কেহ কোন জীবের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরভাবশূন্য হন…(তাঁহার সমক্ষে) প্রাণিবর্গ হিংসা ত্যাগ করিবে। যোগমার্গের আচার্যগণ সুকঠিন নিয়মাবলী সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন।…(সেগুলি পালন না করিলে কেহই যোগী হইতে পারিবে না,) যেমন দানশীল না হইলে কেহ দাতা আখ্যা লাভ করিতে পারে না।…

তোমরা বিশ্বাস করিবে কি—আমি এমন একজন যোগী পুরুষ[১] দেখিয়াছি, যিনি ছিলেন গুহাবাসী, এবং সেই গুহাতে বিষধর সর্প ও ভেক তাঁহার সঙ্গেই একত্র বাস করিত? তিনি কখন কখন দিনের পর দিন মাসের পর মাস উপবাসে কাটাইবার পর গুহার বাহিরে আসিতেন। সর্বদাই চুপচাপ থাকিতেন। একদিন একটা চোর আসিল।…সে তাঁহার আশ্রমে চুরি করিতে আসিয়াছিল, সাধুকে দেখিয়াই সে ভীত হইয়া চুরি-করা জিনিসের পোঁটলাটি ফেলিয়া পলাইল। সাধু পোঁটলাটি তুলিয়া লইয়া পিছনে পিছনে অনেক দূর দ্রুত দৌড়াইয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইলেন; শেষে তাহার পদপ্রান্তে পোঁটলাটি ফেলিয়া দিয়া করজোড়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার অনিচ্ছাকৃত ব্যাঘাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অতি কাতরভাবে জিনিসগুলি লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'এগুলি আমার নয়, তোমার।'

আমার বৃদ্ধ আচার্যদেব বলিতেন, 'ফুল ফুটলে মৌমাছি আপনিই এসে জোটে।' এরূপ লোক এখনও আছেন। তাঁহাদের কথা বলার প্রয়োজন হয় না।…যখন মানুষ অন্তরের অন্তস্তলে পবিত্র হইয়া যায়, হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ঘৃণার ভাব থাকে না, তখন সকল প্রাণীই (তাঁহার সম্মুখে) হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ করে। পবিত্রতার ক্ষেত্রেও এই একই কথা। মানুষের সহিত আচরণের জন্য এগুলি আবশ্যক।…সকলকেই ভালবাসিতে হইবে।… অপরের দোষত্রুটি দেখিয়া বেড়ানো তো আমাদের কাজ নয়। উহাতে

---

[১] গাজীপুরের পওহারী বাবা

কোন উপকার হয় না। এমনকি, ঐগুলির সম্বন্ধে আমরা চিন্তাও যেন না করি। সৎ চিন্তা করাই আমাদের উচিত। দোষের বিচার করিবার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সৎ হওয়াই আমাদের কর্তব্য।

হয়তো মিস অমুক আসিয়া এখানে হাজির; বলিলেন, 'আমি যোগসাধনা ক'রব।' বিশবার তিনি নিজের অভিপ্রায়ের কথা অপরের কাছে বলিয়া বেড়াইলেন। হয়তো ৫০ দিন ধ্যান অভ্যাস করিলেন। পরে বলিলেন, 'এই ধর্মে কিছুই নেই; আমি সেধে দেখেছি, পেলাম না তো কিছুই।'

(ধর্মজীবনের) ভিত্তিই সেখানে নাই। ধার্মিক হইতে হইলে এই পূর্ণ নৈতিকতার বনিয়াদ (একান্ত আবশ্যক)। ইহাই কঠিন কথা।...

আমাদের দেশে নিরামিষভোজী সম্প্রদায়সমূহ আছে। ইহারা প্রত্যূষে পিপীলিকার জন্য সেরের পর সের চিনি মাটিতে ছড়াইয়া দেয়। একটি গল্প শোনা যায়, একবার এই সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি পিঁপড়াদের চিনি দিতেছিল, এমন সময় একজন আসিয়া পিঁপড়াগুলি মাড়াইয়া ফেলে। 'হতভাগা, তুই প্রাণিহত্যা করলি!' বলিয়া প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে এমন এক ঘুষি মারে যে, লোকটি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

বাহ্য পবিত্রতা অত্যন্ত সহজসাধ্য, এবং সারা জগৎ (উহার) দিকেই ছুটিয়া চলিতেছে। কোন বিশেষ পরিচ্ছদই যদি নৈতিকতার পরিমাপক হয়, তবে যে-কোন মূর্খই তো তাহা পরিধান করিতে পারে। কিন্তু মন লইয়াই যখন সংগ্রাম, তখন উহা কঠিন ব্যাপার। শুধু বাহিরের কৃত্রিম জিনিস লইয়া যাহারা থাকে, তাহারা নিজে নিজেই এত ধার্মিক বনিয়া উঠে! মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যীশুখ্রীষ্টের প্রতি আমার খুব ভক্তি ছিল। (একবার বাইবেলে বিবাহভোজের বিষয়টি পড়ি।) অমনি বই বন্ধ করিয়া বলিতে থাকি, 'অহো, তিনি মদ ও মাংস খেয়েছিলেন! তবে তিনি কখনও সাধু পুরুষ হ'তে পারেন না।'

প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য সব সময়েই যেন আমাদের নজর এড়াইয়া যায়। সামান্য বেশভূষা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার! মূর্খেরাও তো উহা দেখিতে পারে। কিন্তু অশন-বসনের বাহিরে দৃষ্টি যায় কয়জনের? হৃদয়ের শিক্ষাই আমাদের কাম্য।...ভারতে একশ্রেণীর লোককে কখন কখন দিনে বিশ-বার স্নান করিতে দেখা যায়, তাহারা নিজেদের খুব পবিত্র

মনে করে। আবার কাহাকেও স্পর্শ করিতে পর্যন্ত তাহারা কুণ্ঠিত হয়। ...স্থূল ব্যাপার, বাহ্য আচার মাত্র! (শুধু স্নান করিয়াই যদি পবিত্র হওয়া যাইত) তবে তো মৎস্যকুলই সর্বাপেক্ষা পবিত্র প্রাণী।

স্নান, পোশাক, খাদ্যবিচার প্রভৃতির প্রকৃত মূল্য তখনই, যখন এগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপূরক হয়।...আধ্যাত্মিকতার স্থান প্রথমে, এগুলি সহায়কমাত্র। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যদি না থাকে, তবে যতই ঘাসপাতা খাওয়া যাক না কেন, কোনই কল্যাণ নাই। ঠিকমত বুঝিলে এগুলি জীবনে অগ্রগতির পথে সাহায্য করে, নচেৎ উন্নতির পরিপন্থী হয়।

এজন্যই এই বিষয়গুলি বুঝাইয়া বলিতেছি। প্রথমতঃ সকল ধর্মেই অজ্ঞলোকদের হাতে পড়িয়া সবকিছুরই অবনতি হয়। বোতলে কর্পূর ছিল, সমস্তটাই উবিয়া গেল—এখন শূন্য বোতলটি লইয়াই কাড়াকাড়ি।

আর একটি কথা।...(আধ্যাত্মিকতার) লেশমাত্রও থাকে না, যখন লোকে বলিতে আরম্ভ করে, 'আমারটাই ভাল, তোমার যা কিছু সবই মন্দ।' মতবাদ ও বাহিরের অনুষ্ঠানগুলি লইয়াই বিবাদ, আত্মায় বা শাশ্বত সত্যে কখনও বিরোধ নাই। বৌদ্ধগণ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া গৌরবময় ধর্মপ্রচার চালাইয়াছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে এই আধ্যাত্মিকতা উবিয়া গেল। ...(খ্রীষ্টধর্মেও এইরূপ।) তারপর যখন কেহ স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট যাইতে এবং তাঁহার স্বরূপ জানিতে চায় না, তখন কলহের সূত্রপাত হয়—এক ঈশ্বরে তিনটি ভাব, না ত্রিত্বভাবে এক ঈশ্বর! স্বয়ং ভগবানের নিকটে পৌঁছিয়া আমাদিগকে জানিতে হইবে—তিনি 'একে তিন, না তিনে এক'।

এই প্রসঙ্গের পর এখন আসনের কথা। মনঃসংযোগের চেষ্টায় কোন একটি আসনের প্রয়োজন। যিনি যেভাবে সহজে বসিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে উহাই উপযুক্ত আসন। মেরুদণ্ড সরল ও সহজভাবে রাখাই নিয়ম। মেরুদণ্ড শরীরের ভার বহিবার জন্য নয়।...আসন সম্বন্ধে এইটুকু স্মরণীয়—যে আসনে মেরুদণ্ডকে শরীরের ভারমুক্ত করিয়া সহজ ও সরলভাবে রাখা যায়, সে-আসনেই বসো।

ইহার পর (প্রাণায়ামের)...শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম। ইহার উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে।...যাহা বলিতেছি, তাহা ভারতের কোন-সম্প্রদায়-

বিশেষ হইতে সংগৃহীত একটা শিক্ষা নয়। ইহা সর্বজনীন সত্য। যেমন এই দেশে তোমরা ছেলেমেয়েদের কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রার্থনা শিক্ষা দাও, (ভারতবর্ষে) বালকবালিকাদের সম্মুখে তেমনি কতিপয় বাস্তব তথ্য ধরা হয়…।

দু-একটি প্রার্থনা ব্যতীত ধর্মের কোন মতবাদ ভারতের শিশুদিগের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় না। পরে তাহারা নিজেরাই তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া এমন কাহারও অন্বেষণ করে, যাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করিতে পারা যায়। অনেকের কাছে ঘুরিতে-ঘুরিতে অবশেষে একদিন উপযুক্ত পথ-প্রদর্শকের সন্ধান পাইয়া বলে, 'ইনিই আমার গুরু!' তখন তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে। আমি যদি বিবাহিত হই, আমার স্ত্রী অন্য একজনকে গুরু গ্রহণ করিতে পারে, আমার পুত্র অন্য কাহাকেও গুরু করিতে পারে, এবং দীক্ষার কথা কেবল আমার এবং আমার গুরুর মধ্যেই সর্বদা গুপ্ত থাকে। স্ত্রীর সাধনপ্রণালী স্বামীর জানার প্রয়োজন নাই। স্বামী তাঁহার স্ত্রীর সাধন-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করেন না, কেন-না ইহা সুবিদিত যে, নিজের সাধনপ্রণালী কেহ কখনও বলিবে না। ইহা যে-কোন গুরু ও শিষ্যের জানা আছে,…অনেক সময় দেখা যায়, যাহা একজনের নিকট হাস্যাস্পদ, তাহাই হয়তো অপরের অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।…প্রত্যেকেই নিজের বোঝা বহিতেছে; যাহার মনটি যেভাবে গঠিত, সেইভাবেই তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। সাধক, গুরু এবং ইষ্টের সম্বন্ধটি ব্যক্তিগত। কিন্তু এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে, যেগুলি সকল আচার্যই উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রাণায়াম ও ধ্যান সর্বজনীন। ইহাই হইল ভারতীয় উপাসনা-প্রণালী।

গঙ্গার তীরে আমরা দেখিতে পাইব—কত নরনারী ও বালক-বালিকা প্রাণায়াম ও পরে ধ্যান (অভ্যাস) করিতেছে। অবশ্য ইহা ছাড়া তাহাদের সাংসারিক আরও অনেক কিছু করণীয় আছে বলিয়া বেশী সময় তাহারা প্রাণায়ামাদিতে দিতে পারে না। কিন্তু যাহারা ইহাকেই জীবনের প্রধান অনুশীলনরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা নানা প্রণালী অভ্যাস করে। চুরাশি প্রকার পৃথক্ পৃথক্ আসন আছে। যাহারা কোন অভিজ্ঞ গুরুর নির্দেশে চলে, তাহারা শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে।

ইহার পরেই আসে 'ধারণা' (একাগ্রতা)।...মনকে দেহের কতকগুলি স্থানবিশেষে ধরিয়া রাখার নাম ধারণা।

হিন্দু বালক-বালিকা...দীক্ষা গ্রহণ করে। সে গুরুর নিকট হইতে একটি মন্ত্র পায়। ইহাকে বীজমন্ত্র বলে। গুরু এই মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের গুরুর নিকট হইতে। এইভাবে মন্ত্রগুলি গুরুপরম্পরায় শিষ্যের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। 'ওঁ' এইরূপ একটি বীজমন্ত্র। প্রত্যেক বীজেরই গভীর অর্থ আছে। এই অর্থ গোপনে রাখা হয়, লিখিয়া কেহ কখনও প্রকাশ করেন না। গুরুর কাছে কানে শুনিয়া মন্ত্র লওয়াই রীতি, লিখিয়া নয়। মন্ত্র লাভ করিয়া শিষ্য উহাকে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান করে এবং উহার ধ্যান করিতে থাকে।

আমার জীবনের এক সময়ে আমিও ঐভাবে উপাসনা করিয়াছি। বর্ষাকালে একটানা চার মাস ধরিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের পর গঙ্গাস্নান ও আর্দ্র বস্ত্রে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জপ করিতাম। পরে কিছু খাইতাম, সামান্য ভাত বা অন্য কিছু। বর্ষাকালে এইরূপ চাতুর্মাস্য।

মানুষের সামর্থ্যে জগতে অপ্রাপ্য বলিয়া কিছুই নাই—ভারতীয় মনের ইহাই বিশ্বাস। এই দেশে যদি কাহারও ধনাকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তাহাকে কর্ম করিয়া অর্থোপার্জন করিতে দেখা যায়। ভারতে কিন্তু এমন লোকও আছে, যে বিশ্বাস করে—মন্ত্রশক্তির দ্বারা অর্থলাভ সম্ভব। তাই সেখানে দেখা যাইবে যে, ধনাকাঙ্ক্ষী হয়তো বৃক্ষতলে বসিয়া মন্ত্রের মাধ্যমে ধন কামনা করিতেছে। (চিন্তার) শক্তিতে সব কিছু তাহার নিকট আসিতে বাধ্য। এখানে তোমরা যে ধন উপার্জন কর, ইহারও প্রণালী একই প্রকার। তোমরা ধনোপার্জনের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর।

কতগুলি সম্প্রদায় আছে, তাঁহাদিগকে বলা হয় হঠযোগী।...তাঁহারা বলেন মৃত্যুর হাত হইতে শরীরটিকে রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ।...তাঁহাদের সমস্ত সাধন শরীর-সম্বন্ধীয়। দ্বাদশ বৎসরের সাধন! সেইজন্য অল্প বয়স হইতে আরম্ভ না করিলে ইহা আয়ত্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।... হঠযোগীদের মধ্যে একটি অদ্ভুত প্রথার প্রচলন আছে; হঠযোগী যখন প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তখন তাহাকে নির্জন অরণ্যে একাকী ঠিক চল্লিশ দিন আসিয়া গুরুনির্দেশিত ক্রিয়াগুলি একে একে যথারীতি অভ্যাস করিতে হয় এবং শিক্ষণীয় সমস্ত কিছুই এই সময়ের মধ্যে শিখিয়া লইতে হয়।...

কলিকাতায় এক ব্যক্তি ৫০০ বৎসর বাঁচিয়া আছে বলিয়া দাবি করে। সকলেই আমাকে বলিয়াছে যে, তাহাদের পিতামহেরাও এই লোকটিকে দেখিয়াছিল।...তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কুড়ি মাইল করিয়া বেড়ান। ইহাকে ভ্রমণ না বলিয়া দৌড়ানো বলাই ভাল। তারপর কোন জলাশয়ে গিয়া আপাদমস্তক কাদা মাখেন। কিছুক্ষণ বাদে আবার জলে ডুব দেন, আবার কাদা মাখেন।...এই-সবের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। (লোকে বলে সাপও দুইশত বৎসর জীবিত থাকে।) সম্ভবতঃ লোকটি খুব বৃদ্ধ, কারণ আমি ১৪ বৎসর ভারত ভ্রমণ করিয়াছি এবং যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই প্রত্যেকে তাহার কথা জানে দেখিয়াছি। লোকটি সারা জীবনই ভ্রমণ করিয়া কাটাইতেছে।...(হঠযোগী) ৮০ ইঞ্চি লম্বা রবার গিলিয়া ফেলিয়া আবার মুখ দিয়া বাহির করিতে পারে। হঠযোগীকে দৈনিক চার বার শরীরের ভিতরের ও বাহিরের প্রতিটি অঙ্গ ধুইতে হয়।

প্রাচীরগুলিও তো সহস্র সহস্র বৎসর অটুট থাকিতে পারে।...তাহাতে হয়ই বা কি? এত দীর্ঘায়ু হওয়ার কামনা আমার নাই। 'এক দিনের বিপর্যয়রাশি মানুষকে কতই না ব্যস্ত করিয়া তোলে!' সর্বপ্রকার ভ্রান্তি ও দোষত্রুটিতে পূর্ণ একটি ক্ষুদ্র শরীরই যথেষ্ট।

অন্যান্য সম্প্রদায় আছে...। তাহারা তোমাদিগকে সঞ্জীবনী সুরা একফোঁটা দেয় এবং উহা খাইয়া তোমাদের যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকে।...কত যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে—সকলের বিষয় বলিতে গেলে মাসের পর মাস লাগিবে। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সব এই দিকে (জড়-জগতের মধ্যেই)। প্রতিদিন এক-একটি নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি...।

ঐ-সকল সম্প্রদায়ের শক্তির উৎস মন। মনকে বশীভূত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। মন একাগ্র করিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। তাঁহারা বলেন, দেহের ভিতর মেরুদণ্ডের কতকগুলি স্থানে বা স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে মন স্থির রাখিতে পারিলে যোগী দেহের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারেন। যোগীর পক্ষে শান্তিলাভের প্রধান বিঘ্ন ও উচ্চতম আদর্শের পরিপন্থী হইল এই দেহ। সেইজন্য তিনি চান দেহকে বশীভূত করিতে এবং ভৃত্যবৎ কাজে লাগাইতে।

এইবার ধ্যানের কথা। ধ্যানই সর্বোচ্চ অবস্থা।...যখন (মনে) সংশয় থাকে, তখন উহার অবস্থা উন্নত নয়। ধ্যানই মনের উচ্চ অবস্থা। উন্নত মন বিষয়সমূহ দেখে বটে, কিন্তু কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলে না। যতক্ষণ আমার দুঃখের অনুভূতি আছে, ততক্ষণ আমি শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধ করিয়া ফেলিয়াছি। যখন সুখ বা আনন্দ বোধ করি, আমি দেহের সহিত মিশিয়া গিয়াছি। কিন্তু সুখ দুঃখ দুই-ই যখন সমভাবে দেখিবার ক্ষমতা জন্মে, তখনই হয় উচ্চ অবস্থা।...ধ্যানমাত্রই সাক্ষাৎ অতিচেতন-বোধ। পূর্ণ মনঃসংযমে জীবাত্মা স্থূল শরীরের বন্ধন হইতে যথার্থই মুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপের জ্ঞানলাভ করে। তখন জীবাত্মা যাহা চায়, তাহাই পায়। জ্ঞান ও শক্তি তো সেখানে পূর্ব হইতেই আছে। জীবাত্মা শক্তিহীন জড়ের সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলিয়া কাঁদিয়া মরে, হায় হায় করে। নশ্বর বস্তুসমূহের সহিত জীবাত্মা নিজেকে মিশাইয়া ফেলে।...কিন্তু যদি সেই মুক্ত আত্মা কোন শক্তি প্রয়োগ করিতে চান, তবে তাহা পাইবেন। পক্ষান্তরে যদি তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতে না চান, তাহা হইলে উহা পাইবেন না। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরই হইয়া যান। এইরূপ মুক্ত পুরুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁহার আর জন্মমৃত্যু নাই। তিনি চিরমুক্ত।

একাগ্রতা ও শ্বাস-ক্রিয়া

মন একাগ্র করিবার ক্ষমতার তারতম্যই মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য। যে-কোন কাজে সাফল্যের মূলে আছে এই একাগ্রতা। একাগ্রতার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে। ইহার ফল প্রতিদিনই আমাদের চোখে পড়ে। সঙ্গীত, কলাবিদ্যা প্রভৃতিতে আমাদের যে উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব, তাহা এই একাগ্রতা-প্রসূত। একাগ্রতার ক্ষমতা পশুদের একরকম নাই বলিলেই চলে। যাঁহারা পশুদের শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে এই কারণে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। পশুকে যাহা শিখানো হয়, তাহা সে ক্রমাগত ভুলিয়া যায়; কোন বিষয়ে একসঙ্গে অধিকক্ষণ মন দিবার ক্ষমতা তাহার নাই। পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এখানেই—মন একাগ্র করার ক্ষমতা পশুর চেয়ে মানুষের অনেক বেশী। মানুষে মানুষে পার্থক্যের কারণও আবার এই একাগ্রতার তারতম্য। সর্বনিম্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে সর্বোচ্চ স্তরের মানুষের তুলনা করিয়া দেখ, দেখিবে একাগ্রতার মাত্রার বিভিন্নতাই এই পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। পার্থক্য শুধু এইখানেই।

সকলেরই মন সময়ে সময়ে একাগ্র হইয়া যায়। যাহা আমাদের প্রিয়, তাহারই উপর আমরা সকলে মনোনিবেশ করি; আবার যে বিষয়ে মনোনিবেশ করি, তাহাই প্রিয় হইয়া উঠে। এমন মা কি কেহ আছেন, নিজের ছেলের অতিসাধারণ মুখখানিও যিনি ভালবাসেন না? মায়ের কাছে সেই মুখখানিই জগতের সুন্দরতম মুখ। মন সেখানে নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়াই মুখখানি তাঁহার প্রিয় হইয়াছে। সকলেই যদি ঠিক সেই মুখখানির উপর মন বসাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার উপর সকলেরই ভালবাসা জন্মিত; সকলেই ভাবিত, এমন সুন্দর মুখ আর হয় না। যাহা ভালবাসি, তাহারই উপর আমরা মনোনিবেশ করি। সুললিত সঙ্গীত শ্রবণকালে আমাদের মন সেই সঙ্গীতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইতে আমরা মন সরাইয়া লইতে পারি না। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহাতে যাহাদের মন একাগ্র হয়, সাধারণ পর্যায়ের সঙ্গীত তাহাদের ভাল লাগে না। ইহার বিপরীতটিও সত্য। দ্রুত-লয়ের সঙ্গীত শ্রবণমাত্র মন তাহাতে আকৃষ্ট হয়।

ছেলেরা হালকা সঙ্গীত পছন্দ করে, কারণ তাহাতে লয়ের দ্রুততা মনকে বিষয়ান্তরে চলিয়া যাইবার কোন অবকাশই দেয় না। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত জটিলতর, এবং তাহা অনুধাবন করিতে হইলে অধিকতর মানসিক একাগ্রতার প্রয়োজন; সেইজন্যই সাধারণ সঙ্গীত যাহারা ভালবাসে, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত তাহাদের ভাল লাগে না।

এই ধরনের একাগ্রতার সব চেয়ে বড় দোষ হইতেছে এই যে, মন আমাদের আয়ত্তে থাকে না, বরং মনই আমাদের চালিত করে। যেন সম্পূর্ণ বাহিরের কোন বস্তু আমাদের মনটিকে টানিয়া লইয়া যতক্ষণ খুশি নিজের কাছে ধরিয়া রাখে। সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণকালে অথবা মনোরম চিত্রদর্শনকালে আমাদের মন উহাতে দৃঢ়ভাবে লগ্ন হইয়া যায়; মনকে আমরা সেখান হইতে তুলিয়া আনিতে পারি না।

আমি যখন তোমাদের মনোমত কোন বিষয়ে ভাল বক্তৃতা দিই, তখন আমার কথায় তোমাদের মন একাগ্র হয়। তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের মনকে কাড়িয়া আনিয়া আমি তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও উহাকে ঐ প্রসঙ্গের মধ্যে ধরিয়া রাখি। এভাবে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু বিষয়ে মন আকৃষ্ট হইয়া একাগ্র হয়। আমরা তাহাতে বাধা দিতে পারি না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, চেষ্টা করিয়া এই একাগ্রতা বাড়াইয়া তোলা ও ইচ্ছামত তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কি না। যোগীরা বলেন, হাঁ, তাহা সম্ভব; তাঁহারা বলেন, আমরা মনকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারি। নৈতিক দিক হইতে একাগ্রতার ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলায় বিপদও আছে; কোন বিষয়ে মন একাগ্র করিবার পর ইচ্ছামাত্র সেখান হইতে সে মন তুলিয়া লইতে না পারিলেই বিপদ। এরূপ পরিস্থিতি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। মন তুলিয়া লইবার অক্ষমতাই আমাদের প্রায় সকল দুঃখের কারণ। কাজেই একাগ্রতার শক্তি বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে মন তুলিয়া লইবার শক্তিও বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। বস্তুবিশেষে মনোনিবেশ করিতে শিখিলেই চলিবে না। প্রয়োজন হইলে মুহূর্তের মধ্যে সেখান হইতে মন সরাইয়া লইয়া বিষয়ান্তরে তাহাকে নিবিষ্ট করিতে পারা চাই। এই উভয় ক্ষমতা সমভাবে অর্জন করিয়া চলিলে বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

ইহাই মনের প্রণালীবদ্ধ ক্রমোন্নতি। আমার মতে মনের একাগ্রতা-সাধনই শিক্ষার প্রাণ, শুধু তথ্য সংগ্রহ করা নহে। আবার যদি আমাকে নতুন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত, এবং নিজের ইচ্ছামত আমি যদি তাহা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া মোটেই মাথা ঘামাইতাম না। আমি আমার মনের একাগ্রতা ও নির্লিপ্ততার ক্ষমতাকেই ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া তুলিতাম; তারপর এভাবে গঠিত নিখুঁত যন্ত্রসহায়ে খুশিমত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম। মনকে একাগ্র ও নির্লিপ্ত করিবার ক্ষমতাবর্ধনের শিক্ষা শিশুদের একসঙ্গেই দেওয়া উচিত।

আমার সাধনা বরাবর একমুখী ছিল। ইচ্ছামত মন তুলিয়া লইবার ক্ষমতা অর্জন না করিয়াই আমি একাগ্রতার শক্তি বাড়াইয়া তুলিয়াছিলাম; ইহাই হইয়াছে আমার জীবনে গভীরতম দুঃখভোগের কারণ। এখন আমি খুশিমত মন তুলিয়া লইতে পারি; তবে ইহা শিখিতে হইয়াছে অনেক পরে।

কোন বিষয়ে ইচ্ছামত আমরা নিজেরাই যেন মনোনিবেশ করিতে পারি; বিষয় যেন আমাদের মনকে টানিয়া না লয়। সাধারণতঃ বাধ্য হইয়াই আমরা মনোনিবেশ করি; বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণের প্রভাবে আমাদের মন সেখানে সংলগ্ন হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, আমরা তাহাকে বাধা দিতে পারি না। মনকে সংযত করিতে হইলে, যেখানে ইচ্ছা করিব ঠিক সেখানেই তাহাকে নিবিষ্ট করিতে হইলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন; অন্য কোন উপায়ে তাহা হইবার নয়। ধর্মের অনুশীলনে মনঃসংযম একান্ত প্রয়োজন। এ অনুশীলনে মনকে ঘুরাইয়া মনেরই উপর নিবিষ্ট করিতে হয়।

মনের নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করিতে হয় প্রাণায়াম হইতে। নিয়মিত শ্বাস-ক্রিয়ার ফলে দেহে সমতা আসে; তখন মনকে ধরা সহজ হয়। প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমেই আসন বা দেহসংস্থানের কথা ভাবিতে হয়। যে-কোন ভঙ্গিতে অনায়াসে বসিয়া থাকা যায়, তাহাই উপযুক্ত আসন। মেরুদণ্ড যেন ভারমুক্ত থাকে, দেহের ভার যেন বক্ষ-পঞ্জরের উপর রাখা হয়। কোন স্বকপোলকল্পিত কৌশল অবলম্বনে মন-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিও না, একমাত্র সহজ, সরল শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়াই এ-পথে যথেষ্ট। বিবিধ কঠোর সাধন-সহায়ে মনকে একাগ্র করিতে প্রয়াসী হইলে ভুল করা হইবে। সে-সব করিতে যাইও না।

মন শরীরের উপর কার্য করে, আবার শরীরও মনের উপর ক্রিয়াশীল। উভয়েই পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রত্যেক মানসিক অবস্থার অনুরূপ অবস্থা শরীরে ফুটিয়া উঠে, আবার শরীরের প্রতিটি ক্রিয়ার অনুরূপ ফল প্রকটিত হয় মনের ক্ষেত্রে। শরীর ও মনকে দুটি আলাদা বস্তু বলিয়া ভাবিলেও কোন ক্ষতি নাই, আবার দুটি মিলিয়া একটি-ই শরীর—স্থূল দেহ তাহার স্থূল অংশ, আর মন তাহার সূক্ষ্ম অংশ—এরূপ ভাবিলেও কিছু আসে যায় না। ইহারা পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল। মন প্রতিনিয়ত শরীরে রূপায়িত হইতেছে। মনকে সংযত করিতে হইলে প্রথমে শরীরের দিক হইতে আরম্ভ করা বেশী সহজ। মন অপেক্ষা শরীরের সঙ্গে সংগ্রাম করা অনেক সহজ কাজ।

যে যন্ত্র যত বেশী সূক্ষ্ম, তাহার শক্তিও তত বেশী। মন শরীরের চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম, এবং অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। এজন্য শরীর হইতে আরম্ভ করিলে কাজ সহজ হয়।

প্রাণায়াম হইতেছে এমন একটি বিজ্ঞান, যাহার সাহায্যে শরীর-অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া মনের কাছে পৌঁছানো চলে। এভাবে চলিতে চলিতে শরীরের উপর আধিপত্য আসে, তারপর শরীরের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি আমরা অনুভব করিতে আরম্ভ করি; ক্রমে সূক্ষ্মতর ও গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করি, অবশেষে মনের কাছে গিয়া পৌঁছাই। শরীরের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি অনুভূতিতে আসামাত্র সেগুলি আয়ত্তে আসে। কিছুকাল পরে শরীরের উপর মনের কার্যগুলিও অনুভব করিতে পারিবে। মনের একাংশ যে অপরাংশের উপর কাজ করিতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিবে; এবং মন যে স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে কাজে লাগাইতেছে, তাহাও অনুভব করিবে; কারণ মনই স্নায়ুমণ্ডলীর নিয়ন্তা ও অধীশ্বর। বিভিন্ন স্নায়ুস্পন্দন অবলম্বনে মনই ক্রিয়া করিতেছে, ইহাও টের পাইবে।

নিয়মিত প্রাণায়ামের ফলে—প্রথমে স্থূল শরীরের উপর ও পরে সূক্ষ্মশরীরের উপর আধিপত্য বিস্তারের ফলে মনকে আয়ত্তে আনা যায়।

প্রাণায়ামের প্রথম ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও খুবই স্বাস্থ্যকর। ইহার অভ্যাসে আর কিছু না হউক স্বাস্থ্যলাভ ও শরীরের সাধারণ অবস্থার উন্নতি হইবেই। বাকী প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে ও সাবধানে করিতে হয়।

প্রাণায়াম

প্রাণায়াম বলিতে কি বুঝায়, প্রথমে আমরা তাহা একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব। বিশ্বের যত শক্তি আছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে তাহার সমষ্টিকে 'প্রাণ' বলে। দার্শনিকদের মতে এই সৃষ্টি তরঙ্গাকারে চলে; তরঙ্গ উঠিল, আবার পড়িয়া মিলাইয়া গেল, যেন গলিয়া বিলীন হইল। আবার এই-সব বৈচিত্র্য লইয়া উঠিয়া আসিল, এবং ধীরে ধীরে আবার চলিয়া গেল। এইভাবে পর পর ওঠা-নামা চলিতে থাকে। জড়পদার্থ ও শক্তির মিলনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে; সংস্কৃতশাস্ত্রাভিজ্ঞ দার্শনিকেরা বলেন: কঠিন, তরল প্রভৃতি যে-সব বস্তুকে আমরা জড়পদার্থ বলিয়া থাকি, সে-সবই একটি মূল জড়পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তাঁহারা এই মূল পদার্থের নাম দিয়াছেন 'আকাশ' (ইথার); আর প্রকৃতির যে-সব শক্তি আমরা দেখিতে পাই, সেগুলিও যে মূল শক্তির অভিব্যক্তি, তাহার নাম দিয়াছেন 'প্রাণ'। আকাশের উপর এই প্রাণের কার্যের ফলেই বিশ্বসৃষ্টি হয়, এবং একটি সুনির্দিষ্ট কালের অন্তে—অর্থাৎ কল্পান্তে—একটি সৃষ্টির বিরতি-সময় আসে। একটি সৃষ্টিপ্রবাহের পর কিছুক্ষণ বিরতি আসিয়া থাকে—সব কাজেই এই নিয়ম। যখন প্রলয়কাল আসে, তখন পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারকারাজি প্রভৃতির সহিত এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইতে হইতে আবার আকাশে পরিণত হয়; সমস্তই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া আকাশে লীন হয়। মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ, গতি, চিন্তা প্রভৃতি শরীরের ও মনের যাবতীয় শক্তিও বিকীর্ণ হইতে হইতে আবার মূল 'প্রাণে' লীন হইয়া যায়। ইহা হইতেই আমরা প্রাণায়ামের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই আকাশ যেমন সর্বত্রই আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং আমরা তাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছি, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান সব কিছুই আকাশ হইতে সৃষ্ট; হ্রদের জলে ভাসমান বরফের টুকরার মতো আমরাও এই ইথারে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। বরফের টুকরাগুলি হ্রদের জল দিয়াই গঠিত, আবার সেই জলেই ভাসিয়া বেড়ায়। বিশ্বের সমুদয় পদার্থও তেমনি 'আকাশ' দিয়া গঠিত এবং 'আকাশে'র সমুদ্রেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণের অর্থাৎ বল ও শক্তির বিশাল সমুদ্রও ঠিক এই-

ভাবেই আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। এই প্রাণসহায়েই আমাদের শ্বাস-ক্রিয়া চলে, দেহে রক্তচলাচল হয়; এই প্রাণই স্নায়ুর ও মাংসপেশীর শক্তিরূপে এবং মস্তিষ্কের চিন্তারূপে প্রকাশ পায়। সব শক্তিই যেমন একই প্রাণের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, তেমনি সব পদার্থই একই আকাশের বিবিধ অভিব্যক্তি। স্থূলের কারণ সব সময়েই সূক্ষ্মের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কোন রসায়নবিদ্ যখন একখণ্ড স্থূল মিশ্রপদার্থ লইয়া তাহার বিশ্লেষণ করিতে থাকেন, তখন তিনি বস্তুতঃ এই স্থূল পদার্থটির উপাদান সূক্ষ্ম পদার্থের অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত হন। আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানের বেলাও ঠিক একই কথা; স্থূলের ব্যাখ্যা সূক্ষ্মের মধ্যে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল তাহার কার্য। যে স্থূল বিশ্বকে আমরা দেখি, অনুভব করি, স্পর্শ করি, তাহার কারণ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহার পিছনে চিন্তার মধ্যে। চিন্তার কারণ ও ব্যাখ্যা আবার পাওয়া যায় আরও পিছনে। আমাদের এই মনুষ্যদেহেও হাত নাড়া, কথা বলা প্রভৃতি স্থূল কার্যগুলিই আগে আমাদের নজরে পড়ে; কিন্তু এই কার্যগুলির কারণ কোথায়? দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর স্নায়ুগুলিই তাহার কারণ; সে স্নায়ুর ক্রিয়া মোটেই আমাদের অনুভবে আসে না; তাহা এত সূক্ষ্ম যে, আমরা তাহা দেখিতে পাই না, স্পর্শ করিতে পারি না; তাহা ইন্দ্রিয়ের ধরা-ছোঁয়ার একেবারে বাহিরে। তবু আমরা জানি যে, দেহের এই-সব স্থূল কার্যের কারণ এই স্নায়ুরই ক্রিয়া। এই স্নায়ুর গতিবিধি আবার সেই-সব সূক্ষ্মতর স্পন্দনের কার্য, যাহাকে আমরা চিন্তা বলিয়া থাকি। চিন্তার কারণ আবার তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর একটি বস্তু, যাহাকে আত্মা—মানুষের চরম সত্তা অথবা জীবাত্মা বলে। নিজেকে ঠিকমত জানিতে হইলে আগে স্বীয় অনুভবশক্তিকে সূক্ষ্ম করিয়া তুলিতে হইবে। এমন কোন অনুবীক্ষণযন্ত্র বা ঐ-জাতীয় কোন যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা দ্বারা আমাদের অন্তরের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলিকে দেখা যায়। এই-জাতীয় উপায় অবলম্বনে কখনও সেগুলি দেখা সম্ভব নয়। তাই যোগী এমন একটি বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেন, যাহা তাঁহাকে নিজের মন পর্যবেক্ষণ করিবার উপযোগী যন্ত্র গঠন করিয়া দেয়; সে যন্ত্রটি মনের মধ্যেই রহিয়াছে। সূক্ষ্ম জিনিস ধরিবার মতো এমন শক্তি মন পায়, যাহা কোন যন্ত্রের দ্বারা কোনকালে পাওয়া সম্ভব নয়।

এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভবশক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে স্থূল হইতে শুরু করিতে হইবে। শক্তি যত সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর হইয়া আসিবে, ততই আমরা নিজ প্রকৃতির গভীরতর—গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিব। প্রথমে আমরা সমস্ত স্থূল ক্রিয়াগুলি ধরিতে পারিব, তারপর চিন্তার সূক্ষ্ম গতিবিধি-গুলি; চিন্তা উদিত হইবার পূর্বেই তাহার সন্ধান পাইব, উহার গতি কোন্ দিকে এবং কোথায় তাহার শেষ, সব কিছুই ধরিতে পারিব। যেমন ধর, সাধারণ মনে একটি চিন্তা উঠিল। মন জানে না—চিন্তাটি উৎপন্ন হইল কিভাবে বা কোথায়। মন যেন সমুদ্রের মতো এক তরঙ্গের উৎস। কিন্তু তরঙ্গটি দেখিতে পাইলেও মানুষ বুঝিতে পারে না—কি করিয়া উহা হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইল, কোথায় তাহার জন্ম, কোথায় বা তাহার বিলয়। তরঙ্গটি দেখা ছাড়া বেশী আর কিছুর সন্ধান সে জানে না। কিন্তু অনুভব-শক্তি যখন সূক্ষ্ম হইয়া আসে, তখন উপরের স্তরে উঠিয়া আসার বহু পূর্বেই তরঙ্গটি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইতে পারি; আবার তরঙ্গটি অদৃশ্য হইবার পরও বহুদূর পর্যন্ত উহার গতিপথের অনুসরণ করিতে পারি। তখনই যথার্থ মনস্তত্ত্ব বলিতে যাহা বোঝায়, তাহা বোধগম্য হয়। লোকে আজকাল নানা বিষয়ে মাথা ঘামাইয়া বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতেছে; কিন্তু এ-সব গ্রন্থ মানুষকে শুধু ভুল পথে পরিচালিত করে। কারণ নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিবার মত ক্ষমতা না থাকায় গ্রন্থ-রচয়িতারা যে-সব বিষয় সম্বন্ধে কখনও স্বয়ং কোন জ্ঞানলাভ করেন নাই, অনুমানমাত্র সহায়ে সেই-সব বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিজ্ঞানমাত্রকেই তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, এবং সে তথ্যগুলিরও পর্যবেক্ষণ ও সামান্যীকরণ অবশ্য প্রয়োজন। সামান্যীকরণ করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ তথ্য যতক্ষণ না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ করিবার আর থাকেই বা কি? কাজেই সাধারণ তত্ত্বে পৌঁছাইবার সব প্রচেষ্টা নির্ভর করিতেছে—যে বিষয়গুলির আমরা সামান্যীকরণ করিতে চাই, সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিবার উপর। একজন একটি কল্পিত মত গড়িয়া তুলিল, তারপর সেই মতকে ভিত্তি করিয়া অনুমানের পর অনুমান চলিতে লাগিল; শেষে সমগ্র গ্রন্থটি শুধু অনুমানে ভরিয়া গেল, যাহার কোনটিরই কোন অর্থ হয় না। রাজযোগ-বিজ্ঞান বলে, সর্বপ্রথম নিজের মন সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য তোমাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে; নিজের

মন বিশ্লেষণ করিয়া, মনের সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তি বাড়াইয়া তুলিয়া মনের ভিতর কি ঘটিতেছে, নিজে তাহা দেখিয়া এ-কাজ করা যায়; তথ্যগুলি সংগৃহীত হইবার পর সেগুলির সামান্যীকরণ কর। তাহা হইলেই যথার্থ মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান আয়ত্ত হইবে। আগেই বলিয়াছি, কোন সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষে পৌঁছাইতে হইলে প্রথম তাহার স্থূল অংশের সাহায্য লইতে হইবে। বাহিরে যাহা কর্মপ্রবাহের আকারে প্রকাশ পায়, তাহাই সেই স্থূলতর অংশ। সেটিকে ধরিয়া যদি আমরা ক্রমে আরও অগ্রসর হই, তাহা হইলে ক্রমে সূক্ষ্মতর হইতে হইতে অবশেষে উহা সূক্ষ্মতম হইয়া যাইবে। এইরূপে স্থির হয়, আমাদের এই শরীর বা তাহার ভিতরে যাহা কিছু আছে, সেগুলি স্বতন্ত্র বস্তু নহে; বস্তুতঃ উহারা সূক্ষ্ম হইতে স্থূল পর্যন্ত বিস্তৃত একই শৃঙ্খলের পরস্পর-সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রন্থি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সবগুলিকে লইয়া তুমি একটি গোটা মানুষ; এই দেহটি অন্তরের একটি বাহ্য অভিব্যক্তি বা একটি কঠিন আবরণ; বহির্ভাগটি স্থূলতর, অন্তর্ভাগটি সূক্ষ্মতর; এমনি ভাবে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দিকে চলিতে চলিতে অবশেষে আত্মার কাছে গিয়া পৌঁছিবে। এভাবে আত্মার সন্ধান পাইলে তখন বোঝা যায়, এই আত্মাই সবকিছু অভিব্যক্ত করিতেছেন; এই আত্মাই মন হইয়াছেন, শরীর হইয়াছেন; আত্মা ছাড়া অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই নাই, বাকী যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা বিভিন্ন স্তরে আত্মারই ক্রমবর্ধমান স্থূলাকারে অভিব্যক্তি মাত্র। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়—এই বিশ্ব জুড়িয়া একটি স্থূল অভিব্যক্তি রহিয়াছে, আর তাহার পিছনে রহিয়াছে সূক্ষ্ম স্পন্দন, যাহাকে ঈশ্বরেচ্ছা বলা যায়। তাহারও পশ্চাতে আমরা এক অখণ্ড পরমাত্মার সন্ধান পাই এবং তখনই বুঝিতে পারি, সেই পরমাত্মাই ঈশ্বর ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং ইহাও অনুভূত হয় যে, জগৎ ঈশ্বর এবং পরমাত্মা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন নহেন; ফলতঃ তাহারা একটি মৌলিক সত্তারই বিভিন্ন অভিব্যক্ত অবস্থা। প্রাণায়ামের ফলেই এ সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। শরীরের অভ্যন্তরে এই যে-সব সূক্ষ্ম স্পন্দন চলিতেছে, তাহারা শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এই শ্বাসক্রিয়াকে যদি আমরা আয়ত্তে আনিতে পারি, এবং তাহাকে ইচ্ছানুরূপ পরিচালিত ও নিয়মিত করিতে পারি, তাহা হইলে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর গতিগুলিকেও ধরিতে পারিব, এবং এইরূপে এই শ্বাসক্রিয়াকে ধরিয়াই মনোরাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করিব।

পূর্বপাঠে তোমাদের যে প্রাথমিক শ্বাসক্রিয়া শিখাইয়াছিলাম, তাহা একটি সাময়িক অভ্যাস মাত্র। এই শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলির মধ্যে কয়েকটি আবার খুব কঠিন; আমি অবশ্য কঠিন উপায়গুলি বাদ দিয়া বলিবার চেষ্টা করিব, কারণ কঠিনতর সাধনগুলির জন্ম আহার ও অন্যান্য বিষয়ে অনেকখানি সংযমের প্রয়োজন, আর তাহা তোমাদের অধিকাংশের পক্ষেই সম্ভব নয়। কাজেই সহজ ও মন্থরতর সাধনগুলি সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিব। এই শ্বাসক্রিয়ার তিনটি অঙ্গ আছে। প্রথম অঙ্গ হইতেছে নিঃশ্বাস টানিয়া লওয়া, যাহার সংস্কৃত নাম 'পূরক' বা পূর্ণীকরণ; দ্বিতীয় অঙ্গের নাম 'কুম্ভক' বা ধারণ, অর্থাৎ শ্বাসযন্ত্র বায়ুপূর্ণ করিয়া ঐ বায়ু বাহির হইতে না দেওয়া; তৃতীয় অঙ্গের নাম 'রেচক' অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ। যে প্রথম সাধনটি আজ আমি তোমাদিগকে শিখাইতে চাই, তাহা হইতেছে সহজভাবে শ্বাস টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ দম বন্ধ রাখিয়া পরে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করা। তারপর প্রাণায়ামের আর একটি উচ্চতর ধাপ আছে, কিন্তু আজ আর সে-বিষয়ে কিছু বলিব না; কারণ তাহার সব কথা তোমরা মনে রাখিতে পারিবে না; উহা বড়ই জটিল। শ্বাসক্রিয়ার এই তিনটি অঙ্গ মিলিয়া একটি 'প্রাণায়াম' হয়। এই শ্বাসক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কারণ নিয়ন্ত্রিত না হইলে উহার অভ্যাসে বিপদ আছে। সেজন্য সংখ্যার সাহায্যে ইহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়; তোমাদিগকে সর্বনিম্ন সংখ্যা লইয়াই আরম্ভ করিতে বলিব। চার সেকেণ্ড ধরিয়া শ্বাস গ্রহণ কর, তারপর আট সেকেণ্ড কাল দম বন্ধ করিয়া রাখো; পরে আবার চার সেকেণ্ড ধরিয়া ধীরে ধীরে উহা পরিত্যাগ কর।* আবার প্রথম হইতে শুরু কর; এভাবে সকালে চারবার ও সন্ধ্যায় চারবার করিয়া অভ্যাস করিবে। আর একটি কথা আছে। এক-দুই-তিন বা এই ধরনের অর্থহীন সংখ্যা গণনা অপেক্ষা নিজের কাছে পবিত্র বলিয়া মনে হয়, এমন কোন শব্দ জপের সহিত শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ করা ভাল। যেমন আমাদের দেশে 'ওঁ' নামক একটি সাঙ্কেতিক শব্দ আছে। 'ওঁ' ঈশ্বরের প্রতীক। এক, দুই, তিন, চার —এই-সব সংখ্যার পরিবর্তে 'ওঁ' জপ করিলে উদ্দেশ্য ভালভাবেই সিদ্ধ হয়।

* সংখ্যা যখন দুই-আট-চার হয়, তখন এই প্রক্রিয়াই কঠিনতর হইয়া উঠে। গুরুর উপদেশ লইয়া এগুলি অভ্যাস করিতে হয়।

আর একটি কথা। প্রথমে বাম নাক দিয়া নিশ্বাস টানিয়া ডান নাক দিয়া উহা ছাড়িতে হইবে, পরে ডান নাক দিয়া টানিয়া বাম নাক দিয়া ছাড়িতে হইবে। তারপর আবার পদ্ধতিটি পালটাইয়া লও; এইভাবে পরপর চল। প্রথমেই চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে খুশিমত শুধু ইচ্ছাশক্তি সহায়ে যে-কোন নাক দিয়া শ্বাসক্রিয়া করিবার শক্তির অধিকারী হইতে পারো। কিছুদিন পর ইহা সহজ হইয়া পড়িবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, এখনই তোমাদের সে শক্তি নাই। কাজেই এক নাক দিয়া শ্বাসগ্রহণ করার সময় অপর নাকটি আঙুল দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে, এবং কুম্ভকের সময় উভয় নাসারন্ধ্রই এভাবে বন্ধ করিয়া রাখিবে।

পূর্বে যে দুইটি বিষয় শিখাইয়াছি, উহাও ভুলিলে চলিবে না। প্রথম কথা, দেহ সোজা রাখিবে; দ্বিতীয় কথা, ভাবিবে যে তোমার শরীর-দৃঢ় এবং অটুট—সুস্থ ও সবল। তারপর চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ ছড়াইয়া দিবে, ভাবিবে সারা জগৎ আনন্দে ভরপুর। পরে—যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, তবে প্রার্থনা করিবে। তারপর প্রাণায়াম আরম্ভ করিবে। তোমাদের অনেকেরই মধ্যে হয়তো সর্বাঙ্গে কম্পন, অথবা ভয়জনিত স্নায়বিক অস্থিরতা প্রভৃতি শারীরিক বিকার উপস্থিত হইবে। কাহারও বা কান্না পাইবে, কখনও কখনও মানসিক আবেগোচ্ছ্বাস হইবে। কিন্তু ভয় পাইও না; সাধনাবস্থায় এ-সব আসিয়াই থাকে। কারণ গোটা শরীরটিকে যেন নতুন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে। চিন্তার প্রবাহের জন্য মস্তিষ্কে নূতন নূতন প্রণালী নির্মিত হইবে, যে-সব স্নায়ু সারা জীবনে কখনও কাজে লাগে নাই, সেগুলিও সক্রিয় হইয়া উঠিবে, এবং শরীরেও সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বহু পরিবর্তন-পরম্পরা উপস্থিত হইবে।

ধ্যান

স্বামীজীর এই বক্তৃতাটি ১৯০০ খৃঃ ৩রা এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্যান ফ্রান্সিস্কো শহরে ওয়াশিংটন হলে প্রদত্ত। সাঙ্কেতিক লিপিকার ও অনুলেখিকা—আইডা আনসেল। যেখানে লিপিকার স্বামীজীর কিছু কথা ধরিতে পারেন নাই, সেখানে কয়েকটি বিন্দুচিহ্ন ... দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বন্ধনীর ( ) মধ্যেকার শব্দ বা বাক্য স্বামীজীর নিজের নয়, ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য নিবদ্ধ হইয়াছে। মূল ইংরেজী বক্তৃতাটি হলিউড বেদান্তকেন্দ্রের মুখপত্র Vedanta and the West পত্রিকার ১১২তম সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৫৫) মুদ্রিত হইয়াছে।

সকল ধর্মই 'ধ্যানে'র উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। যোগীরা বলেন, ধ্যানমগ্ন অবস্থাই মনের উচ্চতম অবস্থা। মন যখন বাহিরের বস্তু অনুশীলনে রত থাকে, তখন ইহা সেই বস্তুর সহিত একীভূত হয় এবং নিজেকে হারাইয়া ফেলে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকের উপমায় মানুষের মন যেন একখণ্ড স্ফটিকের মতো—নিকটে যাহাই থাকুক, উহা তাহারই রঙ ধারণ করে। অন্তঃকরণ যাহাই স্পর্শ করে,...তাহারই রঙে উহাকে রঞ্জিত হইতে হয়। ইহাই তো সমস্যা। ইহারই নাম বন্ধন। ঐ রঙ এত তীব্র যে, স্ফটিক নিজেকে বিস্মৃত হইয়া বাহিরের রঙের সহিত একীভূত হয়। মনে কর—একটি স্ফটিকের কাছে একটি লাল ফুল রহিয়াছে; স্ফটিকটি উহার রঙ গ্রহণ করিল এবং নিজের স্বচ্ছ স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে লাল রঙের বলিয়াই ভাবিতে লাগিল। আমাদেরও অবস্থা ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমরাও শরীরের রঙে রঞ্জিত হইয়া আমাদের যথার্থ স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। (এই ভ্রান্তির) অনুগামী সব দুঃখই সেই এক অচেতন শরীর হইতে উদ্ভূত। আমাদের সব ভয়, দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, বিপদ, ভুল, দুর্বলতা, পাপ সেই একমাত্র মহাভ্রান্তি—'আমরা শরীর' এই ভাব হইতেই জাত। ইহাই হইল সাধারণ মানুষের ছবি। সন্নিহিত পুষ্পের বর্ণানুরঞ্জিত স্ফটিকতুল্য এই জীব! কিন্তু স্ফটিক যেমন লাল ফুল নয়, আমরাও তেমনি শরীর নই।

ধ্যানাভ্যাস অনুসরণ করিতে করিতে স্ফটিক নিজের স্বরূপ জানিতে পারে এবং নিজ রঙে রঞ্জিত হয়। অন্যান্য কোন প্রণালী অপেক্ষা ধ্যানই আমাদিগকে সত্যের অধিকতর নিকটে লইয়া যায়।...

ভারতে দুই ব্যক্তির দেখা হইলে (আজকাল) তাঁহারা ইংরেজীতে বলেন, 'কেমন আছেন?' কিন্তু ভারতীয় অভিবাদন হইল, 'আপনি কি স্বস্থ?' যে মুহূর্তে আত্মা ব্যতীত তুমি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিবে, তোমার দুঃখ আসিবার আশঙ্কা আছে। ধ্যান বলিতে আমি ইহাই বুঝি—আত্মার উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা। আত্মা যখন নিজের অনুধ্যানে ব্যাপৃত এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার তখনকার অবস্থাটিই নিশ্চিতরূপে সুস্থতম অবস্থা। ভাবোন্মাদনা, প্রার্থনা প্রভৃতি অপরাপর যে-সব প্রণালী আমাদের রহিয়াছে, সেগুলিরও চরম লক্ষ্য ঐ একই। গভীর আবেগের সময়ে আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করে। যদিও এ আবেগটি হয়তো কোন বহির্বস্তুকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মন সেখানে ধ্যানস্থ।

ধ্যানের তিনটি স্তর। প্রথমটিকে বলা হয় (ধারণা)—একটি বস্তুর উপরে একাগ্রতা-অভ্যাস। এই গ্লাসটির উপর আমার মন একাগ্র করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই গ্লাসটি ছাড়া অপর সকল বিষয় মন হইতে তাড়াইয়া দিয়া শুধু ইহারই উপর মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু মন চঞ্চল।...মন যখন দৃঢ় হয় এবং তত চঞ্চল নয়, তখনই ঐ অবস্থাকে 'ধ্যান' বলা হয়। আবার ইহা অপেক্ষাও একটি উন্নততর অবস্থা আছে, যখন গ্লাসটি ও আমার মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় (সমাধি বা পরিপূর্ণ তন্ময়তা)। তখন মন ও গ্লাসটি অভিন্ন হইয়া যায়। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না। তখন সকল ইন্দ্রিয় কর্মবিরত হয় এবং যে-সকল শক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে ক্রিয়া করে, সেগুলি (মনেতেই কেন্দ্রীভূত হয়)। তখন গ্লাসটি পুরাপুরিভাবে মনঃশক্তির অধীনে আসিয়াছে। ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। যোগিগণের অনুষ্ঠিত ইহা একটি প্রচণ্ড শক্তির খেলা।... ধরা যাক বাহিরের বস্তু বলিয়া কিছু আছে। সে ক্ষেত্রে যাহা বাস্তবিকই আমাদের বাহিরে রহিয়াছে, তাহা—আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা নয়। যে গ্লাসটি আমাদের চোখে ভাসিতেছে, সেটি নিশ্চয়ই আসল বহির্বস্তু নয়। গ্লাস বলিয়া অভিহিত বাহিরের আসল বস্তুটিকে আমি জানি না এবং কখনও জানিতে পারিব না।

কোন কিছু আমার উপর একটি ছাপ রাখিল; তৎক্ষণাৎ আমি আমার প্রতিক্রিয়া জিনিসটির দিকে পাঠাইলাম এবং এই উভয়ের সংযোগের

ফল হইল 'গ্লাস'। বাহিরের দিক হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া—'ক' এবং ভিতর হইতে উত্থিত প্রতিক্রিয়া—'খ'। গ্লাসটি হইল 'ক-খ'। যখন 'ক'-এর দিকে তাকাইতেছ, তখন উহাকে বলিতে পারো 'বহির্জগৎ', আর যখন 'খ' এর দিকে দৃষ্টি দাও, তখন উহা 'অন্তর্জগৎ'।...কোন্‌টি তোমার মন আর কোন্‌টি বাহিরের জগৎ—এই পার্থক্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলে দেখিবে, এরূপ কোন প্রভেদ নাই। জগৎ হইতেছে তুমি এবং আরও কিছুর সমবায়...।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। তুমি একটি হ্রদের শান্ত বুকে কতকগুলি পাথর ছুঁড়িলে। প্রতিটি প্রস্তর নিক্ষেপের পরেই দেখা যায় একটি প্রতিক্রিয়া। প্রস্তরখণ্ডটিকে বেড়িয়া সরোবরের কতকগুলি ছোট ছোট ঢেউ উঠে। এইরূপেই বহির্জগতের বস্তুনিচয় যেন মন-রূপ সরোবরে উপলরাশির মতো নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব আমরা প্রকৃতপক্ষে বাহিরের জিনিস দেখি না...; দেখি শুধু তরঙ্গ...।

মনে উত্থিত তরঙ্গগুলি বাহিরে অনেক কিছু সৃষ্টি করে। আমরা আদর্শবাদ (idealism) ও বাস্তববাদের (realism) গুণসকল আলোচনা করিতেছি না। মানিয়া লইতেছি—বাহিরের জিনিস রহিয়াছে, কিন্তু যাহা আমরা দেখি, তাহা বাহিরে অবস্থিত বস্তু হইতে ভিন্ন, কেন-না আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা বহিঃস্থ বস্তু ও আমাদের নিজেদের সত্তার একটি সমবায়।

মনে কর—আমার প্রদত্ত যাহা কিছু, তাহা গ্লাসটি হইতে উঠাইয়া লইলাম। কি অবশিষ্ট রহিল? প্রায় কিছুই নয়। গ্লাসটি অদৃশ্য হইবে। যদি আমি আমার প্রদত্ত যাহা কিছু, তাহা এই টেবিলটি হইতে সরাইয়া লই, টেবিলের আর কি থাকিবে? নিশ্চয়ই এই টেবিলটি থাকিবে না, কারণ ইহা উৎপন্ন হইয়াছিল বহির্বস্তু ও আমার ভিতর হইতে প্রদত্ত কিছু—এই দুই লইয়া। (প্রস্তরখণ্ড) যখনই নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, হ্রদ বেচারীকে তখনই উহার চারিপাশে তরঙ্গ তুলিতে হইবে। যে-কোন উত্তেজনার জন্য মনকে তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেই হইবে। মনে কর...আমরা যেন মন বশীভূত করিতে পারি। তৎক্ষণাৎ আমরা মনের প্রভু হইব। আমরা বাহিরের ঘটনাগুলিকে আমাদের যাহা কিছু দেয়, তাহা দিতে অস্বীকার করিলাম...। আমি যদি আমার অংশ না দিই, বাহিরের ঘটনা থামিতে বাধ্য।

অনবরতই তুমি এই বন্ধন সৃষ্টি করিতেছ। কিরূপে? তোমার নিজের অংশ দিয়া। আমরা সকলেই নিজেদের শৃঙ্খল গড়িয়া বন্ধন রচনা করিতেছি…। যখন বহির্বস্তু ও আমার মধ্যে অভিন্ন বোধ করার ভাব চলিয়া যাইবে, তখন আমি আমার (দেয়) ভাগটি তুলিয়া লইতে পারিব এবং বস্তুও বিলুপ্ত হইবে। তখন আমি বলিব, 'এখানে এই গ্লাসটি রহিয়াছে,' আর আমি আমার মনটি উহা হইতে উঠাইয়া লইব, সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটিও অদৃশ্য হইবে…। যদি তুমি তোমার দেয় অংশ উঠাইয়া লইতে সমর্থ হও, তবে জলের উপর দিয়াও তুমি হাঁটিতে পারিবে। জল আর তোমাকে ডুবাইবে কেন? বিষই বা তোমার কি করিবে? আর কোনপ্রকার কষ্টও থাকিবে না। প্রকৃতির প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তুতে তোমার দান অন্ততঃ অর্ধেক এবং প্রকৃতির অর্ধাংশ। যদি তোমার অর্ধভাগ সরাইয়া লওয়া যায় তো দৃশ্যমান বস্তুর বিলুপ্তি ঘটিবে।

…প্রত্যেক কাজেরই সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া আছে…। যদি কোন লোক আমাকে আঘাত করে ও কষ্ট দেয়—ইহা সেই লোকটির কার্য এবং (বেদনা) আমার শরীরের প্রতিক্রিয়া…। মনে কর আমার শরীরের উপর আমার এতটা ক্ষমতা আছে যে, আমি ঐ স্বয়ংচালিত প্রতিক্রিয়াটি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। ঐরূপ শক্তি কি অর্জন করা যায়? ধর্মশাস্ত্র (যোগশাস্ত্র) বলে, যায়…। যদি তুমি অজ্ঞাতসারে হঠাৎ ইহা লাভ কর, তখন বলিয়া থাকো—'অলৌকিক' ঘটনা। আর যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা কর, তখন উহার নাম 'যোগ'।

মানসিক শক্তির দ্বারা লোকের রোগ সারাইতে আমি দেখিয়াছি। উহা 'অলৌকিক কর্মী'র কাজ। আমরা বলি, তিনি প্রার্থনা করিয়া লোককে নীরোগ করেন। (কিন্তু) কেহ বলিবেন, 'না, মোটেই না, ইহা কেবল তাহার মনের শক্তির ফল। লোকটি বৈজ্ঞানিক। তিনি জানেন, তিনি কি করিতেছেন।'

ধ্যানের শক্তি আমাদিগকে সব কিছু দিতে পারে। যদি তুমি প্রকৃতির উপর আধিপত্য চাও, (ইহা ধ্যানের অনুশীলনেই সম্ভব হইবে)। আজকাল বিজ্ঞানের সকল আবিষ্ক্রিয়াও ধ্যানের দ্বারাই হইতেছে। তাঁহারা (বৈজ্ঞানিকগণ) বিষয়বস্তুটি তন্ময়ভাবে অনুধ্যান করিতে থাকেন এবং সব-

কিছু ভুলিয়া যান—এমনকি নিজেদের সত্তা পর্যন্ত, আর তখন মহান্ সত্যটি বিদ্যুৎপ্রভার মতো আবির্ভূত হয়। কেহ কেহ ইহাকে 'অনুপ্রেরণা' বলিয়া ভাবেন। কিন্তু নিঃশ্বাসত্যাগ যেমন আগন্তুক নয় (নিশ্বাস গ্রহণ করিলেই উহার ত্যাগ সম্ভব), সেইরূপ 'অনুপ্রেরণা'ও অকারণ নয়। কোন কিছুই বৃথা পাওয়া যায় নাই।

যীশুখ্রীষ্টের কার্যের মধ্যে আমরা তথাকথিত শ্রেষ্ঠ 'অনুপ্রেরণা' দেখিতে পাই। তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে যুগ যুগ ধরিয়া কঠোর কর্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার 'অনুপ্রেরণা' তাঁহার প্রাক্তন কর্মের—কঠিন শ্রমের ফল…। 'অনুপ্রেরণা' লইয়া ঢাক পিটানো অনর্থক বাক্যব্যয়। যদি তাহাই হইত, তবে ইহা বর্ষাধারার মতো পতিত হইত। যে-কোন চিন্তাধারায় প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণ সাধারণ শিক্ষিত (ও কৃষ্টিসম্পন্ন) জাতিসমূহের মধ্যেই আবির্ভূত হন। প্রত্যাদেশ বলিয়া কিছু নাই।…অনুপ্রেরণা বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহা আর কিছুই নয়,—যে সংস্কারগুলি পূর্ব হইতেই মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে, সেগুলির কার্যপরিণত রূপ অর্থাৎ ফল। একদিন সচকিতে আসে এই ফল! তাঁহাদের অতীত কর্মই ইহার কারণ।

সেখানেও দেখিবে ধ্যানের শক্তি—চিন্তার গভীরতা। ইহারা নিজ নিজ আত্মাকে মন্থন করেন। মহান্ সত্যসমূহ উপরিভাগে আসিয়া প্রতিভাত হয়। অতএব ধ্যানাভ্যাসই জ্ঞানলাভের বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। ধ্যানের শক্তি ব্যতীত জ্ঞান হয় না। ধ্যানশক্তির প্রয়োগে অজ্ঞান, কুসংস্কার ইত্যাদি হইতে আমরা সাময়িকভাবে মুক্ত হইতে পারি, ইহার বেশী নয়। মনে কর, এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছে যে, এই বিষ পান করিলে মৃত্যু হইবে এবং আর এক ব্যক্তি রাত্রে আসিয়া বলিল, 'যাও, বিষ পান কর!' এবং বিষ খাইয়াও আমার মৃত্যু হইল না (যাহা ঘটিল তাহা এই): ধ্যানের ফলে বিষ ও আমার নিজের মধ্যে একত্ববোধ হইতে সাময়িকভাবে আমার মন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। অন্য পক্ষে সাধারণভাবে বিষ পান করিতে গেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

যদি আমি কারণ জানি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাকে ধ্যানের অবস্থায় উন্নীত করি, তবে যে-কোন লোককেই আমি বাঁচাইতে পারি। এই কথা (যোগ)-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু ইহা কতখানি নির্ভুল, তাহার বিচার তোমরাই করিও।

লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে: তোমরা ভারতবাসীরা এ-সব জয় কর না কেন? অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তোমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বদা দাবি কর। তোমরা যোগাভ্যাস কর এবং অন্য কাহারও অপেক্ষা দ্রুত অভ্যাস কর। তোমরা যোগ্যতর। ইহা কার্যে পরিণত কর! তোমরা যদি মহান্ জাতি হইয়া থাকো, তোমাদের যোগপদ্ধতিও মহান্ হওয়া উচিত। সব দেবতাকে তোমাদের বিদায় দিতে হইবে। বড় বড় দার্শনিকদের চিন্তাধারা গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের ঘুমাইতে দাও। তোমরা বিশ্বের অন্যান্যদের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিশু মাত্র। তোমাদের সব কিছু দাবি নিষ্ফল। তোমাদের যদি দাবি থাকে, সাহসের সহিত দাঁড়াও, এবং স্বর্গ বলিতে যাহা কিছু—সব তোমাদের। কস্তুরীমৃগ তাহার অন্তর্নিহিত সৌরভ লইয়া আছে, এবং সে জানে না—কোথা হইতে সৌরভ আসিতেছে। বহুদিন পর সে সেই সৌরভ নিজের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়। এ-সব দেবতা ও অসুর তাহাদের মধ্যে আছে। যুক্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির শক্তিতে জানো যে, তোমার মধ্যেই সব আছে। দেবতা ও কুসংস্কারের আর প্রয়োজন নাই। তোমরা যুক্তিবাদী, যোগী, যথার্থ আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন হইতে চাও।

(আমার উত্তর এই: তোমাদের নিকটও) সব কিছুই জড়। সিংহাসনে সমাসীন ঈশ্বর অপেক্ষা বেশী জড় আর কি হইতে পারে? মূর্তিপূজক গরীব বেচারীকে তো তোমরা ঘৃণা করিতেছ। তার চেয়ে তোমরা বড় নও। আর ধনের পূজারী তোমরাই বা কী! মূর্তিপূজক তাহার দৃষ্টির গোচরীভূত কোন বিশেষ কিছুকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু তোমরা তো সেটুকুও কর না। আত্মার অথবা বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন কিছুর উপাসনা তোমরা কর না! তোমাদের কেবল বাক্যাড়ম্বর। 'ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ!' ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপই। প্রকৃত ভাব ও বিশ্বাস লইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। চৈতন্য কোথায় থাকেন? গাছে? মেঘে? 'আমাদের ঈশ্বর'—এই কথার অর্থ কি? তুমিই তো চৈতন্য। এই মৌলিক বিশ্বাসটিকে কখনই ত্যাগ করিও না। আমি চৈতন্য-স্বরূপ। যোগের সমস্ত কৌশল এবং ধ্যানপ্রণালী আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার জন্য।

এখনই কেন এই সমস্ত বলিতেছি? যে পর্যন্ত না তুমি (ঈশ্বরের) স্থান নির্দেশ করিতে পারিবে, এ-বিষয়ে কিছুই বলিতে পার না। (তাঁহার)

প্রকৃত স্থান ব্যতীত স্বর্গে এবং মর্ত্যের সর্বত্র তুমি তাঁহার অবস্থিতি নির্ণয় করিতেছ। আমিই চেতন প্রাণী, অতএব সমস্ত চেতনার সারভূত চেতনা আমার আত্মাতে অবশ্যই থাকিবে। যাহারা ভাবে ঐ চেতনা অন্য কোথাও আছে, তাহারা মূর্খ। অতএব আমার চেতনাকে এই স্বর্গেই অন্বেষণ করিতে হইবে। অনাদিকাল হইতে যেখানে যত স্বর্গ আছে, সে-সব আমার মধ্যেই। এমন অনেক যোগী ঋষি আছেন, যাঁহারা এই তত্ত্ব জানিয়া 'আবৃত্তচক্ষু' হন এবং নিজেদের আত্মায় সমস্ত চেতনার চেতনাকে দর্শন করেন। ইহাই ধ্যানের পরিধি। ঈশ্বর ও তোমার নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার কর এবং এইরূপে মুক্ত হও।

তোমরা সকলেই জীবনের পিছু পিছু ছুটিয়া চলিয়াছ, আমরা দেখি—ইহা মূর্খতামাত্র। জীবন অপেক্ষা আরও মহত্তর কিছু আছে। পাঞ্চভৌতিক (এই জীবন) নিকৃষ্টতর। কেন আমি বাঁচিবার আশায় ছুটিতে যাইব? জীবন অপেক্ষা আমার স্থান যে অনেক উচ্চে। বাঁচিয়া থাকাই সর্বদা দাসত্ব। আমরা সর্বদাই (অজ্ঞানের সহিত নিজেদের) মিশাইয়া ফেলিতেছি…। সবই দাসত্বের অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল।

তুমি যে কিছু লাভ কর, সে কেবল নিজের দ্বারাই, কেহ অপরকে শিখাইতে পারে না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া (আমরা শিক্ষা করি)…ঐ যে যুবকটি—উহাকে কখনও বিশ্বাস করাইতে পারিবে না যে, জীবনে বিপদ-আপদ আছে। আবার বৃদ্ধকে বুঝাইতে পারিবে না যে, জীবন বিপত্তিহীন, মসৃণ। বৃদ্ধ অনেক দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইহাই পার্থক্য।

ধ্যানের শক্তিদ্বারা এ-সবই ক্রমে ক্রমে আমাদের বশে আনিতে হইবে। আমরা দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছি যে, আত্মা মন ভূত (জড় পদার্থ) প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যের (বাস্তব সত্তা কিছু নাই।)…যাহা বর্তমান, তাহা 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্'। বহু কিছু থাকিতে পারে না। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অর্থ ইহাই। অজ্ঞানের জন্যই বহু দেখি। জ্ঞানে একত্বের উপলব্ধি…। বহুকে একে পরিণত করাই বিজ্ঞান…। সমগ্র বিশ্বের একত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞানের নাম বেদান্ত-বিদ্যা। সমগ্র জগৎ এক। আপাতপ্রতীয়মান বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই 'এক' অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের পক্ষে এখন এই-সকল বৈচিত্র্য রহিয়াছে, আমরা এগুলি দেখিতেছি—অর্থাৎ এগুলিকে আমরা বলি পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ (পাঁচটি মৌলিক পদার্থ)। ইহার পরে রহিয়াছে মনোময় সত্তা, আর আধ্যাত্মিক সত্তা তাহারও পারে। আত্মা এক, মন অন্য, আকাশ অন্য একটি কিছু ইত্যাদি—এরূপ কিন্তু নয়। এ-সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একই সত্তা প্রতীয়মান হইতেছে। ফিরিয়া গেলে কঠিন অবশ্যই তরলে পরিণত হইবে। যেভাবে মৌলিক পদার্থগুলির ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, সেভাবেই আবার তাহাদের ক্রমসঙ্কোচ হইবে। কঠিন পদার্থগুলি তরলাকার ধারণ করিবে, তরল ক্রমে ক্রমে আকাশে পরিণত হইবে। নিখিল জগতের ইহাই কল্পনা—এবং ইহা সর্বজনীন। বাহিরের এই জগৎ এবং সর্বজনীন আত্মা, মন, আকাশ, মরুৎ, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি আছে।

মন সম্বন্ধেও একই কথা। ক্ষুদ্র জগতে বা অন্তর্জগতে আমি ঠিক ঐ এক। আমিই আত্মা, আমিই মন। আমিই আকাশ, বায়ু, তরল ও কঠিন পদার্থ। আমার লক্ষ্য আমার আত্মিক সত্তায় প্রত্যাবর্তন। একটি ক্ষুদ্র জীবনে 'মানুষকে' সমগ্র বিশ্বের জীবন যাপন করিতে হইবে। এরূপে মানুষ এ-জন্মেই মুক্ত হইতে পারে। তাহার নিজের সংক্ষিপ্ত জীবৎকালেই সে বিশ্বজীবন অতিবাহিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে।

আমরা সকলেই সংগ্রাম করি।...যদি আমরা পরম সত্যে পৌঁছিতে না পারি, তবে অন্ততঃ এমন স্থানেও উপনীত হইব, যেখানে এখনকার অপেক্ষা উন্নততর অবস্থাতেই থাকিব।

এই অভ্যাসেরই নাম ধ্যান। (সব কিছুকে সেই চরম সত্য—আত্মাতে পর্যবসিত করা।) কঠিন দ্রবীভূত হইয়া তরলে, তরল বাষ্পে, বাষ্প ব্যোম্ বা আকাশে আর আকাশ মনে রূপান্তরিত হয়। তারপর মনও গলিয়া যাইবে। শুধু থাকিবে আত্মা—সবই আত্মা।

যোগীদের মধ্যে কেহ কেহ দাবি করেন যে, এই শরীর তরল বাষ্প ইত্যাদিতে পরিণত হইবে। তুমি শরীর দ্বারা যাহা খুশি করিতে পারিবে—ইহাকে ছোট করিতে পারো, এমন কি বাষ্পেও পরিণত করিতে পারো, এই দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাতায়াতও সম্ভব হইতে পারে—এই রকম তাঁহারা দাবি করেন। আমার অবশ্যই জানা নাই। আমি কাহাকেও এরূপ করিতে কখনও

দেখি নাই। কিন্তু যোগশাস্ত্রে এই-সব কথা আছে। যোগশাস্ত্রগুলিকে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই।

হয়তো আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই জীবনে ইহা সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলে বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় ইহা প্রতিভাত হয়। কে জানে এখানেই হয়তো কোন প্রাচীন যোগী রহিয়াছেন, যাঁহার মধ্যে সাধনা সম্পূর্ণ করিবার সামান্যই একটু বাকী। অভ্যাস!

একটি চিন্তাধারার মাধ্যমে ধ্যানে পৌছিতে হয়। ভূতপঞ্চকের শুদ্ধীকরণ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয়—এক-একটিকে অপরটির মধ্যে দ্রবীভূত করিয়া স্থূল হইতে পরবর্তী সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মতরে, তাহাও আবার মনে, মনকে পরিশেষে আত্মায় মিশাইয়া দিতে হয়। তখন তোমরাই আত্মস্বরূপ।*

জীবাত্মা সদামুক্ত, সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ। অবশ্য জীবাত্মা ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর অনেক হইতে পারেন না। এই মুক্তাত্মাগণ বিপুল শক্তির আধার প্রায় সর্বশক্তিমান্, (কিন্তু) কেহই ঈশ্বরতুল্য শক্তিমান্ হইতে পারে না। যদি কোন মুক্ত পুরুষ বলেন. 'আমি এই গ্রহটিকে কক্ষচ্যুত করিয়া ইহাকে এই পথ দিয়া পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য করিব' এবং আর একজন মুক্তাত্মা যদি বলেন, 'আমি গ্রহটিকে এই পথে নয়, ঐ পথে চালাইব' (তবে বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি হইবে)।

তোমরা যেন এই ভুল করিও না। যখন আমি ইংরেজীতে বলি, 'আমি ঈশ্বর (God)', তাহার কারণ ইহা অপেক্ষা আর কোন যোগ্যতর শব্দ নাই। সংস্কৃতে 'ঈশ্বর' মানে সচ্চিদানন্দ, জ্ঞান—স্বয়ংপ্রকাশ অনন্ত চৈতন্য। ঈশ্বর অর্থে কোন পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষ নয়। তিনি নৈর্ব্যক্তিক ভূমা।...

আমি কখনও রাম নই, ঈশ্বরের (ঈশ্বরের সাকার ভাবের) সহিত কখনও এক নই, কিন্তু আমি (ব্রহ্মের সহিত—নৈর্ব্যক্তিক সর্বত্র-বিরাজমান

* মৌলিক পদার্থগুলির শুদ্ধীকরণ ভূতশুদ্ধি নামে পরিচিত; ইহা ক্রিয়ামূলক উপাসনার অঙ্গ-বিশেষ। উপাসক অনুভব করিতে চেষ্টা করেন যে, তিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্—এই পঞ্চমহাভূতকে তাহাদের তন্মাত্রাপঞ্চক এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সহিত মনে মিলাইয়া দিতেছেন। মন; বুদ্ধি ও ব্যষ্টি-অহংকারকে লীন করিয়া দেওয়া হয় মহৎ অর্থাৎ বিরাট অহং-এ। প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্ম-শক্তিতে মহৎ লীন হয় এবং প্রকৃতি লীন হয় ব্রহ্ম বা চরম সত্যে। মেরুমজ্জার পাদদেশে মূলাধারে অবস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি উপাসকের চিন্তাধারার মধ্য দিয়া উচ্চতম জ্ঞানকেন্দ্র মস্তিষ্কে সহস্রারে নীত হয়। এই উচ্চতম কেন্দ্রে উপাসক পরমাত্মার সহিত একাত্মতার ধ্যানে নিরত থাকেন।—অনুলেখক।

সত্তার সহিত) এক। এখানে একতাল কাদা রহিয়াছে। এই কাদা দিয়া আমি একটি ছোট ইঁদুর তৈরি করিলাম আর তুমি একটি ক্ষুদ্রকায় হাতি প্রস্তুত করিলে। উভয়ই কাদার। দুইটিকেই ভাঙিয়া ফেল। তাহারা মূলতঃ এক—তাই একই মৃত্তিকায় পরিণত হইল। 'আমি এবং আমার পিতা এক।' (কিন্তু মাটির ইঁদুর আর মাটির হাতি কখনই এক হইতে পারে না।)

কোন জায়গায় আমাকে থামিতে হয়, আমার জ্ঞান অল্প। তুমি হয়তো আমার চেয়ে কিছু বেশী জ্ঞানী, তুমিও একস্থানে থামিয়া যাও। আবার এক আত্মা আছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই ঈশ্বর, যোগাধীশ (স্রষ্টারূপে সগুণ ঈশ্বর)। তখন তিনি সর্বশক্তিমান্ 'ব্যক্তি'। সকল জীবের হৃদয়ে তিনি বাস করেন। তাঁহার শরীর নাই—শরীরের প্রয়োজন হয় না। ধ্যানের অভ্যাস প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু আয়ত্ত করিতে পারো, যোগীন্দ্র ঈশ্বরের ধ্যান করিয়াও তাহা লভ্য। একই বস্তু আবার কোন মহাপুরুষকে, অথবা জীবনের ঐকতানকে ধ্যান করিয়াও লাভ করা যায়। এগুলিকে বিষয়গত ধ্যান বলে। স্বতরাং এইভাবে কয়েকটি বাহ্য বা বিষয়গত বস্তু লইয়া ধ্যান আরম্ভ করিতে হয়। বস্তুগুলি বাহিরেও হইতে পারে, ভিতরেও হইতে পারে। যদি তুমি একটি দীর্ঘ বাক্য গ্রহণ কর, তবে তাহা মোটেই ধ্যান করিতে পারিবে না। ধ্যান মানে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া মনকে ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট করার চেষ্টা। মন সকল চিন্তাতরঙ্গ থামাইয়া দেয় এবং জগৎও থাকে না। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। প্রতিবারেই ধ্যানের দ্বারা তোমার শক্তি বৃদ্ধি হইবে।…আরও একটু বেশী কঠোর পরিশ্রম কর—ধ্যান গভীরতর হইবে। তখন তোমার শরীরের বা অন্য কিছুর বোধ থাকিবে না। এইভাবে একঘণ্টা ধ্যানমগ্ন থাকার পর বাহ্য অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে তোমার মনে হইবে যে, ঐ সময়টুকুতে তুমি জীবনে সর্বাপেক্ষা স্বন্দর শান্তি উপভোগ করিয়াছ। ধ্যানই তোমার শরীরযন্ত্রটিকে বিশ্রাম দেবার একমাত্র উপায়। গভীরতম নিদ্রাতেও ঐরূপ বিশ্রাম পাইতে পার না। গভীরতম নিদ্রাতেও মন লাফাইতে থাকে। কিন্তু (ধ্যানের) ঐ কয়েকটি মিনিটে তোমার মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রায় স্তব্ধ হইয়া যায়। শুধু একটু প্রাণশক্তি মাত্র থাকে। শরীরের জ্ঞান থাকে না। তোমাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেও তুমি টের পাইবে না। ধ্যানে এতই

আনন্দ পাইবে যে, তুমি অত্যন্ত হালকা বোধ করিবে। ধ্যানে আমরা এইরূপ পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকি।

তারপর বিভিন্ন বস্তুর উপরে ধ্যান। মেরুমজ্জার বিভিন্ন কেন্দ্রে ধ্যানের প্রণালী আছে। (যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ বর্তমান। অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী শক্তিপ্রবাহ এই দুই প্রধান পথে গমনাগমন করে।) শূন্যনালী (যাহাকে বলে সুষুম্না) মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যোগীরা বলেন, এই সুষুম্না-পথ সাধারণতঃ রুদ্ধ থাকে, কিন্তু ধ্যানাভ্যাসের ফলে ইহা উন্মুক্ত হয়, (স্নায়বীয়) প্রাণশক্তিপ্রবাহকে (মেরুদণ্ডের নীচে) চালাইয়া দিতে পারিলে কুণ্ডলিনী জাগরিত হয়। জগৎ তখন ভিন্নরূপ ধারণ করে।…(এইরূপে ঐশ্বরিক জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও আত্মজ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে কুণ্ডলিনীর জাগরণ।)

সহস্র সহস্র দেবতা তোমার চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না, কারণ আমাদের জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আমরা কেবল এই বাহিরটাই দেখিতে পারি; ইহাকে বলা যাক 'ক'। আমাদের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আমরা সেই 'ক'-কে দেখি বা উপলব্ধি করি। বাহিরে অবস্থিত ঐ গাছটিকে ধরা যাক। একটি চোর আসিল, সে ঐ মুড়া গাছটিকে কি ভাবিবে? সে দেখিবে—একজন পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া আছে। শিশু উহাকে মনে করিল—একটি প্রকাণ্ড ভূত। একটি যুবক তাহার প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; সে কি দেখিল? নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়তমাকে। কিন্তু এই মুড়া গাছটির তো কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহা যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল। স্বয়ং ঈশ্বরই কেবল আছেন, আমরাই আমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে মানুষ, ধূলি, বোবা, দুঃখী ইত্যাদি-রূপে দেখিয়া থাকি।

যাহারা একইভাবে গঠিত, তাহারা স্বভাবতঃ একই শ্রেণীভুক্ত হয় এবং একই জগতে বাস করে। অন্যভাবে বলিলে বলা যায়—তোমরা একই স্থানে বাস কর। সমস্ত স্বর্গ এবং সমস্ত নরক এখানেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—কতকগুলি বড় বৃত্তের আকারে সমতল ক্ষেত্রসমূহ যেন পরস্পর কয়েকটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে…। এই সমতল ভূমির একটি বৃত্তে অবস্থিত আমরা আর একটি সমতলের (বৃত্তকে) কোন একটি বিন্দুতে স্পর্শ করিতে

পারি। মন যদি কেন্দ্রে পৌছে, তবে সমস্ত স্তরেরই তোমার জ্ঞান হইতে থাকিবে। ধ্যানের সময় কখন কখন তুমি যদি অন্য ভূমি স্পর্শ কর, তখন অন্য জগতের প্রাণী, অশরীরী আত্মা এবং আরও কত কিছুর সংস্পর্শে আসিতে পার।

ধ্যানের শক্তি দ্বারাই এই-সব লোকে যাইতে পারো। এই শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত করে। যদি তুমি পাঁচদিন ঠিক ঠিক ধ্যান অভ্যাস কর, এই (জ্ঞান-) কেন্দ্রগুলির ভিতর হইতে একপ্রকার 'বেদনা' অনুভব করিবে—তোমার শ্রবণশক্তি সূক্ষ্মতর হইতেছে।...(জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যতই মার্জিত হইবে, অনুভূতিও ততই সূক্ষ্ম হইবে। তখন অধ্যাত্মজগৎ খুলিয়া যাইবে।) এইজন্য ভারতীয় দেবতাগণের তিনটি চক্ষু কল্পনা করা হইয়াছে। তৃতীয় বা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে বিবিধ আধ্যাত্মিক দর্শন উপস্থিত হয়।

কুণ্ডলিনী শক্তি মেরুমজ্জার মধ্যস্থিত এক কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে যতই উঠিতে থাকে, ততই ইন্দ্রিয়গুলির পরিবর্তন সাধিত হয় এবং জগৎ ভিন্নরূপে প্রতীত হইতে আরম্ভ করে। পৃথিবী তখন স্বর্গে পরিণত হয়। তোমার কথা বন্ধ হইয়া যায়। তারপর কুণ্ডলিনী অধস্তন কেন্দ্রগুলিতে নামিলে তুমি আবার মানবীয় ভূমিতে আসিয়া পড়। সমস্ত কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া কুণ্ডলিনী যখন মস্তিষ্কে সহস্রারে পৌছিবে, তখন সমগ্র দৃশ্য জগৎ (তোমার অনুভূতিতে) বিলীন হয় এবং এক সত্তা ব্যতীত কিছুই অনুভব কর না। তখন তুমিই পরমাত্মা। সমুদয় স্বর্গ তাঁহা হইতেই সৃষ্টি করিতেছ। সমস্ত জগৎও তাঁহা হইতেই রচনা করিতেছ। তিনিই একমাত্র সত্তা। তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।

সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এঞ্জেলিস্-এ 'হোম্-অব্-ট্রুথ'-এ প্রদত্ত বক্তৃতা

আজ সকালে প্রাণায়াম ও অন্যান্য সাধনাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। তত্ত্বের আলোচনা অনেক হইয়াছে, এখন তাহার সাধন সম্বন্ধে কিছু বলিলে মন্দ হইবে না। এই বিষয়টির উপর ভারতে বহু গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। এদেশের লোক যেমন জাগতিক বিষয়ে কার্যকুশল, আমাদের দেশের লোক তেমনি ঐ বিষয়ে দক্ষ বলিয়া মনে হয়। এদেশের পাঁচজন লোক একসঙ্গে ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করে, 'আমরা একটি যৌথ কারবার খুলিব' (যৌথ প্রতিষ্ঠান? সংস্থা?), আর পাঁচঘণ্টার মধ্যে তাহা করিয়াও ফেলে। ভারতের লোক কিন্তু এ-সব ব্যাপারে এত অপটু যে, তাহাদের পঞ্চাশ বছরের চেষ্টাতেও এ-কাজটি হয়তো হইয়া উঠিবে না। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে; সেখানে যদি কেহ কোন দার্শনিক মত প্রচার করিতে চায়, তাহা হইলে সে মতবাদ যত উদ্ভটই হউক না কেন, তাহা গ্রহণ করিবার লোকের অভাব হইবে না। যেমন ধর, একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত হইয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, বার বছর দিনরাত একপায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলে মুক্তিলাভ হয়; সঙ্গে সঙ্গে একপায়ে দাঁড়াইবার মতো শত শত লোক জুটিয়া যাইবে। সব কষ্ট নীরবে সহ্য করিবে। বহু লোক আছে, যাহারা ধর্মলাভের জন্য বছরের পর বছর ঊর্ধ্ববাহু হইয়া থাকে; আমি স্বচক্ষে এরূপ শত শত লোক দেখিয়াছি। আর এ-কথাও মনে করা চলিবে না যে, তাহারা নিরেট আহাম্মক; বস্তুতঃ তাহাদের জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তার দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কর্মদক্ষতা শব্দটিরও অর্থ আপেক্ষিক।

অপরের দোষ-গুণ বিচার করিবার সময় আমরা প্রায়ই এই একটি ভুল করিয়া বসি; আমাদের মনোরাজ্যে আমরা যে বিশ্ব রচনা করিতেছি, তাহার বাহিরে আর কিছু থাকিতে পারে—এ-কথা যেন আমরা কখনও ভাবিতেই চাই না; আমরা ভাবি—আমাদের নিজের নীতিবোধ, ঔচিত্যবোধ, কর্তব্যবোধ ও প্রয়োজনবোধ ভিন্ন ঐসব ক্ষেত্রে আর সমস্ত ধারণাই মূল্যহীন। সেদিন

ইওরোপ যাত্রার পথে মার্সাই শহর হইয়া যাইতেছিলাম; তখন সেখানে ষাঁড়ের লড়াই চলিতেছিল। উহা দেখিয়া জাহাজের ইংরেজ যাত্রীরা সকলেই ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং সমগ্র ব্যাপারটাকে অতি নৃশংস বলিয়া সমালোচনা ও নিন্দা করিতে লাগিল। ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া শুনিলাম, বাজী রাখিয়া লড়াই করিবার জন্য প্যারিসে একদল লোক গিয়াছিল, কিন্তু ফরাসীরা তাহাদের সশুসন্ত্ব ফিরাইয়া দিয়াছে। ফরাসীদের মতে ও-কাজটি পাশবিক। বিভিন্ন দেশে এই-জাতীয় মতামত শুনিতে শুনিতে আমি যীশুখ্রীষ্টের সেই অতুলনীয় বাণীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে শুরু করিয়াছি—'অপরের বিচার করিও না, তাহা হইলেই নিজেও অপরের বিচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।' যতই শিখি, ততই আমাদের অজ্ঞতা' ধরা পড়ে, ততই আমরা বুঝি যে, মানুষের এই মন-নামক বস্তুটি কত বিচিত্র, কত বহুমুখী! যখন ছেলেমানুষ ছিলাম, স্বদেশবাসীদের তপস্বিসুলভ কৃচ্ছ্রসাধনের সমালোচনা করা আমার অভ্যাস ছিল; আমাদের দেশের বড় বড় আচার্যেরাও উহার সমালোচনা করিয়াছেন, বুদ্ধদেবের মতো ক্ষণজন্মা মহামানবও ঐরূপ করিয়াছেন। তবু বয়স যত বাড়িতেছে, ততই বুঝিতেছি যে, বিচার করিবার অধিকার আমার নাই। কখন কখন মনে হয়, বহু অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এই-সব তপস্বীর সাধনশক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতার একাংশও যদি আমার থাকিত! প্রায়ই মনে হয়, এ-বিষয়ে আমি যে-অভিমত দিই ও সমালোচনা করি, তাহার কারণ এই নয় যে, আমি দেহ-নির্যাতন পছন্দ করি না; নিছক ভীরুতাই ইহার কারণ, কৃচ্ছ্রতা-সাধনার শক্তি ও সাহসের অভাবই ইহার কারণ।

তাহা হইলেই দেখিতেছ যে, শক্তি, বীর্য ও সাহস—এই-সব অতি অদ্ভুত জিনিস। 'সাহসী লোক,' 'বীর পুরুষ,' 'নির্ভীক ব্যক্তি'—প্রভৃতি কথা সাধারণতঃ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের এ-কথা মনে রাখা উচিত যে, ঐ সাহসিকতা বা বীরত্ব বা অন্য কোন গুণই ঐ লোকটির চরিত্রের চিরসাথী নয়। যে-লোক কামানের মুখে ছুটিয়া যাইতে পারে, সেই-ই আবার ডাক্তারের হাতে ছুরি দেখিলে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যায়; আবার অপর কেহ হয়তো কোন কালেই কামানের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস পায় না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে স্থিরভাবে অস্ত্রোপচার সহ্য করিতে পারে।

কাজেই অপরের বিচার করিবার সময় সাহসিকতা, মহত্ত্ব ইত্যাদি যে-সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহার অর্থ খুলিয়া বলা প্রয়োজন। 'ভাল নয়' বলিয়া যে-লোকটির সমালোচনা আমি করিতেছি, সেই লোকটিই হয়তো আমি যে-সব বিষয়ে ভাল নই, এমন কতকগুলি বিষয়ে আশ্চর্য রকমে ভাল হইতে পারে।

আর একটি উদাহরণ দেখ। প্রায়ই দেখা যায়, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কর্মদক্ষতা লইয়া আলোচনাকালে আমরা সর্বদা ঠিক এই ভুলটিই করিয়া বসি। যেমন—পুরুষরা লড়াই করিতে এবং প্রচণ্ড শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে পারে বলিয়া লোকে মনে করে যে, এই বিষয় লইয়া পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো যায়; আর স্ত্রীলোকের শারীরিক দুর্বলতা ও যুদ্ধে অপারগতার সঙ্গে পুরুষের এই গুণের তুলনা করা চলে। ইহা অন্যায়। মেয়েরাও পুরুষদের মতো সমান সাহসী। নিজ নিজ ভাবে প্রত্যেকেই ভাল। নারী যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও স্নেহ লইয়া সন্তান পালন করে, কোন্ পুরুষ সেভাবে তাহা করিতে পারে? একজন কর্মশক্তিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, অপরজন বাড়াইয়াছে সহনশক্তি। যদি বলো, মেয়েরা তো শারীরিক শ্রম করিতে পারে না, তবে বলিব, পুরুষরাও তো সহ্য করিতে পারে না। সমগ্র জগৎটি একটি নিখুঁত ভারসাম্যের ব্যাপার। এখন আমার জানা নাই, তবে একদিন হয়তো আমরা জানিতে পারিব যে, নগণ্য কীটের ভিতরেও এমন কিছু আছে, যাহা আমাদের মানবতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। অতি দুষ্টপ্রকৃতির লোকের ভিতরেও এমন কিছু সদ্গুণ থাকিতে পারে, যাহা আমার ভিতর মোটেই নাই। নিজ জীবনে আমি প্রতিদিন ইহা লক্ষ্য করিতেছি। অসভ্য জাতির একজন লোককে দেখ না! আমার দেহটি যদি তাহার মতো অমন সুঠাম হইত! সে ভরপেট খায়-দায়, অসুখ কাহাকে বলে—তাহা বোধ হয় জানেই না; আর এদিকে আমার অসুখ লাগিয়াই আছে। তাহার দেহের সঙ্গে আমার মস্তিষ্ক বদলাইয়া লইতে পারিলে আমার সুখের মাত্রা কতই না বাড়িয়া যাইত। তরঙ্গের উত্থান ও পতন লইয়াই গোটা জগৎটি গড়া; কোন স্থান নীচু না হইলে অপর একটি স্থান উঁচু হইয়া তরঙ্গাকার ধারণ করিতে পারে না। সর্বত্রই এই ভারসাম্য বিদ্যমান। কোন বিষয়ে তুমি মহৎ, তোমার প্রতিবেশীর মহত্ত্ব অন্য বিষয়ে। স্ত্রী-পুরুষের বিচার করিবার সময় তাহাদের নিজ নিজ মহত্ত্বের মান ধরিয়া উহা করিও। একজনের জুতা আর একজনের

পায়ে ঢুকাইতে গেলে চলিবে কেন? একজনকে খারাপ বলিবার কোন অধিকারই অপরের নাই। এই-জাতীয় সমালোচনা দেখিলে সেই প্রাচীন কুসংস্কারেরই কথা মনে পড়ে—'এরূপ করিলে জগৎ উৎসন্নে যাইবে।' কিন্তু সেরূপ করা সত্ত্বেও জগৎ এখনও ধ্বংস হইয়া যায় নাই। এদেশে বলা হইত যে, নিগ্রোদের স্বাধীনতা দিলে দেশের সর্বনাশ হইবে; কিন্তু সর্বনাশ হইয়াছে কি? আরও বলা হইত যে, গণশিক্ষার প্রসার হইলে জগতের সর্বনাশ হইবে। কিন্তু তাহাতে আসলে জগতের উন্নতিই হইয়াছে। কয়েক বছর আগে এমন একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহাতে ইংলণ্ডের সব চেয়ে খারাপ অবস্থার সম্ভাবনার বর্ণনা ছিল। লেখক দেখাইয়াছিলেন যে, শ্রমিকদের মজুরী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিতেছে। একটা রব উঠিয়াছিল যে, ইংলণ্ডের শ্রমিকদের দাবি অত্যধিক—এদিকে জার্মানরা কত কম বেতনে কাজ করে! এ-বিষয়ে তদন্তের জন্য জার্মানিতে একটি কমিশন পাঠানো হইল। কমিশন ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে, জার্মান শ্রমিকরা উচ্চতর হারে মজুরী পায়। এইরূপ হইল কি করিয়া? জনশিক্ষাই ইহার কারণ। কাজেই জনশিক্ষার ফলে জগৎ উৎসন্নে যাইবে, এ-কথাটির গতি কি হইবে? বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে প্রাচীনপন্থীদেরই সর্বত্র আধিপত্য। তাহারা জনগণের কাছে সব কিছুই লুকাইয়া রাখিতে চায়। আমরাই জগতের মাথার মণি—এই আত্ম-প্রসাদকর সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে তাহারা। তাহাদের বিশ্বাস—এই-সব ভয়ঙ্কর পরীক্ষাগুলিতে তাহাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না, তাহাতে শুধু জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এখন কর্মকুশলতার কথাতেই ফিরিয়া আসা যাক। ভারতে বহু প্রাচীন-কাল হইতেই মনস্তত্ত্বের ব্যাবহারিক প্রয়োগের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চৌদ্দ-শত বছর পূর্বে ভারতে একজন বড় দার্শনিক জন্মিয়া-ছিলেন। তাঁহার নাম পতঞ্জলি। মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক সমস্ত তথ্য, প্রমাণ ও গবেষণা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অতীতের ভাণ্ডারে সঞ্চিত সমস্ত অভিজ্ঞতার সুযোগটুকুও লইয়াছিলেন। মনে থাকে যেন, জগৎ অতি প্রাচীন; মাত্র দুই বা তিন হাজার বছর পূর্বে ইহার জন্ম হয় নাই। এখানে—পাশ্চাত্য-দেশে শিখানো হয় যে, 'নিউ টেস্টামেণ্ট'-এর সঙ্গে আঠারো-শ বছর আগে সমাজের জন্ম হইয়াছিল; তাহার পূর্বে সমাজ বলিয়া কিছু ছিল না। পাশ্চাত্য-

জগতের বেলা এ-কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র জগতের বেলা নয়। লণ্ডনে যখন বক্তৃতা দিতাম, তখন আমার একজন সুপণ্ডিত মেধাবী বন্ধু প্রায়ই আমার সঙ্গে তর্ক করিতেন; তাঁহার তূণীরে যত শর ছিল, তাহার সবগুলি একদিন আমার উপর নিক্ষেপ করিবার পর হঠাৎ তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'তাহা হইলে আপনাদের ঋষিরা ইংলণ্ডে আমাদের শিক্ষা দিতে আসেন নাই কেন?' উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, 'কারণ তখন ইংলণ্ড বলিয়া কিছু ছিলই না, যে সেখানে আসিবেন। তাঁহারা কি অরণ্যে গাছপালার কাছে প্রচার করিবেন?'

ইঙ্গারসোল আমাকে বলিয়াছিলেন, 'পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে প্রচার করিতে আসিলে আপনাকে এখানে ফাঁসি দেওয়া হইত, আপনাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত, অথবা ঢিল ছুঁড়িয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত।'

কাজেই খ্রীষ্টজন্মের চৌদ্দ-শ বৎসর পূর্বেও সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, ইহা মনে করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। সভ্যতা সব সময়েই নিম্নতর অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থায় আসিয়াছে কি-না—এ-কথার মীমাংসা এখনও হয় নাই। এই ধারণাটিকে প্রমাণ করিবার জন্য যে-সব যুক্তি-প্রমাণ দেখানো হইয়াছে, ঠিক সেই-সব যুক্তিপ্রমাণ দিয়া ইহাও দেখানো যায় যে, সভ্য মানুষই ক্রমে অসভ্য বর্বরে পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়, চীনারা কখনও বিশ্বাসই করিতে পারে না যে, আদিম বর্বর অবস্থা হইতে সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে; কারণ তাহাদের অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তোমরা যখন আমেরিকার সভ্যতার উল্লেখ কর, তখন তোমাদের বলিবার প্রকৃত অভিপ্রায় এই যে, তোমাদের জাতি চিরকাল থাকিবে এবং উন্নতির পথে চলিবে। যে হিন্দুরা সাত শত বৎসর ধরিয়া অবনতির পথে চলিতেছে, তাহারা প্রাচীনকালে সভ্যতায় অতি-উন্নত ছিল, এ-কথা বিশ্বাস করা খুবই সহজ। ইহা যে সত্য নয়—এ-কথা প্রমাণ করা যায় না।

কোনও সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও পাওয়া যায় না। অপর একটি সুসভ্য জাতি আসিয়া কোন জাতির সহিত মিশিয়া যাওয়া ব্যতিরেকেই সে জাতি সভ্য হইয়া উঠিয়াছে—এরূপ একটি জাতিও জগতে নাই। এক হিসাবে বলিতে পারা যায়, মূল সভ্যতার অধিকারী জাতি একটি বা দুটি ছিল, তাহারাই বাহিরে যাইয়া নিজেদের

ভাব ছড়াইয়াছে এবং অন্যান্য জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে; এইভাবেই সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়াছে।

বাস্তব জীবনে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় কথা বলাই ভাল। কিন্তু একটি কথা তোমাদের স্মরণ রাখিতেই হইবে। ধর্মবিষয়ক কুসংস্কার যেমন আছে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেইরূপ কুসংস্কার আছে। এমন অনেক পুরোহিত আছেন, যাঁহারা ধর্মানুষ্ঠানকে নিজজীবনের বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করেন; তেমনি বৈজ্ঞানিক নামধেয় এমন অনেক আছেন, যাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের পূজারী। ডারউইন বা হাক্স্‌লির মতো বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের নাম করা মাত্র আমরা অন্ধভাবে তাঁহাদের অনুসরণ করি। এইটিই আজকালকার চলিত প্রথা। যাহাকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান বলি, তাহার ভিতর শতকরা নিরানব্বই ভাগই হইতেছে নিছক মতবাদ। ইহাদের অনেকগুলি আবার প্রাচীনকালের বহু-মস্তক ও বহু-হস্তবিশিষ্ট ভূতে অন্ধ বিশ্বাস অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নয়; তবে পার্থক্য এইটুকু যে, কুসংস্কার হইলেও উহা মানুষকে গাছপাথর প্রভৃতি অচেতন পদার্থ হইতে অন্ততঃ খানিকটা আলাদা বলিয়া ভাবিত। যথার্থ বিজ্ঞান আমাদের সাবধানে চলিতে বলে। পুরোহিতদের সঙ্গে ব্যবহারে যেমন সতর্ক হইয়া চলিতে হয়, বিজ্ঞানীদের বেলায়ও তেমনি সতর্কতা আবশ্যক। অবিশ্বাস লইয়া শুরু কর। বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া, সব প্রমাণ পাইয়া তবে বিশ্বাস কর। আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি অতিপ্রচলিত বিশ্বাস এখনও প্রমাণোত্তীর্ণ হয় নাই। অঙ্কশাস্ত্রের মতো বিজ্ঞানের ভিতরেও অনেকগুলি মতবাদই শুধু কাজ চালাইয়া যাইবার উপযুক্ত সাময়িক সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। উচ্চতর জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি বাতিল হইয়া যাইবে।

খ্রীষ্টজন্মের চৌদ্দ-শ বছর পূর্বে একজন বড় ঋষি কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের সুবিন্যাস, বিশ্লেষণ এবং সামান্যীকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আরও অনেকে তাঁহার আবিষ্কৃত জ্ঞানের অংশবিশেষ লইয়া তাহার বিশেষ চর্চা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে শুধু হিন্দুরাই জ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির চর্চায় যথার্থ আন্তরিকতার সহিত ব্রতী হইয়াছিলেন। আমি এখন বিষয়টি তোমাদের শিখাইতেছি—কিন্তু তোমরা কয়জনই বা ইহা অভ্যাস করিবে? অভ্যাস ছাড়িয়া দিতে কয়দিন বা কয়মাস আর লাগিবে

তোমাদের? এ-বিষয়ের উপযুক্ত উদ্যম তোমাদের নাই। ভারতবাসীরা কিন্তু যুগের পর যুগ ইহার অনুশীলন চালাইয়া যাইবে। শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, ভারতবাসীদের কোন সাধারণ প্রার্থনা-গৃহ কোন সাধারণ সমবেত প্রার্থনা-মন্ত্র বা ঐ-জাতীয় কোন কিছু নাই; তাহা সত্ত্বেও তাহারা প্রতিদিন শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করে, মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করে; এইটিই তাহাদের উপাসনার প্রধান অঙ্গ। এইগুলিই মূল কথা। প্রত্যেক হিন্দুকে ইহা করিতেই হয়। ইহাই সে-দেশের ধর্ম। তবে সকলে এক পদ্ধতি অবলম্বনে উহা না-ও করিতে পারে, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ, মনঃসংযম প্রভৃতি অভ্যাস করিবার জন্য এক এক জনের এক একটি বিশেষ পদ্ধতি থাকিতে পারে। কিন্তু একজনের পদ্ধতি অপরের জানিবার প্রয়োজন হয় না, এমনকি তাহার স্ত্রীর-ও না; পিতাও হয়তো জানেন না, পুত্র কি পদ্ধতি অবলম্বনে চলিতেছে। কিন্তু সকলকেই এ-সব অভ্যাস করিতে হয়। আর এ-সবের মধ্যে কোন গোপন রহস্য নাই; গোপন রহস্যের কোন ভাবই ইহার মধ্যে নাই। হাজার হাজার লোক নিত্য গঙ্গাতীরে বসিয়া চোখ বুজিয়া প্রাণায়াম ও মনের একাগ্রতা-সাধনের অভ্যাস করিতেছে—এ-দৃশ্য নিত্যই চোখে পড়ে। মানব-সাধারণের পক্ষে কতকগুলি অভ্যাস-সাধনার পথে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে দুইটি অন্তরায় থাকিতে পারে। প্রথমতঃ ধর্মাচার্যেরা মনে করেন যে, সাধারণ লোক এ-সব সাধনার যোগ্য নয়। এই ধারণায় হয়তো কিছু সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু গর্বের ভাবই এর জন্য বেশী দায়ী। দ্বিতীয় অন্তরায় নির্যাতনের ভয়। যেমন—এদেশে হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে প্রকাশ্য স্থানে কেহ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে চাহিবে না; এ-সবের চলন নাই এখানে। আবার ভারতে যদি কেহ, 'ভগবান, আজ আমাকে দিনের অন্ন যোগাড় করিয়া দাও' বলিয়া প্রার্থনা করে, তবে লোকে তাহাকে উপহাস করিবে। হিন্দুদের দৃষ্টিতে 'হে আমার স্বর্গবাসী পিতা' ইত্যাদি বলার চেয়ে বড় আহাম্মকি থাকিতে পারে না। উপাসনাকালে হিন্দু ইহাই ভাবিয়া থাকে যে, ভগবান্ তাহার অন্তরেই রহিয়াছেন।

যোগীরা বলেন, আমাদের দেহে তিনটি প্রধান স্নায়ুপ্রবাহ আছে; একটিকে তাঁহারা ইড়া বলেন, অপরটিকে পিঙ্গলা, আর এই দুইটির মধ্যবর্তীটিকে বলেন সুষুম্না; এগুলি সবই মেরু-নালীর মধ্যে অবস্থিত। বামদিকের ইড়া

এবং দক্ষিণের পিঙ্গলা—এই দুইটির প্রত্যেকটিই স্নায়ু-গুচ্ছ; আর মধ্যবর্তী সুষুম্নাটি একটি শূন্য নালী, স্নায়ুগুচ্ছ নয়। এই সুষুম্নাপথ রুদ্ধাবস্থায় থাকে; সাধারণ মানুষ শুধু ইড়া ও পিঙ্গলার সাহায্যেই কাজ চালায় বলিয়া ঐ পথটি তাহাদের কোন প্রয়োজনেই লাগে না। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সঞ্চারী অন্যান্য স্নায়ুগুলির মারফত শরীরের সর্বত্র মস্তিষ্কের আদেশ পৌছাইয়া দিবার জন্য ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর ভিতর দিয়া স্নায়ুপ্রবাহ সব সময় চলাফেরা করে।

ইড়া ও পিঙ্গলাকে নিয়ন্ত্রিত ও ছন্দোবদ্ধ করাই প্রাণায়ামের মহান্ উদ্দেশ্য। কিন্তু শুধু শ্বাসক্রিয়াটুকুর ভিতর কিছুই নাই—ফুসফুসের ভিতর কিছুটা বাতাস ঢুকাইয়া লওয়া ছাড়া উহা আর কি? রক্তশোধন ছাড়া উহার আর কোন প্রয়োজনই নাই; বাহির হইতে আমরা যে বায়ুকে নিশ্বাসের সহিত টানিয়া লই এবং উহাকে রক্তশোধনের কার্যে নিয়োগ করি, সে বায়ুর মধ্যে কোনও গোপন রহস্য নাই; ঐ ক্রিয়াটা তো একটা স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই গতিটিকে প্রাণ-নামক একটি মাত্র স্পন্দনে পরিণত করা যায়; আর সব জায়গার সব গতিই এই প্রাণেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই প্রাণই বিদ্যুৎ, এই প্রাণই চৌম্বক-শক্তি; মস্তিষ্ক এই প্রাণকেই চিন্তারূপে বিকীর্ণ করে। সবই প্রাণ; প্রাণই চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রগণকে চালিত করিতেছে।

আমরা বলি—বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তাহা সবই এই প্রাণের স্পন্দনের ফলে বিকাশলাভ করিয়াছে। স্পন্দনের সর্বোচ্চ ফল চিন্তা। ইহা অপেক্ষাও বড় যদি কিছু থাকে, তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। ইড়া ও পিঙ্গলা নামক নাড়ীদ্বয় প্রাণের সাহায্যে কাজ করে। প্রাণই বিভিন্ন শক্তি-রূপে পরিণত হইয়া শরীরের প্রতি অঙ্গকে পরিচালিত করে। ভগবান্ জগৎ-রূপ কার্যের স্রষ্টা এবং সিংহাসনের উপরে বসিয়া ন্যায়বিচার করিতেছেন—ভগবান্ সম্বন্ধে এই প্রাচীন ধারণা পরিত্যাগ কর। কাজ করিতে করিতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি, কারণ ঐ কার্যে আমাদের কিছুটা প্রাণ-শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়।

নিয়মিত প্রাণায়ামের ফলে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রাণের ক্রিয়া ছন্দোবদ্ধ হইয়া উঠে। প্রাণ যখন নিয়মিত ছন্দে চলে, তখন দেহের সবকিছুই ঠিক-মত কাজ করে। যোগীদের যখন নিজ শরীরের উপর আধিপত্য আসে, তখন

শরীরের কোন অংশ অসুস্থ হইলে তাঁহারা টের পান যে, প্রাণ সেখানে ঠিকমত ছন্দে চলিতেছে না, এবং যতক্ষণ না সহজ ছন্দ ফিরিয়া আসে, ততক্ষণ তাঁহারা প্রাণকে সেদিকে সঞ্চালিত করেন।

তোমার নিজের প্রাণকে যেমন তুমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারো, তেমনি যথেষ্ট শক্তিমান্ হইলে এখানে বসিয়াই ভারতে অবস্থিত অপর একজনের প্রাণকেও তুমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। সব প্রাণই এক। কোন ছেদ নাই মাঝখানে; একত্বই সর্বত্র বিদ্যমান। দৈহিক দিক দিয়া, আত্মিক মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়া, আধ্যাত্মিক দিক দিয়া সবই এক। জীবন একটি স্পন্দন মাত্র। যাহা এই (বিশ্বব্যাপী জড়) 'আকাশ'-সমুদ্রকে স্পন্দিত করিতেছে, তাহাই তোমার ভিতরও স্পন্দন জাগাইতেছে। কোন হ্রদে যেমন কাঠিন্যের মাত্রার তারতম্য বিশিষ্ট অনেকগুলি বরফের স্তর গড়িয়া উঠে, অথবা কোন বাষ্পের সাগরে বাষ্পস্তরের বিভিন্ন ঘনত্ব থাকে এই বিশ্বটিও যেন সেই ধরনের জড় পদার্থের একটি সমুদ্র। ইহা একটি 'আকাশের' সমুদ্র; ইহার ভিতর ঘনত্বের তারতম্য অনুসারে আমরা চন্দ্র, সূর্য, তারা ও আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব দেখিতেছি; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই নিরবচ্ছিন্নতা অব্যাহত রহিয়াছে, সব স্থান জুড়িয়া সেই একই পদার্থ বিদ্যমান।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, জগৎ বস্তুতঃ এক; অধ্যাত্মজগৎ, জড়জগৎ, মনোজগৎ এবং প্রাণ-জগৎ—এরূপ কোন ভেদ নাই। সবই এক জিনিস; যদিও অনুভূতির বিভিন্ন স্তর হইতে দেখা হইতেছে। যখন তুমি নিজেকে দেহ বলিয়া ভাবো, তখন তুমি যে মন, সে-কথা ভুলিয়া যাও; আবার নিজেকে যখন মন বলিয়া ভাবো, তখন শরীরের কথা ভুলিয়া যাও। 'তুমি'-নামধেয় একটি মাত্র সত্তাই আছে; সে বস্তুটিকে তুমি জড়পদার্থ বা শরীর বলিয়া মনে করিতে পারো, অথবা সেটিকে মন বা আত্মারূপেও দেখিতে পারো। জন্ম, জীবন ও মৃত্যু—এ-সব প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র। কেহ কখন জন্মেও নাই, কেহ কখন মরিবেও না; আমরা শুধু স্থান পরিবর্তন করি—এর বেশী কিছু নয়। পাশ্চাত্যের লোকেরা যে মরণকে এত বড় করিয়া ভাবে, তাহাতে আমি দুঃখিত; সব সময় তাহারা একটু আয়ুলাভের জন্য লালায়িত। 'মৃত্যুর পরেও যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি; আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে দাও!' যদি কেহ তাহাদের শোনায় যে, মৃত্যুর পরেও তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহা

হইলে তাহারা কী খুশীই না হয়! এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আসে কি করিয়া! কি করিয়া আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, আমরা মরিয়া গিয়াছি! নিজেকে মৃত বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর দেখি, দেখিবে তোমার নিজের মৃতদেহ দেখিবার জন্য তুমি বাঁচিয়াই আছ। বাঁচিয়া থাকা এমন একটি অদ্ভুত সত্য যে, মুহূর্তের জন্যও তুমি তাহা ভুলিতে পার না। তোমার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন সন্দেহ হইতে পারে না, বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধেও ঠিক তাই। চেতনার প্রথম প্রমাণই হইল—'আমি আছি'। যে অবস্থা কোন কালে ছিল না, তাহার কল্পনা করা চলে কি? সব সত্যের মধ্যে ইহা সব চেয়ে বেশী স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই অমরত্বের ভাব মানুষের মজ্জাগত। যাহা কল্পনা করা যায় না, তাহা লইয়া কোন আলোচনা চলে কি? যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহার সত্যাসত্য লইয়া আমরা আলোচনা করিতে চাহিব কেন?

কাজেই যে দিক হইতেই দেখা যাক না কেন, গোটা বিশ্বটি একটি অখণ্ড সত্তা। এই মুহূর্তে বিশ্বটিকে প্রাণ ও আকাশের, শক্তি ও জড়পদার্থের একটি অখণ্ড সত্তা বলিয়া আমরা ভাবিতেছি। মনে থাকে যেন, অন্যান্য মূল তত্ত্বগুলির মতো এ তত্ত্বটিও স্ব-বিরোধী। কারণ শক্তি মানে কি?—যাহা জড়পদার্থে গতির সঞ্চার করে, তাহাই শক্তি। আর জড়পদার্থ কি?—যাহা শক্তির দ্বারা চালিত হয়, তাহাই জড়পদার্থ। এরূপ সংজ্ঞা অন্যোন্যাশ্রয়-দোষে দুষ্ট। জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের এত গর্ব সত্ত্বেও আমাদের যুক্তির কতকগুলি মূল উপাদান বড়ই অদ্ভুত ধরনের। আমাদের ভাষায় যাহাকে বলে—'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা!' এই-জাতীয় পরিস্থিতিকে 'মায়া' বলে। ইহার অস্তিত্ব নাই, নাস্তিত্বও নাই। একে 'সৎ' বলিতে পার না, কারণ যাহা দেশ-কালের অতীত, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই শুধু 'সৎ'। তবু অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সহিত এই জগতের অনেকটা মিল আছে বলিয়া ইহার ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকৃত হয়।

কিন্তু যেটি আসল সদ্‌বস্তু, পারমার্থিক সত্তা, তাহা সব কিছুরই ভিতর-বাহির জুড়িয়া রহিয়াছে; সেই সত্তাই যেন ধরা পড়িয়াছে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে। এই অসীম, অনাদি, অনন্ত, চির-আনন্দময়, চিরমুক্ত সদ্‌বস্তুটিই আমাদের স্বরূপ, আসল মানুষ। এই আসল মানুষটি জড়াইয়া পড়িয়াছে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালে। জগতের সব কিছুরই এই একই অবস্থা। সব-

কিছুরই সত্যস্বরূপ হইতেছে এই সীমাহীন অস্তিত্ব। (বস্তুশূন্য) বিজ্ঞানবাদের কথা নয় এ-সব ; এ-কথার অর্থ ইহা নয় যে, জগতের কোন অস্তিত্বই নাই। সর্বপ্রকার সাংসারিক ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ইহার একটি আপেক্ষিক সত্তা আছে। কিন্তু ইহার অন্যনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত পারমার্থিক সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ দাঁড়াইয়া আছে।

বিষয়বস্তু ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। এখন মূল বক্তব্যে ফিরিয়া আসা যাক।

আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে (দেহের মধ্যে) যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা সবই স্নায়ুর মাধ্যমে প্রাণের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। আমাদের অজ্ঞাতসারে যে-সব কাজ চলে, সেগুলিকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিলে কত ভাল হয়, বলো দেখি!

ঈশ্বর কাহাকে বলে, মানুষ কাহাকে বলে, পূর্বে তাহা তোমাদের বলিয়াছি। মানুষ যেন একটি অসীম বৃত্ত, যাহার পরিধির কোন সীমা নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র একটি বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ। আর ঈশ্বর যেন একটি অসীম বৃত্ত, যাহার পরিধিরও কোন সীমা নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র সর্বত্রই রহিয়াছে। ঈশ্বর সকলের হাত দিয়াই কাজ করেন, সব চোখ দিয়াই দেখেন, সব পা দিয়াই হাঁটেন, সব শরীর অবলম্বনে শ্বাস-ক্রিয়া করেন, সব জীবন অবলম্বনেই জীবনধারণ করেন, প্রত্যেক মুখ দিয়া কথা বলেন এবং প্রত্যেক মস্তিষ্কের ভিতর দিয়াই চিন্তা করেন। মানুষ যদি তাহার আত্মচেতনার কেন্দ্রকে অনন্তগুণে বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে সে ঈশ্বরের মতো হইতে পারে, সমগ্র বিশ্বের উপর আধিপত্য অর্জন করিতে পারে। কাজেই আমাদের অনুধ্যানের প্রধান বিষয় হইল চেতনা। ধর, যেন অন্ধকারের মধ্যে একটি আদি-অন্তহীন রেখা রহিয়াছে। রেখাটিকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু তাহার উপর দিয়া একটি জ্যোতির্বিন্দু সঞ্চরণ করিতেছে। রেখাটির উপর দিয়া চলিবার সময় জ্যোতির্বিন্দুটি রেখার বিভিন্ন অংশগুলিকে পর পর আলোকিত করিতেছে, আর যে অংশ পিছনে পড়িতেছে, তাহা আবার অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে। আমাদের চেতনাকে এই জ্যোতির্বিন্দুটির সহিত তুলনা করা যায়। বর্তমানের অনুভূতি আসিয়া অতীতের অনুভূতি-গুলিকে সরাইয়া দিতেছে, অথবা অতীত অনুভূতিগুলি অবচেতন অবস্থা প্রাপ্ত

হইতেছে। আমরা টের-ই পাই না যে, সেগুলি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে; কিন্তু সেগুলি আছে, এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের দেহমনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। চেতনার সাহায্য ছাড়া আমাদের অভ্যন্তরে যে-সব কার্য এখন চলিতেছে, সেগুলি সবই একদিন আমাদের সজ্ঞানে সাধিত হইত। এখন স্বয়ংক্রিয় হইয়া চলার মতো যথেষ্ট প্রেরণাশক্তি তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে।

সব নীতিশাস্ত্রেই এই একটা বড় রকমের ভুল ধরা পড়ে যে, মানুষ খারাপ কাজ করা হইতে বিরত থাকিবে কি উপায়ে, সে শিক্ষা তাহারা দেয় নাই। সব নীতিপদ্ধতিই শিখায়, 'চুরি করিও না।' খুব ভাল কথা। কিন্তু মানুষ চুরি করে কেন? ইহার কারণ এই যে, সর্বক্ষেত্রে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি খারাপ কাজগুলি সবই আপনা-আপনি ঘটিয়া যায়। দাগী চোর-ডাকাতেরা, মিথ্যাবাদীরা, অন্যায়কারী নর-নারী—সকলেই নিজ নিজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐরূপ হইয়া গিয়াছে। ইহা সত্যই মনস্তত্ত্বের একটি বড় সমস্যা। মানুষের বিচার—আমাদিগকে অতি উদার সহৃদয় দৃষ্টি লইয়াই করিতে হইবে।

ভাল হওয়া অত সোজা নয়। মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত তুমি তো একটি যন্ত্রমাত্র, তার বেশী আর কি? নিজে ভাল বলিয়া তোমার গর্ব করা কি উচিত? নিশ্চয়ই না। তুমি ভাল, কারণ এরূপ না হইয়া তোমার উপায় নাই। আর একজন খারাপ, কারণ সেও ঐরূপ না হইয়া পারে না। তাহার অবস্থায় পড়িলে তুমি যে কি হইতে, কে জানে? দুশ্চরিত্রা নারী বা জেলখানার চোর তো তোমাদেরই হিতার্থে যীশুখ্রীষ্টের মতো বলিপ্রদত্ত হইতেছে, যাহাতে তোমরা ভাল হও। সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার ধারাই এই। যত চোর ও খুনী আছে, যত বিচারবুদ্ধিহীন, যত দুর্বলতম ব্যক্তি, যত পাপিষ্ঠ, যত দানবপ্রকৃতির লোক আছে, আমার দৃষ্টিতে তাহারা সকলেই এক একজন যীশু। দেবরূপী খ্রীষ্ট এবং দানবরূপী খ্রীষ্ট উভয়েই আমার পূজার্হ। এই আমার মত; এছাড়া অন্য ধারণা আমার পক্ষে অসম্ভব। সতের চরণে, সাধুর পাদপদ্মে, দুষ্টের চরণে, দানবের পদেও আমার নমস্কার। তাহারা সবাই আমার শিক্ষক, আমার ধর্মগুরু, সকলেই আমার ত্রাণকর্তা। কাহাকেও হয়তো আমি অভিশাপ দিই, কিন্তু তবু তাহার পতনের ফলে উপকৃত

হই ; আবার—অপরকে হয়তো আশীর্বাদ করি, আর তাহারও সৎকর্মের ফলে উপকৃত হই। আমার এখানে উপস্থিতি যতটা সত্য, আমি যাহা বলিলাম, তাহাও ততখানি সত্য। পতিতা নারীকে দেখিয়া আমাকে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়, কারণ সমাজ তাই চায়, যদিও সে আমার ত্রাণকর্ত্রী, যদিও তাহার পতিতাবৃত্তির ফলে অপর স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পাইতেছে। কথাটি ভাবিয়া দেখ। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মনে মনে কথাটি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ। কথাটি সত্য—নিরাবরণ, নির্ভীক সত্য। আমি যত বেশী করিয়া জগৎকে দেখিতেছি, যত বেশী সংখ্যক নরনারীর সম্পর্কে আসিতেছি, আমার এই বিশ্বাস ততই দৃঢ়তর হইতেছে। কার দোষ দিব? কার প্রশংসা করিব? সব কিছুর দুটি দিকই দেখিতে হইবে।

সম্মুখে যে কাজ রহিয়াছে, তাহা বিপুল ; আমাদের অবচেতন স্তরে যে-সব অসংখ্য চিন্তা ডুবিয়া রহিয়াছে, আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়াই যেগুলি নিজে নিজে কাজ করিয়া চলে, সেগুলিকে স্ববশে আনিতে চাওয়াই হইল আমাদের সর্বপ্রথম কাজ। খারাপ কাজটি অবশ্য চেতনস্তরেই ঘটে, কিন্তু যে কারণ কাজটিকে ঘটাইল, তাহা ছিল আমাদের অগোচরে বহুদূরে—অবচেতনার রাজ্যে ; সেজন্য তাহার শক্তিও বেশী।

ফলিত মনস্তত্ত্ব প্রথমেই অবচেতনকে নিয়ন্ত্রাণাধীনে আনিবার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ; আর ইহা জানা কথা যে, আমরা উহাকে আয়ত্তে আনিতে পারি। কেন পারি? কারণ আমরা জানি যে, চেতনই অবচেতনের কারণ ; আমাদের অতীতের যে লক্ষ লক্ষ চেতন-চিন্তাগুলি মনের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে, সেইগুলিই অবচেতন চিন্তা ; অতীতের সজ্ঞান ক্রিয়াগুলিই নিষ্ক্রিয় ও অবচেতনরূপে থাকে ; আমরা আর সেগুলির দিকে ফিরিয়া তাকাই না, সেগুলিকে চিনি না ; সেগুলির কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু মনে রাখিও, অবচেতন স্তরে যেমন পাপের শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তেমনি পুণ্যের শক্তিও আছে। আমাদের অন্তরে অনেক কিছু সঞ্চিত আছে, যেন একটি থলির মধ্যে সব পুরিয়া রাখা হইয়াছে। আমরা সেগুলির কথা ভুলিয়া গিয়াছি, সেগুলির কথা ভাবি না পর্যন্ত ; আর তাহার ভিতর এমন অনেকগুলি চিন্তা আছে, যাহা পচিয়া যাইতেছে, পচিয়া নিশ্চিত বিপদের কারণ হইতেছে ; এই-সব অবচেতন কারণই বাহিরে আসিয়া মানব-

সমাজকে ধ্বংস করে। সেজন্য যথার্থ মনস্তত্ত্বের উচিত—যাহাতে এগুলিকে চেতনার আয়ত্তে লইয়া আসা যায়, তাহার চেষ্টা করা। আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে গোটা মানুষটিকেই যেন জাগাইয়া তুলিবার বিশাল কর্তব্য, যাহাতে সে নিজের সর্বময় কর্তা হইতে পারে। শরীরের ভিতরে যে-সব যন্ত্রের কাজকে আমরা স্বয়ংক্রিয় বলিয়া থাকি, যেমন যকৃতের ক্রিয়া, সেগুলিকে পর্যন্ত নিজের ইচ্ছাধীন করা যায়।

এ-বিষয়ে চর্চার প্রথম অংশ হইল অবচেতনকে নিয়ন্ত্রণ করা। পরের অংশ—চেতনারও পারে চলিয়া যাওয়া। অবচেতনের কাজ যেমন চেতনার নিম্নস্তরে হয়, তেমনি আর এক ধরনের কাজ হয় চেতনার ঊর্ধ্বে, অতিচেতন স্তরে। এই অতিচেতন অবস্থায় পৌছিলে মানুষ মুক্ত হয় ও দেবত্ব লাভ করে; মৃত্যু অমরত্বে রূপায়িত হয়, দুর্বলতা অনন্তশক্তির রূপ দেয়, এবং লৌহশৃঙ্খল পর্যবসিত হয় মুক্তিতে। অতিচেতনার এই সীমাহীন রাজ্যই আমাদের লক্ষ্য।

কাজেই এখন পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, কাজটিকে দু-ভাগে ভাগ করিতে হইবে। প্রথমতঃ ইড়া ও পিঙ্গলা নামে শরীরে যে দুটি সাধারণ (স্নায়বিক) প্রবাহ আছে, সেগুলিকে ঠিকমত চালাইয়া অবচেতন ক্রিয়াগুলিকে আয়ত্তে আনিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ চেতনারও উর্ধ্বে উঠিয়া যাইতে হইবে।

শাস্ত্রে বলে, আত্মসমাহিত হওয়ার জন্য সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে যিনি এই সত্যে পৌছিয়াছেন, তিনিই যোগী। এই অবস্থায় সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যায়। সুষুম্নার মধ্যে তখন একটি প্রবাহ প্রবেশ করে; ইতিপূর্বে এই নূতন পথে কোন প্রবাহ প্রবেশ করে নাই। প্রবাহটি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে থাকে, এবং বিভিন্ন পদ্মগুলি (মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সুষুম্না-কেন্দ্রগুলি, যোগশাস্ত্রের ভাষায় এগুলিকে 'পদ্ম' বলা হয়) অতিক্রম করিয়া অবশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া পৌছায়। যোগী তখন নিজের যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ ভাগবত সত্তা উপলব্ধি করেন।

আমরা নির্বিশেষভাবে সকলেই যোগের এই চরম অবস্থা লাভ করিতে পারি। কাজটি কিন্তু দুরূহ। যদি কেহ এই সত্য লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে শুধু বক্তৃতা শুনিলেই বা কিছুটা প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই চলিবে না। প্রস্তুতির উপরেই সব কিছু নির্ভর করে। একটি আলো জ্বালিতে

কতটুকু আর সময় লাগে? মাত্র এক সেকেণ্ড; কিন্তু বাতিটি প্রস্তুত করিতে কতখানি সময় যায়! দিনের প্রধান ভোজনটি করিতে আর কতটুকু সময় লাগে? বোধ হয় আধঘণ্টার বেশী দরকার হয় না। কিন্তু খাবারগুলি প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। এক সেকেণ্ডের মধ্যে আলো জ্বালিতে চাই আমরা, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, বাতিটি প্রস্তুত করাই হইল প্রধান কাজ।

লক্ষ্যলাভ এত কঠিন হইলেও তাহার জন্য আমাদের ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টাও কিন্তু বৃথা যায় না। আমরা জানি, কিছুই লুপ্ত হইয়া যায় না। গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'এজন্মে যাহারা যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাহারা কি ছিন্ন মেঘের মতো বিনষ্ট হইয়া যায়?' শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, 'সখা, এ-জগতে কিছুই লুপ্ত হয় না। মানুষ যাহা কিছু করে, তাহা তাহারই থাকিয়া যায়। এজন্মে যোগের ফললাভ করিতে না পারিলেও পরজন্মে আবার সে সেই ভাবেই চলিতে শুরু করে।' এ-কথা না মানিলে বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতির অদ্ভুত বাল্যাবস্থার ব্যাখ্যা করিবে কিরূপে?

প্রাণায়াম, আসন—এগুলি যোগের সহায়ক সন্দেহ নাই; কিন্তু এ-সবই দৈহিক। বড় প্রস্তুতি হইতেছে মনের ক্ষেত্রে। তাহার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন—শান্ত সমাহিত জীবন।

যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে স্বাধীন হইতেই হইবে, এবং এমন এক পরিবেশে নিজেকে রাখিতে হইবে, যেখানে তুমি একাকী ও সর্ববিধ উদ্বেগ-মুক্ত। যে আরামপ্রদ সুখের জীবন চায়, আবার সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞানও লাভ করিতে চায়, তাহার অবস্থা সেই মূর্খেরই মতো, যে কাষ্ঠখণ্ড-ভ্রমে একটি কুমীরকে আঁকড়াইয়া নদী পার হইতে চায়। 'আগে ঈশ্বরের রাজ্যের খোঁজ কর, তাহা হইলে সব কিছুই তোমার নিকট আসিয়া পড়িবে।' ইহাই সর্বোত্তম কর্তব্য, ইহাই বৈরাগ্য। একটি আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, আর কোন কিছু যেন মনে স্থান না পায়। যে জিনিসের কোন কালে বিনাশ নাই, তাহা, অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতাকে পাইবার জন্যই যেন আমরা আমাদের সর্বপ্রকার শক্তি নিয়োগ করি। অনুভূতিলাভের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকিলে আমাদিগকে লড়িতেই হইবে; সেই চেষ্টার ভিতর দিয়াই

আমরা উন্নত হইব। অনেক কিছু ভুলভ্রান্তি হইবে; কিন্তু তাহারাই হয়তো ভুলের ছদ্মবেশে আমাদের কল্যাণসাধনের দেবদূত।

ধ্যানই অধ্যাত্মজীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়ক। ধ্যানকালে আমরা সর্ববিধ জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্ত হই, এবং নিজ ভাগবত স্বরূপ উপলব্ধি করি। ধ্যানের সময় আমরা কোন বাহ্য সহায়তার উপর নির্ভর করি না। আত্মার স্পর্শে মলিনতম স্থানগুলিও উজ্জ্বলতম বর্ণের আভায় উদ্ভাসিত হইতে পারে, জঘন্যতম বস্তুও সুরভিমণ্ডিত হইতে পারে, পিশাচও দেবতায় পরিণত হইতে পারে, তখন সব শত্রুভাব—সব স্বার্থ শূন্যে লীন হয়। দেহবোধ যত কম আসে, ততই ভাল। কারণ দেহই আমাদের নীচে টানিয়া আনে। দেহের প্রতি আসক্তির জন্য, দেহাত্মবোধের জন্য আমাদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে। রহস্যটি এই: চিন্তা করিতে হয়—আমি দেহ নই, আমি আত্মা; ভাবিতে হয়—সমগ্র বিশ্ব এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাহা কিছু সবই, তাহার ভালমন্দ সব কিছুই হইতেছে পরপর সাজানো কতকগুলি ছবির মতো, পটে অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর মতো; আমি তাহার সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টা।

রাজযোগ-প্রসঙ্গে

যোগের প্রথম সোপান যম।

যম আয়ত্ত করিতে পাঁচটি বিষয়ের প্রয়োজন :

১. কায়মনোবাক্যে কাহাকেও হিংসা না করা।

২. কায়মনোবাক্যে সত্য কথা বলা।

৩. কায়মনোবাক্যে লোভ না করা।

৪. কায়মনোবাক্যে পরম পবিত্রতা রক্ষা করা।

৫. কায়মনোবাক্যে অপাপবিদ্ধতা।

পবিত্রতা শ্রেষ্ঠ শক্তি। ইহার সম্মুখে সব কিছু নিস্তেজ। তারপর 'আসন' বা সাধকের বসিবার ভঙ্গী। আসন দৃঢ় হওয়া চাই, এবং শির পঞ্জর এবং দেহ ঋজু ও সরলরেখায় অবস্থিত হইবে। মনে মনে চিন্তা কর—তোমার আসন দৃঢ়, কোন কিছু তোমাকে টলাইতে পারিবে না। অতঃপর চিন্তা কর—মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটু একটু করিয়া তোমার সমগ্র দেহ বিশুদ্ধ হইতেছে। চিন্তা কর—শরীর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এবং জীবন-সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য একটি নিখুঁত শক্ত ভেলা।

ঈশ্বরের নিকট, জগতের সকল মহাপুরুষ, ত্রাণকর্তা এবং পবিত্রাত্মাদের নিকট প্রার্থনা কর, তাঁহারা যেন তোমায় সাহায্য করেন। তারপর অর্ধঘণ্টা প্রাণায়াম অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক ও রেচক অভ্যাস কর ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত মনে মনে 'ওঁ' শব্দ উচ্চারণ কর। আধ্যাত্মিক শব্দের অদ্ভুত শক্তি আছে।

যোগের অন্যান্য স্তর : (১) প্রত্যাহার অর্থাৎ সকল বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়া সম্পূর্ণরূপে মানসিক ধারণার দিকে পরিচালিত করা ; (২) ধারণা অর্থাৎ অবিচল একাগ্রতা ; (৩) ধ্যান অর্থাৎ প্রগাঢ় চিন্তা ; (৪) সমাধি অর্থাৎ (শুদ্ধ ধ্যান) রূপবিবর্জিত ধ্যান। ইহা যোগের সর্বোচ্চ এবং শেষ স্তর। পরমাত্মায় সকল চিন্তাভাবনার নিরোধের নাম সমাধি—যে অবস্থায় উপলব্ধি হয়, 'আমি ও আমার পিতা এক।'

একবারে একটি কাজ কর, এবং উহা করিবার সময় অপর সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া উহাতেই সমগ্র মন অর্পণ কর।

রাজযোগ-শিক্ষা

(ইংলণ্ডে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত)

প্রাণ

পদার্থ (জড়প্রকৃতি) পাঁচ প্রকার অবস্থার অধীন : আকাশ, আলোক, বায়বীয়, তরল ও কঠিন—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্—ইহাই সৃষ্টি-তত্ত্ব। অতি সূক্ষ্ম বায়ুরূপ আদি পদার্থ হইতে ইহাদের উদ্ভব।

বিশ্বের অন্তর্গত তেজ 'প্রাণ' নামে অভিহিত—উহাই এই উপাদানগুলির (পঞ্চভূতের) মধ্যে শক্তিরূপে বিদ্যমান। প্রাণশক্তির ব্যবহারের নিমিত্ত মনই মহা যন্ত্রস্বরূপ। মন জড়াত্মক। মনের পশ্চাতে অবস্থিত আত্মাই প্রাণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। প্রাণ জগতের পরিচালক-শক্তি ; জীবনের প্রত্যেকটি বিকাশের মধ্যে প্রাণশক্তি দৃষ্ট হয়। দেহ নশ্বর, মনও নশ্বর ; উভয়ই যৌগিক পদার্থ বলিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবেই। এই-সকলের পশ্চাতে আছে অবিনাশী আত্মা। শুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মা প্রাণের নিয়ামক ও পরিচালক। কিন্তু যে বুদ্ধি আমাদের চতুর্দিকে দেখি, তাহা সর্বদাই অপূর্ণ। এই বোধ পূর্ণতা লাভ করিলে যীশুখ্রীষ্টাদি অবতারের আবির্ভাব ঘটে। বুদ্ধি সর্বদা নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এজন্য উন্নতির বিভিন্ন স্তরের মন ও দেহ সৃষ্টি করিতেছে। সকল বস্তুর পশ্চাতে—যথার্থ সত্তায় সকল প্রাণীই সমান।

মন অতি সূক্ষ্ম পদার্থ ; উহা প্রাণশক্তি প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ। শক্তির বহিঃপ্রকাশের নিমিত্ত পদার্থের প্রয়োজন।

পরবর্তী প্রশ্ন হইল—প্রাণকে কিরূপে ব্যবহার করা যায়। আমরা সকলেই প্রাণের ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু কি শোচনীয় ভাবেই না উহার অপচয় ঘটে! প্রস্তুতির স্তরে প্রথম নীতি হইল সমুদয় জ্ঞানই অভিজ্ঞতা-প্রসূত। পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহিরে যাহা কিছু বিদ্যমান, আমাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার জন্য উহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

অবচেতন, চেতন ও অতিচেতন—এই তিনটি স্তরে আমাদের মন ক্রিয়া করিয়া থাকে। যোগীই কেবল অতিচেতন মনের অধিকারী। যোগের মূলতত্ত্ব

হইল, মনের ঊর্ধ্বে গমন। আলোক অথবা শব্দের স্পন্দনমাত্রা অনুযায়ী এই তিনটি স্তরের বিষয় অবগত হওয়া যায়। আলোর কতকগুলি স্পন্দন এত মন্থর যে, সহজে উহা দৃষ্টি-গোচর হয় না—স্পন্দনমাত্রা দ্রুত হইয়া আমাদের নিকট আলোকরূপে প্রতিভাত হয়; তারপর স্পন্দনের বেগ এত দ্রুত হয় যে, আর উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। শব্দ সম্বন্ধেও অনুরূপ ঘটিয়া থাকে।

স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না করিয়া কিরূপে ইন্দ্রিয়াতীত হইতে পারা যায়, তাহাই শিখিতে হইবে। কতকগুলি যৌগিক ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে গিয়া পাশ্চাত্য মন বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে ঐ শক্তিগুলি তাঁহাদের মধ্যে অস্বাভাবিকরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রায়ই ব্যাধির আকার ধারণ করে। হিন্দুগণ বিজ্ঞানের এই বিষয়টি অনুশীলনপূর্বক নির্দোষ করিয়াছেন। এখন সকলেই কোন ভয় বা বিপদের আশঙ্কা না করিয়া উহা চর্চা করিতে পারে।

অতিচেতন অবস্থার একটি সুন্দর প্রমাণ হইল মনের আরোগ্য-বিধান; কারণ—যে চিন্তা আরোগ্য সম্পাদন করে, তাহা প্রাণেরই একপ্রকার স্পন্দন এবং উহাকে ঠিক চিন্তা বলা যায় না, কিন্তু চিন্তা অপেক্ষা উচ্চস্তরের এমন কিছু—যাহার নাম আমাদের জানা নাই।

প্রত্যেক চিন্তার তিনটি অবস্থা আছে। প্রথমতঃ চিন্তার উদয় অথবা আরম্ভ—যাহার বিষয়ে আমরা সচেতন নই; দ্বিতীয়তঃ যখন চিন্তা মনের উপরিভাগে আসে; তৃতীয়তঃ যখন চিন্তা আমাদের নিকট হইতে সঞ্চারিত হয়। চিন্তা জলের উপরিভাগে অবস্থিত বুদ্বুদের ন্যায়। চিন্তা ইচ্ছার সহিত যুক্ত হইলে উহাকে আমরা শক্তি বলি। যে স্পন্দন দ্বারা তুমি পীড়িত ব্যক্তিকে নীরোগ করিতে চাও, তাহা চিন্তা নয়—শক্তি। যে মানবাত্মা সকলের মধ্যে অনুস্যূত, সংস্কৃতে তাহাকে 'সূত্রাত্মা' বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

প্রাণের শেষ এবং সর্বোত্তম প্রকাশ হইল 'প্রেম'। যে মুহূর্তে প্রাণ হইতে প্রেম উৎপন্ন করিতে পারিবে, তখনই তুমি মুক্ত। এই প্রেম লাভ করাই সর্বাপেক্ষা কঠিন ও মহৎ কাজ। অপরের দোষ দেখিও না, নিজেরই সমালোচনা করা উচিত। মাতালকে দেখিয়া নিন্দা করিও না; মনে রাখিও, মাতাল তোমারই আর একটি রূপ। যাহার নিজের মধ্যে মলিনতা নাই, সে অপরের মধ্যেও মলিনতা দেখে না। তোমার নিজের মধ্যে যাহা বর্তমান,

অপরের মধ্যে তুমি তাহাই দেখিয়া থাকো। সংস্কার-সাধনের ইহাই সুনিশ্চিত পন্থা। যে-সকল সংস্কারক অন্যের দোষ দর্শন করেন, তাঁহারা নিজেরাই যদি দোষাবহ কাজ বন্ধ করেন, তবে জগৎ আরও ভাল হইয়া উঠিবে। নিজের মধ্যে এই ভাব পুনঃ পুনঃ ধারণা করিবার চেষ্টা কর।

যোগ-সাধনা

শরীরের যথাযথ যত্ন লওয়া কর্তব্য। আসুরিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরাই দেহের পীড়ন করে। মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখিও। বিষণ্ণভাব আসিলে পদাঘাতে তাহা দূর করিয়া দাও। যোগী অত্যধিক আহার করিবেন না, আবার উপবাসও করিবেন না; যোগী বেশী নিদ্রা যাইবেন না, আবার বিনিদ্রও হইবেন না। সর্ব বিষয়ে যিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন।

কোন্ সময় যোগাভ্যাসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ? উষা ও সায়ংকালের সন্ধিক্ষণে যখন সমগ্র প্রকৃতি শান্ত থাকে, তখনই যোগের সময়। প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ কর। স্বচ্ছন্দভাবে আসনে বসিবে। মেরুদণ্ড ঋজু রাখিয়া, সম্মুখে বা পশ্চাতে না ঝুঁকিয়া শরীরের তিনটি অংশ—শির, গ্রীবা ও পঞ্জর সরল রাখিবে। অতঃপর দেহের এক একটি অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র দেহটি সম্পূর্ণ বা নির্দোষ—এইরূপ চিন্তা কর। তারপর সমগ্র বিশ্বে একটি প্রেমের প্রবাহ প্রেরণ কর এবং জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা কর। সর্বশেষে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত মনকে যুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে মনের গতিবিধির উপর একাগ্রতা-সাধনের ক্ষমতা অর্জন কর।

ওজঃশক্তি

যাহা দ্বারা মানুষের সহিত মানুষের (একজনের সহিত অপরের) পার্থক্য নির্ধারিত হয়, তাহাই ওজঃ। যাঁহার মধ্যে ওজঃশক্তির প্রাধান্য, তিনিই নেতা। ইহার প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি আছে। স্নায়ুপ্রবাহ হইতে ওজঃশক্তির সৃষ্টি। ইহার বিশেষত্ব এই যে, সাধারণতঃ যৌনশক্তিরূপে যাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকেই অতি সহজে ওজঃশক্তিতে পরিণত করা যাইতে

পারে। যৌনকেন্দ্রে অবস্থিত শক্তির ক্ষয় এবং অপচয় না হইলে উহাই ওজঃ-শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। শরীরের দুইটি প্রধান স্নায়ুপ্রবাহ মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্ব দিয়া নিম্নে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিরের পশ্চাদ্ভাগে স্নায়ুপ্রবাহ-দুটি ৪ সংখ্যার মতো আড়াআড়িভাবে অবস্থিত। এইরূপে শরীরের বাম অংশ মস্তিষ্কের দক্ষিণ অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্নায়ুচক্রের সর্বনিম্নপ্রান্তে যৌনকেন্দ্র—মূলাধারে (Sacral Plexus) অবস্থিত। এই দুই স্নায়ুপ্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত শক্তির গতি নিম্নাভিমুখী এবং ইহার অধিকাংশ মূলাধারে ক্রমাগত সঞ্চিত হয়। মেরুদণ্ডের শেষ অস্থিখণ্ড এই মূলাধারে অবস্থিত এবং সাঙ্কেতিক ভাষায় উহাকে 'ত্রিকোণ' বলা হয়। সমস্ত শক্তি উহার পার্শ্বে সঞ্চিত হয় বলিয়া ঐ শক্তি সর্পরূপ প্রতীকের দ্বারা প্রকাশিত হয়। চেতন ও অবচেতন—এই দুই স্নায়ুপ্রবাহের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করে। কিন্তু অতিচেতন যখন এই চক্রের নিম্নভাগে উপনীত হয়, তখন স্নায়ুপ্রবাহের ক্রিয়া বন্ধ হয়, এবং উর্ধ্বগামী হইয়া চক্রাকার সম্পূর্ণ করিবার পরিবর্তে স্নায়ু-কেন্দ্রের গতি রুদ্ধ হইয়া ওজঃশক্তিরূপে মূলাধার হইতে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া উর্ধ্বমুখে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ মেরুদণ্ডের ঐ ক্রিয়া (সুষুম্না নাড়ী) বন্ধ থাকে, কিন্তু ওজঃশক্তির গমনাগমনের নিমিত্ত উহা উন্মুক্ত হইতে পারে। এই ওজঃপ্রবাহ মেরুদণ্ডের একটি চক্র হইতে অপর চক্রে ধাবিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি (যোগী) জীবনের এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উপনীত হইতে পারো। মনুষ্যদেহধারী আত্মার পক্ষে সর্বপ্রকার স্তরে উপনীত হওয়া ও সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব বলিয়াই অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানুষের পক্ষে অন্য ধরনের দেহ আর প্রয়োজন হয় না, কারণ সে ইচ্ছা করিলে এই দেহেই তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারে। ওজঃশক্তি যখন এক স্তর হইতে অন্য স্তরে ধাবিত হইয়া অবশেষে সহস্রারে Pineal Gland-এ (মস্তিষ্কের যে অংশের কোন ক্রিয়া আছে কি-না শারীর-বিজ্ঞান বলিতে পারে না) আসিয়া উপনীত হয়, তখন মানুষ দেহও নয়, মনও নয়; তখন সে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত।

যৌগিক শক্তির মহা বিপদ এই যে, ঐ শক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া মানুষ পড়িয়া যায়, এবং উহার যথার্থ প্রয়োগ জানে না। যে-ক্ষমতা সে লাভ করিয়াছে, সেই বিষয়ে তাহার কোন শিক্ষা এবং জ্ঞান নাই।

বিপদ এই যে, এই-সকল যৌগিক শক্তির প্রয়োগের ফলে যৌনানুভূতি অস্বাভাবিকরূপে জাগ্রত হয়, কারণ বাস্তবিকপক্ষে যৌনকেন্দ্র হইতেই এই-সকল শক্তির উদ্ভব। যৌগিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ না করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও উত্তম পন্থা, কারণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত অধিকারীর উপর ঐ শক্তিগুলি অতি মারাত্মক রকমের ক্রিয়া করে।

প্রতীকের প্রসঙ্গে বলিতেছি। মেরুদণ্ডের উর্ধ্বে এই ওজঃশক্তির গতি পেঁচানো স্ক্রু-র মতো অনুভূত হয় বলিয়া উহাকে 'সর্প' বলা হয়। ঐ সর্পের অবস্থান ত্রিকোণের উপরে। যখন ঐ শক্তি জাগ্রত হয়, তখন মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া যায় এবং এক চক্র হইতে অন্য চক্রে বিচরণকালে আমাদের অন্তরে এক নূতন জগৎ উদ্ঘাটিত হয়—অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন।

প্রাণায়াম

প্রাণায়াম-অভ্যাস হইতেছে অতিচেতন মনের শিক্ষা। শরীরের দ্বারা যে অভ্যাস করিতে হয় (শারীরিক প্রক্রিয়া), তাহা তিন অংশে বিভক্ত এবং উহার কার্য প্রাণবায়ু লইয়া—অর্থাৎ নিঃশ্বাস গ্রহণ, ধারণ ও ত্যাগ (পূরক, কুম্ভক ও রেচক)। চার সংখ্যা গণনা করিতে করিতে এক নাসারন্ধ্রের সাহায্যে বায়ুগ্রহণ করিতে হইবে, ষোল সংখ্যা গণনা করিতে করিতে উহা ধারণ করিবে এবং আট সংখ্যা গণনা করিতে করিতে অপর নাসারন্ধ্রের সাহায্যে বায়ু (নিঃশ্বাস) ত্যাগ করিতে হইবে। অতঃপর নিঃশ্বাস লইবার সময় অপর নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া বিপরীতভাবে উহার অভ্যাস করিতে হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এক নাসারন্ধ্র বন্ধ রাখিয়া এই প্রক্রিয়া আরম্ভ করিতে হয়; কিন্তু যথাসময়ে প্রাণবায়ু তোমার বশে (আয়ত্তে) আসিবে। সকাল-সন্ধ্যায় চারিবার এইরূপ প্রাণায়াম করিবে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের পারে

'অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য তোমার সন্নিকটে।' 'অনুতাপ' শব্দটি গ্রীকভাষায় 'Metanoctic' (Meta শব্দের অর্থ—উর্ধ্বে, অতীত) এবং

ইহার আক্ষরিক অর্থ 'জ্ঞানের পারে যাও'—পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের—'এবং স্বীয় অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, যেখানে স্বর্গরাজ্য দেখিতে পাইবে।'

স্তর হ্যামিলটন কোন দার্শনিক আলোচনার শেষে বলিয়াছেন, 'এখানে দর্শনের অবসান (সমাপ্তি), এখানে ধর্মের আরম্ভ।' বুদ্ধির ক্ষেত্রে ধর্মের স্থান নাই এবং কখন থাকিতে পারে না। বুদ্ধিপ্রসূত বিচার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয়ের সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। অজ্ঞেয়বাদিগণ বলেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে জানিতে সমর্থ নন, এবং তাঁহারা ইহা যথার্থই বলিয়া থাকেন, কারণ ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ জ্ঞান তাঁহারা নিঃশেষ করিয়াছেন, তথাপি ঈশ্বর-জ্ঞান সম্বন্ধে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। অতএব ধর্মকে প্রমাণ করিবার জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অমরত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আমাদিগকে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ ও তত্ত্বদর্শিগণ 'ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন' বলিয়া দাবি করেন, অর্থাৎ তাঁহারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, এবং স্বীয় অন্তরেই ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। মানুষ যখন এই বিশ্বের অন্তর্গত সেই পরম সত্য দর্শন করে, কেবল তখনই তাহার সকল সন্দেহের নিরসন হয়, এবং হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়। ইহাই 'ঈশ্বর-দর্শন'। আমাদের কাজ হইল সত্যকে নিরূপণ করা, কেবল মতামত গলাধঃকরণ করিলে চলিবে না। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো ধর্মজগতেও সাক্ষাৎভাবে জানিবার জন্য তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যে যে জ্ঞান আছে, তাহার বাহিরে যাইলেই উহা সম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ধর্মজগতের সত্যসমূহ যাচাই করিয়া লওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর-দর্শনই একমাত্র লক্ষ্য, শক্তিলাভ নয়। শুদ্ধ সৎ, চিৎ ও প্রেমই জীবনের লক্ষ্য ; এবং প্রেমই ঈশ্বর-স্বরূপ।

চিন্তা, কল্পনা ও ধ্যান

স্বপ্নে ও চিন্তায় আমরা যে বৃত্তি অর্থাৎ কল্পনা প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহাই সত্যে উপনীত হইবার উপায় হইবে। কল্পনাশক্তি অধিক প্রবল হইলে বিষয়বস্তু দৃষ্ট হয়। অতএব কল্পনা-সহায়ে আমরা শরীরকে সুস্থ

অথবা পীড়িত অবস্থায় আনিতে পারি। যখন কোন বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন মস্তিষ্কের অণুপরমাণুগুলির অবস্থান নলের ভিতর দিয়া নানা রঙের কাচখণ্ডের প্রতিফলন দ্বারা দৃষ্ট কারুকার্যের ন্যায় হইয়া থাকে (Kaleidoscopic)। মস্তিষ্কের অণুপরমাণুগুলির ঐরূপ সংস্থাপন ও সংযোগের পুনঃপ্রাপ্তিই 'স্মৃতি' বলিয়া অভিহিত হয়। ইচ্ছাশক্তি যত প্রবল হয়, মস্তিষ্কের পরমাণুগুলির পুনর্বিন্যাসের সফলতা তত অধিক হইয়া থাকে। দেহকে আরোগ্য করিবার একটিমাত্র শক্তিই আছে, এবং ঐ শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। ঔষধ ঐ শক্তিকে উদ্দীপিত করে মাত্র। দেহের মধ্যে যে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, ঐ শক্তি দ্বারা তাহা বিতাড়িত হয়, এবং দেহের রোগ ঐ সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ। যদিও ঔষধের দ্বারা দেহপ্রবিষ্ট বিষ দূরীভূত করিবার শক্তি উদ্দীপিত হইয়া থাকে, চিন্তাশক্তির দ্বারাই উহা অধিকতর স্থায়িভাবে উদ্দীপিত হয়। পীড়ার সময় যাহাতে আদর্শ স্বাস্থ্যের স্মৃতি জাগরিত হয় এবং সুস্থ থাকাকালীন মস্তিষ্কের পরমাণুগুলি যে-অবস্থায় ছিল, পুনর্বিন্যাসের সময় আবার সেরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারে, সেজন্য স্বাস্থ্য ও শক্তি-সম্বন্ধীয় চিন্তায় কল্পনার আধিপত্য প্রয়োজন। ঐ অবস্থায় শরীর মস্তিষ্কের অনুসরণ করিবার প্রবণতা লাভ করে।

পরবর্তী ক্রম হইল আমাদের উপর অপরের মনের ক্রিয়ার দ্বারা উক্ত প্রণালীতে উপনীত হইতে পারা। ইহার বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখা যায়। যে উপায়ে এক মনের উপর অপর মন ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহা শব্দ। সৎ ও অসৎ চিন্তাগুলির প্রত্যেকটিই প্রভাবসম্পন্ন শক্তি এবং এই বিশ্ব ঐরূপ চিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ। অনুভূত না হইলেও কম্পন যেমন চলিতে থাকে, সেইরূপ কার্যে রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত চিন্তা চিন্তারূপেই বিদ্যমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ঘুঁষি না মারা পর্যন্ত হাতের মধ্যে ঐ শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে, অবশেষে উহা কার্যে রূপান্তরিত হইয়া ঘুঁষিতে পরিণত হয়। আমরা সৎ ও অসৎ উভয়বিধ চিন্তার উত্তরাধিকারী। যদি আমরা নিজেদের পবিত্র ও সৎচিন্তার যন্ত্রস্বরূপ করি, তবে সৎ চিন্তাসকল আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে। শুদ্ধাত্মা কখনও অসৎ চিন্তা গ্রহণ করিবে না। অসৎ লোকের মনই অসৎ চিন্তাগুলির উপযুক্ত ক্ষেত্র। এগুলি ঠিক

জীবাণুর মতো উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। চিন্তাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায়; নূতন নূতন আবেগ ঐগুলিতে কম্পন সৃষ্টি করিয়া চিন্তারাজ্যে উদিত হয়; অবশেষে এক বৃহৎ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া অপরগুলিকে আত্মসাৎ করে। প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর এই বিশ্বজনীন চিন্তাপ্রবাহের পুনরুত্থান ঘটে, এবং তখন ঐ বৃহৎ তরঙ্গটি অন্যান্য ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করে। এইরূপে একজন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তিনি যে-যুগে বাস করেন, সে-যুগের চিন্তাসমূহ তিনি নিজ মনের মধ্যে ধারণ করেন এবং ঐগুলিকে বাস্তব রূপ দিয়া মানবজাতির নিকট অর্পণ করেন। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, লুথার প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বৃহদাকার তরঙ্গের দৃষ্টান্তস্বরূপ; তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক মানুষের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের পারস্পরিক ব্যবধান প্রায় পাঁচশত বৎসরের। যে-তরঙ্গের পশ্চাতে সর্বদা অত্যুজ্জ্বল পবিত্রতা ও মহত্তম চরিত্র বিরাজ করে, তাহাই পৃথিবীতে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর একবার আমাদের যুগে চিন্তাতরঙ্গের স্পন্দন বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব উহার অন্তর্নিহিত ভাব, এবং নানা আকারে ও নানা সম্প্রদায়ের উহা আবির্ভূত হইতেছে। এই-সব তরঙ্গের উদ্ভব ও বিলয় পর্যায়ক্রমে হইলেও গঠনমূলক ভাব সর্বদা ধ্বংসের অবসান ঘটায়। তখন মানুষ নিজ আধ্যাত্মিক স্বরূপ লাভের নিমিত্ত গভীরে ডুব দেয়, সে নিজেকে কখনও কুসংস্কার দ্বারা বদ্ধ বলিয়া অনুভব করে না। অধিকাংশ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী এবং উহারা বুদ্বুদের ন্যায় ওঠে ও পড়ে, কারণ ঐসকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সাধারণতঃ চরিত্রবল নাই। পূর্ণ প্রেম ও প্রতিক্রিয়াহীন হৃদয় দ্বারাই চরিত্র গঠিত হয়। নেতা চরিত্রহীন হইলে আনুগত্য সম্ভব নয়। পূর্ণ পবিত্রতা দ্বারাই স্থায়ী আনুগত্য ও বিশ্বাস নিশ্চিতরূপে লাভ করা যায়।

একটি ভাব আশ্রয় কর, উহার জন্য জীবন উৎসর্গ কর এবং ধৈর্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাও; তোমার জীবনে সূর্যোদয় হইবেই।

কল্পনার প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরিয়া আসা যাক।

কুণ্ডলিনীকে এমনভাবে কল্পনা করিতে হইবে যেন তাহা বাস্তব। ত্রিকোণ-অস্থিখণ্ডে কুণ্ডলী-আকারে সর্পটি অবস্থান করিতেছে, ইহাই প্রতীক।

তারপর পূর্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস কর এবং নিঃশ্বাস ধারণ করিয়া বা শ্বাসবদ্ধ করিয়া উহাকে ৪ সংখ্যা আকৃতির নিম্নে প্রবহমান স্রোতের মতো কল্পনা কর। স্রোত যখন নিম্নতম অংশে উপনীত হয়, তখন উহা ত্রিকোণাবস্থিত সর্পটিকে আঘাত করে এবং ফলে সর্পটি মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া উর্ধ্বে উত্থিত হয়—এইরূপ চিন্তা কর। চিন্তা দ্বারা প্রাণপ্রবাহকে ত্রিকোণাভিমুখে পরিচালনা কর।

দৈহিক প্রণালী আমরা এখন শেষ করিলাম এবং এই অংশ হইতে মানসিক প্রণালীর আরম্ভ।

প্রথম প্রক্রিয়ার নাম—'প্রত্যাহার'। মনকে বাহ্য বিষয় হইতে গুটাইয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে।

দৈহিক প্রণালী শেষ হইলে মনকে ইচ্ছামত দৌড়াইতে দাও, বাধা দিও না। কিন্তু সাক্ষীর ন্যায় উহার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখো। এইরূপে এই মন তখন দুই অংশে বিভক্ত হইবে—অভিনেতা ও দ্রষ্টা। তারপর মনের যে-অংশ দ্রষ্টা বা সাক্ষী, তাহাকে শক্তিশালী কর এবং মনের গতিবিধি দমন করিবার চেষ্টায় সময় নষ্ট করিও না। মন অবশ্যই চিন্তা করিবে; কিন্তু ধীরে ধীরে এবং ক্রমশঃ সাক্ষী যখন তাহার কার্য করিয়া যাইবে, অভিনেতা—মন অধিকতর আয়ত্ত হইবে, যে-পর্যন্ত না তোমার অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া : ধ্যান। ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। আমরা স্থূলদেহধারী এবং আমাদের মনও রূপ চিন্তা করিতে বাধ্য। ধর্ম এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং বাহ্যরূপও অনুধ্যানের সাহায্য করে। কোন রূপ ব্যতিরেকে তুমি ঈশ্বরের চিন্তা (ধ্যান) করিতে পার না। চিন্তা করিতে গেলে কোন না কোন রূপ আসিবেই, কারণ চিন্তা ও প্রতীক অবিচ্ছেদ্য। সেই রূপের উপর মন স্থির করিতে চেষ্টা কর।

তৃতীয় প্রক্রিয়া : ধ্যানাভ্যাস দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায় এবং ইহা যথার্থ 'একাগ্রতা' (একমুখীনতা)। মন সাধারণতঃ বৃত্তাকারে ক্রিয়া করে। কোন একটি বিন্দুতে মন নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা কর।

অবশেষে ফললাভ। মন এই অবস্থায় উপনীত হইলে আরোগ্যকরণ, জ্যোতিঃদর্শন ও সর্বপ্রকার যৌগিক শক্তি লাভ হয়। মুহূর্তমধ্যে তুমি এই

চিন্তা-প্রবাহ কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতে পারো, যেমন যীশুখ্রীষ্ট করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ করিবে।

পূর্বে যথাযথ শিক্ষা না থাকায় এই-সকল শক্তিদ্বারা অনেকের পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু আমি তোমাদিগকে ধৈর্য ধরিয়া যোগের এই স্তরগুলি খুব ধীরে ধীরে অভ্যাস করিতে বলি; তারপর সমস্তই তোমাদের আয়ত্তে আসিবে। প্রেম যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে কিছু পরিমাণে আরোগ্যকরণ অভ্যাস করিতে পারো, কারণ প্রেম কোন অনিষ্ট সাধন করে না।

মানুষমাত্রেই অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ও ধৈর্যহীন। সকলেই শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সেই শক্তি অর্জন করিবার জন্য অতি অল্প লোকই ধৈর্য ধারণ করে। সে বিতরণ করিতেই উৎসুক, কিছু সঞ্চয় করিবে না। অর্জন করিতেই দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু খরচ করিতে অল্প সময় লাগে। সুতরাং শক্তি অর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অপচয় না করিয়া সঞ্চয় কর।

রিপুর প্রত্যেকটি তরঙ্গ দমন করিলে তাহা তোমার অনুকূলে সমতা রক্ষা করে। অতএব ক্রোধের পরিবর্তে ক্রোধ প্রদর্শন না করাই উত্তম কৌশল। সকল নৈতিক বিষয়েই এই নিয়ম প্রযোজ্য। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, 'অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না।' এই উপদেশ যে কেবল নীতিসঙ্গত, তাহা নয়; সত্যই ইহা উত্তম পন্থা। ইহা আবিষ্কার না করা পর্যন্ত আমরা উহার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করি না, কারণ যে-ব্যক্তি ক্রোধ প্রদর্শন করে, সে শক্তির অপচয় করিয়া থাকে। মস্তিষ্কে ঐ-সকল ক্রোধ ও ঘৃণার সমাবেশ হইতে পারে, এরূপ সুযোগ মনকে দেওয়া সঙ্গত নয়।

রসায়ন-বিজ্ঞানে মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিকের কার্য সমাপ্ত হইবে। একত্ব আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিজ্ঞান পূর্ণত্ব লাভ করে, এবং বহু সহস্র বৎসর পূর্বে এই একত্ব লব্ধ হইয়াছে। মানুষ পূর্ণ ঐক্যে উপনীত হয় তখনই, যখন সে বোঝে, 'আমি ও আমার পিতা এক।'

নির্দেশিকা